যুগ-বিপ্লবী বিবেকানন্দ

(ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

নব ভারতী

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব
ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ **বিজয়ানন্দ স্বামীর**
অভয় করে অর্পণ করলুম

মৃণালকান্তি

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে অনেক বই লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে এই বীর সন্ন্যাসীর আবির্ভাব শুধু আমাদের ধর্ম্মজীবনের দিক্ হইতে নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনের দিক্ হইতেই এত তাৎপর্য-পূর্ণ যে এসম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয় ততই ভাল। এই আলোচনার প্রেরণা আমাদের জাতীয় জীবনকে সামগ্রিকভাবে শ্রেয়োবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—এই জন্যই শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি দাশ গুপ্তের 'যুগ-বিপ্লবী বিবেকানন্দ' গ্রন্থখানিকে আমরা স্বাগত ভাষণ জানাইতেছি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'ধর্ম্ম' কথাটি বহুদিন হইতেই একটি বিশেষ অর্থে এবং একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হইতে দেখি। বিশেষ অর্থে ধর্ম্ম কথাটি ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' কথাটিরই সমার্থক—অধ্যাত্মজীবনের প্রতি দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ভগবান্ বা দেব-দেবী অবলম্বনে কৃত্যাদিই তাহার মুখ্য অংশ। ব্যাপক অর্থে ধর্ম্ম কথাটি হইল বিশ্ব-প্রবাহের অন্তর্নিহিত পরমশ্রেয়োঃ-রূপ একটি শাশ্বত সত্যে বিশ্বাস—যে সত্য আমি—আমার সমগ্র জীবন—সমগ্র সমাজ-জীবন—সমগ্র বিশ্বজীবনকেই ধারণ করিয়া আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, একেবারে সর্ব্বত্র না হইলেও বহু স্থলেই আমরা ধর্ম্মকে তাহার বিশেষ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং সেই বিশেষ অর্থকে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকে আমরা বাস্তব জীবন হইতে যেন একটু একটু করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিলাম। শ্রেয়ঃ যদি জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন শ্রেয়ঃ হয় তবে তাহা আর জীবনকে ধারণ করিতে পারে না—ফলে জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা ব্যবধান বড় হইয়া উঠিয়া ধর্ম্মকে একটা কৃত্রিম পোষাকী রূপ দান করিতেছিল। ধর্ম্মের এই জীবন-বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম রূপটা যে শুধু আমাদের কোনও মঙ্গলের কারণ হয় না তাহাই নহে, তাহা উল্টা দিকে আমাদের সমাজ-জীবনের মধ্যে কতগুলি কৃত্রিম শ্রেণীবিরোধ সৃষ্টি করিয়া একটা শোষণেরই প্রচ্ছন্ন পন্থা রূপে দেখা দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড় কাজ হইল, জীবন-বিচ্ছিন্ন এই ধর্ম্মের ভাঁওতার উপরে নির্ম্মম আঘাত—এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহ্বান ধর্ম্মকে

সর্ব্বভাবে জীবনগত করিয়া তোলার জন্য। তাঁহার বহু উচ্চারিত 'প্র্যাক্‌টিক্যাল্ বেদান্ত' (Practical Vedanta) কথাটির অব্যর্থ ইঙ্গিত এই দিকেই। পরম শ্রেয়ঃকে তিনি বাস্তব জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষিত করিয়া লইয়া কোনও অলক্ষ্য লোকে নির্ব্বাসিত করিবার সক্রিয় বিরোধী ছিলেন—তিনি তাঁহার বজ্র-নির্ঘোষে প্রচার করিলেন সেই ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম সমগ্র জীবনকে ধারণ করিয়া বরেণ্য জ্যোতির আলোকে বিশ্বমানবকে মঙ্গলের পথে উর্ধ্বায়নের নিরন্তর প্রেরণা দান করে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ যুগধর্ম্মের পটভূমিকাটিকেও আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর দিকে দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বানিজ্যের যে উত্তরোত্তর প্রসার দেখা গেল তাহার ভিতর দিয়া কত গুলি মতবাদ ক্রমপ্রধান্য লাভ করিতে লাগিল, এই মতবাদ গুলিকে যদি আমরা দুইটি সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করি তাহা হইলে তাহাদিগকে নাম দেওয়া যাইতে পারে বুদ্ধিবাদ এবং মানবতাবাদ। এতদিন যে অন্ধ বিশ্বাসের উপরে আশ্রয় করিয়া মানুষ প্রেয় ও শ্রেয়ের স্বপ্নসৌধ রচনা করিয়াছিল মোহমুক্ত জ্ঞানের অনুশীলন এবং বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কার সেই স্বপ্নসৌধের ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ফাটল ধরাইয়া দিল। মানুষের বুদ্ধির উপরে মানুষের দেখা দিল নূতন করিয়া শ্রদ্ধা এবং আস্থা। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে সেই বুদ্ধি আসিয়া আমাদের ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ডাইনে বাঁয়ে যখন অফুরন্ত প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতে লাগিল—আমরা তখন তাহার সন্তোষজনক উত্তর কোনও দিকে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আসলে আমাদের শান্তিস্বপ্নের মধ্যে এত রূঢ় প্রশ্নের শাণিত শরবর্ষণের জন্য আমরা হয়ত প্রস্তুতই ছিলাম না। কিন্তু যে যুগে এই প্রশ্নগুলি আসিয়া চারিদিক হইতে আমাদের শান্তিভঙ্গের কারণ রূপে দেখা দিতেছিল সেই যুগে বুদ্ধিকে আর প্রাজ্ঞজনোচিত অবজ্ঞায় উড়াইয়া দিবার উপায় ছিল না—কারণ সে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনের উপরে পুর্ণ প্রতিষ্ঠিত। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি—আর ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহাকে অবান্তর বা অবাঞ্ছিত বলিয়া উড়াইয়া দিব তাহাত কখনও সম্ভব হয় না। এই বুদ্ধি-বাদের অনিবার্য পরিণতি সংশয় এবং অবিশ্বাসে; আর উনবিংশ শতাব্দীর

বাঙালীর সেই সংশয় এবং অবিশ্বাস একদিন রক্তমাংসের মূর্ত্তি গ্রহণ করিল যুবক নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। এই বিগ্রহীভূত সংশয়কে এড়াইয়া চলিলে কোনও লাভ হইবে না—ইহার জিজ্ঞাসার সমাধান চাই। সেই সমাধানের আশায় যুবক নরেন্দ্রনাথ আসিয়া বসিলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরের গদাধর পুরোহিতের কাছে—বোধির মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিল বুদ্ধি। সমাধান আসিল শুধুমাত্র তর্কের পথে নয়—গভীর উপলব্ধির পথে—যে উপলব্ধিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—যাহা হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ভেদ করিয়া দেয়—ছিন্ন করিয়া দেয় সর্ব্ব-সংশয়। উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদ এবং তৎপ্রসূত যুক্তিবাদ অস্বীকৃত বা অবজ্ঞাত না হইয়া অনন্ত শক্তি সঞ্চয় করিল উপলব্ধির অমৃত-প্রস্রবণ হইতে—নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধিবাদ সার্থকতা লাভ করিল বিবেকানন্দের মধ্যে—যিনি বাঙালী জীবনের কালী-মায়ের খড়-মাটি ছানিয়াই সৃষ্টি করিলেন অপুর্ব্ব এক জীবনগত বেদান্তধর্ম্মকে।

অন্যদিকে বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদ ও জাতির মন ষোল আনা না হইলেও বার আনা দখল করিয়া বসিয়াছিল; মানুষের ঝোঁক দেখা দিল মর্ত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া স্বর্গের দিকে না তাকাইয়া স্বর্গকেই মাটির মর্ত্ত্যের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মর্ত্ত্যকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে; মানুষ ছাড়িয়া দেবতা ভজিতে না গিয়া মানুষের মধ্য দিয়াই দেবতাকে সত্য করিয়া তুলিতে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই ধর্ম্মকে শুধু জীবনগত করিতে বলিলেন না,—দেবোপসনাকে ছড়াইয়া দিলেন নরের সেবার মধ্যে—শিবকে আবিষ্কার করিতে বলিলেন জীবের মধ্য দিয়া। নর তখন রূপ নিল নারায়ণের—সাধনা তাই রূপ নিল সেবার। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্ম প্রথমতঃ তাই সমগ্র জীবনকে ধারণ করিয়া রাখিবার কর্ম্ম; দ্বিতীয়তঃ তাহা বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত সেবার ধর্ম্ম। বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সেবার অধিকারই আসে না—সেবা সেখানে কর্ম্মবন্ধন; আবার সেবায় পুর্ণ পরিণতি লাভ না করিলে বেদান্ত যে শুধু তত্ত্বমাত্রে অনর্থক হইয়া রহিল। এই সব দিক হইতে লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—বিবেকানন্দ প্রচারিত ধর্ম্মের দৃঢ়পটভূমি উনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম্ম—অন্যভাবে বলিলে বলিতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্ম্মই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী জাতির যথার্থ ধর্ম্ম।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন জীবনের প্রথমাবধি এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বীর্য্যে ও তেজে গঠিত ছিল তাঁহার দেহ। একটা তন্দ্রাগ্রস্ত জাতির মধ্যে তিনি

তাঁহার এই অগ্নিমন্ত্রের আবৃত্তি করিয়াছিলেন সিংহবিক্রমে—আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ একদিন সেই দীপ্ত নির্ঘোষে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করিয়া সে ধ্বনি গিয়া কম্পন জাগাইয়াছিল দেশে দেশে বহু মানুষের প্রাণে। সেই অগ্নিদীপ্ত চরিত্র আকর্ষণ করিতেছে আজিও বাঙালীর শ্রদ্ধালু মনকে—সেই শ্রদ্ধালু মন লইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন শক্তিমান্ নবীন লেখক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। এই চরিত্রটির ব্যাপ্তি ও মহিমাকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া শুধু একটা সাহিত্য-কর্ম্ম নয়—ইহা একটা মহান্ জাতীয় কর্ম্ম। লেখক 'যুগ-বিপ্লবী বিবেকানন্দ'কে অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ইহা দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নাই; সেই দুঃসাহসকে যদি কেহ চপলতাও বলেন সেক্ষেত্রেও লেখক বলিবেন,—'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ'—এত বড় বিরাট চরিত্র তাঁহার অন্তরের সকলটুকু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া নিজের বেগে যেন উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে। এই স্বতঃউৎসারণ তাঁহার শ্রদ্ধার অর্ঘ্যের সহিত শিল্পিমনের সকল অর্ঘ্যও মিলাইয়া দিয়াছে; এই দুই প্রকারের অর্ঘ্য ত আসলে দুই নয়—সততায় ও অকাপট্যে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। লেখকের কোনও সচেতন স্পর্ধা নাই—আছে আন্তরিক নিবেদন; সেই নিবেদনকে যাঁহারা সহৃদয় মন লইয়া আগাইয়া আসিয়া গ্রহণ করিয়া লইবেন তাঁহারাই করিবেন লেখকের সকল সাধনার মর্যাদা দান। লেখক শুধু স্বামিজীর চরিত্র বর্ণনা করেন নাই—কথার তুলিকায় সমগ্র পরিবেশ সহ তাঁহার জীবনটিকে অঙ্কিত করিয়া পাঠক সাধারণের নিকট তাহাকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, জীবন্ত মানুষটিরই স্পর্শ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার যে সাফল্য তাহাকে আমি অসামান্য বলিয়াই মনে করি।

৯৮।৪ রসা রোড,
কলিকাতা—২৬
১।১০।৫৫।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

যুগ-বিপ্লবী বিবেকানন্দ

১

"তোদের বংশের কেউ সন্ন্যেসী হয়েছে ?"

"গিয়েছে কেউ ঘর-বাড়ী ছেড়ে ? আরাম-ঐশ্বর্য্যের সুখ-অঙ্কে গা এলিয়ে না দিয়ে পরমাত্মার অভিসারে ? মায়া-দয়া-প্রেম-প্রীতির স্মৃতিটুকু মুছে, হেলায়-খেলায় মোহ-বাঁধন ছিঁড়ে, গিয়েছে কেউ গৈরিক বাস প'রে তার মন-মাঝির খোঁজে ?"

স্কুলে ভর্ত্তি হোতে নতুন কোন ছেলে এলেই তার কাছে নরেনের এই প্রথম প্রশ্ন—প্রথম জিজ্ঞাসা।

টাকার খোঁজ নয়। নয় ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের নিরিখ জানার তাগিদ। নয় জমিদারীর মুনাফা বা তালুকের আয়ের অঙ্ক। কেবল কেউ সন্ন্যেসী হয়েছে কিনা তাই জানার আকুলি।

সাথীদের চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। অবাক্ দৃষ্টি। বয়স তো মাত্র সাত। নীচু শ্রেণীর ছাত্র। মেট্রোপলিটন্ স্কুলের সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর। তার মুখে একি কথা! কোথায় খোঁজ নেবে, তোর জামাটা কত, জুতো-জোড়া কিনে দিলে কে রে ? আচ্ছা ভাই, তোর ঐ পেন্‌সিল্‌টার দাম কত ? তা নয়, কেউ সন্ন্যেসী হয়েছে কি না তার খোঁজ!

আবার বলে—"ধন-মান, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে বিবাগী হয়ে ?"

—গিয়েছে কেউ মায়ের বুকে বেদন স্রোতের উজান বইয়ে ? বিরহিণী প্রিয়ার চোখে জোয়ার এনে ? কাঞ্চনের রৌদ্র-দগ্ধ রংএর আভায় অন্ধকারের গুণ্ঠন টেনে ? গিয়েছে, গিয়েছে কেউ সন্তানের কাঁদোন-ধোয়া ডাকে সাড়াটি না দিয়ে বধির হ'য়ে ?

এ যেন কত বড় বাহাদুরি। কত বড় গৌরবের বারতা। সন্ন্যাসী হওয়া যেন রাজার রাজত্বের চেয়েও মস্ত ঐশ্বর্য্যের ব'লে মনে হয় নরেনের কাছে। বুক ফুলিয়ে, উন্নত-শিরে মন্দ্রমুখর হ'য়ে তাই বারে বারে শুধায়—"হয়েছে কি কেউ তোদের বংশে সন্ন্যেসী ?"

যারা ওকে জান্‌তো, তারা বলে শ্লেষ ক'রে, টিপ্পনী কেটে—"তা দিয়ে তোর দরকারটা কি? তুই বেশ আছিস্‌। আছিস্‌ রাজার হালে, সুখের পায়রাটি হ'য়ে! বাপ তোর এটর্ণী। আয় করে দু'হাত ভ'রে। খরচ করে মন উজিয়ে। তোর আবার ভাবনা কি? সন্ন্যাসীর খোঁজে তোর কি দরকার? তোর বংশে আবার সন্ন্যাসী কি!"

নরেন বলে—"ছাই জানিস।" ঝাঁজিয়ে ওঠে। ওঠে হুঙ্কার দিয়ে ওদের কথার প্রতিবাদ করে। বলে—"আমার ঠাকুরদা দুর্গাচরণ দত্ত সন্ন্যেসী হয়েছিলেন—"

ধনীর ধন, মানীর মান পারেনি দুর্গাচরণ দত্তকে আকৃষ্ট করতে। আকৃষ্ট করতে পারেনি নব নাগরিক সভ্যতার বিলাস-আড়ম্বরের মোহিনী মায়া।

মন টানে তার উল্টো স্রোতে। পড়ে রামায়ণ, বেদান্ত। সঙ্গ খোঁজে সাধু-সন্ন্যাসীর।

এলো তার জীবনে কি এক বৈরাগ্য! দেখলো যেন কি এক দিব্য শুদ্ধ স্নিগ্ধ সুন্দর মোহন মূরতি। শুনল তার আহ্বান। যেন ডাকছে সুদূর থেকে, ওরে তুই আয়! কেটে গেল তার সংসারের ঘোর। পার্থিব জগতের মায়া-মোহের বাঁধন গেল শিথিল হ'য়ে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে দুর্গাচরণ লোভ-লালসা, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির যবনিকা টেনে চলে গেল। গেল সত্যের সন্ধানে। গেল তার আত্মার আত্মীয়ের খোঁজে।

পেছনে রেখে গেল দুর্গাচরণ তার চিরবিরহিণী প্রিয়া। আর রেখে গেল প্রাণাধিক শিশু-পুত্র বিশ্বনাথ দত্তকে।

তারপরে গড়িয়ে গেল অনেকগুলো দিন। গেল বেদনা-ব্যথায় বিরহ-বিধুর মনটা নানা তিক্ত মধুর আবেশের মধ্য দিয়ে। যখন মনে জাগে প্রবলভাবে স্বামীর একান্ত উপস্থিতিটুকু, তখন সুদর্শন পুত্র বিশ্বনাথকে কোলে আঁকড়ে একটু শান্তি পায় মা। মুছে ফেলে চোখের জল আঁচলে।

আট বছরের বিশ্বনাথ। চল্‌ল তাকে নিয়েই মা কাশীতে। চল্‌ল নৌকাযোগে বিশ্বনাথ-দর্শনে। যিনি ব্যথা দিয়ে কাঁদিয়েছেন, কোলে পুত্র দিয়ে যিনি আবার দুঃখের শিয়রেই হাসিয়েছেন, চল, তাকে একটিবার দেখে আসি।

বৃষ্টি-ঝরা দিন। মন্দিরের আনাচ-কানাচ সিক্ত, ভিজা। যেন ওর চোখের জলে পথ পৃক্ত হ'য়ে গেছে। গেছে মন্দিরের সম্মুখটুকুও। স্যাৎসেঁতে পিচ্ছিল সিঁড়িটা তো হ'য়ে গেছে যেন তেলতেলে। যেতে যেতে পিছ্‌লে গেল

পা। পড়ে গেল নারী। ছুটে এলো কোথা থেকে যেন এক সন্ন্যাসী। ধরল তাকে। বলল—"মায়ি গির্ গিয়া।"

চমক্ লাগল। শিউরে উঠল। কে এই সন্ন্যাসী? তাকাল একবার মুখোমুখি চোখাচোখি—এ-যে সেই দুর্গাচরণ! বিশ্বনাথের বাবা! "মায়া হায়, এ মায়া হায়"—বলতে বলতে পালিয়ে গেল; পালিয়ে গেল ত্রস্তপায় সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ। ওরা রইল চেয়ে, চেয়ে রইল বিরহিণী প্রিয়া, আর স্নেহের কাঙ্গাল পুত্র।

মন যখন হ'য়ে ওঠে আকুল, ওঠে যখন প্রাণ অধীর চঞ্চল হ'য়ে, নির্ম্মল নিকেতনের পরম সুন্দরকে দেখার জন্য, আসেন তো হৃদ্‌বিহারী তখনই। আসেন ধূলির ধরায় মাটির ঘরে মানুষের মতই। এই যে দর্শন, এই যে স্পর্শন, এ কিসের —এবং কার? বিশ্বনাথ দেখতে গিয়ে দেখে এলো প্রেমময় প্রাণপ্রিয়কে।

এ-যে বিশ্বনাথেরই ইঙ্গিত। তারই প্রেরিত প্রতিভূ! কিন্তু ও যে পালিয়ে গেল। রইল না একদণ্ড। যে পরম, সে যে চরমেই দেখা দেয়। বিপদ কেটেছে তাই চ'লে গেল।

কেটে গেল দ্বাদশ বর্ষ। উৎরিয়েছে নিরীক্ষা পরীক্ষার দিন। এসেছে দুর্গাচরণের জীবনে শান্তি ও সমাহিতি। এসেছে মায়াঘন ছায়া-মেদুর শীতলতা ওর জীবনে। ফিরে এলো একবার ঘরে। এলো সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নিয়ম-বাঁধা পথে। প্রিয়া নাই। চলে গেছে আজ একটি বছর হোল। পেল এসে পুত্র বিশ্বনাথকে। যাক, ভালোই হোল। হয়ত মিনতি জানাত বিরহিণী। কাঁদতো প্রাণ উজিয়ে। গলা ছেড়ে। হয়ত চলার পথটা হ'য়ে যেত পিচ্ছিল। মায়াঘন মানব-মনের চিরন্তনের দাবী জানিয়ে কত কিছুই না বলত। আশীর্ব্বাদ করল দুর্গাচরণ ছেলেকে। তারপরে চলে গেল। চলে গেল তার ঈপ্সিত পথে মুক্তির মহামন্ত্র বুকে ক'রে।

সুখের সংসার বিশ্বনাথের। অভাব নেই। নেই কোন দুঃখ-দৈন্যের কালো কুটিল ঝড়। বেশ সুখে-শান্তিতে দিন কাট্‌ছে বিশ্বনাথ দত্তের। বিশাল সম্পত্তি। দাঁড়িয়েছে কত লোকের ঈর্ষার বস্তু হোয়ে। খ্যাতিতে নামে ডাকে কত লোকের ক্ষীণকাতর দৃষ্টি সজাগ হ'য়ে রয় দত্তবংশের আড়ম্বর-ঐশ্বর্য্যের তোরণদ্বারে।

কিন্তু তবু নেই ভুবনেশ্বরীর মনে শান্তি।

সংসারে বাস ক'রেও উন্মনা। মুখে নেই এক বিন্দু হাসির রেখা। দিন-যামিনী কাটে যেন কি এক ব্যথার বিষে। কাজ ক'রে যায়, কিন্তু মনটা ফেলে

রাখে যেন কোন্ এক অজানা অচিন্ দেশের সম্রাটের পদপ্রান্তে। ফেলে রাখে দীনের দীন হ'য়ে অনাথিনীর মত তার অসহায় আবেদনটুকু। অসংবদ্ধ মন। অধীর-আবেগে আকুল-করা প্রাণ। কাতর, করুণ দৃষ্টি। যেন কি এক অশান্ত ঝড়ের বেগে মুষ্ড়ে গেছে চুপ্সে গেছে মুখ।

আহা, এত যার ঐশ্বর্য্য, এত যার নামডাক, সে কেন স্বামীর গর্ব্বে গরবিণী হ'য়েও পায় না শান্তি? কেন সে পারে না বিভাষ-বিলোল হাসিটুকু দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা নিতে?

এ কিসের দুঃখ? কিসের ক্ষোভ?

কেবল ফুল আর বেলপাতা, বেলপাতা আর ফুল। এই নিয়েই দেব-দেউলের দ্বারে দ্বারে কাটে তার দিন, দিন কাটে গোপন মনের মিনতি-কাতর প্রার্থনাটুকু জানাতে।

সে কত না আবেগ! কত না অনুরাগ!

যেন শৈল-সূর্য্যের শিখরচূড়ায় মেঘবতীর কান্না। যেন বোবা নদীর বাঁকে বাঁকে স্রোতের উজান ধারা। এ-যে কাঁদোন-ধোয়া কাজল বুকের সজল অশ্রুধারা। কিন্তু কেন? কেন এমন হোল?

শিবের পায়ে অর্ঘ্য দেয়। দেয় মন-বাগানের মদির-মধুর কুসুম আজল ভ'রে। দেয় ব্যাকুল-করা আকুল হৃদির পদ্মপলাশ ছিঁড়ে।

একি হোল?

এলো কি ভুবনেশ্বরীর জীবনে মায়া-মোহের বাঁধন ছেঁড়ার পালা?

এলো কি ত্যাগের তীব্র কৃচ্ছ্রব্রত জীবন-মরুর পারে? না ভোগ-বিরতির বিতৃষ্ণা?

না।

তবে?

ওর মানসলোকে হাসে খেলে সুকুমার একটি শিশু। তৃষা-শুষ্ক মরুর বুকে মাতৃস্নেহের উজান। আর সেই উজানের কলস্বনায় ও শোনে, কেবল শোনে দিনরাত মা-মা ডাকের সাড়া।

তাই তো এতো আনাগোনা—আনাগোনা শিবের চরণ-প্রান্তে। দেব-দেউলের দ্বারে দ্বারে আর রামায়ণের পাতায়।

ছিল তো চার-চারটি মেয়ে, তার আবার বিদায় হয়েছে

ছেলের মুখ দেখেনি এখনও। চিঠি লেখে গোপনে কাশীতে, লেখে দত্তবংশের জনৈকা মহিলার কাছে।—পূজা দিও, অর্ঘ্য দিও, দিও হোম শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের শ্রীচরণে। দিও আমার মনের একান্ত কাতর মিনতিটুকু জানিয়ে।

দু'দিন বাদে চিঠি এলো কাশী থেকে। যেমন বলা তেমন করা। পূজো—অর্ঘ্য—হোমে বিশ্বনাথকে জানিয়েছে ভুবনেশ্বরীর মনের কথা। শান্তি পেল মন। তৃষা-শুষ্ক মরুর বুকে হোল বিন্দু বিন্দু বারি-সিঞ্চন। শ্রদ্ধামুগ্ধ মন হোল শান্ত।

কেবল বহির্জগতের বিলাসব্যসনে হয় না মনোরাজ্যের সম্রাটের মনোরঞ্জন। রয় না শুধু অতটুকু নিয়েই সে শান্ত। যেমন নাকি ফল্গু। বুকে তো তার মাটির মায়ের কতই মোহনশ্রী।

মনোরম মুগ্ধকর কত সবুজ কত অবুঝ তরু-লতা-বীথি। নীলাকাশে পাখীর কূজন। হাওয়ায় তারই সুর-লহরী। কি অপূর্ব্ব! কি মধুময়!

কিন্তু কই?

আসেনা তো একটি বারও ফল্গু তাদের কাছে। আসেনা তো চুপিচুপি দুটো কথা কইতে। সবুজ টিপের শ্যামল কান্তি নিতে ললাটপটে! রসঘন মন ধরা দিতে চায় না বাইরে। আত্মসুখে মত্ত হ'যে ডুবে যায় সে গভীরে। ডুবে যায় শীতল তুহিন মনের অতলান্তে। বাইরের আবরণে নেই তার আসক্তি। চায় না চাক্‌চিক্যের ঝলসানো জৌলুস। তাই ফল্গু অন্তঃসলিলা। থাকে আবরণের আড়ালে। দৃষ্টির অন্তরালে;

আছে, থাক প্রচুর ঐশ্বর্য্যের বাহার ভুবনেশ্বরীর। থাক কাঞ্চনের ঠিক্‌রে-পড়া রৌদ্রোজ্জ্বল আভা। থাক দাসদাসী আর পাইক-পিয়াদায় রাজত্বটা ভ'রে। কি আসে যায় তাতে। এ-যে নিছক বাইরের আবরণ। মন এই নিয়েই তো হয় না শান্ত। গোপনে গহনে আর একটি স্রোত বয়, বয় ধীরে চুপিচুপি।

যেমন নাকি ফুলের শোভা—

গাছকে তো উজাড় ক'রে ফোটে কত রং-বেরঙের ফুল। দু'দিন থাকে, তারপরে যায় ঝরে। আবার ফোটে আবার ঝরে। ক্ষণিক শোভায় ক্ষণিক মোহের জাল ছড়িয়ে শুকায় তার রস-রং-শোভা। কিন্তু এ যৌবন, এ স্নিগ্ধ কান্তির শোভন মদির রূপের সার্থকতা কোথায়?

একটি ফলে।

সাত রাজার ধন একটি মাণিক। ঐযে যৌবন, ঐযে রূপ ওর উছলে-পড়া উজল-করা দেহের তটে—মনের হাটে উজান বয় কিসের ?

মাতৃত্বের !

আর সেই অশান্ত অধীর বিলোল বিলাপের পরিসমাপ্তি কোথায় ?

কোল-জোড়া একটি সুকুমার শিশুর মাঝে।

ভুবনেশ্বরীর হয়েছে তো তাই। অধীর আকুল মন। মাতৃত্বের স্নেহ-সুধায় অপরিসীম সাড়া। পাগল-পারা আকুল-করা আহ্বান। আহ্বান তার বুক-দোলানো, মন-ভুলানো, কোল-জুড়ানো শিশুর।

তাইতো মন বসে না ঘরের কাজে। পড়ে থাকে মন্দিরে। উন্মিমুখর ব্যাকুল আশায় বিভোর বিলোল মন। বীতস্পৃহ বাইরের কাজে। একাগ্র মন কেবল পড়ে থাকে গৃহ-দেবতার মন্দিরে। বিশ্বনাথের শ্রীচরণ-কমলে। চিত্ত যায় বিভোর হোয়ে। হোয়ে যায় স্নিগ্ধ শিশুর চিন্তায়। মায়াঘন চোখে ঝরে জল। জ্ঞান-গরিমার উর্দ্ধলোকে ভুবনেশ্বরী শিশুর মত কাঁদে।

তন্ময় ভুবনেশ্বরী। ধ্যানগম্ভীর তার মূর্ত্তি। সেই কখন কোন্ সকাল বেলায় ঢুকেছে মন্দিরে। ভাঙছে না এখনও তার ধ্যান। আস্‌ছে না ফিরে জ্ঞান চেতন-লোকে। রৌদ্র-পোড়া দুপুর গেছে হেলে। হেলে গেছে দিনের আলো পশ্চিমেরই অস্তপারে তিমিরতীর্থ-তীরে। নেইতো বাহ্যজ্ঞান! অচেতনের অনন্তে সে শিশুর মত তন্ময়। ক্রমে গেল দিনের আলো ম্লান হ'য়ে আঁধার পথে। ঘনিয়ে এল ধূসর কালো সন্ধ্যা। জ্বলল সাঁঝের আলো। কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খনাদে মুখর মুগ্ধ সন্ধ্যা। মুগ্ধ হোল ভুবনেশ্বরীর মনটাও। দেখল এমন সময়, দেখল তার জাগর স্বপ্নে তপঃক্লিষ্ট তনু। দেখল যেন ধ্যান-মৌনী দেহটি তার স্বর্গীয় এক স্নিগ্ধ বিভায় মিলে যাচ্ছে ধীরে চুপে। আবেশ-অবশ দেহে তার নেমে এল ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ল ভুবনেশ্বরী গভীর রাতের কোলে। ঘুমিয়ে পড়ল শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহটি তার অচেতনের অঙ্কে।

রাত্রি গভীর।

নিঝুম পুরী। নিথর চতুর্দ্দিক। নেই কোথাও কিছুর সাড়া। সাড়া কেবল ভুবনেশ্বরীর স্বপ্নলোকে কৈলাসেশ্বর শঙ্করের। দেখছে, দেখছে যেন চেয়ে চেয়ে পলকহীন চোখে। দেখছে ভুবনেশ্বরী।

কি দেখছে ?

দেখছে ধবল শুভ্র সৌম্য দিব্য কান্তি। দেখছে অপরূপ রূপলাবণ্যের বিচ্ছুরণে দিক-বিদিক উদ্‌ভাসিত। আলো নয়—জ্যোতির জ্যোছনায়—পুলকিত রাতের আঁধার। বিমুগ্ধ আত্মা। বিস্ময় অপার। ডুব দিল, ডুব দিল দেবী রূপের অতলান্তে—অপরূপ রূপ-রস-ভূবে।

তারপর ?

তারপর তারই মাঝে ধীরে ধীরে আভাসিত হোল একটি অপূর্ব্ব শিশু মূর্ত্তি। এগিয়ে এল কাছে। এগিয়ে এল ভুবনেশ্বরীর তৃষাতুর স্নেহের শীতল অঙ্কে।

ঘুম গেল ভেঙে। ভেঙে গেল তন্দ্রা। অচেতনের পার উজিয়ে এল আলোর বন্যা। দেখল দেবী, দেখল রাতের বুকে কিরণ জ্বলছে রবির। সে কি কেবল ঘরে ? যতদুর দৃষ্টি যায়—যেদিক চায়—যেদিক ধায়, কেবল স্নিগ্ধ শুভ্র আলো।

ভক্তিমতি ভক্তিভরে স্মরণ করল বিশ্বনাথের চরণ। কণ্ঠে জাগল ঘন-গম্ভীর ধ্বনির অনুরণন—"হে শিব—হে শঙ্কর—হে করুণাময়।" প্রণাম করল, প্রণাম করল বারে বারে ভক্তিপ্লুত অন্তরে মনোময়কে, বিশ্বনাথকে ভুবনেশ্বরী।

এমন আর একটি স্বপ্ন দেখেছিল, দেখেছিল স্বর্ণময়ী দেবী। দেখেছিল গৌনকান্তি বিজয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে।

বিজয় কে ?·········

এসেছিল চারশত বছর আগে নদীয়ার শ্রীপাট শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৌরবোজ্জ্বল বংশে। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য ছিল মহাবিষ্ণুর অবতার ব'লে খ্যাত।

জীবের দুঃখে কাতর ভক্ত ভক্তি-মুক্তির পরাশান্তির সন্ধানে কঠোর কঠিন তপস্যায় তন্ময় হোল। তন্ময় হোল অসত্য অশিবের শ্মশান-শিয়রে সত্যের ও জ্ঞানের আলো জ্বালাবার মানসে।

শ্রীহরি পূর্ণ করল তার বাঞ্ছা। অবতীর্ণ হোল পাপক্ষত ক্লেদপৃক্ত বাংলার কোলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

কলিহত জীবকে দিলো কোল। হরিনামের রস-বন্যায় প্লাবন আনল, আনল ব্রজধামের প্রেমবারি মর্ত্তধামের রিক্ত ক্ষেত্রে। পাপী-তাপী নর-নারী এই প্রেম-তরঙ্গে করল অবগাহন। অবগাহন করল নবজীবনের আস্বাদনে। মুক্তি পেল। উদ্ধার হোল। কিন্তু কালের চরণক্ষেপ হ'য়ে এলো মন্থর।

মন্থর হোল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে। ধর্ম্ম হ'য়ে পড়ল মলিন। শাস্ত্র ও সদাচার থেকে ভ্রষ্ট হোল বাংলার ভক্ত সাধকের দল। কর্ত্তা ভজা, কিশোরী সাধকদের প্রভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত নির্ম্মল নিরাবিল শুদ্ধসত্ব বৈষ্ণবধর্ম্মের সৌধশিখর থেকে নেমে এলো, ওরা পাপের পঙ্ক-অঙ্কে। যায়—যায় বুঝি সার্ব্বভৌম বৈষ্ণবধর্ম্ম লুপ্ত হ'য়ে। হাহাকার, হতাশায় শান্তিপুর তথা সারা বাংলায় এক ব্যথার গুঞ্জরণ জাগল। এমন সময় এলো, এলো শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈত বংশে আর এক মহাপুরুষ। এর নাম আনন্দকিশোর। ধর্ম্মচর্চ্চা, পূজা-অর্চ্চনায় কাটে আনন্দের দিন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে করতে দুই চক্ষু সিক্ত হয় জলে। রোমকূপ দিয়ে নির্গত হয় শোণিত-সুধা। ভিজে যায় সর্ব্বাঙ্গ। দেখতে দেখতে বসন যায় রঞ্জিত হ'য়ে। আনন্দ ডাকে তার শ্যামসুন্দরকে। কত রঙ্গ—কত রস—তাকে নিয়ে। কাঁদে, হাসে, কয় কথা। অবশেষে একদিন আনন্দ আনন্দের রস-বন্যায় উচ্ছল, উদ্বেল হ'য়ে উঠল। গলায় বাঁধল নিত্যপূজার শালগ্রামশিলা। স্মরণ করল গৌর-নিতাই—সীতানাথ, শ্যামসুন্দরকে। যাত্রা করল জগন্নাথ দর্শনে। যাত্রা করল শান্তিপুর থেকে বুকে হেঁটে শ্রীক্ষেত্রে। মৃত্তিকা-ঘর্ষণে বক্ষস্থল ও জানুর সন্ধিতে হোল ঘা। রক্ত ঝরতে লাগল সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে। কিন্তু নয়ত সে বিরত হবার! বুকে জানুতে নেক্‌ড়া জড়িয়ে আবার সুরু করল যাত্রা। পুরো একটি বছর বুকে হেঁটে এসে উপস্থিত হোল শ্রীক্ষেত্রে। এই আনন্দেরই পুত্র বিজয়কৃষ্ণ।

রাস-পূর্ণিমার উছলে পড়া—জ্যোছনা। মৃদুমধুর মলয় সমীর বইছে ধীরে ধীরে। বাজছে কাঁসর, বাজছে ঘণ্টা।

দিগঙ্গনার হুলুধ্বনিতে মুখর মুগ্ধ রাত। স্বর্ণময়ী ফিরছে ঘরের দিকে। ফিরছে শ্যামসুন্দরকে প্রণাম ক'রে। স্বচ্ছ পথ। আঁধার নেই কোনখানে। তারই মাঝে এলো, এলো এক জ্যোতি মূর্ত্তি গৌরকান্তি শুভ্র সুন্দর ছেলে। এলো এগিয়ে কাছে। চলতে চলতে ঢুকল গিয়ে ঘরে। ঢুকল স্বর্ণময়ীর আঁচলখানা ধ'রে।

চমক্ লাগে। ফিরে তাকায়। ফিরে তাকায় স্বর্ণময়ী পিছু পানে।

কিন্তু কই?

আরতো নেই !

মূর্চ্ছিত মন। ব্যথার বাণে স্বর্ণময়ীর বুকে জাগে সঘন দোলা। ঘুমিয়ে পড়ে স্বর্ণময়ী, ঘুমিয়ে পড়ে বেদন-ব্যথার রোদনটুকু নিয়ে।

একি ! এ-যে জ্যোছনার চেয়েও ভাস্বর, স্নিগ্ধ ! অপূর্ব্ব, অপরূপ। স্বপ্নে এসে কথা কয়, কথা কয় সেই শিশুটি। আহা, কত আদর, কত সোহাগ। কত কাছের কথা—

"মা, আমি তোমার কাছে এলাম।"

ভগবান তুমি যুগে যুগে আস
মানুষেরে ভালো বেসে,
তপ্ত ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন ধরায়
দীনতম দীন বেশে।
মোহ বাসনার অন্ধ আঁধারে
আলোর দিশারী জ্ঞানের আধারে
সত্যের চীর পরা প্রজ্ঞার
বর্ত্তিকা লয়ে হেসে,
মানুষের ঘরে মানুষের মত
দীনতম দীন বেশে।

এ বিজয় কি যে-সে ছেলে !

পূজারী এসে দরজা খুলবে শ্যামসুন্দরের। মন্দির বন্ধ। বিজয় খেলছিল বসে। খেলছিল যেন কার সাথে। হঠাৎ একি হোল ! শিশু বিজয় তার দু'খানা ছোট্ট হাত দিয়ে প্রাণপণ ঠেলছে দরজা। তার কাঠের রঙিন বল হারিয়ে গেছে। গেছে তা' শ্যামসুন্দরের কাছে কি ?

"এই শ্যামসুন্দরই পালিয়ে এসেছে আমার বল নিয়ে। ও—ওযে খেলছিল আমার সঙ্গে।" কারও কথা শুনছে না বিজয়। ঠেলছে, শুধু ঠেলছেই দরজা। কিন্তু খুলছে না যে। তখন আকুল আকুতি, অধীর মিনতি—দিয়ে দাও আমার বল। শুধু কেন বসে রইলে দরজা এঁটে ? এস না বাইরে। এস একটিবার দরজা খুলে।

না, এতেও তো হচ্ছে না। গলছে না শ্যামসুন্দরের অন্তর।

রাগে রোষে টৈটম্বুর হোল বিজয়। ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো একখানা লাঠি। আচ্ছা রইলেম। পূজারী এসে তো খুলবে।

"একটু পরে দুয়ার খুললে তোমায় কে রক্ষা করে দেখব।" দরজা তো খুলল এসে পূজারী। কিন্তু ঢুকতে দিল না তাকে মন্দিরে।

কেন ?

পৈতে হয়নি যে এখনও।

রাগে দুঃখে বালক শ্যামসুন্দরকে বলতে লাগল—

"আমার বল নিয়ে পালিয়ে এলে। আবার আমাকে ঘরে যেতে দেওয়া হোল না। আচ্ছা, কাল আবার খেলতে এসো।

আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে জলগ্রহণ করছি না।"

কিছু খেল না বিজয়। পড়ে রইল গভীর দুঃখে অনুরাগে চুপটি ক'রে।

মা শুয়ে পড়ল ওর ঘরে ভাত রেখে। কত সাধ্য সাধন মার।

কিন্তু ফল হোল না কিছু।

ঘুম গেল ভেঙে। ঘুম ভেঙে গেল মাঝ-রাতে স্বর্ণময়ীর। শুনছে যেন বিজয় কথা কইছে কার সাথে—

"যাক, ঘাট মানলে। তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা।" ক্ষণিক পরে অনুরাগে আবেগে বলতে লাগল আবার—

"আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাইনি। কিন্তু তাই ব'লে তুমি কেন খেলে না ?"

স্বর্ণময়ী তো অবাক্।

"বেশ, বেশ, দু'জনে এক সঙ্গে খাই এস।"

ঢাক্‌নাটা তুলল বিজয়। খেতে লাগল ভাত। সাথে যেন আরো কে একজন খেতে ব'সে গেল।

ভক্ত আর ভগবান। এর মাঝে ভেদ কিসের ?

একাত্ম সম্বন্ধ, অভিন্ন প্রাণ।

তোমার দুঃখে ও কাঁদবে না ? না কাঁদলে চলবে কেন ? তুমি না হোলে যে শ্যামসুন্দরের খেলা জমবে না। ও খেলবে কার সাথে ?

পৌষের হিমাক্ত সকাল।

আচ্ছন্ন দিগ্‌বলয় কুয়াশার কুজ্ঝটিকায়।

হিমমলিন তুহিনশুভ্র শ্বেত বিন্দু ঢেকে দিয়েছে শ্যামলা মায়ের সবুজ হাসি।

তারই মাঝে চলেছে—

চলেছে ত্রস্ত-পদ-সঞ্চারে নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

যেন মিছিল ক'রে যাচ্ছে—

যাচ্ছে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে—

যাচ্ছে সংক্রান্তির সকালে পুণ্যি সঞ্চয়নে।

মকর সপ্তমীর স্নান আজ।

দ্যুলোক-দুহিতা উষার সবে ভাঙল এই ঘুম।

ওঠেনি এখনও সূর্য্য।

ডাকছে পাখী। ডাকছে মোরগ—ওঠো জাগ ব'লে। আলতু হাওয়া বইছে চুপিচুপি—শীত-কাতর নরনারীর দেহে-মনে শিহরণ জাগিয়ে। কাঁপছে তারা। কাঁপছে যেন বাঁশবনের চিরল পাতার মত।

ওদিকে তো ভুবনেশ্বরী প্রায় সংজ্ঞাহীনা।

তীব্র ব্যথায় জর্জ্জরিত দেহ। কাঁপছে থেকে থেকে।

যেন নদীর জলে মৃদু দোলন,—

দোলন সূর্য্য জাগার আগে।

যেন সাগরবুকে সঘন কাঁপন—

কাঁপন প্রসব-বেদন-ব্যথায়।

ঠিক তেমনি ভুবনেশ্বরী কাঁপছে। চোখে ঝরছে জল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ! ১২ই জানুয়ারী—ভোর ৬টা।

হিমাচ্ছন্ন তুহিন-সমুদ্র মন্থন ক'রে জাগল নবারুণ।

হোল অরুণোদয়। পড়ে গেল দিকে দিকে সাড়া। সাড়া পড়ে গেল যেমন প্রকৃতির বুকে—তেমনি যুগ ও জীবনে।

ওরে তোরা শঙ্খ বাজা। দে হুলুধ্বনি। কাঁসর-ঘণ্টায় মুখর ক'রে তোল, মুখর ক'রে তোল আজিকার এ প্রসন্ন সকালটিকে। সাগর-সেচা মাণিকের সন্ধান মিলেছে। এসেছে কৈলাসেশ্বর ভুবনেশ্বরীর কোলে। তার ধ্যানলোকের স্নিগ্ধ সুন্দর এসেছে বাস্তবে, এসেছে জ্ঞান-সত্য-কর্ম্ম-ধর্ম্মের আলো লয়ে হাতে। এসেছে আঁধার পথের যাত্রীদের আলোর রাজ্যে নিতে।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

সফল হোল ভুবনেশ্বরীর স্বপ্ন। নভকোণে জেগে উঠল সূর্য্য। শাখে শাখে পাখীরা ধরল গান। শিমুলিয়া গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে পুলকোচ্ছল হাসি। সাধনার ধন স্বপ্ন-সিদ্ধ শিশুকে তুলে নিল, তুলে নিল সদ্যোজাত ছেলেটিকে ভুবনেশ্বরী কোলে। অপরূপ রূপ-লাবণ্যের লাবণি ওর অঙ্গে। যেন ঠিক তার পিতামহ—দুর্গাচরণের মত দেখতে।

তাই কেউ বলে নাম রাখ শিশুর 'দুর্গাদাস'।

আবার কেউ বলে—না। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর স্মরণে সজাগ হ'য়ে উঠল তখন—সজাগ হ'য়ে উঠল সেই দিব্য স্নিগ্ধ স্বপ্নের মোহন মূর্ত্তিখানা।

বলল—"না গো না। ওর নাম বীরেশ্বর রাখা হোক।"

সেই থেকে ওর ডাক-নাম হোল 'বিলে'।

অন্নপ্রাশনের দিন এলো এগিয়ে। সাথে সাথে এলো নতুন নামকরণের পালা।

কি নাম দেওয়া হবে?

দাও ওর নাম—নরেন্দ্র।

নরের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, যে সম্রাট্, রাজন্— নরোত্তম। তার নাম নরেন্দ্র বিনে আর কি হবে।

ও-যে এসেছে লক্ষ কোটি মানব-জমিনে সোনার ফসল ফলাতে। এসেছে বন্ধ্যা মন-জমিনকে চষে নিড়িয়ে উর্ব্বর করতে। এসেছে জ্ঞানের লাঙ্গলে কর্ম্মের ফাল লাগিয়ে।

নরোত্তম নয়তো কি? নরেন্দ্র যে তাই নররাজ।

ডেকে যেচে বলে—বলে সাথীদের—

"এই, দেখি, তোর হাত দেখি।"

মস্ত এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যেন, পাণ্ডিত্য ফলায় সাথীদের ওপর। বলে—"ছাই কিছু নেই। তোর কিছু হবে না—সন্ন্যেসী হওয়া নেই তোর অদৃষ্টে।"

দুর্লভ বস্তু। সাধনার ধন। একি যে-সে হোতে পারে? "এই দ্যাখ্, আমার হাতে কত বড় চিহ্ন। আমি নির্ঘাত সন্ন্যেসী হব।"

কত বড় গর্ব্বের। কত আনন্দের এ সংবাদ। সাথীরা থাকে চেয়ে। চেয়ে থাকে পলকহীন চোখে নরেন্দ্রের দিকে। আর নরেন্দ্র ব'লে যায় কত গল্প। গল্প ব'লে যায় জ্ঞানী তাপসের মত। ত্যাগ-তিতিক্ষার মাঝ দিয়ে সন্ন্যেসী-জীবনের পরিণতির কথা। ব'লে যায়—দুঃখ-আপদ-বিপদের মুখোমুখি

হ'য়ে এগোতে হয়। এগোতে হয় মহা কৃচ্ছ্রব্রতের বেদনাহত পথের কঙ্কর-কণ্টক মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে। যারা রইল টিকে তারাই পেল পরাসত্যের সন্ধান। আর যারা হোয়ে গেল ভ্রষ্ট, তারা রয়ে গেল বিষয়-বুদ্ধির কালো মলিন পঙ্কে নিমজ্জিত হ'য়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা-যোগ-ধ্যানের শ্রমলব্ধ বস্তু এটি। একমন আর একধ্যানে চাই তন্ময়তা। তন্ময়তা চাই অন্তর-বিশ্বের খোঁজ নেওয়ার জন্যে। এখানে তো নিত্য নূতন সমস্যা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, লাজ, মান, ভয় ও মৃত্যু।

আর ওখানে?

সুন্দর, কান্তি, স্নিগ্ধ, শুভ্র-আলো-জোছনা, প্রাণ ও গান। যেমন নাকি সকালের আরশিখানার দিকে তাকিয়ে দিনের খবরটি জানা যায়, ঠিক তেমন এই নরেনের দিকে পলক ফেলে শোনা যায় ওর জীবন-স্রোতের কল্লোল। ও বলবে না তো আর কে বলবে? কে বলবে আর এমন আকুল আবেগ ও আকুতি ল'য়ে—ওরে, কেউ সন্ন্যেসী হয়েছে তোদের বংশে?

শিবের মত আকৃতি নরেনের।

কিন্তু প্রকৃতি ?

ঠিক যেন গোকুলের ননীচোরা কানুর মত। নন্দঘোষের কি আর শান্তি ছিল ? এটা ফেলে। ওটা ভাঙে। সে এক হৈ-হল্লার মধ্য দিয়ে কাটত তার দিন।

নরেনও তাই।

অশান্ত দুর্দ্দান্ত স্বভাব। শিষ্টতা নেই। নেই ভব্য-সভ্য সুবোধ বালকের লক্ষণ ওর চরিত্রে। কেবল খেয়াল আর খুশি। মর্জ্জি আর মতলব। ভেঙে গুঁড়িয়ে তচ্‌নচ্‌ ক'রে দিলে। দিলে তচ্‌নচ্‌ ক'রে সাজান-গোছান জিনিস-পত্তর।

দু-দুটো ঝি রেখে দিয়েছে বিশ্বনাথ দত্ত।

কিন্তু মাটির বাঁধ দিয়ে কি আর আট্‌কে রাখা সম্ভব—স্রোতের উচ্ছ্বাস ? প্রথমে আসে জল চুয়িয়ে।

তারপর ?

খর স্রোতের প্লাবনে কোথায় তলিয়ে দেয় সে শক্ত পোক্ত প্রতিরোধ। মিলিয়ে যায় বাঁধ মুহূর্ত্তে নদীতে। মিলিয়ে যায় চিহ্নহীন হ'য়ে অন্তহীন অতলান্তে।

ঝি এসে কি করবে ?

এ-যে বিষম সমস্যা। মান্‌বে না কোন শাসন। ভয় দেখালে পরোয়া নেই থোড়া। উত্যক্ত, ক্ষিপ্ত সবাই বালকের ব্যবহারে।

বড় অশান্তি ভুবনেশ্বরীর। কেবল কি ঘরেই আগুন জ্বালায় নরেন ?

পাড়া-পড়শী থেকে গ্রাম অবধি তার পরিক্রমা। সবাই ভোগে। ভোগে বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে ঐ বিলের জন্যে।

ওগো দিলে যদি—এমন অশান্ত ক'রে কেন ?

আর যদি করলে অশান্তই, তবে সান্ত্বনার উপায়টি ব'লে দাও। দাও গো আমার নরেনকে একটু স্থির-শান্ত আত্মস্থ ক'রে। এ-যে বিষম ছেলে গো। শুধু কি কেবল আমাকেই জ্বালায় ? রইতে পারে না যে পাড়ার লোক, গ্রামের

মানুষ ওর অত্যাচারে। আকুল মিনতি জানায় ভুবনেশ্বরী। জানায় বিশ্বনাথের শ্রীচরণ-প্রান্তে।

অভিনব! অপূর্ব্ব!

অপূর্ব্ব এক তরঙ্গ স্পন্দিত হ'য়ে উঠল ভুবনেশ্বরীর অন্তর-মনকে মন্থন করে। যেন তার মাঝ থেকে উত্থিত হোল এক মন্ত্র গম্ভীর ধ্বনি—বল শিব, শিব! শীতল বারিতে সিঞ্চন ক'রে দাও ওর মস্তক।

একি যে-সে?

স্বয়ং শম্ভু। ধূর্জ্জটি।

উদ্দণ্ড নর্ত্তনে নাচছে ভোলা। ক্ষেপা ক্ষেপেছে আবার। যেন প্রলয়-নাচন সুরু ক'রে দিলে। সুরু ক'রে দিলে—মত্ত ভোলা। বাপুরে বাপু! এ জ্বালা সয় কার? বাড়ীর লোকেরা তো অস্থির।

বিরক্ত হ'য়ে মা বললে—"মহাদেব নিজে না এসে কোত্থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন একটা ভূত।"

ওগো, ভূত বললে কাকে গা তুমি?

না-না, এ তো ভূত নয়। অদ্ভুত। সাধারণ নয়। অসাধারণ।

দিদিরা যায় তেড়ে মারতে। মারতে যায় আর সইতে না পেরে। অমনি লাফিয়ে পড়ল নর্দ্দমায়। মাখল সোনার অঙ্গে কর্দ্দমের কালি। হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল, দাঁড়াল ওদের সামনে।

বলল—"কৈ আমায় ধর দিকি?"

শুচি-অশুচির ঊর্দ্ধ লোকে বালক বিলে বিজয়গর্ব্বে দাঁড়িয়ে। দিদিরা সরে গেল দূরে। দূরে গেল অপবিত্র হবার ভয়ে। মা বলে—"ত্থাখ্ বিলে, অমনধারা দুষ্টুমি করলে মহাদেব তোকে কৈলাসে প্রবেশ করতে দেবে না।"

অমনি চুপ! বিস্ময়-বিমোহিত বিলোল বালক তাকিয়ে থাকে মার দিকে, কান্না যায় থেমে। থেমে যায় মত্ত পাগল মুহূর্ত্তে। নরেন এখন শান্ত।

থাকে সুবোধ বালকটির মত চুপ ক'রে। চুপ ক'রে রয় মায়ের কণ্ঠে—শিব! শিব! স্তুতি শুনে। আর তারই হাতের শীতল বারি সিঞ্চনে।

হবে না কেন?

ও-যে সাক্ষাৎ শিব।

চোখ বুজে ধ্যান করে।

পদ্মাসনে ব'সে থাকে নীরব ঘনছায়াব কায়া হ'য়ে। থাকে অনড় সান্দ্র, স্থির, স্থবির হ'য়ে।

কে যেন বলছে ওকে, বলছে—চোখ বুঝবি। বসবি আসন ক'রে। দেখবি মাথা দিয়ে গজাবে জটা। নামবে তা মাটিতে। সিঁধবে গিয়ে বটের শেকড়ের মত।

তাই নরেন ধ্যানে বসে।

কিন্তু কই? জটা তো নামছে না!

টান হ'য়ে চোখ বুজে তো রইল কত সময়। রইল ঠিক তাপসের মত গম্ভীর হ'য়ে গভীরে। রইল যোগীর মত যোগমার্গে। কোথায়—কোথায় তার জটা?

গেরুয়া রংএর একটুক্রো কাপড় পরনে। ধ্যানী মৌন নরেনের কান্না আসে বুক ফেটে, কান্না আসে জটা না দেখে।

মা ভুবনেশ্বরী দেখে তো অবাক্।

বলল—"একি?"

নরেন বলে—"আমি শিব হয়েছি।"

আবার ডুবে যায়। যায় তন্ময় হ'য়ে আত্মরতির সুখ-সায়রে।

মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকায়। তাকায় জটা কতদূর নামল তা দেখবার জন্যে।

কিন্তু না! জটাতো নামলো না এখনও!

বললে আকুল হ'য়ে নরেন—বললে মার দিকে তাকিয়ে। —"মা, এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই?"

ভুবনেশ্বরীর মনটা হ'য়ে পড়ে শঙ্কা-কাতর। ভাবে, এমন সাধনার ধন, আমার বুকের মাণিক বুঝি আর রইল না ঘরে। এতটুকুন ছেলে, তার এত সব ধ্যান, যোগ, কান্না। একি হোল গো! যায় বুঝি খাঁচার পাখী উড়ে বনের কোলে। যায় বুঝি আমার বুকের পাঁজর ক'খানা ভেঙে। তাইতো ভুবনেশ্বরীর অস্থির মন। বলে, "না গো না, জটা হ'য়ে কাজ নেই।"

বাপ বলল একদিন,—"বড় হ'য়ে কি হবি রে বিলে?"

সহজ সরল জবাব—"কোচোয়ান হব।" জিনে বসবে। জোর চাবুক মারবে। ছুট্‌বে গাড়ী জোর বেগে। অচেতনের পিঠে হানবে চেতনার চাবুক। বিদ্যুতের মত চম্‌কাবে অন্ধ স্থবির তামস অন্ধকারে চাবুকের রশিটা।

ধর্ম্ম আর কর্ম্ম দুটি অশ্ব। মিলবে এসে এক হ'য়ে। জ্ঞান ও সত্যের রাস ধ'রে চালাবে গাড়ী। চালাবে প্রজ্ঞার পথে, মুক্তির সন্ধানে। অলস, অন্ধ তামসিকের দল এসে চাপবে, চাপবে নরেনের গাড়ীতে। তাদের নিয়ে ছুটবে ঘোড়া বেগে।

মারো চাবুক! মারো মোহাচ্ছন্ন যুগের বুকে, মারো তোমার স্বপ্ন-শক্তির চাবুক। জড়ত্বের জাড্য যুগে জাগরণের চাবুক!

স্থূল, জীর্ণ, ভ্রান্ত যাত্রী ল'য়ে ছুটুক তোমার অশ্ব। হোক আরো বেগবান। তুমি থাকো রাস ধ'রে। ধ'রে থাকো শক্ত হাতে। রজোগুণের সারথি হ'য়ে।

লিখেছে বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দকে,—লিখেছে—

"আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীন-হীন? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব?"

রয়েছে তো সবই অন্তরে। কেবল জাগ্রত করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে মনের অথৈ অনন্ত হ'তে সত্যের স্বাতীদীপ। প্রাণের প্রেরণায় আনন্দের সরোবরে একবার ডুব দে দিকিনি। দেখ্ কত সুন্দর! কত মধুর! কত মনোময় বিহ্বল বিভূতি। কেবল দুঃখের মালা জপে ক্ষীণ হ'লে চলবে না। এগোতে হবে বিস্তৃত বক্ষটা ফুলিয়ে।

আত্মার সত্যকে জানতে—দেখতে—আয়ত্তে আনতে।

"দীন-হীন ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করো দিকি। বীর্য্যমসি বীর্য্যম্, বলমসি বলম্, ওজোহসি ওজঃ, সহোহসি সহো, ময়ি ধেহি। তুমি বীর্য্যস্বরূপ, আমাকে বীর্য্যবান করো। তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বলবান করো। তুমি ওজঃ-স্বরূপ, আমাকে ওজস্বী করো। তুমি সহশক্তি, আমাকে সহনশীল করো। রোজ ঠাকুর-পুজোর সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানং অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ—আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করবে—ওর মানে কি? ওর মানে, আমার ভেতরই সব আছে—আমার ইচ্ছা হ'লেই সমস্ত প্রকাশিত হবে।"

ইচ্ছার সাথে জুড়ে দাও দেখি শক্তি। শক্তির সাথে জুড়ে দাও—ঝড়ো ঈশানের বেগকে। তারপর চাবুক মারো। মারো চাবুক ভাঙা জীর্ণ আর নিশ্চল গতিহীন বিরতিতে। দাও ছুট্। ছুট্ দাও পাকা-পোক্ত সহিসের মত। সাবধান, বাজিতে জিততে হবে কিন্তু। ছুট্ দাও বাদশাহী মরদ ল'য়ে।

সহিসের সঙ্গে ভাব হয়েছে নরেনের।

আস্তাবলের সহিস। সহিসের বড় দুঃখ, বড় ব্যথা।

কেন ?

বিয়ে করেছে বলে।

সে কি ?

বড় ঝক্‌মারি। জীবনের নানান্ ঘাটে বিপর্য্যয়। অশান্তি-জ্বালা। সংসারের দাদন শুধতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রতিপদে জ্যান্ত-মরণ। মরণ আসে যেন নিত্যি। আসে নানা কাজে বারে বারে। এক পা এগোয় তো তিন পা পিছু হটে। আর সয় না—সয় না এ জীবনের শত সহস্র ব্যথার কাকলি। একি সহজসাধ্য কাজ ? বিয়ে যেন আর কেউ করে না। যেন বেদবাণী।

সহিস দিল নরেনের কানে ত্যাগের মন্ত্র। নরেন তো সহিসকে সহিস ব'লে দেখে না ; ও যেন তার কাছে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। একরোখা মন নরেনের—হঠাৎ চমক খায়। দ্বন্দ্ব-দোলার পাগলা মাতন হাওয়ায় ওর মনে জাগে ঝড়।—তবে এ কি সত্য ? বিয়ে করলে এমন হয় ?

কিন্তু নরেন যে রাম-সীতার ভক্ত। পূজো করে নিত্য। দেয় আজল ভ'রে অর্ঘ্য।

কেমন হবে ?

মার কাছে কত গল্প শুনেছে, শুনেছে রাম-সীতার নির্ম্মল অপূর্ব্ব অদ্ভুত ভালোবাসার কত শত গল্প।

বাবার আদেশ পালনের জন্যে রাম চল্‌ল বনে। চল্‌ল চৌদ্দ বছরের জন্যে।

সীতা সাথে যাবে ব'লে বসল।

কি করা এখন ? একটি নারী কেমন ক'রে রইবে বনে !

কত ভয়। কত আপদ-বিপদ সেখানে। কিন্তু যাবেই যাবে সে। পতি যদি থাকতে পারে ঘন গভীর বনরাজির শ্যাম-সমারোহের মধ্যে, তবে তার বিরহিণী প্রিয়া কেন রইতে পারবে না ? দেহের-সুখকর পরশ-স্পৃহা তো ক্ষণিকের, মন আর মন। মনে মন যোগ হ'লে ভয়-শঙ্কা-লাজ-মান কিচ্ছু থাকে না। সব ভেসে যায়—ভেসে যায় নদীর স্রোতের মত। সীতা যাবেই।

কি আর করা ! চল্‌ল রাম আগে আগে। মাঝে সীতা। পিছু পিছু হাঁটল স্নেহের ভাই লক্ষ্মণ !

কেটে গেল চৌদ্দটি বছর। মাঝে সীতাকে হরণ করল রাবণ।

কিন্তু সতীর দেহ স্পর্শ করতেও পারেনি দস্যু।

কিন্তু তবু রাম বললে, তাকে কেমন ক'রে নিয়ে যাই এখন অযোধ্যায়।

কেন?

সে যে অপহৃতা।

তবে কি করা?

পরীক্ষা দেবে সতী। জ্বালল আগুনের কুণ্ড। দিল তাতে ঘৃতের আহুতি। আগুন জ্বলে উঠল দ্বিগুণ। মা-লক্ষ্মী সতী-সাধ্বী সীতা—হেঁটে গেল সেই জ্বলন্ত কুণ্ডের মধ্যে। কিন্তু পাবক স্পর্শ করল না তাকে। ও-যে নিকষিত হেম, শুচিতার মন্দাকিনী।

এমন সব গল্প কত কত শুনেছে নরেন। কিন্তু সীতা যে বিবাহিতা। দুঃখে ব্যথায় কাঁদতে থাকে নরেন। রাম-সীতার দুঃখে। মাকে দেখে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে—"মা, আমি সীতা-রামের পূজো করব কেমন ক'রে—সীতা রামের বৌ ছিল যে?"

মা বললে—"তাতে কি! বেশ, সীতা-রামের পূজো নাই বা করলে, কাল থেকে, বাবা, তুমি শিবপূজো করো।"

বোঝা নামল মনের। গুমট ব্যথার অশ্রু-ঝরা চোখ দুটি হ'য়ে উঠল স্বচ্ছ। একটু যেন হাল্‌কা হোল বুকটা।

সান্ধ্য তন্দ্রা এলো ঘনিয়ে ধরণীর চোখে।

অন্ধকার চল্‌ল ক্রমে বেড়ে। এলো সে নিবিড় গভীর হ'য়ে ধরণীর শ্যাম-সবুজ হাসিটুকু ঢেকে। আকাশে জ্বলছে অসংখ্য উজ্জ্বল তারা। পাখীরা ফিরছে কুলায়। যাচ্ছে মানুষ দিনের খেলা শেষ ক'রে রাতের কোলে। যাচ্ছে মায়া-মোহে আসক্ত আলয়ে। যাচ্ছে প্রেমের শিয়রে প্রীতির দীপটি জ্বালতে। নিবিড় ঘন আঁধার-ছায়ায় দুটো প্রাণের-কথা কইতে।

আর একদিকে চলছে তিক্ত-মধুর আবেশ। লয় ও জয়ের দ্বন্দ্ব।

অবসান ও অনুরাগের রোদন-রুদ্ধ মনে ব্যথা ও কথার ঝড়।

ছাতের ওপরে দাঁড়িয়ে নরেন।

হাতে তার রাম-সীতার মূর্ত্তি। দাম্পত্য প্রেমের জ্বলন্ত-জাগ্রত আদর্শ। যেন হাসছে। হাসছে দামাল ছেলের বিদ্রোহে ভাবী জীবনের প্রস্তুতির বৈচিত্র্যে। ৯০০০

এই তো লীলাময়ের লীলা। বিচিত্র এ জগৎ, আর বহু-বিচিত্র মানুষের পথ ও মত। একই ভগবানের বহুরূপে প্রকাশ। প্রকাশ তাঁর বহু-বিচিত্র জীবের ধ্যান-গম্ভীর অন্তরে। জীব যেমন ক'রে তাঁকে দেখতে চায়, তেমনি সাজে তিনি আবির্ভূত হন।

একদিকে সীতা-রামের প্রতি গভীর ভক্তি, আর একদিকে বিবাহিত জীবন ঘিরে বিক্ষুব্ধ বিতৃষ্ণায় আলোড়ন-বিলোড়ন।

ঠিক হ'য়ে গেল মন। এ পথ নরেনের নয়। মূর্ত্তিখানা তুলে নিলে হাতে। তাকাল একবার মায়া-করুণ দৃষ্টিতে।

তারপর ?

দিলে ফেলে।

শূন্য আসন পূর্ণ করল। পূর্ণ করল এনে শিব-বিগ্রহ। শ্বেতশুভ্র শুদ্ধ-স্ফটিকস্বচ্ছ চন্দ্রচ্ছটা। অন্তহীন অনন্ত ধূর্জ্জটি। প্রলয়-প্রক্ষালিত জটাজুটধারী—কৈলাসাধিপতি শঙ্কর।

আর নরেন নিজে ?

ভুবনেশ্বরীর স্বপ্নে আভাসিত হয়েছিল কৈলাসেশ্বর, সেই হিমগিরির হিমশুভ্র চূড়া থেকে এক রাতের অন্ধকারে—

আর ঠাকুর বলেন,—বলেন কিনা—"ও হচ্ছে পাতাল-ফোঁড়া শিব। ও বসানো শিব নয়।"

আবার বললেন—"কারো পদ্ম দশ দল ; কারোর ষোড়শ দল, কারোর বা শত দল। কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন সহস্রদল।"

*　　*　　*　　*　　*　　*

আরে জাত আবার কি ?

আর জাতের যায় বা কি ?

এটা কি মেটে পাতিল না কাঁচের বাসন যে ফেটে বা ভেঙে যাবে ?

চিন্তায় পড়েছে নরেন। যদি জাত না থাকে তবে কী হয় ?

গায়ের রং পাল্‌টে যায় ? না দিন যায় রাত হ'য়ে ? কোন্‌টা সত্য ? আর কোন্‌টা ভ্রান্ত ? জাত মানা ; না জাত না-মানা ? মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করে নরেন—"ভাতের থালা ছুঁয়ে গায় হাত দিলে কি হয় ? বাঁ হাতে ক'রে গেলাস তুলে জল খেয়ে হাত ধোয় কেন ? হাতে তো এঁটো লাগেনি ?"

আচ্ছা, একবার দেখলে তো মন্দ হয় না। জাতটা কেমন ক'রে যায়।

বিশ্বনাথের বৈঠকখানা।

আসে নানা জাতের মক্কেল এখানে।

সার বাঁধা রয়েছে হুঁকো। একটা দুটো নয়--অনেকগুলো। এটা বামুনের, এটা শূদ্দুরের, এটা মুসলমানের।

নরেন ঢুকল ঘরে। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে, আর ভাবে, দেই একটা টান আগে মুসলমানের হুঁকোটায়। যাবে তো জাত একেবারে যাক্। তুলে নিল হাতে হুঁকোটি। দিল এক টান। অমনি যেন কোত্থেকে এসে পড়ল বিশ্বনাথ। বললে—"ও কি হচ্ছে রে বিলে ?"

বুক ফুলিয়ে বললে অমনি—"দেখছি, কোন্‌খান দিয়ে জাত যায়। যাকে রেখেছি ছোট ক'রে, দেখছি তাকে ছুঁলে কী হয় ?"

পুকুর মিলে হয় নদী। তারপর অন্তহীন সাগর—সমুদ্র। প্রদেশ হয় দেশ, আর দেশ হয় মহাদেশ। মহাদেশও হারিয়ে ফেলে তার সীমা অসীম বিশ্বে। দূরে ঠেলে রাখলে কি আর চলে ? টেনে নাও যে পতিত, তাকে কোলে। যে অবজ্ঞাত, তাকে বুকে। আর যে পড়ে আছে সমাজের চোখে স্নেহ-হীন হ'য়ে, তাকে ডাক দিকিনি অন্তর হ'তে। দেখ কলহ-বিবাদ গিয়ে কেমন সুন্দর হ'য়ে ওঠে জগৎটা।

"শশীকে যেতে বোলো মালাবারে।" চিঠি লিখেছে রাখালকে নরেন। "সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণে অর্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্ব্যচোষ্য খানা, আবার নগদ ! ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নেই--ভোগ সাঙ্গ হ'লেই স্নান। পয়সা নেবে, সর্ব্বনাশ করবে, আবার বলে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা। আর কাজ তো ভারি, আলুতে বেগুনে যদি ঠোকাঠুকি হয়, তা হ'লে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে ! মহাদঁক সামনে সাবধান, ঐ দঁকে সকলে প'ড়ে মারা যাবে—ঐ দঁক যে হিন্দুর ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে। আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা, এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে প'ড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' কি পুঁথিতে থাকবে নাকি ? যারা এক টুক্‌রো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না তারা আবার মুক্তি কি দিবে ?"

স্বয়ং ধূর্জ্জটি এসেছে।

এসেছে প্রলয়-পিনাক হাতে ক'রে রুক্ষ রিক্ত ঊষর মরুকে উর্ব্বর করতে। রুদ্ধ-সভ্যতার বুকে আঘাত হেনে মন্থরকে করতে এসেছে মন্দ্রমুখর। যুগ ও জীবনের জড়ত্বকে করবে অপসৃত। অপসৃত করবে ওর উদাত্ত আহ্বানে। আর সে আহ্বানে ছুটে আস্‌বে লক্ষ কোটি নরনারী। থাকবে না সেখানে জাতির ছুঁৎমার্গের বজ্জাতি। তাই গরীবের দুঃখে, আর্ত্তের কান্নায় বিদ্রোহী বিলে। ওর প্রাণ যে কেঁদে আকুল। শুধু নীরব অশ্রুতে তার সমাপ্তি ঘটতে দেবে না নরেন। জাতিকে জাগাবে। তুলবে হাত ধ'রে। অসত্যের আচরণে হানবে ভ্রূকুটি।

ও কি যে-সে?

ও-যে যুগের বুকে বৈশাখ, অসত্যের বুকে প্রলয় নাচন। এক হাতে জীবন, মৃত্যু অন্য হাতে। "শিব ও রুদ্র, রক্ষক ও সংহারক।" আর এই উভয় শক্তিকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত হয়েছিল ওর জীবনের সাধন-সংহিতা। আর মানুষ দেখেছিল ওর জীবনের পাতায় পাতায় মনুষ্যত্বের মহিমোজ্জ্বল প্রকাশ।

সাথী-সঙ্গীদের ডেকে জড়ো করছে নরেন।

বললে, চল আমরা ধ্যান ধ্যান খেলি।

আরে ধ্যান ধ্যান খেলা আবার কি রে?

চোখ বুজে আসন ক'রে রাখতে হবে দেহের শিরদাঁড়াটি টান ক'রে।

তারপর?

তারপর কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত ক'রে মিলিয়ে দিতে হবে সহস্রারে।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি কি?

মেরু-পর্ব্বতের মত মানবের দেহ-ব্রহ্মাণ্ডেও রয়েছে মেরুদণ্ডটি। এর একটির নাম কুমেরু, অপরটির নাম সুমেরু। সর্ব্বনিম্নে রয়েছে যেটি তাকে বলে মূলাধার চক্র। এই মূলাধার চক্রকেই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ মেরু বলে। এবং সর্ব্ব উচ্চে 'সহস্রার'-কে ব'লে থাকে উত্তর মেরু। দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের যে অমেয় শক্তি, অজেয় তেজ ও দীপ্তি তাদের অবস্থান এই মূলাধারে। এবং এই মূলাধার পদ্মেই সুপ্ত রয়েছে কুলকুণ্ডলিনী, অর্থাৎ শিব-শক্তি।

জাগ্রত করতে হবে একে। এই সুপ্ত শক্তিকে। রয়েছে সে মূলাধার চক্রে। সেই সদ্যোত্থিত শক্তিকে তারপরে ক্রমে করতে হবে ঊর্দ্ধগা। পৌঁছে গেলে মণিপুরে। মানে মূলাধার থেকে নাভিদেশ পর্য্যন্ত হোল তার ব্যাপ্তি। এলে শক্তি ও প্রবৃত্তির রাজ্যে। পথ সুরু এখান থেকেই। যে পথে রয়েছে ভোগ ও লোভ-লালসার নিবৃত্তি, আর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—বোধের প্রকাশ।

এ পথে এগোতে হয় কেমন ক'রে?

ন্যাস—প্রাণায়াম।

এই দুই যানে আরোহণ কর।

যেতে যেতে কত তত্ত্ব, কত সত্য তোমার কাছে আভাসিত হবে।

আভাসিত হবে কখনো আলো, কখনো আঁধার। আবার কখনো জ্যোতি, জোছনা, দিব্য কান্তি।

হ'য়ে যাবে তন্ময়। মন যাবে অধীর হ'য়ে। হ'য়ে যাবে সেই সুন্দর আভাটিকে স্থির নিষ্কম্প ক'রে চোখের সামনে রাখার জন্যে। তুমি ডুব দেবে আরো গভীরে নিবিড়ে।

শক্তি তখন প্রবৃত্তিমার্গ থেকে চলতে থাকবে একটানা নিবৃত্তি-গামিনী হ'য়ে।

চলে এলে দুঃখজীর্ণ সংসারের আবর্ত্ত থেকে তুমি। এলে মঙ্গলের শুভ্র স্নিগ্ধ পরা প্রজ্ঞার রাজ্যে।

হোল না কিন্তু এখানেই শেষ। কতকগুলো বিভূতি দর্শন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির সাক্ষাৎ ও পরিচয় মাত্র।

এগিয়ে চলো আরো সামনে। শুধু কেবল বিভূতির খেলা দেখে তাই নিয়ে যদি রইলে পড়ে, তবে কিন্তু আর ভক্তের ভাগ্যে ঘটিল না অদ্বয় সত্য লাভ করা।

চল --আরো চল এগিয়ে।

এবারে মিলিয়ে দাও শক্তিকে সহস্রারে। মিলিয়ে দাও শিবের সাথে। চেয়ে দেখ। দেখ তন্ময় হ'য়ে ভাববিহ্বল দুটো নয়ন মেলে--দেখ শিব-শক্তির মিথুনলীলা।

কি অপূর্ব্ব, কি রসঘন রূপ!

তলিয়ে গেছে তোমার প্রবৃত্তিগুলো নিবৃত্তির গভীরে। পেয়েছ তুমি অদ্বয় সত্যের দর্শন স্পর্শন। এখানে ভোগ ও মুক্তি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তলিয়ে যায় কোন্ গহন গুহার অতলান্তে। চিহ্ন মেলে না আর।

বিমুগ্ধ আত্মার মিলন হয় আত্মীয়ের সাথে। তন্ময় হ'য়ে থাকে বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হ'য়ে। বিভোর হ'য়ে যায় অপূর্ব্ব অপরূপ রূপ-রসভুবনে।

সকলেই বসেছে ধ্যানে। নরেন এবং তার সঙ্গীরা।

গায় মেখেছে ছাই। তারপর চোখ বন্ধ ক'রে পদ্মাসনে--সে কি ধ্যান!

একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য নরেন।

কিন্তু আর সবাই?

তারা কেউ চাইছে--কেউ ভাবছে এখন উঠি। আবার কেউ বা নড়ে যাচ্ছে আসন থেকে।

কিন্তু নরেন ডুব দিয়েছে তো দিয়েছেই।

একটি ছেলে চোখ মেলে চাইল হঠাৎ। চাইল ওরা কি করছে তাই দেখার জন্যে।

আরে সাপ—সাপ—সাপ—! বিরাট বিষধর সর্প ওদের সামনে। চীৎকার ক'রে উঠল সবাই। গেল পালিয়ে।

কিন্তু নরেন?

তার কথা ওরা কেউ ভাবল না। ফেলেই পালাল।

নরেন তো তখনও চেতনার মহার্তার্থে সত্য-সুন্দরের সঙ্গে কথা কইছে। মন-কথা। চীৎকার, কোলাহল, কলরোল, আহ্বান—কিছু গেল না তার কানে।

সে-যে এখনো রয়েছে সুমেরু শিখরে। রয়েছে নিরন্তিন নিরাবিল ভোগহীন সুখ-নিকেতনে। বাহ্যজ্ঞান কেমন ক'রে থাকবে?

এখানে এলে থাকে না কারোর বাহ্যজ্ঞান।

বালকেরা তো ত্রস্ত-ব্যস্ত হ'য়ে খবর দিল বিলের মা আর বাবাকে।

এই যে শুনুন---

কি?

প্রকাণ্ড সাপ! নরেন ঠায় ব'সে আছে তার কাছে।

কোথায়?

সেই যেখানে আমরা 'ধ্যান ধ্যান' খেলছিলাম! সেখানে। শীঘ্র আসুন।

ছুটে এলো বাবা মা।

এসে কি দেখল?

দেখল নরেন তখনো বসে। দেখল তরুণ স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত এক অপূর্ব্ব চন্দ্র-সুষমায়। নিস্পন্দ, নির্ম্মেঘ। যেন কুমার যোগাসনে ধ্যানস্থ! সম্মুখে বিষধর সর্প ফণা বিস্তার ক'রে কি যেন শুনছে মন্ত্রমুগ্ধের মত। বোধ হয় অনাহত ধ্বনি। মন যখন স্থির হ'য়ে যুক্ত হ'য়ে যায় শিব-শক্তির সাথে, তখন সাধকের কণ্ঠে এক অপূর্ব্ব ধ্বনির অনুরণন স্পন্দিত হ'তে থাকে। এ ধ্বনি বংশীধ্বনির চেয়েও মুগ্ধকর মধুময়। তাই বুঝি বিষধর সর্প কান পেতে আছে। কান পেতে আছে সেই ধ্বনির অনুরণনের দিকে।

হৈ চৈ হটগোল। সাপ গেল পালিয়ে। কিন্তু নরেনের ধ্যান তো আর ভাঙে না। অবাক-বিস্ময়ে জনক-জননী শান্ত-স্থির। দেখছে তারা, দেখছে চেয়ে চেয়ে ক্ষুদ্র বালকের ধ্যান গম্ভীর মূর্ত্তিখানা। মিলছে এসে পাড়ার লোকেরাও।

তবে কি সত্যি আমার বিলে ত্যাগ-তিতিক্ষার সাধনা করছে? বুঝি বাপ আমার রইবে না ঘরে। এমনি কত সব চিন্তা উঁকি মারে মার মনে।

ভাঙল ধ্যান।

এত লোক কেন? হোল কি?

এদিক ওদিক তাকায় বিলে।

ওরে, তুই কি আর বাঁচতিস্ আজ!

কেন?

কত বড় সাপ! এসেছিল তোর কাছে। তুই তো নিশ্চল হ'য়ে রইলি বসে। ভাগ্যিস্ কামড় দেয় নি। যদি দিত তবে আর উপায় ছিল না বিলে!

কিন্তু কই! "আমি তো সাপের কথা কিছু জানি না!"

সবাই তো অবাক! আরে বলিস্ কি? অত বড় সাপ! তুই মোটে টের পেলি না! যাক বাপু—যা হয়েছে হয়েছে, কামড়ে তো দেয় নি?

কাকে কামড়াবে?

ওখানে যে বিষধর সর্পও হার মানে। হিংস্র হ'য়ে যায় অহিংস। লোভ-লালসায় তারও আসে নিবৃত্তি। আসে নিবৃত্তি—অমন শীতল, স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত গণ্ডিতে এসে।

সকলে বলে সর্ব্বনাশ হয়েছিল আজকে! কিন্তু নরেন বলে কিনা—"আমি এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করছিলাম।"

ও-যে চোখ বুজলেই দেখতে পায় এক স্নিগ্ধ জ্যোতিচ্ছটা। শুয়ে শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেশে দেখে। দেখে প্রতিভাত হয়েছে একটা জ্যোতির্গোলক।

কোথায়?

দুটি ভ্রূ-র মধ্যে।

সে কি আলো! ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে তা ওর সারা অঙ্গে। মুহূর্ত্তে বিলীন হ'য়ে যায় ওর আমিত্ব। বিমোহন-আলোর আভাতিতে নরেন করে অবগাহন।

এ কোন্ মার্গের কথা?

প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির পথে যেতে যেতে এমন লোভাকর মনোহর দর্শন ঘটে সত্যশুদ্ধ সাধকের জীবনে।

ছোট্ট বালক নরেন।

ও কিন্তু ভাবে, এমন দর্শন বুঝি সকলেরই হয়। হয় বুঝি এমনি ঘুমিয়ে পড়ার আগে। নরেনের যে নিত্যি এমন হ'য়ে থাকে। তাই তো অভ্যাসের মধ্যে এসে গিয়েছে রসরাজের লীলা-খেলা। তাই তো নরেন ভাবে ঘুম-ঘুম চোখে, সকলেরই হয় বুঝি এমন।

এমন আনন্দঘন রসে আবিষ্ট হ'য়ে এমন স্নিগ্ধ পবিত্র জোছনার জ্যোতি-তরঙ্গে ভেসে ভেসে ঘুমিয়ে পড়ে নরেন।

ঘুমিয়ে পড়ে প্রাণ ও অপান বায়ুকে রুদ্ধ ক'রে।

সন্ন্যেসী দেখলে আর ধরে না নরেনের আনন্দ।

মুক্ত হস্ত আর উদার অন্তর নিয়ে এগিয়ে যায় কাছে।

কি চাই? বলো, বলো তোমার কি অভিপ্রায়?

পরনের কাপড়খানা পর্য্যন্ত দান ক'রে দিলে। আরো কতো কিছু এটা, সেটা, নানান্ জিনিষ-পত্তর।

মা তো তেড়ে আসে রক্ত-নেত্রে। বলে, এ তোমার কেমন খেয়াল বিলে? ঘরের জিনিস কি অমন ক'রে দিতে আছে? এটা সেটা না হয় দিলে। কিন্তু অবশেষে পরনের কাপড়খানাও?

কে শোনে কার কথা!

কৌপীন প'রে নৃত্য করে বালক। নৃত্য করে নন্দদুলাল দানের আনন্দে। নৃত্য করে বিভূতি-ভূষণ উলঙ্গ হ'য়ে। মনোমুগ্ধকর নৃত্য। মায়ের মন ভুলে যায় শাসন। চেয়ে থাকে পলকহীন দু'চোখ মেলে। চেয়ে থাকে তার দুরন্ত দুষ্টু বিলের দিকে।

আরে ও কি কথা কইছে কথক-ঠাকুর?

কইছে তো হনুমানের কথা।

কি?

সে নাকি ভালবাসে কলা খেতে। থাকে কলাবাগানে। কত রঙ্গ-রস। কত না অঙ্গভঙ্গিতে বুঝোচ্ছে ঠাকুর। বুঝোচ্ছে শ্রোতাদের।

নরেন উঠল লাফিয়ে। বললে, "মশাই, আপনি যে বললেন হনুমান ভালো-বাসে কলা খেতে, থাকে কলাবাগানে, আমি সেখানে গেলে তাকে দেখতে পাব?"

ভক্তের মনে আকুল আকুতি। জিজ্ঞাসার ঝড়। ঠাকুর তা বুঝল। বললে—"হাঁ খোকা, তাকে কলাবাগানে খুঁজলেই তুমি পাবে।"

অটল বিশ্বাস। চল্‌ল নরেন কলাবাগানে। চল্‌ল খুঁজতে হনুমান। রইল ব'সে ঠায়। রইল তার প্রতীক্ষায়।

কিন্তু কৈ গো! হনুমান তো এলো না!

ভগ্নমন নিয়ে ফিরল নরেন। ফিরল বাড়ীর দিকে।

বললে মাকে—"মাগো, কত সময় তো রইলাম ব'সে ঠায় কলাবাগানে, কিন্তু হনু তো এলো না। কথক-ঠাকুর তো বলে দিলে, হনু নাকি থাকে কলাবাগানে, খায় কলা।"

আচ্ছা, তবে ও গেল কোথায় ?

ভুবনেশ্বরী বুঝল বালক বিলের একাগ্রচিত্তের অটল বিশ্বাসের এ এক অভিব্যক্তি। মন তার আকুল হ'য়ে গেছে হনু দেখবার জন্যে। ওর বিশ্বাসে করল না আঘাত ভুবনেশ্বরী। বললে কাছে ডেকে—"দুঃখ করো না বাবা। আজ হয়ত হনুমান রামকার্য্যে কোথাও চলে গেছে। তুমি তাকে আর একদিন নিশ্চয় দেখতে পাবে।"

তেজোদীপ্ত ব্রহ্মচারী বিবেক বেলুড়ে এলেই বলে বলে ত্যাগী-সন্ন্যাসীদের ডেকে—"দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজো চালিয়ে। দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতের সম্মুখে এই মহাবীর্য্যের আদর্শ ধর। দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই—কি হবে এই সব কুঁড়ে পিণ্ডগুলো দিয়ে। আমার ইচ্ছে ঘরে ঘরে মহাবীরের পূজো হোক।" 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

শক্তি আর সত্য। কর্ম্ম আর ধর্ম্ম, এ দুটো এক হ'লে আর ভাবনা কি রে ? নরেনের যে হয়েছে তাই। এসেছে প্লাবন ওর জীবনে। এসেছে মোহ-মুগ্ধ জাড্য যুগের বুকে ঝড় জাগাবে বলে।

ভয় কি ?

ভয়কে জয় ক'রে তবে তো নামতে হবে। বুনতে হবে কর্ম্মের জমিনে ধর্ম্মের বীজ। তার পরে ফসল।

রুক্ষ রিক্ত উষর ক্ষেত্রে কি কোনদিন ভালো ফসল ফলে !

গাছ জন্মে, কিন্তু তা আগাছা। দুটো পাতা আর এক গোছা শেকড় মাত্র। মাটিতে সেঁধোয় না তা। কেবল কতকগুলো পচা পাতা আর ময়লা পঙ্কে জড়িয়ে কোন মতে থাকে বেঁচে।

কিন্তু একটু হাওয়া আসুক, অমনি তার আয়ু এলো ঘনিয়ে।

এ জাতটা দেখল না একবার চোখ মেলে। দেখল না কী তার আছে—আর কী ছিল। অতীতের ঐতিহ্যকে মুহূর্ত্তে গেল ভুলে। এলিয়ে দিল জীবনটা বিলাস ও আড়ম্বরের রং-ঝিলের ক্ষণিক শোভায়। হায়রে হায় ! চেয়ে দেখ, তোমার তপোবন। তোমার ঋষি, বেদ, বেদান্ত। চেয়ে দেখ 'বিশাল তটে রূপের হাটে নীলকান্তমণির লীলা-নিকেতন।' দেখ দেখি, ঐ উত্তরের তপোসিদ্ধ তাপস হিমালয়ের সৌম্য শান্ত মূর্ত্তিটি। দেখ চেয়ে, দক্ষিণের শান্ত শীতল বনরাজি, আর উত্তাল তরঙ্গলহরগুলো। কেবল অনুকরণের মোহ-মুগ্ধ মন ল'য়ে হেঁটে না পথে। নয়ন মেলে, প্রাণ ঢেলে

তোমাকে তুমি দেখতে শেখ। উপলব্ধি কর তোমার সত্তার সত্য। আর তোমার দেশগৌরবে গর্ব্বভরে মাথা উঁচু ক'রে উদাত্ত কণ্ঠে বল—বল একবার নয়—দু'বার নয়, বারে বারে—আমি ভারতবাসী। ভারতবর্ষ আমার প্রাণ। ভারতবর্ষের ঋষিকুল আমার সাধনার দেবতা।

সারাটা দেহের রক্ত এসে জমা হয়েছে মুখে।

পা থেকে দেহ অবধি শুকিয়ে যাচ্ছে কাঠ হ'য়ে। কি হবে রে অমন হ'য়ে বেঁচে থেকে?

দে দিকি ওদের অলস আলস দেহটা ধ'রে একটি প্রবল ঝাকুনি। রক্তগুলো ফিন্‌কি দিয়ে ছুটুক্। ছুটুক্ শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ।

মাজাটায় বাঁধুক জোড়। দেহে আনুক নতুন বল। আসুক নতুন প্রেরণা। মাজাটা রাখতে হবে খাড়া। তবেই এক লাফে লঙ্কা পার। তাইতো নরেন বললে--"দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজো চালিয়ে।"

ও-কি যে-সে ছেলে?

ইস্পাতে গড়া শক্ত পোক্ত দেহ। মনটাও উদার আকাশের মত। দুর্ব্বার গতি নরেনের।

কিচ্ছু মানে না। চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলে তো বিশ্বাস নেই কিছুতে। খাঁটি বাস্তববাদী।

দেখে শুনে বাজিয়ে তবে সমর্পণ। তার আগে?

মোটেই না।

কয়েকজন সঙ্গী মিলে হাঁটছে একটু পথে। কোন নিশানা নেই পথের।

তবে ওরা যাচ্ছে কোথায়?

এই অকাজের কাজে।

যেতে যেতে অবশেষে খেয়াল হোল, ওদেরই এক সঙ্গীর বাড়ী যাবে।

চাঁপাফুল বড় প্রিয় নরেনের। যাদের বাড়ীতে যাচ্ছে তারা, সেখানে আছে একটি চাঁপাফুলের গাছ।

নরেন গিয়ে চেপে বসল চাঁপার ডালে।

কেবল কি বসেই ক্ষান্ত?

তবে?

হেলে দুলে শুয়ে ব'সে কত রঙ্গ।

বাড়ীর কর্ত্তা তো অবাক। জিজ্ঞাসা নেই, হুকুম চাওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না, বেশ মর্জ্জিমত অমনি ব'সে গেল চাঁপার ডালে! এতো আচ্ছা দুষ্ট ছেলে দেখছি!

কিন্তু একে তো ধমকে ফেরানো যাবে না। যদি ভয় দেখিয়ে কিছু হয়।

এই, শুনছ?

কি?

"ও গাছটায় উঠো না।" বললে বাড়ীর বুড়ো। বললে বেশ গম্ভীর কণ্ঠে।

নরেন বললে—"কি হয় উঠলে?"

এ-তো আচ্ছা ছেলে! কি? কেন? এর আবার ব্যাখ্যা করতে হবে?

একটু রাঙা চোখে নরেনের দিকে তাকিয়ে বললে—

"ও গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকে।"

পাল্‌টা প্রশ্ন ক'রে বসল নরেন—"সেটা দেখতে কি রকম?"

"ওরে বাবা, সে ভয়ঙ্কর! ঘুরে বেড়ায় সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে রাতের অন্ধকারে।"

নরেন বললে—"তা বেড়াক না।"

নির্ভাবনায় নির্ম্মল নির্ম্মেঘ মুখ নরেনের। বললে—"তাতে আমার কি?"

মানে? একদম ঘাড় দেয় মট্‌কে। মট্‌কে দেয় যারা ও গাছটায় ওঠে তাদের।

তাই নাকি? ভাবছে নরেন।

আচ্ছা দেখি কেমন আমার ঘাড়, আর কেমন দত্যির শক্তি। রাতের অন্ধকার এলো ঘন কালো হ'য়ে।

নরেন যাত্রা করল ঘর ছেড়ে চুপিচুপি। ধীরে। মন্থরপদবিক্ষেপে এগিয়ে এলো। এলো সেই চাঁপাগাছের কাছে। ওর বড় সাধ হয়েছে, সাধ হয়েছে ব্রহ্মদত্যিটার সাথে মোলাকাৎ করতে।

সাথীরা এলো এগিয়ে। এগিয়ে এলো নরেনের পিছু-পিছু।

কেন?

বাধা দিতে।

বললে তারা—"না ভাই, অমন করিস্‌নে, নির্ঘাত তোর ঘাড় মট্‌কাবে।"

নরেন দেয় কথাটা উড়িয়ে। হেসে ফেলে খিলখিল ক'রে। ভয় পাবে দূরের কথা, আরো যেন বুকটা ফুলে উঠল। বললে শুধু, "তুই একটা আস্ত বোকা।"

আরে না না, অপদেবতার কথা কি বলা যায়? হয়ত দিবেই বা মট্‌কে ঘাড়।

ও কিচ্ছু না। "তোর ঠাকুরদা ভয় দেখাবার জন্যে বানানো গল্প বলে গেলেন। যদি সত্যি সত্যি এই গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকত, তা হ'লে এতক্ষণে আমার ঘাড় মট্‌কে দিত।"

রাত বিকেল কত এসেছে নরেন। এসেছে একাকী দোল খেতে চাঁপার ডালে। কই দত্যিটা তো একদিনও একটু দয়া ক'রে এলো না। আর এখন কিনা একেবারে ঘাড় দেবে মট্‌কে! না! যত সব বাজে বকুনি!

না ভাই, তবুও যেন ভয় হয়। চল্ ফিরে যাই বাড়ী।

নরেন ওঠে ঝাঁজিয়ে। বলে—"লোকে একটা কিছু বললেই বিশ্বাস করতে হবে? পরীক্ষা ক'রে দেখব না নিজে?" বলতে বলতে বীর হনুমানের মত এক লাফ। ধরে ফেলল ডালখানা। বসল উঠে ডালে।

দেখবে নিজে। চাক্ষুষ দেখবে। বিচার করবে। করবে যাচাই। যাচাই করবে সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে। শুনেই কি করতে হবে বিশ্বাস? কতই তো শোনা যায়। কিন্তু তার প্রমাণ পাওয়া যায় ক'টির। কেবল রূপকথার ঝুলি-ঝাড়া বুলি শুনেই আশ্বস্ত হবার লোক নয় নরেন।

তাই যদি হোত তবে এমন অনিন্দ্য সুন্দরী চাঁপা পেত না তার প্রেমাস্পদের পরশ মধুর। ও-যে বনের কোলে আপনি ফুটে' বনেই পড়তো ঝরে। কে দিত জীবনের উপান্ত বেলায় ফুল-সজ্জার সজ্জা রচনা ক'রে? কে তবে অর্ঘ্য হ'য়ে যেত মহামরণের শ্মশানতীর্থে কালো মেয়ের চরণতলে?

নরেন যে এসেছে ভ্রম ভাঙ্গাতে। এসেছে সংস্কারের অন্ধকার থেকে চির-মুক্তির চির-সুন্দরের আলোক-উজ্জ্বল পথে মোহমুগ্ধ যাত্রীদের আহ্বান জানাতে।

নরেনের সে উদাত্ত আহ্বানে কত যাত্রী এগোবে আলোর পথে। সত্যের, সুন্দরের, জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার দীপ জ্বেলে নরেন রইবে সমুদ্র-শিয়রে, দাঁড়িয়ে। রইবে অজ্ঞান অসত্যের বুকে আঘাত হানতে। শিবের সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে। তাইতো দলের আগে চলে নরেন। বলে, ভয় কিছু না।

ও-সব মনের ভ্রম। দেখ যাচাই ক'রে। বিচার ক'রে। তারপরে বিশ্বাস করো। শুনে শুনে দিন গুনে গেলে কি হবে। দিন গুনে, সব জেনে দেখে তুমিই না হয় অন্যকে শুনাও। শুনাও তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।

নারায়ণ কি নর হ'য়ে আসে? না নর যায় নারায়ণ হ'য়ে?

লোকে বলে ঈশ্বর আসেন মানুষ হ'য়ে—ধরণীর ধূলি মলিন ঘরে। আসেন মানুষকে মুক্তি দিতে, পথ দেখাতে। সত্যের আলোতে, জ্ঞানের জ্যোতিতে জগৎকে উদ্‌ভাসিত ক'রতে।

নরেন গর্জ্জে ওঠে। বলে—"ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন এ বললেই হবে; এর প্রমাণ চাই।"

গিরিশ ঘোষ বললে—"বিশ্বাসই প্রমাণ।"

না—না, অমন উড়ন্ত বিশ্বাসে নরেন মত দেবে না। নরেন বলে—"আমি ট্রুথ চাই—প্রুফ চাই।" সত্য ও প্রমাণ। এই তো ভক্তের অন্তরের চির-জিজ্ঞাসা। সত্যকে সাধনায় আনতে হবে। প্রমাণের পরোয়ানায় স্বাক্ষর নিতে হবে তার। তবে গিয়ে বিশ্বাস। এই দুটি ধারা যদি মিলে যায় এক হ'য়ে, বয় যদি একই খাতে একই সঙ্গমে, তবে আর ভাবনা কি? সত্য সুন্দর আসবেন হেঁটে হেঁটে। আসবেন মনের ময়দানে বাঁশী হাতে ক'রে। এই তো সাধনা। আর একে বলে অনুরাগ। এটুকু যার অন্তরে স্পন্দিত হ'য়ে উঠবে—তার আর ভাবনা কি?

সে দেখতে পাবে কে নর আর কে নারায়ণ। কে শিব—আর কে শক্তি।

নরেন বলে—"শাস্ত্রই বা বিশ্বাস করি কি ক'রে? একেক জন একেক কথা বলেছে। যার যা মনে এসেছে তাই—"

না গো না। তুমি ঝাল খেয়ো না পরের মুখে। ডুবুরীর মত ডুব দাও দিকিনি! ডুব দাও সাগরের অতলান্তে গভীরে, গহনে। দেখ, ভাল ক'রে দেখ, সেখানে কি শুধু জল আর জল? না মণি-মুক্তাও আছে? দেখ, একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখ—সেখানে কি কেবল নিবিড় নিশুতি না জ্বলন্ত পাবকও আছে।

দেখবে না কেন?

দেখবে, নিশ্চয় দেখবে, দেখবে দুচোখ মেলে, প্রাণ ঢেলে, ধরে ছুঁয়ে।

একি আলেয়ার আলো! না কালো মেয়ের চরণ-চিহ্ন! তা দেখতে হবে না?

নরেন বলে—"হাতী যখন দেখিনি, তখন সে ছুঁচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে কিনা কেমন ক'রে জানব।"

বহ্নি জ্বলে ওঠার পূর্ব্বাভাস। সংশয়-ধূমে ঢাকা চিত্তাকাশে তাই উঠেছে জিজ্ঞাসার, বিচারের ও পরীক্ষার ঝড়। নরেনের কণ্ঠে ঘন গম্ভীর উক্তি—"আমি বিচার চাই। ঈশ্বর আছেন, বেশ; কিন্তু তিনি কোথাও ঝুলছেন এ আমি মানতে পারব না।"

ঠাকুর বললেন—"সবই সম্ভব।"

তিনি ঝুলতেও পারেন, তুলতেও পারেন, আকাশ-পথে বিমানেও উঠতে পারেন, আবার খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে মানস-সরোবরে বেড়াতেও জানেন।

ভক্তের অন্তরে যখন ভগবানের আবির্ভাব ঘটে, তখন ভক্ত হ'য়ে যায় ভগবান।

কত রূপ। কত ঐশ্বর্য্য তাঁর দেহ-মনে স্ফুরিত হ'তে থাকে। ভক্ত মণিকর্ণিকার ঘাটে জোড়াসনে ব'সে থাকে চোখ বুজে জলের ওপরে, নির্বিবাদে মনের আনন্দে। এ-যেন এক বাজিকরের খেলা।

ঠাকুর বলেন—"তিনি ভেল্‌কি লাগিয়ে দেন। বাজিকর গলার ভেতরে ছুরি চালায়, আবার বা'র করে। ইট পাটকেল খেয়ে ফেলে।"

লোকে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ নয়নে। ভাবে একি খেলা!

কিন্তু ভেল্‌কি নরেন দেখতে চায় না। নরেন দেখতে চায়, যে ভেল্‌কি দেখায় সেই ভেল্‌কিওয়ালাকে। ভেল্‌কি ভ্রান্ত। কিন্তু ভেল্‌কি যে দেখায়, সে সত্য। তাঁর তো একটা আকার আছে! আছে তো একটা দেহ? সেই দেহধারী ভেল্‌কিওয়ালা কোথায়? কোথায় সেই ঐশ্বর্য্য-বঞ্জিত বাজিকর? তাঁকেই দেখতে হবে।

নরেন তাঁকে দেখবে। দেখবে মুখোমুখী, শুনে নয়—ছুঁয়ে। তত্ত্বকথায় নয়, অনুভূতির পরশে। কেবল অনুভূতির পরশেও নয়। তবে?

দেখবে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে, চোখে চোখ রেখে। মুখের কাছে মুখ এগিয়ে বলবে—কে গো তুমি? জবাব পাবে। তবে বিশ্বাস। কে নারায়ণ আর কে কালী আর কেই-বা ভগবান; তাঁদের সাথে মিলে মিশে তবে তো জানবে, শুধু শুনে বিশ্বাস করার ছেলে নরেন নয়।

৪

গঙ্গার ঘাটে জাহাজ নোঙ্গর করা।

কেমন ঝক্‌মকে মনোহারী।

সাধ জাগল নরেনের মনে—সঙ্গীদের তলব করল।

বলে—চল, দেখে আসি।

কাদের ও জাহাজটা?

খাস বিলিতি জাহাজ—ইংরেজদের।

কিন্তু ওখানে যেতে হোলে লাগবে যে ছাড়পত্র। সই করাতে হবে বড সাহেবকে দিয়ে। বাপ্‌রে বাপ! সেকি সহজসাধ্য কাজ?

সঙ্গীরা বলে, থাক্‌গে ভাই কাজ নেই।

চল বাড়ী ফিরে যাই। ও লালমুখো হৃষ্টপুষ্ট সাহেবের সাথে কথা কইবে কে? আর কেই-বা ওর মুখোমুখী হ'য়ে বলবে—দিন তো একটা সই ক'রে?

তার চেয়ে চল ভাই, বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরে যাই। যাই মায়ের ছেলে মায়ের কোলে।

কিন্তু নরেন নাছোড়বান্দা। ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবো?

না—হ'তে পারে না। যখন মন চাইছে জাহাজ দেখতে, তখন জাহাজ দেখতেই হবে।

একবার এদিক-সেদিক তাকালো নরেন।

বেপরোয়া ভাব। সটান উঠে গেল লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে।

উঠছে আর ভাবছে—

ভাবছে, একবার উঠে পড়ি, তারপরে দেখা যাবে কি করা যায়।

সামনেই একটা কামরায় ব'সে আছে সাহেব। পর্দ্দাটা ঝোলাম। দেখল ফাঁক দিয়ে নরেন।

ঠিক সাহেবই তো?

হ্যাঁ, সাহেবই বটে। বুক ফুলিয়ে ঢুকল নরেন, ঢুকল সাহেবের কামরায়।

সাহেব তো হতভম্ব! অবাক্-বিস্ময় তার চোখে মুখে।

হাতের কাগজখানা বাড়িয়ে ধরল।

ভাবখানা—আর কেন? দাও একটা সই ক'রে!

সামনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নরেন গট্‌গট্‌ ক'রে নীচে জয়ের আনন্দে।

ধরল এবার প্রহরী।

জিজ্ঞেস করে প্রহরী—"তুম্‌ ক্যায়সে উপর মে গিয়া?"

নরেন বলে—"হাম্‌ জাদু জান্‌তা।"

*　　*　　*　　*　　*

বাবার সঙ্গে যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ রায়পুর—যাচ্ছে নাগপুব থেকে গরুর গাড়ীতে ক'রে।

পনের দিনের পথ।

ঘন অরণ্যের বিথারিত ছায়া-মেদুর পথ।

ওপরে অসীম নীলিমার নিরাবিল নির্ম্মলতা। ডাইনে সবুজ শ্যামল শোভা।

বামে বনানীর মর্ম্মর মঞ্জীর। পেছনে ফেলে-আসা পথ।

সামনে অদৃশ্য নিশানার একটানা আঁকাবাঁকা ধরিত্রীর অগোছালো বিননি। আর চতুর্দ্দিকে একটা মনোহর লোভাকর মুগ্ধ শ্রী। যেমনি বিরাট, তেমনি অপূর্ব্ব।

যেদিকে তাকাও সেদিকেই বিস্ময়ের প্রতিফলন। আকাশে, বাতাসে, বনে, কান্তারে, পাহাড়-পর্ব্বতে কেবল অপূর্ব্ব মনোহারী ঐশ্বর্য্য। ডাকে বিহগ। ডাকে যেন কণ্ঠে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে। ওড়ে অলি—ওড়ে যেন তার অথৈ মনের অন্তহীন তন্‌হার হাহাকার নিয়ে।

এখানে আসে—ওখানে যায়। এ-ফুলে বসে ও-ফুলে চায়। অতৃপ্ত বাসনা। বিধুর বিরহ।

চল্‌ছে নরেনের গাড়ী, চল্‌ছে বিন্ধ্যাচলের পথ পেরিয়ে। ঘন বনের পথ কাটিয়ে। একাকী একটি শকটে নরেন।

আর-গাড়ীতে মা ও ভাই।

যত দেখে তত তন্ময় হ'য়ে পড়ে। তন্ময় হয় নরেনের মন নীল সাগরে বলাকার ঝাঁক দেখে। তন্ময় হয় শ্যামল অমল ধবল কুসুম দেখে বনের কোলে।

আহা মরি মরি কি রূপ! কবির কাব্যাকাশে যেন ঝড়ের মাতন জাগে, জাগে আবেগের ঝড়—অনুরাগের ছন্দ!

শ্যামল অমল ধবল কুসুম বনে—
তার সাথেই মিলছে যেন শৃঙ্গ বনের সনে।

কে দিল রে এমন রূপের উজাড় করা শোভা
কাটছে যেন কুহক মনের দেখে মুগ্ধ লোভা !
নীল সাগরের অন্তহীনে পাখীর অবাধ খেলা—
যে দিকে চাই কেবল শুধু অসীম নীলের মেলা।

মরে যাই ! মরে যাই ! এমন নয়ন-ভোলানো রূপ তো দেখেনি আর কোন দিন নরেন। ওগো, কে তুমি লিপিকার ! তোমার সরু চিক্কণ তুলির আঁচড়ে মনোময় ক'রে তুলছে যৌবনা ধরিত্রীর রূপকে ?

ডুব দাও দাও তোমার মনের অন্তহীন অতলান্তে। খোঁজ, ডাক, ডাক অধীর-আকুল কণ্ঠে। ডাক সেই শিল্পীকে। আভাসিত হবেন তিনি তোমার মন-বাগানে। বিভাসিত হবেন তুলি আর রং নিয়ে। আলো আর জল নিয়ে।

জলে জাগাবে ঢেউ—ধুয়ে যাবে তোমার মনের মালিন্য।

আলো জ্বেলে দেবে অন্তরে—তুমি দেখবে তোমার স্বরূপকে।

তারপর ?

তুলি দিয়ে লিখে দেবে তোমার মনের শ্লেটে—

কাকে খোঁজ ? যাকে খোঁজ, আমি সেই শিল্পী।

চল্‌ছে গাড়ী—চল্‌ছে এগিয়ে। যত যায়, তত মগ্ন হ'য়ে পড়ে মন।

হঠাৎ একটা মৌচাক পড়ল নরেনের চোখে।

সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে সমতল অবধি একটা বিরাট ফাটল। তাই জুড়ে রয়েছে, রয়েছে সমতল থেকে শিখর অবধি। তিল তিল প্রেমের ফসল। কোথায় এর সুরু আর কোথায় অন্ত ?

ভাবের সাগরে ডাকে বান। নরেন ত্রিজগৎ-নিয়ন্তার শোভা-সমারোহে হারিয়ে ফেলে বাহ্যজ্ঞান। ভাব-মদিরা পান ক'রে ক'রে হ'য়ে যায় বিভোর।

কে ? কে তুমি রূপকার ?

রেখেছ তোমার সৃষ্টির সমারোহে আকীর্ণ ক'রে বন—মন, নদী—পাহাড়, আকাশ ও আলো !

যোগীর ধ্যানলোকে অনুভূত হোল ঈশ্বরের অনন্ত উপলব্ধি। নরেন ধ্যানস্থ হোল—

ধ্যানস্থ হোল সেই মৌচাক দেখে। ধ্যানমগ্ন হোল ঈশ্বরের অনন্ত মধুর ঐশ্বর্য্যের ঝিলমিল-করা জ্যোতিলিখন দেখে।

বাপ ভাবে, চিরাচরিত ছকে-আঁটা পথে তো নরেনকে শিক্ষা দেওয়া চলবে না, চলবে না তো স্কুলের গণ্ডিবদ্ধ রুদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে তার মনের দোর খুলে দেবার পথ ক'রে দেওয়া।

আর রায়পুরে তো স্কুলও নেই।

নিজেই নিল ভার, পুত্রকে গড়ে তুলবে মনের মত ক'রে। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য—নানা বিষয়ে নানাভাবে ছেলেকে পাঠ দিয়ে জ্ঞানের পরিধিকে দিতে লাগল বিস্তার ক'রে।

বঙ্গ-সাহিত্যের এক নামী লেখক। এসেছেন বিশ্বনাথ দত্তের সাথে দেখা করতে।

এসেছেন রায়পুরে, অতীত দিনের স্মৃতি স্মরণ ক'রে।

খুশীভরা মন বিশ্বনাথের। রসিক পেয়েছে রসের জন। সুরু হোল সাহিত্য আলোচনা। বাপ ডাকল নরেনকে।—ওরে, এদিকে আয়!

এলো নরেন। ছোট্ট এতটুকু ছেলে।

বয়সে ছোট্ট হোলে কি হবে? ওর শক্তি অসীম। সীমানার ধার ধারে না ও। চলে গতির গাড়ীতে মনকে সারথি ক'রে অনন্তের দৃষ্টিহারা মার্গে।

ছোট্ট মাটির ঢেলাটির শক্তি কেউ তলিয়ে দেখেছে?

পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে তো হেঁটে গেলে কতবার।

কিন্তু তার মাঝে আছে সৃষ্টির উপাদান—আছে আশ্রয়ের আবাস—সঙ্গীতের লহরী।

সে কেমন?

ওতে ছেনে পিনে জল দাও, বীজ বোন—তোমার ক্ষুধার খোরাক যোগাবে।

তাপে তেজে কঠিন করো, ও আশ্রয়ের আবাসে তোমাকে আব্‌রে রাখবে। আবার হাতের মুঠোতে ক'রে ছুঁড়ে দাও নীরোদ নীল সাগরে, গান গাইবে, তরঙ্গ জাগাবে। এ-কুল থেকে ও-কূল অবধি ডেকে যাবে। ডেকে যাবে লহরে লহরে সমান তালে, সমান মানে।

থাম। শোন। শোন অতটুকুন ছোট্ট নরেনের জ্ঞানের গান!

তারপর?

একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন বিশ্বনাথের বন্ধু। অবাক্ হোল নরেনের মুখে কত সব উচ্চাঙ্গের কথা শুনে। যেন বহুদিনের সাধনাকে নরেন

একদিনে আয়ত্তে এনেছে। বঙ্গ-সাহিত্যের নামী লেখক বলে, নরেনকে কাছে ডেকে—"আশা করি, একদিন তোমার দ্বারা বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হবে।"

হে সাহিত্যিক, তুমি শুধু সাহিত্যের গৌরবকেই দেখলে—দেবেন্দ্রনাথ ধাম্মিক—সে দেখবে কি?

দেখবে নরেনের ভেতরে দিব্য জ্যোতির অপূর্ব্ব বিচ্ছুরণ।

বলবে, "নরেন, তোমার চোখ দেখে বুঝেছি, তুমি যোগী।"

আর ঠাকুর?

সে তো পাগলের মত কাঁদে আর বলে। বলে—'ওরে তুই আয়।'

খরচে লোক বিশ্বনাথ।

খরচ করে দু-হাত ভ'রে। যেমন আয় তেমন ব্যয়। চিন্তা করে না বিন্দুমাত্র ভবিষ্যতের কথা। দুঃখীর দুঃখে কাঁদে তার মন। ব্যথিতের কান্নায় বিগলিত হ'য়ে যায় অন্তর। আত্মীয়-স্বজনদের অভাব-অনটনের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে রাখে নিজের কাছে। নরেন কি এতে অসুখী?

না।

তবে?

কে যেন ব'লে দিয়েছে ওকে। ব'লে দিয়েছে, তুই বাপের কাছে বল একটু খরচের বহরটা কমাতে। বল, অনাগত দিনগুলোর কথা একটু ভাবতে।

এমন ক'রে কেউ খরচ করে? তোদের উপায় হবে কি? কে যেন ত্যাগীর কানে দিয়েছে স্বার্থের কুটিল মন্ত্র। ওর তো এখনও সংসারের ভাব-ভাবনার দিন আসেনি! ছোট্ট ছেলে, ছোট্টটির মতই দিন কাটছে তার। পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া—ব্যস্; বাপ কি ভাবে, কি না ভাবে তা দিয়ে বালক বিলের দরকারটা কি? আর সংসারের কথা নিয়ে এখন ওর চিন্তা করারই বা কি আছে?

তবুও বালক বিলে এগিয়ে গেল বাবার কাছে।

বললে—"বাবা, আমাদের জন্য কি রেখেছেন আপনি।"

চমকে উঠল বিশ্বনাথ!

একি কথা বলছে নরেন? এ জ্ঞান দিল কে ওর কানে? ব্যথা পেল। কিন্তু মেজাজ হারাল না।

বললে শান্ত ধীর কণ্ঠে বিশ্বনাথ, বললে কক্ষগাত্র-বিলম্বিত আর্শিখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে—"যা, আর্শিতে দেখে আয় নিজের চেহারাটা, বুঝবি তা' হোলে তোকে আমি কি দিয়েছি।"

দর্শন করো, করো তোমার স্বরূপ দর্শন! আজানুলম্বিত বাহু—ললাটে বিজয়-তিলক, নয়ননীলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আর প্রশান্ত বক্ষের পঞ্জরে পঞ্জরে জ্ঞান-ধ্যান ও নাম-কীর্ত্তনের কি অপূর্ব্ব সমারোহ। করো, দর্শন করো তোমার অন্তরাত্মার আত্মজনকে। যিনি তোমাকে নিয়ে খেলছেন, কভু দ্বন্দ্ব, কভু বিশ্বাস, আবার কখনো নাস্তিক, কখনো আস্তিক সাজিয়ে। দেখ, ভাল ক'রে দেখ একবারটি—তোমাকে তুমি দেখতে পারো কিনা।

নরেন ভাবে, আত্মীয়-স্বজনদের আশ্রয় দিয়েছ—বেশ! কিন্তু তা ব'লে কি তোমাকে যোগাতে হবে তাদের মদের খরচ? দিতে হবে এনে ভাং, গাঁজা, আর চরস? এ কেমন আশ্রয়? আশ্রয়ের নামে ওদের মাতলামোকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না কি?

নরেন তাই রেগে আগুন।

তীব্র অভিযোগ নিয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথের সম্মুখে।

কর্ম্মযোগীর অন্তরে কর্ম্মের আগুন। জ্ঞানের ভাতি।

সে কেমন ক'রে সইবে অলস কিঙ্করদের আলস মদির স্বভাব?

বাপ তো ছেলের কথাবার্ত্তা শুনে অবাক্!

তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে বহুক্ষণ। তারপর আনন্দে উদ্বেল পিতৃহৃদয় জড়িয়ে ধরল নরেনকে বক্ষে। জড়িয়ে ধরল কত না আবেগে!

—ওরে, তুই আয়, আয় আমার বুকে। অশুচির প্লাবনে প'ড়েও তুই শুচির সমুদ্র। অন্যায়ের অঙ্কে মাথা রেখেও বিলে, তুই আমার ন্যায়ের নিদান। আর পাপের পঙ্কে পৃক্ত হ'য়েও তুই নির্ম্মল নিশান। আয়রে, বিলে, একবারটি আমার বুকে আয়!

দু-হাত প্রসারিত ক'রে দিল বিশ্বনাথ। বিলে এলো ছুটে। ধরল জড়িয়ে।

এ যেন পদ্মা আর মেঘনার সঙ্গম-সুখ।

মেঘনা চলে ছন্দোবদ্ধভাবে।

আর পদ্মা?

ভেঙে তচনচ ক'রে আবিল আবর্জ্জনা ধুয়ে মুছে একদম শ্বেতশুভ্র নির্ম্মলতা ছড়িয়ে।

বাপ চায় ঢেকে রাখতে দুঃখের দহনকে—

ঢেকে রাখতে চায় বালু চাপা দিয়ে—

কিন্তু ছেলে ?

উড়িয়ে দিতে চায় দুঃখের দহনাগ্নিকে প্রলয় নর্ত্তনে।

বাপ বলে—"ওরে জীবন যে কত দুঃখের তা তুই এখনি কি বুঝবি! যখন বড় হবি, তখন দেখবি, কি গভীর দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিকের মুক্তির জন্যে, জীবনের শূন্যময় ব্যর্থতার কি বিরাট গ্লানির হাত থেকে ক্ষণিক নিষ্কৃতির জন্যে তারা নেশা ভাং করে ; এ যখন জানবি, তখন তাদের উপরে তোরও দয়া হবে।"

বালক বিলের মাথা হোল নত। নত হোল পিতার মুখে এতগুলো দরদ-দুঃখের কথা শুনে।

শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে পিতার কথার আর প্রতিবাদ করতে পারল না ছেলে। মেনে নিল।

বুঝি বা ব্যথা পেলে সংসারী জীবের জীবন এমনই ছন্নছাড়া হ'য়ে যায়! থাকে না জীবনের কোন মোহ। স্নেহে অভিষিক্ত নবনী কোমল মনটা হ'য়ে ওঠে পাষাণ। যায় তারা দয়ামায়াহীন হ'য়ে। আদর্শ ব'লে জীবনে আর থাকে না কিছু।

বুঝি বা ওরাও অমন। তাই মদ, ভাং, গাঁজা না হোলে চলে না।

মনটা নেশায় ডুবিয়ে রাখে। ভুলিয়ে রাখে নেশা দিয়ে আপন সত্তাকে। তা না হোলে বুঝি ওরা বাঁচত না!

কথাগুলো বারে .বারে নরেনের মনকে করে আলোড়িত।

সম্ভ্রমে নত হ'য়ে যায় মাথা।

ব'লে, ব'লে বেড়ায় প্রিয়জনদের কাছে, পিতার গুণের কথা। দিল্-দরিয়া মনের কথা।

কত বড় গর্ব্ব! কত না তৃপ্তি! সে একজন মহৎ ব্যক্তির সন্তান ব'লে। শৈশবের লীলালীন প্রত্যূষে কৈশোরের উপকূলে দাঁড়িয়ে, বিশ্বনাথ শুনিয়েছে নরেনকে মহাজনের মহান্ কথা।—

দেখ্ বিলে, সকলকে মহান চোখে দেখিস্। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ভেদ রাখিস্ না। এরা যেন কেউ তোর কাছ থেকে ব্যথা পেয়ে ফিরে না যায়। যুক্ত থাকিস্ সত্যের সাথে। তা' হোলে তোর ব্যবহারের মধ্যেও মাধুর্য্য রইবে, বাপ। ন্যায়, নীতি, সত্য, ধর্ম্ম এদের সামনে রেখে, পথে চলিস।

তাতে যদি তোর পা ক্ষত-বিক্ষতও হ'য়ে যায় কাঁটার ঘায়, তবুও থাকিস্ অটল। ফিরে আসিস্ নে যেন বিলে!

আর অন্যায়কে ক্ষমা করিস্ নে কোনদিন নরেন!

সে অন্যায়কারী যেই হোক। রাজাই হোক আর মহারাজাই হোক।

নির্ভীক চিত্ত। দ্বিধাহীন ভাব। অটল নরেন, অপ্রিয় সত্য শুনাতে।

বুদ্ধির বাটখারায় নিজের মান নিজেই ওজন ক'রে চলে নরেন। যে দিকে দেয়, যে পাল্লায় ঝুলোয়, সে দিকেই তো ঝুঁকে পড়ে।

তবে কেন নরেন বলবে না সত্য? উড়াবে না কেন নীল সাগরের অগৈ অন্তে শাশ্বত সত্যের ধ্বজা?

যুক্তির বাণে কেন মিথ্যার অন্ধকারকে ক্ষত ছিন্ন করবে না নরেন?

* * * * * *

দীর্ঘ দিনের কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নেবে ওদের এক শিক্ষক। মেট্রো-পলিটন স্কুলের শিক্ষক।

ছাত্রেরা দিবে মানপত্র। বিদায়াভিনন্দন।

কে এখন দুটো কথা কইবে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের পক্ষ থেকে?

চিন্তায় পড়ল ছেলেরা।

চল ভাই, নরেনকে বলি। যেন কে একজন বলল এই কথা।

আর কি। অমনি এসে ধরল তারা নরেনকে।

—যা কিছু বল্‌তে হবে তোকেই ভাই।

সভার সভাপতি হোলেন বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা আরম্ভ হোল। কিন্তু এই সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে বলা কি সহজসাধ্য? একফালি চিন্তার মেঘ দেখা দিল নরেনের চিত্তাকাশে। কিন্তু যখন ওরা ধরেছে, বলতেই হবে কিছু।

মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল তার শঙ্কা। তারপর ডাক পড়ল।

এলো সভামঞ্চে নরেন।

বলতে হবে আবার ইংরেজীতে। অনর্গল ব'লে গেল। আর সে কি দু-দশ মিনিট? পুরো আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করলো, ব'লে গেল ওদের ক্ষোভ, দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কথাগুলো।

কি অপূর্ব্ব প্রকাশ-ভঙ্গী। অদ্ভুত কণ্ঠ! বক্তৃতায় মুগ্ধ ক'রে দিল সবাইকে। ওকি।

সভাপতি যে আসন ছেড়ে নেমে আসছেন।

হে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ! তুমি নেমে এলে তোমার আসন ছেড়ে?

এলে বুঝি তোমার মুগ্ধ মন নিয়ে শিশু-বনস্পতিকে বারি সিঞ্চন করতে?

নরেনের প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলেন সুরেন্দ্রনাথ।

এ জগতে যারা এলো, এলো যাঁরা অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে, এলো যারা অ-শিবের শ্মশান-শিয়রে শিব-সুন্দরের মহামন্ত্র শোনাতে, তারা যে এমন ক'রেই শৈশবের লীলাচঞ্চল ভূমিতে দাঁড়িয়ে, অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ-গন্ধ পেয়েছে। পেয়েছে তারা দিব্য চোখে দেখতে অনাগত দিনের স্পষ্ট স্বচ্ছ রূপটিকে। তাইতো এতটুকুন ছেলের মুখে ও-রকম স্বভাব-মধুব ভাষা। ফুটে উঠল তা কি অপূর্ব্ব হ'য়ে, ফুটে উঠল কি সুললিত ছন্দোবদ্ধতার মাঝ দিয়ে!

কেউ কেউ বলে,—কি বলে?

বলে নরেন অহঙ্কারী।

বলবেই তো। তারা যে দেখে নরেনকে অনেক ব্যবধানে—

দেখে, তাদের আর নরেনের মাঝে স্তরের প্রভেদ বিরাট।

তাই তো ওদের স্থূল দৃষ্টিতে নরেন ভেসে ওঠে অহঙ্কারী হ'য়ে।

কিন্তু সত্যি কি নরেন অহঙ্কারী?

না।

তবে?

ওর অন্তর-দৃষ্টির জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে—তত্ত্ব, জ্ঞান, সত্য ও মুক্তি।

তাই তো সাধারণের ভাবনা-চিন্তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়—

দাঁড়ায় নরেনের বিরাট ব্যক্তিত্ব।

উপদেশ দেয় বয়োজ্যেষ্ঠদের। আর বলে যেন বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাব লয়ে যত সব তত্ত্বকথা।

তাই শুনে কেউ কেউ ভাবে—

নরেন একটি পহেলা নম্বরের অহঙ্কারী, আত্মগর্ব্বী ছেলে। যেখানে যে কাজে যায়, নরেন তার দলপতি।

তোমরা ভাব, ভাব—তোমাদের ক্ষীণকাতর মন লয়ে—তাই বিরাটকে দেখ ক্ষুদ্র ক'রে। ভাব তোমরা রাতের বুকে একটি তেলের দীপ জ্বেলে সূর্য্যের নিন্দের কথা। খুঁজতে যাও কূয়ো কেটে সমুদ্রের অথৈ অন্তকে?

ওর মাঝে যে বিরাট বিক্ষুব্ধ নদীর খরধারা। বনস্পতির মর্ম্মর ধ্বনি। আর নীল সাগরের স্পষ্ট স্বচ্ছ নির্ম্মল নির্ঝর।

একটিবার চেষ্টা কর। চেষ্টা কর দেখতে ওর অন্তর-রাজ্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকে। দেখ চেয়ে, সূর্য্য-চন্দ্রের কি অপূর্ব্ব মিলন। দিনের অঙ্গে রাত্রির অবসান। দেখ ওর রৌদ্রদগ্ধ আয়ত দীপ্ত আঁখিতে পাবক বহ্নি।

শোন, ওর জলদ-মন্দ্রিত কণ্ঠে মানব-আত্মার জয়-গান।

আর চেয়ে দেখ তো ওর পথ-চলার পদাঙ্কে কিসের স্বাক্ষর?

আলো জ্বলছে না?

এগিয়ে চল ঐ পথে। দ্বন্দ্ব দুঃখের সঙ্কীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে মন থেকে। দীনের চেয়েও দীন হ'য়ে অর্পণ কর তোমার আমিত্বকে ওর কাছে।

অর্পণ কর, শান্তি পাবে।

জটিল-কুটিল মন সরল-সুন্দর হ'য়ে উঠবে। চিত্ত ভ'রে যাবে তোমার আনন্দের অমিয় লহরে।

ওকি যে-সে?

ও-যে এসেছে কুটিল—কুহক—অজ্ঞান—অন্ধকারময় আচ্ছন্ন আবেশের মাঝে উল্কাব বেগবান আবেগ লয়ে।

এসেছে আজিকার মোহময় জাতিকে অতীত ঐতিহ্যের উদ্গীথ শোনাতে।

এসেছে সনাতন ধর্ম্মের সত্য, স্নিগ্ধ ও পবিত্র বেদবাণী বক্ষে লয়ে।

ঠাহর করতে পারনি তো?

তাই বলছ নরেন অহঙ্কারী।

অহঙ্কারী নয় নরেন। নরেন অহং-সংহারী।

* * * *

এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে ঢুকল এসে কলেজে।

সুরু হোল তার জীবনে এক নতুন অধ্যায়।

একদিকে রঙ্গ-স্ফূর্ত্তি, গান, বাজনায় বিলোল নরেন। আর একদিকে—আঘাত, সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও অভিঘাতের বেদনায় বিক্ষুব্ধ-চিত্ত।

দু-ধারা চলল পাশাপাশি—চলল নরেনের জীবন-মনকে কখনো মরুময় ক'রে—কখনো বা বিশুদ্ধ বিমল আনন্দের দোলা দিয়ে।

শতাব্দীর সায়ন্তনী ক্রমে এলো গাঢ় ঘোর হ'য়ে বিদিশার নেশায়।

মোগল সাম্রাজ্যের সৌধ-শিখরে রাত্রির অবগুণ্ঠন।

মহারাষ্ট্রের গতিবেগে শ্লথ লগ্ন।

আর, শিখ গরিমার উজ্জ্বল আকাশে নিশীথের যৌবন।

তিমির-তন্দ্রার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দুটো জাতি।

এক হিন্দু। আর মুসলমান।

ভেসে যাচ্ছে দেশ—

ভেসে যাচ্ছে, আত্ম-বিস্মৃতির অথৈ অতলান্তে। যাচ্ছে ভেসে সুরা সমুদ্রের অবাধ্য ঢেউয়ে, ইংরেজীয়ানার বাহাদুর বাহারে।

পাগলা হ'য়ে গেছে দেশ। গেছে নিরাশার নিষ্ঠুর অন্ধকারে তামসিকতার তপস্যায়।

মাতালের দল চুর হ'য়ে প'ড়ে আছে।

কোথায়?

রাস্তায় ঘাটে। নর্দ্দমায়। নালায়।

সান্ত্রী এলে বলে—আছি বাবা নর্দ্দমায়, পুলিশের আয়ত্তের বাইরে। ধরতে পারবে না টিকিটিও।

যেন মস্ত এক ওস্তাদি।

আবার বলে—"সেকালে পেত ভূতে।"

আর একালে?

"একালে পেয়েছে আমাদের মদে।"

ব্রাণ্ডি, হুইস্কি।

আর?

চরস—ভাং—গাঁজা।

এ না হোলে নাকি যুক্ত হ'তে হয় মূর্খ-অশিক্ষিতের দলে।

অশিক্ষিত কে? ইংরেজী জানে না যে সেই অশিক্ষিত।

শিক্ষিতেরা বলে, বলে কিনা—মদ না খাওয়া মানে কুলে কালি মাখা।

রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে পাশ করেছে বি. এ.। কিন্তু এতগুলো পাশ করলে কি হবে?

ও-যে মদ খেতে চায় না। মদ খায় না।

দুঃখ ক'রে বলে ঘোষ মশাই– "তুই শিখলি না মদ খেতে, তোকে আমি কেমন ক'রে বা'র করি সমাজে ?"

আবার প্যারীচরণ সরকার আহাম্মকের মত স্থাপন করছে একটা সভা।

ঘটা ক'রে নাম দিয়েছে তার 'সুরাপান নিবারণী সভা'।

হায়! হায়! আবেগ-পাগল পরানুকরণের জাত! তোমার কৃষ্টি, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সাধনাকে মুহূর্ত্তের মত্ততায় একদম তলিয়ে দিলে! তলিয়ে দিলে বেনের বিশুষ্ক আভরণের মনোহারী চাক্‌চিক্যে, জড়বাদের দেহ সর্ব্বস্বতায় ?

ওতে যে গভীরতা নেই। আছে শুধু বিস্তৃতির ক্ষুধা। নেই তো ত্যাগের তপ। আছে কেবল ভোগের জপ। ও ফুলে নেইকো গন্ধ। কেবল আছে দলের বাহার রঙের জৌলুস।

তবুও থামছে না গতির স্রোত।

চলছে মায়ামৃগের পিছু পিছু। চলছে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা-আচার-বিচারের রূক্ষরিক্ত পথে।

শিক্ষিত সমাজ তো ভেঙে পড়েছে একদম। ভেঙে পড়েছে সাহেবিয়ানার মোসাহেবিতে। ফাঁকা ফাঁকা ইংরেজী বুলির তুবড়ি ছুটিয়ে চলছে তারা। গালি দেয় ইংরেজীতে। ইংরেজীতে বলে কথা। আর ইংরেজীতে ভালোবাসার অনুরাগের ফুলঝুরি ছোটায়।

বিজিতের দল মুগ্ধ, মোহাবিষ্ট তারা বিজয়ী জাতির গুণ-গরিমায়।

শতাব্দীর তমসাচ্ছন্ন আঁধার সায়রে দাঁড়িয়ে ওরা, অবসর পায় না পিছু ফিরে তাকাবার। কেবল এগিয়ে চলার নেশা। চলল তামসিকতার তন্দ্রাচ্ছন্ন তুহিন তমিস্রায়।

উপপত্নী রাখে তারা। রাখে অর্থের জোরে।

সুরাপানে ছোটে ভ্রমরের মত। ছোটে তারা মদের আড্ডায়।

নেই কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ।

শোনে তারা কান পেতে।

কি ?

আপন ধর্ম্মের, কৃষ্টি-কর্ম্মের নিন্দা-গাথা। শোনে হিন্দুর আচার মন্দ। বিচার মিথ্যা। ধর্ম্ম ভ্রান্ত। পৈশাচিকতা পূর্ণ।

প্রতিবাদ করবে ? তার শক্তি কোথায় !

এ-যে গা ঢেলে দিয়েছে, ঢেলে দিয়েছে গা উচ্ছন্নের স্রোতে।

হিন্দুর আবার ধর্ম্ম ?

নিছক কতকগুলো মাটি আর পাথর পূজার সমারোহ।

ছ্যাই, একি একটা ধর্ম্ম নাকি !

শিক্ষার আলো যারা পেয়েছে, তারাও যেমন চলে ; আবার যারা তা পায়নি, তারাও ঠিক তেমনই।

সুরা—ভাং—গাঁজা আর চরস !

বেশ মশ্‌গুল জীবন। খৃষ্টধর্ম্মের নাম ক'রে চলল পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতা, চলল উচ্ছৃঙ্খলতার প্লাবন। এমন দুর্দ্দশায় মহাপ্রাণ যীশুও বুঝি হলেন লজ্জিত, ক্লিষ্ট।

গির্জ্জায় গিয়ে জানু পেতে প্রার্থনার সমারোহ।

ব্যস্ ঈশ্বরকে হ'য়ে গেল ডাকা।

আবার বলে ওরা,—চৈতন্যদেব ! সে আবার কে ?

চিনতে পারে না জাতি তার আরাধ্য দেবতা। চিনতে পারে না পিতৃ-কুলের কাউকে।

বলে—গীতা-চণ্ডী-ভাগবত ?

আরে, ওগুলো আবার বই নাকি ? ওগুলোতে আছে কি ? কতকগুলো বিকারগ্রস্ত মনের বিলাপে আছে পূর্ণ হ'য়ে।

বেদ-পুরাণ-উপনিষদ্ ?

কে জানে ! ওর তো নামই শুনিনি।

শুনল যদি কোথাও কিছু বিস্ময়ের কথা। অমনি ব'লে ফেলল ধোপদস্তুর ভদ্রলোকের দল।

কি ?

ও-সব "কথক ঠাকুরের কথা।"

বিশ্বাস করে না কেউ কথক ঠাকুরদের কথা। ওগুলো নাকি কতকগুলো মিথ্যার রকমারি বিন্যাস।

গোটা দেশটা ঝুঁকে পড়ল খৃষ্টধর্ম্মের দিকে। কতকগুলো লোক গেল আবার মাতাল হ'য়ে। তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করল আরো অনেকে। এমন প্রাণ-মাতানো মন-ভোলানো ধর্ম্ম কি আর আছে !

বেরুল পাদরির দল। বেরুল গলির মোড়ে। পার্কের ধারে। গির্জ্জার গহনে।

মনে তাদের মালিন্যের কালি। দুরভিসন্ধির অভীপ্সা প্রচ্ছন্ন অন্তরে এসে ছড়িয়ে পড়ল তারা, ছড়িয়ে পড়ল ভারতের শহরে, বন্দরে, গাঁয়ে!

উদ্দেশ্য ?

ধর্ম্মের নামে পাকাপোক্ত ক'রে নিচ্ছে রাজত্বের ভিতটা।

কেবল কি কামান দিয়েই শাসন করা চলে ?

ভাবে-ভাবনায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে খাঁটি সাহেব ক'রে তুলতে হবে। তবে তো বনেদ হবে পাকা।

চতুরের দল ফেলেছে চালাকির জাল। একবার জালে ধরা দিলেই হোল! এদেশ ছেড়ে যেতে চাইলেও ছাড়বে না গুণমুগ্ধ পদলেহীর দল।

চলল দেশের বুকে অনাচার। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অভিযান। ডুবে গেল স্বাজাত্যাভিমান।

নেমে এলো, নেমে এলো অবিশ্বাস, অশান্তি, দুঃখ ও দহন। নেমে এলো পাপের প্লাবন মুক্তির মহাতীর্থে।

সুরু হোল আষাঢ় বাদল।

যায়, যায় বুঝি আত্ম-বিস্মৃত জাতির শেষ চিহ্নটুকুও—যায় বুঝি অবলুপ্তির অন্ধকারে বিলুপ্ত হ'য়ে। নৈস্ফল্যের গুহায় কে জ্বালাবে আশার দীপ-শিখা ? কে শোনাবে ধ্বংসের মরু-শ্মশানে জীবনের জয়গান? কে দেখাবে পথ, রাত্রির যাত্রীদের ?

ওগো, তুমি নেমে এসো—

নেমে এসো ধারণ করতে, নেমে এসো ধাত্রীর মত—ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে নিশ্চিত নির্ভাবনার অঙ্কে নিতে!

রুদ্র-বীণায় কে যেন ঝঙ্কার দিল। ফিরে তাকাল শিক্ষিত সমাজ।

কে? কে তুমি এলে তন্দ্রাচ্ছন্ন আঁধার সায়রে মুক্তির দীপ জ্বালিয়ে? এলো স্মরণীয় সন্তান! এলো মুক্তি-যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত রাজা রামমোহন রায়। শুনালো বেদান্তের বাণী। শুনালো ভারতীয় ঋষির তপোলব্ধ শাশ্বত সত্যের উদার সার্ব্বজনীন বাণী। দেবান্তের তত্ত্বদর্শনের সার্থক সমাচার নিয়ে এলো এই মহাবিপ্লবী, সমন্বয়ের যাজ্ঞিক।

চাইল রাত্রির যাত্রীদের পথে আলো জ্বালাতে।

কিন্তু কেউ দাঁড়াল না। দাঁড়াল না রামমোহনের পাশে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ চাইল স্তব্ধ ক'রে দিতে রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলন।

কেন ?

বিধবা পুড়িয়ে মারতে দেবে না রাজা। দেবে না এই নিষ্ঠুর জঘন্য কাজ সমাজে অনুষ্ঠিত হ'তে। প্রবল প্রতিরোধের পাঁচিল দাঁড় করালো রামমোহন। প'ড়ে গেল হিন্দু সমাজে একটা প্রবল সাড়া। সবার মুখে এক কথা। সতীদাহ ? সে যে মহাপুণ্যের কাজ। এ না করলে যে ধর্ম্ম থাকবে না। রসাতলে যাবে, রসাতলে যাবে হিন্দু ধর্ম্ম। স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দেওয়া—সে যে স্বর্গ-প্রাপ্তির পুণ্য।

প্রাচীনপন্থীরা নিষ্ক্রিয় রইল না। তারা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল বাল-বিধবা। নিক্ষেপ করল মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায়। ধরল বাঁশ দিয়ে চেপে। অসহায় অনন্যোপায় হতভাগিনীরা বরণ করতে লাগল মৃত্যু, বরণ করতে লাগল শেষ অশ্রু-বিন্দু ধরণীর কোলে রেখে।

আরো এক মহা-পুণ্যের মহা-যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগল তারা—তাজা, তাজা শিশুদের। গঙ্গার ফেনিল তরঙ্গে নিক্ষেপ করল, নিক্ষেপ করল সমাজপতিরা মায়ের বুক শূন্য ক'রে সুকুমার-অবলা শিশুদের।

রামমোহন সুরু করল আন্দোলন। বন্ধ ক'রে দিল সতীদাহ প্রথা। বন্ধ ক'রে দিল গঙ্গাবক্ষে সন্তান-নিক্ষেপের পুণ্য অর্জ্জন।

রোল উঠল প্রতিবাদের। উঠল হাহাকার। গেল, গেল, হিন্দু ধর্ম্ম লুপ্ত হ'য়ে গেল। রক্ষণশীল দলপতি রাধাকান্ত দেব রক্তনেত্রে উড়িয়ে দিতে চাইল রামমোহনকে। গোপনে আয়োজন করতে লাগল তার অপসারণের।

কিন্তু যুগের বুকে জেগেছে তখন মহামুক্তির ঢেউ। কে কার গতি রোখে ? কে পারে, এই উচ্ছল, বিলোল, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের বিদ্যুৎ বেগকে বেঁধে রাখতে ?

কেবল কি সতীদের দাহ করতে না দিয়েই ক্ষান্ত হোল ?

না।

তবে ?

এলো বিদ্যাসাগর।

সতীদের বিয়ে-ও দেবে। বিয়ে দেবে বাল-বিধবাদের।

শুনে ত প্রাচীনপন্থীরা অবাক্ !

এ-যে ঘোর অনাচার ! মহা পাপ !

লেগে গেল প্রাচীনপন্থীরা মরিয়া হ'য়ে। যেন আগুনে পড়ল ঘৃতের আহুতি। বলল তারা, বলল—এমন অধর্ম্মের স্থান নেই হিন্দু ধর্ম্মে।

প্রতিবাদ জানাল বিদ্যাসাগর। বলল,—"বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, এজন্মে এর চেয়ে অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করতে যে পারব তার সম্ভাবনা নেই; এর জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি এবং আবশ্যক হলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—

বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে দেখে,—"এতদিন খাল, ডোবা, পুকুর দেখেছি। আজ সমুদ্র দেখলাম।"

কিন্তু এ সমুদ্রের প্রবল প্রভঞ্জনেও গেল না ধুয়ে-মুছে সমাজের মালিন্য।

এলো কেশব। এলো বিজয়। দেবেন ঠাকুর দিল তাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা।

সুরু হোল দিকে দিকে আন্দোলন—সুরু হোল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ইংরেজী পড়ুয়া ছেলে কেশব। চমৎকার বক্তৃতা দেয়। মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেলে জনগণকে। মুগ্ধ ক'রে ফেলে দু-চার কথা বলতে, বলতেই।

সেই কেশব সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হোল একাধিক পত্রিকা।

মদিরাক্ষরা সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজটা দাঁড়াল একটু থমকে। থমকে দাঁড়াল কেশব সেনের বক্তৃতার সম্মোহনে। সংঘাতমুখর দুটি ধর্ম্ম-বিরোধী জাতির মাঝে কেশব যেন নিশ্চিত ঐক্যের সেতুবন্ধন।

কেশব শুনাল তাদের নতুন কথা। দেখাল তাদের সহজ পথ। বলল,—গ্রহণ কর যীশুর ধর্ম্ম। কিন্তু সরিয়ে দাও যীশুকে। মূর্ত্তি নিয়ে মাতামাতি কিসের? মনের খোঁজ নাও। জান আত্মার স্বরূপ। তবেই কেটে যাবে—ভুল-ভ্রান্তি। অপসৃত হবে অন্ধকার। খুলে যাবে তৃতীয় নয়ন। দৈহিক সুখ-ভোগে নয়। একেবারে তন্ময় হ'তে হবে ঐহিকের সাধনায়। মুক্ত করতে হবে, মুক্ত করতে হবে কায়ার মায়া থেকে প্রাণকে।

দেহকে জ্বালার দহন দিয়ে মেলে না আত্মার তৃপ্তি। ধর্ম্ম হয় না ঐ ক'রে। সুন্দরের সাধনায় আবার জঞ্জালের স্তূপ কেন? কেন জ্যোছনার জয়গানে আবার মেঘের খঞ্জনি? ওখানে কেবল একটি যন্ত্রই বাজতে পারে—ঝঙ্কৃত হ'তে পারে মাত্র একটি সুর, একটি ছন্দ। সে যন্ত্র হোল মনো-বীণা। আর সে সুর হোল বেহাগ। ছন্দ হোল লাচাড়ী।

ফিরে তাকাল ওরা। চোখে মুখে অবাক্ বিস্ময়!

সুরটা লেগে গেল কানে। বলে কিনা,—এ-ত বেশ কথা! বেশ ধর্ম্ম! আরে, ও ভায়া, শুনছনি কি বলছে?—

এর মাঝে পাওয়া যায় যীশুকেও। আবার আছে এতে বাপ দাদার ধর্ম্মকর্ম্মও।

চল, আমরাও ভিড়ে যাই। ভিড়ে যাই সেন-মশাই-এর সম্প্রদায়ে।

এমনি দিনের পটভূমিতে এলো বিজয়কৃষ্ণ। শোনাতে লাগল তার কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী। সত্যের চিরন্তনী বার্ত্তা। রাস্তার বাঁকে। কলেজের গেটে। যেখানে জনতার ভিড়, সেখানেই বিজয়ের বক্তৃতা।

ভেঙে পড়ল ওদের মন।

চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব! বলল—নেশাটা তো বড্ড লাগিয়েছে! দাঁড়া দেখি। শোন্ কি বলছে!

বিজয় ব'লেই চলেছে—

ব'লে চলেছে—পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। আছেন তিনি বাইরেও। আবার অন্তরেও। তিনি অনন্ত। অসীম। রূপারূপের উর্দ্ধ্বের। সত্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জমিনে তিনি আভাসিত হন। আভাসিত হন ভক্তের তন্‌হা মেটাতে। অন্তর মন শীতল ক'রে দিতে। জ্ঞান-স্বরূপে বিরাজ করেন তিনি। বিরাজ করেন নিরাকার অদ্বয়-শক্তি। তাঁকে পেতে হোলে চাই অনুরাগের কান্না। দর্শন-লোভন আকুতি। দরকার নেই তো মন্ত্র-তন্ত্রের। কেবল একবারটি চোখের জলে বুক ভাসালেই ভক্তের অন্তরে হয়—সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের বসতি, প্রীতি। নেমে আসেন তিনি তাঁর সিংহাসন থেকে ভক্তের হৃদিপদ্মে আশ্রয় নিতে। এই সাধনা হাঁটু ভেঙে দল বেঁধে সমারোহ ক'রে নয়। নীরবে নিভৃতে একাকী ডুবে যেতে হবে অন্তর-গহনে। দেখবে, কি সুন্দর! কি মধুর! কেটে যাবে অন্তরাকাশ হ'তে বৈশাখের ঘন-কালো মেঘ। নির্ম্মল অন্তরে শুনবে তাঁর পদধ্বনি, তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ ছন্দ। দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে। তখন বলতে ইচ্ছা হবে—

ওগো, সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন তোমার নৃত্য ছন্দ—আকাশের নীলিমায় যেমন তুমি জ্যোতির্ম্ময়—তেমনি আমার অন্তর-দর্পণে হোক তোমার শুভ্র প্রকাশ। অপসৃত হ'য়ে যাক দ্বন্দ্ব-অন্ধকার। মেঘের চোখে দিয়েছ কান্না। চাতকের কণ্ঠে দিয়েছ তৃষ্ণা। ঠিক তেমন যেন হয় আমার অন্তরের আকুলতা। আসে যেন বুক ফেটে কান্না। তোমাকে লাভ করবার ব্যাকুল, আকুল কান্না।

ব'লে ফেলল উন্মার্গগামীর দল—

ব'লে ফেলল—বেশ! বেশ! তোফা! তোফা!

তবে আর কেন? এখানে প'ড়ে থেকে কি হবে?

চল ফিরে যাই।

কোথায় ?

ব্রাহ্ম-সমাজে।

গা তুলল রাত্রির যাত্রীরা। তাকাল ফিরে। তাকাল ফিরে বিজয়কৃষ্ণের দিকে।

নদীর স্রোত বেগবান হোলেও, তাতে থাকে আবিল। থাকে আবর্জ্জনা। এরা আসে থেকে-থেকে। ভেসে ভেসে।

যদিও তারা স্থিতিহীন। কিন্তু তবুও সৃষ্টি করে ক্ষণেকের অবরোধ।

গা তুললে কি হবে ? বেঁকে বসল আর একটি দল। বলতে সুরু ক'রে দিলে তারা—ব্রাহ্ম-ট্রাহ্ম কিছু নয়। ঠাকুর-দেবতা সব মিথ্যা। সব ভ্রান্ত।

এরা কারা ?

নাস্তিকের দল।

এলো আবার বাস্তববাদীরা।

মানতে চাইল না ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো বস্তুকে। ধর্ম্ম তাদের কাছে নিছক একটা হাসির বস্তু। এগুলো নাকি ভীরুর লক্ষণ। রণক্ষেত্র হ'তে পলায়নের সযত্ন প্রয়াস মাত্র।

এলো আরো কত দল। দাঁড়াল কেউ রুখে ব্রাহ্ম-সমাজকে। কেউ-বা হিন্দুর হিন্দুত্ব ধ'রে রাখবার জন্যে উঠল মেতে। দ্বন্দ্বের অবসান হোল না। সুরু হোল দিকে দিকে ধর্ম্ম-বিপ্লব। সনাতন ধর্ম্মের ভিতে ধরিয়ে দিল কাঁপন—কাঁপন ধরিয়ে দিল অন্তর-দ্বন্দ্বের প্রলয় বৈশাখ।

দেখা দিল কত নতুন নতুন সমস্যা।

বিশৃঙ্খলা। বিভ্রান্তি। অশান্তি। অন্ধকার।

ওদিকে এসে দাঁড়াল আবার মিশনারিরা—

দাঁড়াল তাদের ধর্ম্মকে প্রচার করবার জন্যে নব-উদ্যমে। স্বাজাত্যের এই অন্তর-দ্বন্দ্বের সুযোগটুকু তারা গ্রহণ করল পুর্ণভাবে।

বাংলা শিখে ফেলল পাদরিরা।

এখন আর কে পারে তাদের গতিকে রুখ্‌তে।

বাংলার তথা ভারতের ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের শ্মশানভূমিতে গাড়ল গির্জ্জার ভিত—গাড়ল পাদরির দল।

কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর।

দেখা হ'য়ে গেল কলকাতায়—'সঙ্গত সভায়'।

এ যেন তুই মহাসমুদ্র। মিলেছে এক মোহনায়।

যেমন কেশব, তেমনি বিজয়। প্রজ্ঞার পাহাড়। ভক্তির সাগর। উদ্দীপনের আলো।

অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে -তাকিয়ে থাকে একজন আর একজনের দিকে। দৃষ্টি যেন পড়ে না! নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত স্নিগ্ধ—উজ্জ্বল—নিস্পন্দ।

কি দেখছে চেয়ে চেয়ে?

দেখছে, সীমার মাঝে অসীমকে। দেখছে, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডকে।

ভাব হোল। আলাপ জমল। তারপর তো একেবারে একাত্মা। এক প্রাণ। যেন এক বৃন্তের তুটি ফুল। মাতিয়ে দেবে এ-কূল, ও-কূল! আর কে পারে ধ'রে রাখতে! আনন্দে নৃত্য করে মন। ব'য়ে চলে প্রেমের উজান।

বিজয়ের পানে তাকিয়ে কেশব ভাবে,—কে এলে তুমি প্রলয়ের রাত্রে আলো লয়ে হাতে?

আবার বিজয় ভাবে অপলক আঁখিপাতে,—তবে কি সুর্য্যের সম্পাত হোল নগ্না তিমিরে!

আর ভাবনা নেই। নৈষ্ফল্যের গুহায় এবার জ্বলবে সাফল্যের আলো।

ছড়িয়ে পড়বে দীপ্তি। অপস্থত হবে অন্ধকার। জাগবে মানুষ। চলবে মিছিল।

বিজয় বেরিয়ে পড়ল দেশ-পরিক্রমায়। বেরিয়ে পড়ল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করতে।

আর কেশব?

সে তো তুলল রীতিমত একটা আলোড়ন। মহানগরীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত অবধি প'ড়ে গেল সাড়া। বক্তৃতা। আর বক্তৃতা!

শুধু কি তাই?

চালাল লেখনী। সংবাদপত্রের মারফৎ জানিয়ে দিল তাদের উদ্দেশ্য।

সন্তুষ্ট হ'য়ে ছুটল লোক, ছুটল দলে দলে। যোগ দিতে লাগল ব্রাহ্ম-সমাজে।

কিন্তু তবুও ঝড় থামল না।

বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-লহরগুলো চলল সমান তালেই।

দেখা দিল আর এক নতুন সমস্যা।

কেশব চাইল—কি?

চাইল, পুরাতনের জীর্ণতায় আনতে নতুনের প্রাণ-চেতনা—চাইল রক্ষণশীলতার মাঝখানে উদারতা। চাইল স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ-বিবাহ। চাইল ব্রাহ্ম-সমাজকে খৃষ্টীয় নীতিবাদের সঙ্গে তাল সামাল ক'রে ভ্রান্ত যাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে।

কিন্তু বেঁকে বসল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাধল গুরু-শিষ্যে দ্বন্দ্ব।

বাহ্যিক আচার-বিচার, সে তো সংস্কারের অঙ্গ। তাকে নিয়ে প'ড়ে থাকলে চলবে কেন? জাতির বুকে নেমে এসেছে অন্ধকারের গুণ্ঠন। প্রধান কাজ, তাকে অপসৃত করা। ভ্রান্তির গুহা থেকে নিয়ে আসতে হবে তাকে সত্যের আলোকে, নিয়ে আসতে হবে উন্মুক্তির দিগন্তে।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পারল না একমত হোতে।

ফলে হোল কী?

ভাগ হ'য়ে গেল সমাজ।

কেশব সেনের দলে রইল বিজয়কৃষ্ণ। রইল শিবনাথ। ওদের সমাজের নাম হোল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ'।

আর দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম হোল 'আদি সমাজ'।

দু'ধারা চলল দু'দিকে।

ওদিকে আবার প্রাচীনপন্থীরা গঠন করল—

'হরি সভা'। গঠন করল 'ধর্ম্ম-সভা'। হিন্দুত্বের গায়ে রং লাগাল পাশ্চাত্যের। চাইল হিন্দুর হিন্দুত্বকে ধ'রে রাখতে মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু প্রাণ কোথায়? কোথায় হবে তাদের প্রতিষ্ঠা?

এ-যে কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর!

চালাকীতে কি আর মহৎ কাজ হয়? তাতে প্রকাশ পায় শুধু মনের কুৎসিত বৃত্তি। দিন দিন হ'য়ে পড়ে তা আবরণহীন। শূন্য হৃদয় পূর্ণ থাকলেই তবে পরিবেশনে আনন্দ।

ভাড়া-করা বক্তা এনে ভক্তি বিতরণ। ভুঁড়ি ভাসানো ভোজন।

কীর্ত্তন আর দান।

দেউলে-মন মুখর হোল বহিরঙ্গার প্রাচুর্য্যে। কিন্তু মনে জাগল না অনুরাগের তন্‌হা। অনুভূতির প্রকাশ। নিছক কতকগুলো বাহবা পাবার মোহ লয়ে চলল তারা—

চলল সমাজের, দেশের ও কালের বুকে।

বিজয় আর কেশব কী করছে?

ভাসিয়েছে তরণী—

ভাসিয়েছে তারা মুক্তির তরণী ভক্তির সাগরে। তুলে দিয়েছে পাল। হাল ধরেছে শক্ত হাতে।

বেশ জোর বিভেদ বাধল। বিভেদ বাধল সমাজে—সমাজে। ধর্ম্মে—ধর্ম্মে। মত্ত হ'য়ে উঠল দেশ। মত্ত হ'য়ে উঠল আত্মদ্বন্দ্বে। জাগল প্রবল ঝড়। নব-নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রপীঠ কলকাতা হোল যেন রণক্ষেত্র।

যায় ধর্ম্ম! যায় বুঝি দেশ! যায় বুঝি জাতির আত্ম-পরিচয়টুকুও মুছে!

ঘোর দুর্দ্দিন। প্রলয়ের দুরন্ত সঙ্কেত। সংস্কারের ঝড়।

প্লাবন-ক্ষুব্ধ চঞ্চল আবেশ। বিমূঢ়-বিস্ময়ে বিদিশার অন্ধকারে বিভ্রান্ত জাতি নীড়হারা।

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

মহানগরীর উপকণ্ঠে ও কার কণ্ঠস্বর? কে-ও দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞার প্রদীপ হাতে লয়ে?

কণ্ঠে করুণার কলগীতি। নয়নে প্রেমের অঞ্জন। বয়ানে চন্দ্রপ্রভা। চরণে সূর্য্যদীপ্তি। কে—কে এলো রে?

রাণী রাসমণির পূজারী। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পূজারী ঠাকুর।

ডেকে বললেন,—"ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়!"

দলের ভেদ নেই। মতের দ্বন্দ্ব নেই। নেই জাত-বিচার। কেবল বল্‌ছেন —ওরে আয়! আয় তোরা ছুটে!

আহা এমন ক'রে তো আর কেউ ডাকে নি!

ওগো দেবতা, তবে কী তুমি এলে—

এলে, সঞ্জীবনী মন্ত্রে মোহাচ্ছন্ন জাতির ঘুম ভাঙাতে ?

এলে কি তুমি দহন থেকে উত্তরণের সংবাদ জানাতে ?

ওগো আলোর দিশারী, জ্বলুক তোমার জ্ঞানের দীপ-শিখা। রাত্রির তমিস্রায় জাগুক সূর্য্য। টেনে দাও, দাও টেনে ক্লেদ-পঙ্কে শেষাঙ্কের যবনিকা। বেজে উঠুক দুঃখের রাত্রিশেষে বাউলের একতারা।

আবার সেই আকুল আহ্বান,—"ওরে, তোরা আয় !"

চম্‌কে তাকায় ওরা। মনে ভাবে—ওগো কে—কে তুমি ?

ভারতের যুগস্রষ্টা অবতার। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়-সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

এ যে—সে নয় ?

নির্ব্বিকল্প সাধনায় সিদ্ধ। জেনেছে পরাসত্যের পথ। পেয়েছে মহাজ্ঞানের সন্ধান। দেখেছে মাকে। কথা বলে মৃন্ময়ী-মা। বলে চিন্ময়ী হ'য়ে। হাসে। নাচে। খেলে। আবার নাচায়। খেলায়।

একটু চোখের অদেখা হোলে ভক্ত কেঁদে আকুল।

বলে,—"মা, দেখা দিবি তো দে, নয় তো এই খড়্গ দিয়ে আজ এখানেই জীবন বলি দেব।"

এলোকেশী অমনি হেসে ওঠে। হেসে ওঠে সুন্দরী, সুরেশ্বরী। বলে, আমি যে তোমার অন্তরেই আছি।

সেই মায়ের ছেলে এসেছে। এসেছে মায়ের নাম শোনাতে। এসেছে প্রাণের ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর হ'য়ে। মানুষের মত। মানুষের ঘরে। স্নিগ্ধ সুন্দর, জোছনা। সাম্য-শান্তি-কান্তি। প্রজ্ঞা, প্রেম ও প্রাণ। এ যে একেবারে অপূর্ণতার মাঝে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। অশান্তির অন্ধকারে শান্তির সামসঙ্গীত। দ্বন্দ্বের কোলাহলে সাম্যের সমন্বয়। প্রলয়ের খণ্ড-বিক্ষিপ্ত বাত্যায় অখণ্ডের অজেয় বিজয়।

রাহুর বাহু শিথিল হোল। জাগল সূর্য্য। হোল অরুণোদয়।

এলো মরা নদীতে স্রোতের কলতান। মরুতে ফুটল তাজা ফুল।

আলোয় আলোময় হ'য়ে গেল দিক্ বিদিক্।

এগিয়ে এলো মূর্ত্তি পূজা-বিরোধীর দল—

এগিয়ে এলো মন্ত্রমুগ্ধের মত।

কেশবই এলো আগে।

কালীবাড়ীতে মহা-সম্মেলন। শক্তি-সাধককে ঘিরে শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান একইভাবে ভাব-মৌন।

কিন্তু এ-কী হোল্?

প্রাণে—মনে অমিল। দেহে গেহে সংঘাত?

অথচ, সম্মূঢ়। সমাসক্ত। সম্পৃক্ত।

কেশব চায়—

চায় তার অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের বসতি-প্রীতি।

নিরাকার ব্রহ্মাদি সাকার সাধনায় তন্ময়।

ত্যাগীর তপোবনে তাপস তপোমগ্ন।

আর কেন?

এবারে লেখা হ'য়ে যাক, লেখা হ'য়ে যাক তোমার বিজয়-কেতনে মায়ের নাম। উড়ুক তা' আকাশে। উড়ুক মনের সীমাহীন অসীম নভে।

শক্তি চাই। শক্তি না হোলে কি মুক্তি মেলে? শক্তিতেই তো আসে অনুরাগের কান্না। ভক্তির অশ্রান্ত প্রবাহ।

সে শক্তির আধার কোথায়?

মায়ের শ্রীচরণ-কমলে।

মাকে ডাকতে হবে। কেঁদে-কেঁদে হাসি ফোটাতে হবে মায়ের মুখে। বলতে হবে—আমায় দেখা দে মা। দেখা দে তোর রূপমধুর মাধুরী লয়ে।

কেশব মা ডাকতে শিখেছে। মা-মা ব'লে কাঁদে। মায়ের নামে চোখে আসে কান্না। ভাব-সমুদ্রে জাগে ঢেউ। কেশব সমর্পণের আনন্দে যায় আত্মহারা হ'য়ে। গোপনে গহনে নিভৃতে নিরজনে পুজা করে কেশব, পুজা করে পরমহংসের পাদপদ্ম। একেবারে দরজায় খিল দিয়ে তারপরে উপাসনা। পাছে কেউ বা দেখে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য, নিরাকার-ব্রহ্মের উপাসক, তার কি মাতৃভাবে তন্ময়তা শোভা পায়?

এ-যে নিয়ম-বিরোধী কাজ। বে-আইনী ভাব।

ঠাকুর বলেন,—"আজ আমাকে কেশব পুজা করেছে। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, পাছে ওর দলের লোকেরা টের পায়। ও যেমন দরজা বন্ধ ক'রে পুজো কল্লে, তেমন ওর দরজাও বন্ধ থাকবে।"

কেশব নিশীথের বিহগ। ঘনারণ্যের অনাঘ্রাত কুসুম।

কিন্তু এই কি সেই কেশব?

দুরন্ত বিদ্রোহী। উড়িয়ে দিতে চায় প্রাচীন ধর্ম্মপন্থাকে। মাতা সারদাসুন্দরীর মন-ভরা ভাবনা। কি করবে এমন দামাল ছেলেকে নিয়ে? কেমন ক'রে ফিরিয়ে আনবে পথে!

সবাই মিলে বললে—ওকে মন্ত্র দাও। কুলগুরুর মন্ত্র। তবে যদি মনের ঘুণ কাটে।

দিন তারিখ দেখা হোল। এলো দীক্ষার মুহুর্ত্ত।

কিন্তু কোথায় কেশব?

ডাকাডাকি। সবাই মিলে গলা ছেড়ে ডাকল। কিন্তু সাড়াটি নেই।

সে কি আর বাড়ীতে আছে?

সটান চলে এসেছে দেবেন ঠাকুরের কাছে।

খবর পাঠিয়েছে বাড়ীতে। খবর পাঠিয়েছে—পৌত্তলিক গুরুর কাছে দীক্ষা নেবে না সে।

সে কী কথা গো।

উৎসবের হাস্য-মুখর অঙ্গনে নেমে এলো বিষাদের কালো ছায়া। সবাই তো চটে লাল। যেন পেলে এখনই সম্‌ঝে দেবে।

কেশব এসে ব্রাহ্ম-সমাজের বই দিল মাকে। বলল,—প'ড়ে দেখ মা।

বই প'ড়ে তো সারদাসুন্দরী অবাক্। এ ধর্ম্মে দোষ কী! এতো বেশ কথা।

গুরুঠাকুরকে বইখানা দেখাল সারদাসুন্দরী। বলল,—"দেখুন, আমার কেশব কি ধর্ম্ম পেয়েছে।"

গুরুঠাকুরের মুখেও সেই এক কথা,—"এতো বেশ ধর্ম্ম। তুমি ভেব না কো, তোমার কেশবের মঙ্গল হবে।"

সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা লিখে দেয় কেশব, লিখে দেয় মায়ের হাতে!

পড়তে পড়তে সারদাসুন্দরীর চোখে জল আসে। ডুবে যায় গভীরে।

একদিন ঘটল এক বিষম বিপত্তি।

কি?

কেশবের জ্যেঠামশাই-এর চোখে প'ড়ে গেল।

চোখে প'ড়ে গেল সারদাসুন্দরীর প্রার্থনার মন্ত্রপাঠ।

আর কি উপায় আছে? এগিয়ে এলো কাছে। বলল,—দেখি কী পড়া হচ্ছে?

পড়ছে কেশবের লেখা প্রার্থনার মন্ত্র।

"ও হাতের লেখা কার?" শুধোলেন কেশবের জ্যেঠামশাই।

মাথা নীচু ক'রে রইল সারদাসুন্দরী।

"বুঝতে পেরেছি কার! কেশবের—না?" বললেন তিনি।

এবারেও সারদাসুন্দরী চুপ।

টেনে নিল কাগজখানা। ফেলে দিল টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে।

গোপনে চোখ মোছে মা। কেশবকে ডেকে বলে,—"কেশব, তুই আবার আমায় লিখে দে বাপ।"

আবার লিখে দিতে চাইল না কেশব। বলল, ওরা আবার ছিঁড়ে ফেলবে মা!

পাড়ার লোক বলে—

বলে সারদাসুন্দরীর কাছে,—"হ্যাঁ গা, ছেলেটাকে একটু দাবাতে পারো না?"

"কেন?"

"সারাটা রাত জেগে থাকে। মারা যাবে যে!"

মায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। জল আসে চোখে। মিনতি-কাতর প্রার্থনা জানায় ঈশ্বর-সমীপে।

—হে অন্তরতম, পূর্ণ কর তুমি আমার কেশবের মনোবাঞ্ছা। ওর দর্শন-লোভন আকুতি জুড়িয়ে দাও, জুড়িয়ে দাও তোমার দর্শন দিয়ে। যে দীপ জ্বেলে দিয়েছ তার অন্তরে, প্রকাশ ঘটে যেন তার বাইরেও। হে সর্ব্ব দহনতারণ কেশব আমার যেন মুক্তি পায় দহন থেকে। পায় যেন তোমার শ্রীচরণের শান্তি-তীর্থ।

দেশের লোকেরা বলে—

বলে কিনা—জাহাজে চড়লে হয় পাপ। বিমূঢ় কেশব থাকে তাকিয়ে। তাকিয়ে থাকে অপলক-নয়নে। মনে ভাবে—সে আবার কেমন কথা?

যুক্তি খোঁজে। বিচার করে। কিন্তু মন তো সায় দেয় না!

জাহাজে চড়লে কি পাপ হয় দেখবে কেশব। মনে করল, যাবে জাহাজে ক'রে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। দেখবে পাপের রকমটা একবার।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাত্রা করল—জাহাজে ক'রে সিংহলে।

কলুটোলার সেন পরিবারে নেমে এলো—

নেমে এলো একটা হিমাক্ত-স্তব্ধতা। সারা বাড়ীময় যেন একটা থম্‌-থমে ভাব। বলাবলি করতে লাগল সকলে—বলাবলি করতে লাগল অভিমানে, দুঃখে,—অবশেষে মান খুইয়ে প্রতিশোধ নিলে! এ কী করল কেশব! এখন যে বাইরে গিয়ে আর মুখ দেখানো যাবে না। এ-কে হিন্দুর ছেলে! তার 'পরে আবার কলুটোলা সেন-বংশের সন্তান সে, ক'রে ফেলল এমন একটা কাজ? বলি ধর্ম্ম কি আর থাকবে? হিন্দুর ছেলে হ'য়ে চড়ল কিনা জাহাজে?

মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল সবাই। যেন কত বড় অপরাধ হয়েছে। জ্যেঠামশাই তো যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল। মায়ের চোখে ভ'রে এলো জল। সমাজে বড় মুখ ছোট হ'য়ে গেল তাদের। কেশব মাখিয়ে দিল চূণ-কালি সংসারের সকলের মুখে।

ফিরে এলো বীর। এলো কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় শান্তির ও সত্যের দীপ জ্বালাতে। এলো জীর্ণ ধর্ম্মের আবরণ উন্মোচিত ক'রে বলিষ্ঠ সত্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দিতে।

ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য হবে কেশব। সে কি কম আনন্দের কথা!

মার কাছে এসে বললে কেশব—

স্ত্রীর কথা। বললে—নিয়ে যেতে চাই ওকে সভায়।

একবাক্যে সম্মতি। বললে সারদাসুন্দরী—তা যাবি!

কিন্তু বাড়ীর লোক বেঁকে বসল। করল অমত। কিছুতে যেতে দেবে না। বললে,—"বউকে সেতখানায় আট্‌কে রাখো। নইলে জাত-কুল সব যাবে।"

হরিমোহন বললে আবার,—"তালা এঁটে দাও ফটকে।"

হৈ-হৈ কাণ্ড। বাড়ীশুদ্ধো লোক ক্ষেপে আগুন!

কিন্তু কেশব কি আর যে-সে ছেলে?

মায়ের আদেশ পেয়েছে। শত বাধাকে উল্‌টে ফেলে দেবে সে।

ঠেলে ফেলবে দূরে বিঘ্নের উপল। আসুক্ ঝড়। আসুক্ বন্যা। তার পথ কেউ পারবে না আট্‌কে রাখতে।

ছুটে গেল স্ত্রীর কাছে। বলল গিয়ে,—"হয় আমার সঙ্গে এসো। নয় তো পরিবারের গুরুজনদের সঙ্গে থাকো। এই শুভ মুহূর্ত্তে দ্বিধা করবার সময় নেই।"

ঘরের বউ বেরিয়ে এলো পথে। বেরিয়ে এলো জীবনসঙ্গিনী ধর্ম্মসঙ্গিনী হ'য়ে।

কিন্তু এসে থেমে গেল ফটকে। রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে দ্বার। দরোয়ান ব'সে।

কেশব ধমক দিল। বলল,—"খোল দরজা!"

আর না খুলে উপায় কী।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দরজা দিল খুলে। স্বামী-স্ত্রী হাতে-হাত ধ'রে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল পথে।

* * * * * *

সেই কেশব! ব্রাহ্ম-সমাজের এত বড় ভক্ত! তার একি হোল?

দেবেন ঠাকুরকে মানলে না। তাকালে না একবার বিজয়ের দিকে। সটান চলে এলো? চলে এলো দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাতৃমন্ত্র শুনতে?

কেন আসবে না?

মায়ের কৃপায় পেয়েছে পথ। খুলে গেছে তার তৃতীয় নয়ন। কী দেখছে সে নয়নে?

দেখছে, মায়ের বিচিত্র প্রকাশ। কভু সে সাকার। কভু নিরাকার। কখনো মূর্ত্তিতে স্নিগ্ধ-সুন্দর। কখনো বা রূপারূপের উর্দ্ধে উজ্জ্বল অপূর্ব্ব জ্যোতি। একই আধারে সর্ব্বরূপের প্রকাশ। যে যেমন ভাবে ডাকে, তার কাছে তেমন রূপে ধরা দেয়। ধরা দেয় এলোকেশী, মা সুরেশ্বরী সুন্দরী।

তাই তো কেশব তন্ময় হয়েছে। তন্ময় হয়েছে মাতৃরূপ দর্শনের আকুতি লয়ে।

রূপের ধ্যান করতে করতে যেতে হয় অরূপে। প্রথমে মা। তারপরে মাতৃত্ব। মাতৃত্ব নিরাকার। কিন্তু মা সাকার।

ঐ সাকারের ধ্যান করতে করতেই আসে—

আসে নিরাকারে তন্ময় হবার আনন্দ।

পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করতে হোলে কী করতে হয়?

প্রচুর অধ্যয়ন। প্রথম অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় করতে হবে নিবিড়ভাবে। তার পরে উপলব্ধি। তেমনি জ্ঞানের পথে যেতে হোলে চাই ভক্তির সরসীতে অবগাহন। ভক্তি এলেই মুক্তির তরণীতে পাল উড়বে। চলবে তরী বেগে। চলবে জ্ঞানের রাজ্যে। নিরাকারের পথে। নির্গুণের অখণ্ডে।

কিন্তু কেশবের চেলারা মানল না এ ভাব। রাখতে চাইল না আচার্য্যের আসনে তাকে। বাধল বিষম বিবাদ। দেখা দিল দ্বন্দ্ব। ছুটল বাক্‌যুদ্ধের ঝড়। কেউ ছাড়ে না কাউকে।

ও-দিকে বিজয় নেই কাছে। কে এখন সামাল দেবে ?

যায় বুঝি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' ভেঙে !

সু-যোগ বুঝে দাঁড়িয়ে গেল আবার সনাতন পন্থীরা।

সনাতন পন্থীরা চাইল—

চাইল ব্রাহ্ম-সমাজের টুটি চেপে ধরতে।

কে ছাড়ে এমন সুযোগ ?

কৃষ্ণপ্রসন্নের বাগ্মিতার সঙ্গে যুক্ত হোল—

শশধরের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। আবার কমলকৃষ্ণের 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী' সভার নব অভিযান হোল সুরু। সুরু হোল দিকে দিকে। সে এক মহাতরঙ্গ।

কেশবকে সরিয়ে দিল, সরিয়ে দিল আচার্য্য-পদ থেকে। হোল 'সাধারণ সমাজের' গোড়া পত্তন।

ভেঙে গেল কেশব সেনের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ'। গঠন করল কেশব নতুন সমাজ। নাম দিল 'নববিধান'। ওদিকে 'সাধারণ সমাজের' পুরোভাগে এসে দাঁড়াল—বিজয়কৃষ্ণ। এলো শিবনাথও। পুর্ব্ববঙ্গের সমাজ নিয়ে নিলে বিজয়কৃষ্ণকে আচার্য্য-পদে বরণ ক'রে।

লিখল 'সমালোচক' সংবাদপত্র—

লিখল বিজয়কৃষ্ণকে,—"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা নগরীতে এলে পরে এক নব জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। জনগণের উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি ও নূতন জীবন লাভ হোল।……এখানে সর্ব্বদা বিজয়বাবুর ন্যায় একজন সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধ মতাবলম্বী, আদর্শ আচার্য্য থাকেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

দু'-বছর কেটে গেল। গেল আরো ছ'টা মাস চলে।

কিন্তু মন ভেঙেছে বিজয়কৃষ্ণের—

মন ভেঙেছে কেশবকে হারিয়েই। আর ভালো লাগে না কিছু। এমন হৈ-হুল্লোড়ে টিকতে চায় না মন। এসেছে জীবনে নীরবতা। এখন যেন অন্তর-বিশ্বে ডুবে থাকতেই ভালো লাগে। তাই লিখল বন্ধুদের কাছে—

লিখল বিজয়কৃষ্ণ,—"পূর্ব্বে মনে করতাম, ব্রাহ্ম-সমাজ চিরশান্তির স্থান, এখানে কোনও প্রকার গোলযোগ প্রবেশ করতে পারে না। এখন তার

সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখে নিতান্ত ব্যথিত হয়েছি। এক একবার মনে করি, ব্রাহ্ম-সমাজের যা হবার হোক, আর কোন প্রকার আন্দোলন করব না। ....অন্যায়, অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ, তাই উদাসীন থাকতে পারি না।"

এ কিসের প্রস্তুতি ?

এ-যে অন্তরঙ্গা ভাব। মন নেই আর বাইরের বাহারে। এখন কেবল অন্তরের অনন্তে চায় লীন হ'য়ে যেতে। চায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বলেছিল একদিন কেশব। বলেছিল বিজয়কে,—"তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়েছ।"

স্মরণ হয় সে কথাটি। তন্ময় হ'য়ে ভাবে—এখন কোন্ পথে যাই। কে দেখাবে পথ ! মনে পড়ে অতীত দিনের মুগ্ধ মধুর দিনগুলো।

দেখেছিল একদিন, দেখেছিল বিজয় তার জাগর দৃষ্টিতে।

পথ দেখাতে নেমে এসেছিল—

নেমে এসেছিল নিশীথে নিশ্চুপে গোস্বামী সমীপে।

কে ?

স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য। এসেছিলো তাঁর দল-বল নিয়ে।

গভীর রাত্রি। বিজয় ব'সে ধ্যান করছে। ডাকছে তার সুন্দরকে। হঠাৎ শুনতে পেল। শুনতে পেল শব্দ। কে যেন দরজা ঠেলছে। আসতে চাইছে ঘরে। খুলল দরজা বিজয়। ঢুকল এসে একদল জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। ঘর গেল আলোতে আলোময় হ'য়ে। অবাক্ দৃষ্টি বিজয়ের চোখে। পলক আর পড়ে না !

একজন বললেন—আমি অদ্বৈতাচার্য্য। পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন বিজয়কে সবার সঙ্গে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলেন।—বলতে লাগলেন—"ইঁনি মহাপ্রভু। ইঁনি নিত্যানন্দ। আর ঐ যে ব'সে আছেন, উঁনি হচ্ছেন শ্রীবাস।"

আলাপ হোল বিজয়কৃষ্ণের—

আলাপ হোল সবার সঙ্গে। অবশেষে বললেন—

বললেন বিজয়কে,—"তোমার ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য শেষ হয়েছে ; এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। এখনই তিনি তোমাকে দীক্ষা দেবেন। শীঘ্র স্নান ক'রে এসো।"

অধীর মন। নৃত্য ক'রে উঠল আনন্দে। ত্রস্ত পদ-সঞ্চারে চলল—চলল স্নান করতে বিজয়।

স্নান ক'রে এলো। পড়ে রইল সিক্ত বসন কূয়োর কাছে।

সকাল হোল। ডাকল পাখী। পুবের আকাশে হোল অরুণোদয়। জাগল ঘুম থেকে, জাগল বিজয়ের স্ত্রী যোগমায়া দেবী। কূয়োর কাছে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। ভাবতে লাগল—এত ভোরে স্নান তো কোনদিন করেন না! কি ব্যাপার।

এসে জিজ্ঞেস করল—

জিজ্ঞেস করল যোগমায়া,—এত সকালে স্নান সেরে এলে কেন?

বলল বিজয়—

বলল মুগ্ধ মনে স্নিগ্ধ চোখে যোগমায়ার দিকে তাকিয়ে, বলল অপুর্ব্ব দর্শনের কথাটি।

আবেগ-বিহ্বল অন্তর যোগমায়ার। এলো চোখে অনুরাগের কান্না। শুনেই যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়ল যোগমায়া।

বললে, তুমি ভাগ্যবান।

তখন ছিল বিজয় কেশবে একাত্ম সম্বন্ধ। বলল এসে কেশবকে,—ওরে এমন দেখলাম।

সাবধান ক'রে দিলে কেশব। ব'লে দিলে বিজয়কে,—"এ কথা আর কাউকে বলো না। বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ। তোমাকে পাগল ব'লে করবে উপহাস।"

সেই কেশব গেল চলে—

চলে গেল মাতৃ-সাধনার পথে।

কেমন ক'রে বিজয়ের মন টিক্‌বে?

যাবে। যাবে। সময় হোলে বিজয়ও যাবে তার বিজয়-কেতন আকাশে উড়িয়ে দিয়ে।

ব্রাহ্ম-সমাজ আর ভালো লাগে না। মন চায় না কলহমুখর পরিবেশ। কী হবে এখানে থেকে। অসীমের ছায়া পড়ে বিজয়কৃষ্ণের মনে। তন্‌হা জাগে। আকুলতা অন্তরে। কী যেন নেই। কি যেন পাওয়া হয়নি এখনো। অপুর্ণ জীবন। চাইছে পুর্ণতার আনন্দ। চাইছে অপরিমিত সুখ। অনন্ত বস্তুর পুর্ণানন্দ। চাইছে অফুরন্ত পরিতৃপ্তি।

'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।
যো বৈ ভূমা তদমৃত মথযদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।'

তবে কি বিজয়কৃষ্ণের মনে এলো—

এলো কি তবে ভূমা দর্শনের আকুতি?

বুঝি তাই।

মেছুয়াবাজার রাস্তা ধ'রে হাঁটছে। হাঁটছে বিজয় একাকী। মনে তার ব্যথার ঝড়। বেদনার আকুতি। হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল, দেখা হ'য়ে গেল এক পশ্চিমা সাধুর সঙ্গে। প্রণাম করল বিজয়। সাধু করল তাকে আশীর্ব্বাদ। মন যেন ভ'রে গেল একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে।

দিন গেল বয়ে—

অনেক দিন।

ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে ব'সে উপদেশ দিচ্ছে বিজয়। ঘর-ভর্ত্তি লোক। শেষ হোল উপাসনা। এক এক ক'রে বেরিয়ে যেতে লাগল সবাই। অবশেষে বেরিয়ে এলো যখন বিজয়, তখন হাতখানা ধ'রে ফেলল সাধু। থম্‌কে দাঁড়াল। একটু মুচকি হাসি। জিজ্ঞেস করল সাধুর কাছে—

জিজ্ঞেস করল বিজয়কৃষ্ণ,—"উপাসনা কেমন হোল?" সাধু বলল,—"বড়ী আচ্ছা! সব তো বেদকা বাণী হ্যায়।"

কিন্তু বিজয়ের অন্তরে যে নিরন্তর বাজছে—

বাজছে বংশীবদনের সুর-ধ্বনি। ব্যাকুল মন আকুল হ'য়ে খুঁজছে সেই সুন্দরকে। কোথায়? কোথায় পাবে তাঁকে?

সাধু বুঝল। বুঝল বিজয়ের মনের ভাব। বললে—"আচ্ছা, তম্ গুরু কিয়া?"

বিজয় বললে,—"না মহারাজ! আমরা গুরুবাদ মানি না।"

একটু হাসি দিয়ে বলল সাধু,—"ওঃ এইছি ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া।"

সে কি! চম্‌কে উঠল মন। তাকিয়ে রইল অপলক নয়নে। তাকিয়ে রইল বিজয়কৃষ্ণ সাধুর পানে।

গুরু! গুরু কে?

গুরু হচ্ছে সমুদ্রের সেতু। পারাপারের মাঝি। পাঠশালার পণ্ডিতের কাছে প্রথম আখর শিক্ষা। তার পরে পুঁথি পাঠ। গুরুর কাছে প্রথম তত্ত্বলাভ। তার পরে তৎপুরুষের তনুশোভা। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান রয়েছেন

সর্ব্বভূতে। রয়েছেন আকাশে, বাতাসে। রয়েছেন অনলে, অনিলে। রয়েছেন দেহে, গেহে, বন্ধনে, মুক্তিতে।

কিন্তু তার ঠিকানা পাওয়া যাবে কার কাছে?

কে ব'লে দেবে পথের নিশানা?

গুরু। গুরুর কৃপা নিয়েই করতে হয় সুরু। সুরু করতে হয় সুন্দরের অভিসারে যাত্রা।

'ধ্যান মূলং গুরুমূর্ত্তি
পুজা মূলং গুরুপদং
মন্ত্র মূলং গুরুবাক্য
মোক্ষ মূলং গুরুকৃপা।'

বিজয়কৃষ্ণ বললে—

বললে আকুল হ'য়ে—তবে আমি গুরু চাই। চাই জানতে সেই পরম সুন্দরকে। সাধুকে ধরল বিজয়। বলল—আমায় দীক্ষা দিন।

সাধু বললে, "নেহি। তোমহারা গুরু দোস্রা হ্যায়, বখৎ হোনেসে মিল্ যায়গা। ঘাবড়াও মৎ।"

বের হোল গুরুর সন্ধানে বিজয়। সুরু হোল বিজয়ের বিজয়াভিযান। সমাপ্তি ও সার্থক হোল তার অভিযান আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে, ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের স্পর্শে। জাগ্রত বিজয়। 'এ যে সাক্ষাৎ শিব হ্যায়।'

প্রবল প্লাবন। সংস্কারের ঝড়। রাজনৈতিক আন্দোলন।

সে এক মহা হট্টগোল ব্যাপার। কেশব সেনের 'ইয়ং বেঙ্গল' ইন্ধন যোগাল, ইন্ধন যোগাল দেশ-মাতৃকার মুক্তি-সাধনায়। অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনকে। লিখতে লাগল গরম গরম কথা। ঘুমন্ত জাতির বুকে হানল বিদ্যুতের চাবুক। একটু তাকাল। তাকাল বিক্ষিপ্ত, বিক্ষুব্ধ জাতি! তাকাল তাদের তন্দ্রামদির চোখগুলো মেলে।

কি দেখল?

দেখল, প্রলয়-বিধূনিত বাংলার বাঙ্গালী আর একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। নিঃসীম নিশি নির্ঝরে সূর্য্যের রুদ্র দীপ্তি। আর দেখল, বন্ধ্যা মানব জমিনে কর্ম্মের শানিত লাঙ্গল।

ওরা উঠে দাঁড়াল।

শুনল যেন কার বজ্রদৃঢ় আহ্বান—

শুনল দৃপ্ত কণ্ঠের নির্ঘোষ—ধ্বংস নয়, সংগঠন। হলাহল নয়, অমৃত। দাসত্ব নয়, মুক্তি। মৃত্যু নয়, জীবন।

ফিরে তাকাল ওরা। ফিরে তাকাল সেই পুরুষসিংহের দিকে। অপলক নয়ন। বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্ত। স্থির, নিষ্কম্প আঁখিতারা। ভাবল, ভাবল তারা—কে এলো রে? কে এলো সংস্কার-সমাচ্ছন্ন শর্ব্বরীতে হাতে লয়ে আলোর বর্ত্তিকা? এ কে? সিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ। ভাবী ভারতের বীরাচারী, দিব্যাচারী যুগ-বিপ্লবী বিবেকানন্দ।

৭

সিমলে ষ্ট্রীটের সুরেশ মিত্তির দাঁড়িয়ে—

দাঁড়িয়ে আছে নরেনের বাড়ীর দরজায়। ভাবছে মনে, যদি নরেন না থাকে বাড়ীতে তবে কি হবেখন!

আচ্ছা একটা ডাক দিয়ে দেখি তো!

"ওরে বিলে, বাড়ী আছিস্?" ডাকল সুরেশ।

কে?

বাইরে আয়। আমি সুরেশ।

দোর খুলল নরেন। দেখল সুরেশের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। কি ব্যাপার?

ঠাকুর এসেছেন সুরেশের বাড়ীতে। শুনতে চেয়েছেন গান। আর কে শোনাবে। নরেনের শরণাপন্ন হোল সুরেশ। নরেনের গানে যে নেশা লেগে যায়। চোখে আসে কান্না। এমন গান ঠাকুর শুনতে যে বড় ভাল বাসবেন।

বলল সুরেশ নরেনকে—"চল্, আমার বাড়ী চল্।"

কেন?

"গান গাইবি।"

গান!

হাঁ, গান।

শুনেই যেন মনটা গেল আকুল হ'য়ে। ডাকল বান। বান ডাকল ভাবের সাগরে। গানের নাম শুনলে আর কথাটি নেই। সব কাজ ফেলে রেখে, সব ব্যথা ভুলে গিয়ে অমনি মেতে যায় গানে।

গাইবে না কেন?

গান। এই গান গেয়ে যে নরেন আনে, আনে তার তপ্ত তৃষিত মরু-মনে শান্তির বারি-বর্ষণ। গানই হচ্ছে ধ্যান। আর, এই ধ্যানের ধন হোলেন পরম জন। তাঁকে যে গান গেয়েই ভোলাতে হয়। আনতে হয় অন্তরে। ভাঙতে হয় তাঁর মান। কান্নাও গান। সে সঙ্গীত অন্তরের। কত সুর। কত ছন্দ তার।

সাধু বেলাল কান্নার সুরে আজান দিয়ে টলিয়ে দিত।

টলিয়ে দিত আল্লার আসন। আসতেন তিনি, আসতেন নেমে ভক্তের কান্নার অশ্রু মোছাতে। অন্তরকে করতে তীর্থান্বিত, নির্ব্বাপিত হ'য়ে যেত দহন জ্বালা।

থাকত তাকিয়ে অপলক নয়নে। পরিয়ে দিত তাঁর গলে প্রেমের মালা।

ওরে গানের মত কি আর কিছু আছে?

বাউল একতারা বাজিয়ে আখর দেয়—

'আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কেবল খুঁজি তাঁরে।'

অমনি খুলে যায় মন্দিরের দরজা। নেমে আসেন মনের মানুষ। নেমে আসেন ঐশ্বর্য্যের সিংহাসন ছেড়ে পর্ণকুটীরে ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে।

নরেন গাইবে না সেই গান?

নরেন গান গায়, গান গায় সুরের মিড়ে শান্ত ধীরে মনের বীণে বেহাগ রাগ তুলে।

কেন?

যদি আসে, আসে যদি সুরে সুরে রাত দুপুরে একটি লহর দিতে, কান্না-করুণ আকুল ডাকে প্রাণের অর্ঘ্য নিতে।

পরীক্ষা এসে গেছে।

বি. এ. পরীক্ষা, নেই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ, চলল নরেন, চলল সুরেশ মিত্তিরের পিছু-পিছু, গান গাইতে গুণমণির মন্দিরে।

সিমলে পল্লী। সুরেশ মিত্তিরের বাড়ী।

এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—এসেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে মিত্তিরের বাড়ীতে।

বাড়ীখানা যেন হ'য়ে গেছে মন্দির। কত লোকের ভীড়, এসেছে তারা আগ্রহভরে দেখতে জ্যান্ত বিগ্রহ।

একি কম কথা, ভগবান এলেন—এলেন শুধু ভক্তের হৃদয়-মন্দিরেই নয়। একেবারে চোখের সামনে, দিনের বেলায়, মাটির ঘরে মানুষ হ'য়ে।

আসবেন না কেন?

মানুষের মধ্যেই যে তাঁর প্রকাশ।

যেমন উদধি ধারণ করে সপ্ত স্বর্গের প্রতিবিম্ব। ঠিক তেমনি মানুষ হ'য়ে যায় ঈশ্বরায়িত, তীর্থান্বিত হয় তার অন্তর। আর সেই মহাতীর্থে তীর্থপতির মধুর রূপ মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে মানুষেরই দেহে মনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমজন নয় তো কি!

নরেন এসেছে, এসেছে সুরেশ মিত্তিরের পিছু-পিছু, ঢুকল বাড়ীর মধ্যে, দাঁড়াল গিয়ে ঠাকুরের সম্মুখে।

অপলক দৃষ্টি। অনড়, স্থির, ধীর।

তাকিয়ে আছেন ঠাকুর, তাকিয়ে আছেন নরেনের দিকে।

কে তুমি?

অঙ্গে অনিন্দ্য কান্তি! মর্ম্মে ফল্গুর ঝড়, কণ্ঠে করুণার উদ্গীথ। আজানু-লম্বিত বাহু, দেহে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি!

কে? কে?

ললাট ফলকে অরুণিত দীপ্তি। নয়নে নীলোৎপল. স্কন্দে শুভ্র উত্তরীয়, হৃদয়ে স্বাতীর সমারোহ, পরনে শান্তির শ্বেতবাস, ভাবে মদির আবেশ।

কে গো তুমি?

আঁধারে সূর্য্য-দীপ্তি, বয়ানে যুগের বারতা, চরণে অরবিন্দ।

স্মরণে সমুৎকণ্ঠা।

কে এলে?

এ-যে সেই জ্যোতির্ম্ময় ঋষি মূর্ত্তি! সপ্ত ঋষির একজন!

অবাক্ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্থির—নিস্পন্দ—ধীর—গম্ভীর।

তবে কি, তকে কি সেই ঋষি এলো না কি?

আরো একটু এগিয়ে এলেন ঠাকুর—

এগিয়ে এলেন নরেনের কাছে।

হ্যাঁ! হ্যাঁ! এ-যে সেই মূর্ত্তি। সেই রূপ! সেই জ্যোতি!

দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন। দেখেছিলেন সমাধিমার্গে আরূঢ় হ'য়ে।

কি?

এক অপুর্ব্ব দর্শন হয়েছিল ঠাকুরের।

সমাধি অবস্থায় উঠে যাচ্ছিলেন একদিন রামকৃষ্ণ। উঠে যাচ্ছিলেন জ্যোতির্ম্ময় পথ ধ'রে শূন্যে নভোমণ্ডলে, ফেলে এলেন শ্যামায়িত ধরণী।

পার হোলেন অরণ্য সবুজ পৃথিবী। এলেন জ্যোতিষ্ক লোকে।

তারপর?

থামলেন না এখানে। মন মজল না জ্যোতিষ্ক লোকেও। চললেন আরো উর্দ্ধে। যেতে যেতে দর্শন হোল অনেক দেব-দেবী। ব'সে আছে তারা পথের

দু-ধারে। অপূর্ব্ব ভাবঘন মূর্ত্তি। অনিন্দ্য কান্তি। তবুও থামলেন না যাত্রী। এবার চলে এলেন, চলে এলেন ভাবরাজ্যের সৌধচূড়ায়।

কি দেখলেন এখানে ?

একটি রেখা।

কিসের ?

জ্যোতির।

অন্তহীন বিশাল রাজ্যকে দিয়েছে দু'ভাগ ক'রে এই রেখাটি।

একেই বলে খণ্ড, আর অখণ্ডের দেশ।

তারপর ?

রামকৃষ্ণ এসে ঢুকলেন অখণ্ডের রাজ্যে। অদ্বৈতের সীমায়। কোন মূর্ত্তি নেই। নেই দেব-দেবী।

সে কি ?

তবে কি এখানে দেব-দেবীর আসবারও অধিকার নেই ? কেবল অখণ্ডের রাজ্যে দিব্যজ্যোতি ঘনতনু সাতজন ঋষি ভাবমৌন।

বিস্ময় লাগে ঠাকুরের। খুঁজে পান না যুক্তি। কি ব্যাপার! তবে কি স্নিগ্ধ জ্যোতিষ্মান ঋষিদের কাছে দেব-দেবীও আসতে পারে না ? অবাক্ লাগে। ভাবোন্মত্ত মন যেন অভিভূত হ'য়ে যায়। দেব-দেবী যেখানে আসার অধিকার থেকে হোল বঞ্চিত, সেখানে এই ঋষিরা কি ক'রে এলো ? বুঝলেন ঠাকুর—বুঝলেন জ্ঞানে, পুণ্যে, ত্যাগে, ভক্তিতে এরা চলে দেব-দেবীরও আগে। অভিভূত হোলেন রামকৃষ্ণ। পলক আর পড়ে না চোখের। এমন অপূর্ব্ব রূপ মধুর মুগ্ধ দর্শন আর তো কোনদিন হয় নি তাঁর!

তারপর ? তারপর ?

ঘনীভূত হ'য়ে গেল পরিব্যাপ্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডলের একাংশ। আকার নিল একটি স্নিগ্ধ, সৌম্য দেব-শিশুর।

কি সুন্দর! কি বা দেহকান্তি! অপূর্ব্ব কিরণ বিকিরণ হচ্ছে তার দেহ থেকে।

শিশুটি এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল একজন ঋষির সামনে।

জড়িয়ে ধরল গলা। ডাকতে লাগল আকুল কণ্ঠে।

ভাঙল ঋষির ধ্যান।

দেখতে লাগল আনন্দঘন শিশুটিকে—দেখতে লাগল অনিমেষে। কি

যেন বলতে চায় শিশু। প্রসন্ন, স্নিগ্ধ, প্রফুল্ল কমল কান্তির মতো প্রতিফলিত হোল ঋষির দৃষ্টি। প্রতিফলিত হোল শিশুটির 'পর।

বলল শিশু—"আমি যাচ্ছি, তুমিও এসো।"

কোথায় ?

পৃথিবীতে। এসো কিন্তু। অবিশ্যি এসো!

প্রদীপ্ত নয়ন ঋষির ডুবে গেল—

ডুবে গেল ধীরে ধীরে ধ্যানলোকে। ধ্যানস্থ হোল ঋষি।

বিমোহিত হ'য়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখলেন যেন সেই ঋষির দেহ থেকে একটি আলোর রশ্মি নেমে এলো। নেমে এলো পৃথিবীতে।

এ-যে সেই তপোস্নিগ্ধ দিব্য ঘনতনু। এ-যে সেই ঋষিকে দেখছি!

তাকিয়ে রইলেন অপলক নয়নে।

একটি গান গাইল নরেন! ভজন গান।

তন্ময় হ'য়ে শুনলেন ঠাকুর। ভাবতরঙ্গে জেগে উঠল বিলোল বিলোড়ন।

এ কে? ঘর কোথায়? কি পরিচয়? বাবার নাম কি?

কোন্ বাড়ীর ছেলে রে?

কত কথা। কত জিজ্ঞাসা? কত ভাব রামকৃষ্ণের মন-যমুনায় উজান খেলে যায়।

এগিয়ে এলেন কাছে। দেখতে লাগলেন ভাল ক'রে।

ভ্রম নয়তো! এই তো সেই ঋষি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক সেই। কোন ব্যতিক্রম নেই তো! নেই কোন বিলক্ষণ। একেবারে দেহে—মনে, কথায়—কায়ায়, তেজে—জোছনায় সেই অখণ্ডের ঘনীভূত জ্যোতির্ম্ময় ঋষি। আর পারলেন না সংযমের শিলাসনে ব'সে থাকতে। বললেন কাছে এসে রামকৃষ্ণ—"একবারটি দক্ষিণেশ্বরে এসো আমার কাছে। কেমন—আসবে?"

আহা কি মিনতি! কি আকুল প্রার্থনা। কি না করুণ কাকুতি! একবারটি এসো! আসবে তো?

আদেশ নয়। হুকুম নয়। নয়তো অনুরোধ।

এ-যে বাৎসল্য প্রেম। প্রার্থনা! পূর্ব্বরাগ। আর্ত্তি ও প্রতীক্ষা।

ফিরলেন ঠাকুর তপোবনে—দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু কি যেন ফেলে এসেছেন। হারিয়ে গেছে যেন কোন আঁচলের নিধি—হৃদয়ের ধন। উন্মনা

মন। হাওয়ার মত উড়ে যায় কোন নীলিমার নীল সায়রে। আবার মেঘের মত ভারী হ'য়ে ওঠে মন। মন্দ্রিত কলমুখর কণ্ঠ। কেবল তার মাঝে চকিত চঞ্চল সমীরণের মত এক-একটি লহর দেন ঠাকুর. কই তুই এলি না! ... দিয়েও দিলি না! ক্ষণিকের সুখকর মুখরতা। দরশন। তারপর আবার অন্ধকার, অন্তরাল, অগোচর। তবে কেন দেখা দিলি? যদি গোপনে গহনে চুপিশারে রইবি, তবে কেন ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা হ'য়ে প্রতিভাত হোলি?

ঐ—ঐ বুঝি নূপুর বাজে! বংশীর সুরেলা সঙ্গীত। কিন্তু বংশীবদন কই? কোথায় সে সুন্দর—শান্ত—স্নিগ্ধ—সৌম্য?

কোথায়—কোথায় সেই রম্য রব—রবি—রশ্মি?

তুই আয় ফিরে। ফিরে আয়রে একটিবার। "ওরে তুই কে জানি না। কি হবে জেনে? তবু তুই একবার আয়। তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। তোকে ছাড়া সব অন্ধকার। একেবারে একা।"

নীরব ছায়াঘন সন্ধ্যায় গঙ্গার কূলে ছুটে যান রামকৃষ্ণ। কাঁদেন হাঁক ছেড়ে।

যেন ঝড় জেগেছে হৃদয়াকাশে। আর সে ঝড়ের বেগে ভেসে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। ভেসে যাচ্ছেন অথৈ অন্তহীন অতলান্তে। যেন পাষাণ গ'লে বইছে তপ্ত নির্ঝর। যেন মরুর মায়াস ছায়ার কান্না। আর সে কান্নার কাজলে সজল হ'য়ে উঠছে আকাশ। ঝর্‌ছে জল। বইছে হাওয়া। কাঁপছে বন-কান্তার। ঝর্‌ছে পল্লব-কুসুম।

এও তো কান্না। শ্যামলীর কান্না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মাতৃত্বের হাহাকার। কে না চায় এমন সন্তান। মায়ের ইজ্জৎ, মান, সম্ভ্রম অমন সন্তান বৈ কে পারে রাখতে। তাইতো প্রকৃতিও যেন চঞ্চলা। সজলা।

ঘুম নেই ঠাকুরের চোখে। থাকেন নিশীথ নির্জ্জনে একাকী জেগে। কেবল সন্ধানী দৃষ্টি। ঐ! ঐ বুঝি আসে! আসে—আসে—আসে—বুঝি সে। না!

এলো না তো! বুঝি পাতার মর্ম্মরি!

আবার উঠে বসেন!

কিন্তু কইগো, এলো না তো। এলো না প্রাণের স্পর্শে। চোখের সামনে। দেহের দেহলিতে।

তবে তুই কি আসবিনে?

আসবিনে আমার তৃষাশুষ্ক মরু-মনে?

ভবতারিণীর কাছে ছুটে যান রামকৃষ্ণ।

বলেন,—ওগো আর কাঁদাস্‌নে মা।

এনে দে, এনে দে মা। এনে দে, ওকে শুধু একটিবার এনে দে। আমি যে আর রইতে পারছিনে। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে নরেনকে এনে দে মা সঙ্গী ক'রে। আসুক নরেন আমার বেসুরা মনে সঙ্গীতের সুর নিয়ে। তপ্ত তৃষিত বুকে বৃষ্টির মত ঝেঁপে আসুক। আর চাইনে কিছু। চাইনে সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য। চাইনে পারিজাত, মন্দাকিনী। চাইনে মা, আর কিছু। শুধু কেবল একটিবার নরেনকে এনে দে। শুধু ও হোলেই আমার চলবে মা। আমি জুড়িয়ে নেই আমার দর্শনলোভন আকুতি। জুড়িয়ে নেই মা, শ্রবণ মনন আকুলতা। মাগো! পাষাণী, আর একটিবার, শুধু একটিবার এনে দে!

"আমি এসেছি।"

অ্যাঁ! তুই এসেছিস্?

কে যেন ডেকে তুলল ঠাকুরকে। এইমাত্র শুয়েছিলেন। তন্দ্রাঘোরে চোখ দুটো এসেছিল বুঝে।

উঠে বসলেন এক লাফে।

আয়—আয়। এত রাত ক'রে এলি কেন?

হাত বাড়ালেন রামকৃষ্ণ।

কিন্তু না! কিছু নয়তো! একি! কোথায় গেলি। কোথায় পালালি পতঙ্গ?

ওরে পাগল, ওরে প্রমত্ত, এ কি খেলা খেলতে এলি! বুকে যে শেল হেনে গেলি। আগুন জ্বেলে দিলি।

এদিক ওদিক ভালো ক'রে খুঁজে দেখলেন রামকৃষ্ণ।

না। কেউ নেই তো!

এই তুই তড়িৎ তরঙ্গ, আবার তুই নিঃসীম নিথর। এই এলি সাগরের ফেনশুভ্র তরঙ্গের মত নেচে নেচে রসে রঙ্গে, আবার এখনই মিলিয়ে গেলি প্রাণে রেখে দুরন্তের গান!

এই দেখলাম রূপে রূপময় সুন্দর স্নিগ্ধ, আবার এর মাঝেই অখণ্ডের অন্তহীনে লীন হ'য়ে গেলি? ওরে! তুই আয়। আমায় খোঁজ দে তোর। কোথায় পাব তোকে। তুই না এলে যে আর প্রাণ বাঁচে না।

সময়ের মূল্য প্রচুর।

একটা পাগ্‌লা বামুনের কাছে এসে সময় ক্ষয় করবার মতো অবসর নরেনের নেই।

আই. এ. পাশ করেছে নরেন। পড়ছে বি. এ.। দর্শন নিয়ে পড়ছে।

ভালো ছাত্র। সকলের প্রিয়। দলের দলপতি। সবাই ওকে মানে। কথা শোনে একবাক্যে।

যেমন আদর ঘরে, তেমন বাইরেও। বেশ আছে। দিন কাটছে ভালোই। যশে, রসে, আনন্দে।

বলল একদিন নরেনের অধ্যক্ষ।

বলল হেষ্টি সাহেব,—"এমন একটি দর্শনের ছাত্র কেবল সমগ্র ইংলণ্ডে কেন? নেই সারাটা জার্ম্মাণ দেশেও।"

ব্রজেন শীল আসে—

আসে বই বগলে ক'রে নরেনের কাছে। বলে,—আমায় একটু দর্শন পড়িয়ে দিবি?

খুলে বসে পুঁথি-পত্তর। পড়িয়ে দেয় ব্রজেনকে।

কিন্তু নরেন ভাবে—

ভাবে, কি হবে দর্শন প'ড়ে। পাশ ক'রে ডিপ্‌টি জজ। না দশটা-পাঁচটার আজ্ঞাবহ ভৃত্য? জীবন কি তবে এই? থাকবে কি সীমানার সীমাতেই সীমিত? তাঁতের মাকুটার মত ছুটোছুটি। তারপরে সায়াহ্ন সন্ধ্যা। অন্তিমের আহ্বান। উপান্ত দিনের ভাবনা। বলি, এই কি জীবন?

নরেনের মনে প্রশ্নের প্রভঞ্জন। জিজ্ঞাসার ঝড়।

পড়ে ডেকার্টের অহংবাদ। হিউম ও বেনারের নাস্তিকতার কথা। খোঁজে তার প্রশ্নের জবাব।

ব্যর্থ হ'য়ে ভাবে আবার। ভাবে, তবে কোথায় মিলবে সমস্যার সমাধান?

খুলে বসে ডারউইন। রাত জেগে অধ্যয়ন করে স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়বাদ।

কিন্তু তবুও মেলে না তার জিজ্ঞাসার জবাব। মন যায় আরো খারাপ হ'য়ে। ডুবে থাকে পুঁথির পাতায়।

পাশ্চাত্ত্য বিশ্বের বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রকে করে মন্থন। তারই সঙ্গে আবার বেদ, বেদান্ত। সাংখ্য, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত প'ড়ে যায় এক এক ক'রে। একদিকে হার্ব্বার্ট, স্পেন্‌সার, কাণ্ট ও মিল। আর একদিকে ভারতবর্ষ। তার বেদ ও বেদান্ত। দর্শন ও তর্ক। যুক্তি ও বিচার।

কিন্তু তবুও মহা জিজ্ঞাসার জবাবটি তো খুঁজে পায় না, খুঁজে পায় না নরেন জ্ঞানের সমুদ্রে। পুঁথির পাতায়।

এ দর্শনে, দর্শন কই? এ-যে কেবল ঘর্ষণ। মুহূর্ত্তের ঝক্‌মকি।

ক্ষণেকের ক্ষণ ভাতি। তার পরে আবার অন্ধকার। অজগর রাত্রি। সংশয়, সন্দেহ। নরেন চাইছে সত্য-দর্শন। চাইছে জ্ঞানের অগম্যকে জানতে।

ব্রজেন শীল বুঝল নরেনের মনের ভাব। অন্তরে জাগে ভয়।

এমন ছেলে, তার জীবন যদি যায়, যায় যদি ব্যর্থ হ'য়ে তবে যে জগৎ হবে বঞ্চিত। বঞ্চিত হবে মহাসম্পদ থেকে।

তাই বললে একদিন—

বললে ব্রজেন নরেনকে—তুমি শেলির কবিতা পড়। পড় হেগেলের দর্শন আর ফরাসী বিপ্লবের রক্ত-ক্ষরা ইতিহাস।

কেন?

তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে। পাবে মনে শান্তি।

আর বিশ্রাম নেই। অমনি খুলে বসল শেলি। পড়ল হেগেল। পড়ল ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী।

কিন্তু কই! কি বলল ব্রজেন?

আকুল চিত্ত। অধীর মন। কান্না আসে চোখে। বিলাপ করে নরেন। বিলাপ করে মনে মনে। খোঁজে প্রাণের জন।

ওগো, তবে কি তুমি নেই? নেই তুমি রূপে, দৃশ্যে, গন্ধে ও গানে? তবে কেন এলে, এলে ইন্দ্রিয়ের পারে তোমার অতীন্দ্রিয়ের খেলা খেলতে। আর যদি এলেই—তবে কেন আমার অন্তরে তুমি থাকো অগোচরে। অন্তরালে। অন্ধকারে। দাও, দাও একবারটি দেখা দাও। বল, আমি যেমন সত্য, তুমিও তেমন শাশ্বতী।

দ্বন্দ্ব ও সংশয়। কান্না ও কাকলি। দু-ধারা চলল নরেনের জীবন, যৌবনকে মন্থন ক'রে।

ধর্ম্মপ্রচারক দেখে ছুটে যায়। যায় নরেন ত্রস্ত পায় তার অন্তরের অনন্ত জিজ্ঞাসার জবাব চাইতে। বলে স্থির—স্নিগ্ধ দুটি আঁখি মেলে।

বলে,—"দেখেছেন আপনি ঈশ্বর ?"

তাকিয়ে থাকে অবাক্ হ'য়ে—

তাকিয়ে থাকে প্রচারক।

কি জবাব দেবে ?

সে যে তত্বাতীত। জানে না তার খোঁজ জ্ঞানী-গুণী। বলেছে বাউল। বলেছে একতারা বাজিয়ে—

"তন্ত্রে মন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে সে কি ধরা—
উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা।"

তবে তাকে পাবার উপায় কি ?

সে যে জ্ঞানের অগম্য। গুণের গুণরাজ।

কোন্ গুণের ?

ভক্তি গুণ। প্রেম গুণ। আর ভালোবাসা গুণ।

মাত্র এই তিন গুণ। এই তিনটি গুণ থাকলেই লাভ করা যায় নির্গুণ। আসেন ভক্তের অন্তরে প্রীতির স্বর্গ রচনা করতে। আসেন প্রেমময় প্রেমের দেউলে প্রাণের দীপ জ্বালতে।

"জ্ঞানের অগম্য সে যে
প্রেমেতে ভিখারী।"

প্রেম জমলে আর ভাবনা নেই। প্রেমময় প্রেমের খেলা খেলতে আসবেন—আসবেন ভক্তের দুয়ারে ভিখারীর সাজে। মান-অভিমান, ছোট-বড়, তুমি-আমি, সব তলিয়ে যাবে, যাবে ভালোবাসার অথৈ সাগরে—অন্তহীন গভীরে।

প্রেমের কিন্তু আবার প্রকার-ভেদ আছে!

সে কি ?

চাই নিষ্কাম প্রেম। নিষ্কলুষ প্রীতি। যে প্রেমে নেই কামনা-বাসনার গন্ধটুকু। চাই যে এমন প্রেম। তা না হোলে তো প্রেমময়ের মন ভুলানো যাবে না! শুদ্ধাভক্তি। আর নিষ্কাম আসক্তি। এই দিয়ে লাভ করতে হবে

অপরিমিত প্রেম। ঈশ্বরের দর্শন। দেহরূপ ঢাকনাটা সরিয়ে রেখে, তারপর মনে মন মেলাতে হবে। হবে, কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় তন্ময় হোতে।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম—
কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হোলে, কৃষ্ণ-প্রেমে অধীর হোলে, তাকে বলে প্রেম। এমন যে প্রেমিক, সে বলতে পারে, বলতে পারে প্রেমরঞ্জনের খবর। জানাতে পারে রাজচক্রবর্ত্তীর ঠিকানা। রসিক রাখে রসের খোঁজ। শুষ্ক তর্কে কি হবে?' যুক্তিতে মুক্তি নেই। নেই সম্ভোগ সুখ। মুক্তি দিতে পারেন মুক্তকেশী। ভক্তির সরসীতে বান ডাকলে ভক্তকে পারাপারের খেয়া পার করতে আসেন কাণ্ডারী।

কি জবাব দেবে প্রচারক? এ প্রশ্নের যেখানে অঙ্কুর উদগম, সেখানেই সাফল্যের ফসল। মন, আর মন। মনই জানে তার খোঁজ।

চুপ হ'য়ে গেল প্রচারক। তাকিয়ে রইল নরেনের সমুৎকণ্ঠিত আয়ত দীপ্ত চোখের দিকে। কত ঘুরে ফিরে প্রচার করল প্রচারক ঈশ্বরের কথা। কত রসে রসালো ক'রে বলল। কিন্তু এমন তো কেউ কোনদিন বলেনি!

বলেনি তো,—"দেখেছেন আপনি ঈশ্বর?"

তবে কি নরেনের প্রশ্নের কোন সমাধান মিলবে না?

বলতে পারে না কেউ—হ্যাঁ দেখেছি। দেখেছি আমি তাঁকে। যেমন তোমাকে দেখছি ঠিক তেমনটি দেখেছি তাঁকেও।

নরেন বলবে,—বলো কি, দেখাতে পারো আমাকে?

আমি দেখাব কি রে? দেখতে পাবি। তুই নিজেই দেখতে পারবি।

নরেন আকুল হ'য়ে ছুটবে। ব্যাকুল হ'য়ে শুধাবে—ওগো, তুমি কতদূরে? কোন্ পথ ধ'রে হাঁটলে পাওয়া যাবে তোমার তাড়িত স্পর্শ! ঘুচিয়ে দাও অন্তরায়। ব'লে দাও তোমার অনুসন্ধানের মন্ত্রটি। তুমি যদি দয়াময়—তবে কেন এমন অন্তরালে—থাকো আমায় আড়াল ক'রে? বল, বল কোন্ পথ ধ'রে হাঁটব? কোন্ দিকে যাত্রা করব?

আহারে রুচি নেই। দুটো ভাত খুঁটে খায়। তাও আবার নিরামিষ। শয্যায় বিলাস নেই। নেই আরামের আয়োজন। হেমকান্তি দেহখানা এলিয়ে দেয় মেঝেতে। উৎকণ্ঠা নিয়ে জেগে থাকে রাত।

ঘুম আসে না চোখে। হৃদয়ের শব্দ শোনে। শোনে কান পেতে। শিহরণ জাগে দেহে। আকুল হ'য়ে খোঁজে। খোঁজে মরমীকে।

ধবধবে সাদা থান পরনে। কাঁধে উত্তরীয়। পথে চলে আর মনে মনে বলে—কোথায় তুমি! এখনো এলে না! দিলে না আমার প্রশ্নের জবাব?

কঠোর কঠিন কৃচ্ছ্রব্রত। কৃচ্ছ্রব্রত করেছে নরেনের জীবন-যৌবনকে সংহত। নরেন ফিরবে না। যায়, যাক দেহ। তবুও সে জানবে। চিনবে। দেখবে। দেখবে কে আছে ঐ ইন্দ্রিয়াতীতে। অরূপে। রূপাতীতে। সেই সুন্দরের অন্দরে পৌঁছে তবে শান্ত হবে তার দুরন্ত জিজ্ঞাসা। অজ্ঞেয়কে আনবে নরেন জ্ঞানের গণ্ডিতে। দেখবে মর্ম্ম চোখে। দেখবে আবার চর্ম্ম চোখেও। তার পরে সমাপ্তির প্রশান্তি। অর্পণের আনন্দ। তাই তো ব্রহ্মচর্য্য নিয়েছে নরেন। ছেড়েছে ঘর। ভাড়াটে ভিটায় থাকে এখন।

মা-ভুবনেশ্বরী ভাবে, ছেলের পড়াশুনার অসুবিধে হয় বাড়ীতে। তাই একাকী থাকে নরেন। থাকে কলহ-কোন্দলের বাইরে।

বাপ দিয়েছে ছেলেকে অবাধ স্বাধীনতা। তাই কিচ্ছু বলে না মুখে।

কিন্তু নরেন পড়ছে আর কতক্ষণ?

এক মনে, এক ধ্যানে তন্ময় নরেন।

তন্ময় হ'য়ে থাকে দিন-রাত।

এমনি ক'রে তো কত দিন-রাত্রি শেষ হ'য়ে গেল।

কিন্তু নরেনের জীবনে তো সে এলো না।

সেই দিন! সেই রাত।

আলো আর অন্ধকার। চাঁদের হাসি। স্বাতীর সফেদমালা। মৃদু-মধুর মলয় সমীর। এ তো নিত্যিকারের।

সংসার। সংঘাত। দুঃখ-ব্যথা।

তবে কি এ জীবনের একটুও বৈচিত্র্য নেই?

চোখ ফেটে কান্না আসে।

আকুল সুরে আবার ব্যাকুল হ'য়ে বলে। বলে, কে আছ আকাশে, বাতাসে, অনলে, অনিলে! কে আছ জলে, স্থলে, পলে, পুলিনে! দাও, দাও আমার দ্বিধান্বিত অন্তরে সমাধানের সত্য স্বীকৃতিটি। মিটিয়ে দাও আমার সস্পৃহ অন্তরের তন্হা।

পাড়ার লোকে বললে—

বললে কিনা ছেলের বিয়ে-থা দেও বিশ্বনাথ। বয়স হয়েছে।

আর কতদিন রাখবে বিয়ে না দিয়ে ?

ব্যস্ত হ'য়ে উঠল বিশ্বনাথ। ক'নে দেখতে লাগল এখানে ওখানে। দর কষাকষি। টাকার অঙ্ক পেশ। তার পরে আবার মেয়েও চাই রূপের ডালি।

ভুবনেশ্বরীর তো যেন আর সময় সয় না। আজ বিয়ে হোলেও ভালো হয়।

কিন্তু নরেন বসল বেঁকে। সে নাকি করবে না বিয়ে।

জিদ ধরেছে। কিচ্ছুতে না। টাকা দিক। আসুক না অপ্সরা। ভোলাতে পারবে না নরেনকে।

ভাবনায় পড়ল বিশ্বনাথ। ভুবনেশ্বরী তো কেঁদে ফেলে আর কি। কুল পায় না চিন্তা ক'রে।

ডাকল বিশ্বনাথ—

ডাকল রাম দত্তকে। বলল সব কথা খুলে।

অবাক্ রাম দত্ত—সে কি!

হ্যাঁ রাম, "ও নাকি বিয়ে করবে না।"—এখন কি হবে ?

চিন্তায় পড়ল রাম দত্ত। বলল আবার বিশ্বনাথ। বলল রামকে—

—দেখ, যদি তুই মত করাতে পারিস্। তবে যে একগুঁয়ে ছেলে, তুইও পারিস্ কিনা সন্দেহ। দেখ, আমার অদৃষ্টে কি আছে।

রাম দত্ত লেগে গেল ঘটকালিতে।

কিন্তু নরেনের মন খোঁজে মরমীকে। খোঁজে দয়াময়ীকে। চায় না সে প্রিয়ার পরশ। চায় না তার পুলকমদির হাসি। আর মায়া-মোহের বাঁধন। নারী নিয়ে বিলাস ক'রে কি হবে ? নরেন চায় রতির পাঁজালে উড়াতে বিরতির ধূপ। মন তার বলে, বলে—কে চায় নারী ? বলো নারায়ণীর খোঁজ কোথায় ? বলো, বলো তাঁর ঠিকানা!

রাম দত্ত কত বুঝাল। বলল কত রকম ক'রে।—বাপ-মার অবাধ্য হোতে আছে ? ওরা দেবতা। জানিস্, মা-বাবা সন্তানের কখনো অমঙ্গল

চায় না। তুই অমন করিস্ না। বিয়েতে সম্মতি দিয়ে, তাদের চিন্তা থেকে মুক্তি দে বিলে।

—না, না। বিয়ে করব না আমি।

—অবাধ্য হবি তুই ?

—এখানে বুঝি অবাধ্যই হোতে হয় রে। কি ছাই—বিয়ে—আর বিয়ে। কোথায় ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখানে চল্ আমায় নিয়ে।

রাম দত্ত অবাক্-বিস্ময়ে তাকাল—

তাকাল নরেনের দিকে। বলল—"তুই ধর্ম্ম চাস্ ?"

জান্তে চাস্ তাঁর খোঁজ ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেমন ক'রে ভগবানকে পাওয়া যায় তাই বল।

আকুল হ'য়ে যায় নরেনের চিত্ত। যেন চোখ দুটো উঠল ছল ছল ক'রে। ঈশ্বর! ঈশ্বরের সন্ধান না নিয়ে নরেন আর শান্তি পাচ্ছে না মুহূর্ত্ত।

রাম দত্ত বুঝল। বুঝল রাম দত্ত, নরেনের মনের ভাব। বলল চুপি চুপি,—তবে শোন্ বিলে। কাছে আয়।

কি ?

"যদি সত্যি ধর্ম্ম লাভ করতেই মন চায়, তবে মিছে ব্রাহ্ম-সমাজে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে যা। দেখে আয় মূর্ত্তিমান ধর্ম্মকে।"

বিশ্বনাথের সংসারেই মানুষ হয়েছে রাম দত্ত। ছিল একজন প্রধান চেলা ব্রাহ্ম-সমাজের। ক্যাম্বেল থেকে ডাক্তার হ'য়ে বেরিয়ে রাম মস্ত একজন নাস্তিক ব'নে গেল।

কেশব গাইছিল তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জয়গান। শুনল একদিন কেশবের কাছে,—ওরে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব হয়। হয় সমাধি। জ্ঞান থাকে না। বাহ্য জগৎকে ভুলে তন্ময় হ'য়ে যায় অনন্তের ধ্যানে।

রাম দত্ত দিল কথাগুলো উড়িয়ে। নিশ্চয়ই হিষ্টিরিয়ার রোগী।

কেশব জিব কাটে। বলে, ছিঃ ছিঃ! কি বলছিস্ ? "ধীর স্থির শান্ত হ'য়ে থাকে। আপনা আপনি ভালো হয়। ডাক্তার লাগে না কখনো।"

কথাগুলো যেন মানতে চাইল না রাম দত্তের মন। ভাবল সে—এমন তো পাইনি কোন বইতে! কি জানি! হবে হয় ত।

এমনি সংশয় সন্দেহ নিয়ে কাটছিল রাম দত্তের দিন। মন মানতে চাইলেও, যুক্তি খুঁজে পেল না রাম। এমনি দিনে ঘটল এক বিপর্য্যয়।

ঘটল রাম দত্তের জীবনে। দু-দুটো বোন গেল মারা। মারা গেল কলেরায়। পারল না তাদের ফেরাতে রাম দত্ত। ফেরাতে পারল না বিজ্ঞানের জ্ঞানে। মন গেল ভেঙে। জ্বলতে লাগল অশান্তির তুষানল মনে। রাম খোঁজে শান্তি। খোঁজে শান্ত সমাহিত ভাব।

কিন্তু কে দিতে পারে তা?

মনে পড়ে কেশব সেনের কথা। স্মরণে সজাগ হ'য়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া-মূর্ত্তি।

চলল একদিন—

চলল রাম দত্ত সাকারবাদীর অভিসারে। দক্ষিণেশ্বরে। চলল মিরগি-রোগীর রোগ-নিরীক্ষণে।

সঙ্গে যাচ্ছে মনোমোহন আর গোপাল মিত্তির।

ভাবল রাম—যদি পাওয়া যায় একটু শান্তি, বুঝব তবে, তুমি সত্যি। তুমি অভ্রান্ত। তুমিই মানুষের মনের মানস-সরোবর।

রুদ্ধ দরজা।

কেমন ক'রে এখন ডাকবে! বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছে তারা, ভাবছে এক মনে, এক ধ্যানে—ওগো আলোর দিশারী, খোল দ্বার।

মরমীর মরম বীণায় জাগল একটি ঝঙ্কার। বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বুঝলেন তাঁর জন্যে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে লোক বাইরে।

উঠে দাঁড়ালেন। খুলে দিলেন দোর। বেরিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখেই রাম দত্ত করল এক প্রণাম। ভুলে গেল মুহূর্ত্তে, ভুলে গেল তার মন নাস্তিকতার কথা।

কেবল কী শুধু নীরবে প্রণামই করল?

না।

তবে?

বললে রাম—"নারায়ণ।"

নিরাকারবাদী লুটিয়ে পড়ল সাকার সাধকের চরণ-প্রান্তে। বলল মনে মনে—হে দহনোত্তরণের অধিপতি, আমাকে মুক্ত করো দহন থেকে। শিখিয়ে দাও কান্নার মাঝে হাসির স্নিগ্ধতা দেখতে। মরমের মাঝে শুনতে দাও জীবনের সংবাদ। যে আগুন জ্বল্‌ছে বুকে, সে আগুনকে কর তুমি নির্গলিত শান্তি সরোবর। ধুয়ে মুছে নির্ম্মল ক'রে দাও অন্তর। মালিন্য

অপসৃত হোক। ফুটে উঠুক মনের বৃন্তে ভাগবতী তনু। যেমন প্রসূন ফোটে। গন্ধ ঢালে। ঠিক তেমনি তুমি আমার অন্তরকে কর শান্তিতীর্থ। ঘুচিয়ে দাও অন্ধকার।

বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বুঝলেন রাম দত্তের মনের ভাব। বললেন ঠাকুর,—তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? "বোসো।"

বসল ওরা। বলতে লাগলেন ঠাকুর—

বলতে লাগলেন রাম দত্তকে,—"হ্যাঁগা, তুমি নাকি ডাক্তার? আমার হাতখানা একবার দেখ না।"

চম্‌কে ওঠে রাম দত্ত। এ খবর কে বলল? কেমন ক'রে জানল?

মুহূর্ত্তে রাম দত্তের মন গেল মুগ্ধ হ'য়ে। মিলিয়ে গেল সন্দেহের অন্ধকার মন থেকে।—এ-যে অন্তরর্য্যামী। সব খবর জেনে-শুনে ব'সে আছে।

তবুও রাম বলল—"ঈশ্বর কি আছেন?"

বললেন ঠাকুর—"দিনের বেলায় তো একটি তারাও দেখা যায় না। তাই ব'লে কি বলবে তারা নেই!"

—কিন্তু তাকে দেখবার উপায়টি কি?

"বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরতে হোলে কি করো? আগে খোঁজ নাও। যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের থেকে খোঁজ নাও। কি মাছ আছে, কি টোপ খায়, কি চার লাগে। শেষে সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করো। ধরো সেই মনোনীত মাছ।"

বলতে বলতে আবার প্রশ্নের সুরে শুধালেন ঠাকুর—"কিন্তু ছিপ ফেলা মাত্রই কি মাছ ধরা পড়ে? স্থির হ'য়ে অপেক্ষা করতে হয়। তবেই আস্তে আস্তে 'ঘাই' আর 'ফুট' দেখা যায়। তখন বিশ্বাস হয় পুকুরে মাছ আছে, আর ব'সে থাকতে থাকতে আমিও একদিন ধ'রে ফেলব।"

কেবল চাই—বিশ্বাস। তার সঙ্গে ত্যাগ, তিতিক্ষা হ'লেই হোল। অনুরাগ জন্মাবে। ঈশ্বরের নামে লেগে থাকতে চাইবে মন। একটি ক্ষণকণাও বিফলে কাটাতে ইচ্ছা হবে না।

রাম দত্তের পাষাণ মন গেল গ'লে। মুগ্ধ হোল তার অন্তর। রামকৃষ্ণের স্পর্শে মরুতে ফুটল ফুল। এলো রাম দত্তের অন্তরে পীযূষধারা। নিল দীক্ষা। দীক্ষা নিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

কেবল কি রাম দত্তই?

সুরেশ কি ছিল? সে রাম দত্তের 'পরও এক ডিগ্রী।

কেশবের মৃদঙ্গের চামড়া দিল একদিন ছুরি দিয়ে কেটে। তারপরে ধরল একদিন রাম দত্তকে। বলল—"ওহে রাম, চল তোমার গুরুর কাছে, একদিন নিয়ে চল।"

রাম বলে—"চল।"

বলল সুরেশ,—"কিন্তু একটি কথা, যদি তোমার হংস মনে শান্তি দিতে না পারে, তবে তার কান ম'লে দিয়ে আসব।"

শুধু কান কেন? চড় কষে, চুল টেনে না হয় নাস্তা-নাবুদ ক'রে আসবেখন।

তার পর?

আর কি। হ'য়ে গেল নিবিড় যোগ। হবে না কেন?

চিনির পাহাড়ে উঠে পিঁপড়ে কী আর মুখ বুজে ব'সে থাকে?

সুরেশ হ'য়ে গেল দাসের দাস।

আর বিলে?

মস্ত পণ্ডিত। কত সব পড়েছে। জানে অনেক। যুক্তিতে, বিচারে, বিজ্ঞানে নরেন নরের রাজা। সে কি আর যাবে একজন অশিক্ষিত বামুনের কাছে?

তবুও রাম ঘটকালি ছেড়ে নরেনকে টানতে লাগল বনমালীর দ্বারে।

বলল আর একদিন,—"বিলে, শোন্—"

এগিয়ে এলো নরেন। "চল্ একদিন দক্ষিণেশ্বরে। পরমহংস দেখবি?"

আর কোথায় যায় রাম। বলল অমনি নরেন। বলল অবজ্ঞা, অবহেলা ভরে,—আরে, "সেটা তো মুখ্‌খু—"

কি জানে? পড়া-শুনা নেই বিন্দু। বিদ্যার নামে নবঢং। কেবল ফাঁকা ফাঁকা ভাবের কথা। আর চোখের জল।

রাম দত্ত যেন কানে দেয় আঙ্গুল। গুরুনিন্দা তার অন্তরে জাগিয়ে দেয় ঝড়।

তবুও কি নরেন থামছে?

বলল আবার,—"কী আছে তার কাছে যে শুনতে যাব?

মিল্, স্পেন্সার, লকি, হ্যামিল্টন্ এত পড়লুম। পেলাম না কোন হদিস্। আর একটা কৈবর্ত্তের বামুন, কালীর পুজারী সে জেনে ফেললে সব?"

রাম বললে—"একবার গিয়ে কথা কয়েই দেখ না।"

নরেন সম্মতি জানাল। বলল—"বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো, নইলে কান ম'লে দেব বলছি।"

কান মলতে চাইল কৈলাস বসুও। কান মলতে চাইল—শ্রীরামকৃষ্ণের।

ডেকে বলল রাম দত্তকে,—"তুমি বলছ, তাই যাচ্ছি একবার তোমার পরমহংসকে দেখতে। যদি ভালো লোক হয় তো ভালো নইলে তার কান ম'লে দেব ব'লে রাখছি।"

যাত্রা করল রাম দত্ত। যাত্রা করল কৈলাস বসুকে নিয়ে।

ঠাকুর অসুস্থ। আছেন কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে। ওরা সব নীচে ব'সে।

ক্ষণিক পরে একটি লোক এলো। বলল, ঠাকুর ব'লে পাঠিয়েছেন—

কি ?

"যে বাবুটি আমার কান ম'লে দেবেন বলেছেন, তাকে ওপরে নিয়ে এসো।"

হতবাক্ হ'য়ে গেল কৈলাস। কান মলতে গিয়ে খেয়ে এলো মনমলা। অধীর আকুল হ'য়ে চাইল ক্ষমা।

হে অন্তর্য্যামী, তোমাকে গোচরে আনি এমন সাধ্য কি ? তুমি শক্তি দিলে তবে তো তন্‌হা মিটবে। পরশ দিলে কাটবে মনের মেঘ। উঠবে সুর্য্য। হবে অরুণোদয়। আমরা অজ্ঞান—তাই ব'লে কি তুমিও করবে বঞ্চিত ? রাখবে দুরে ঠেলে ?

একটি প্রশ্ন। একটি মুখ। তাই নরেনের মুখর মন।

কই? কোথায়? কোথায় সেই সুন্দর?

কে দেবে নরেনকে নিশ্চিত সংবাদ—হ্যাঁ তাঁকে আমি দেখেছি। শুধু কি কেবল দেখা?

—কথা বলেছি। ধরেছি।

পাগল মন নরেনের। যেমন ক'রেই হোক, সে জানবে। দেখবে। কোথায় ঈশ্বর, তাঁর খোঁজ করবে।

কিন্তু সে খোঁজ দেবে কে? কে দেবে পথের কথা বলে?

ভাবল নরেন, হয়ত খোঁজ জানে তাঁর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

ছুটল নরেন। ছুটল বায়ুর বেগে। ত্রস্ত পায়ে, আকুল মন লয়ে। ছুটল নরেন তার সঙ্গী খুঁজতে দেবেন ঠাকুরের কাছে।

গঙ্গার কূলে নৌকো বাঁধা দেবেন্দ্রনাথের। উঠল এসে নরেন। ধ্যান-গম্ভীর মহর্ষি। মুদিত নয়ন। দেহে প্রশান্ত প্রদীপ্তি। মুখে উজ্জ্বল কিরণ। ভাবে স্নিগ্ধচ্ছটা। সারাটি প্রকোষ্ঠে যেন একটা শান্ত গম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করছে।

নরেন ঢুকল। ঢুকল মহর্ষির কামরায়। দাঁড়াল মুখোমুখি। প্রথমে চুপ। মৌন। স্থির। তারপরে বলল—

বলল মহর্ষিকে—"আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?"

কেঁপে উঠল মাটি। চম্‌কালো মহর্ষির মনে বিদ্যুৎ। অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। কথাটি নেই মুখে। কি দেখছে চেয়ে চেয়ে মহর্ষি?

দেখছে যেন নিশার কোলে নীড়হারা তৃষাতুর একটি পাখী। কত ব্যথা। কত আবেগ তার বক্ষ-পঞ্জরে। যদি না জবাব পায়, হয়ত তবে বিসর্জ্জন দেবে জীবন।

মহা ভাবনায় পড়ল মহর্ষি। শুনল আবার,—"ঈশ্বর দেখেছেন আপনি?"

তাকাল মহর্ষি।

এ কে? সেই ব্রাহ্মভক্ত ছেলেটি নয়! লিখিয়েছে খাতায় নাম। গায় ভজন গান। বসে ধ্যানে। যায় তন্ময় হ'য়ে। এ-যে সেই নরেন্দ্রনাথ! নিরাকার ব্রাহ্মভক্তের মুখে এ কী প্রশ্ন?

ভাবনায় পড়ল মহর্ষি।

কিন্তু মুহূর্ত্তে তার মন আবার কেমন যেন হ'য়ে যায়।

ভাবল,—হোক সাকার সন্ধান! তবুও এমন ক'রে কে খোঁজে তাঁকে? কে করে তাঁর তত্ত্ব?

বলল মহর্ষি—"তোমার চোখ দুটো কি উজ্জ্বল! যেন যোগী জনোচিত চক্ষু।"

কে চায় তা শুনতে। মন ভেঙে যায় নরেনের।

পারল না বলতে মহর্ষিও!

তবে এখন উপায়? কে বলতে পারে? কে দিতে পারে তাঁর ঠিকানা নরেনকে? কোথায় সেই গুণময়ের গুণবিচারী। প্রেমময়ের প্রণয়ী—কোথায় সে বধূ? যে ব'লে দেবে নরেনকে, তার বরের খোঁজ?

হে ঈশ্বর, তুমি কি তবে নেই? সব মিথ্যা? সব ভ্রম? যদি থেকে থাকো, তবে বল, বল কোথায় পাব তোমায় দেখ্‌তে! যেমন আকাশে তারা দেখি, নদীতে দেখি ঢেউ। বনেতে কুসুম দেখি, পঙ্কে দেখি পঙ্কজ। ঠিক তেমনি তুমি আভাসিত হও। আভাসিত হ'ও আমার দর্শনলোভন আকুতি জুড়োতে। তৃষাতুর অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে।

সহসা মনে প'ড়ে গেল রাম দত্তের কথা,—"……দক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান ধর্ম্মকে দেখে আয়।"

সঙ্গে সঙ্গে আবার স্মরণ হোল নরেনের মনে—

স্মরণ হোল হেষ্টি সাহেবের কথা,—"নির্ব্বিকল্প-সমাধি হয় দক্ষিণেশ্বরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের।"

বলেছিল একদিন হেষ্টি। বলেছিল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়াতে পড়াতে ভাব-সমাধি প্রসঙ্গে।

সময় হোলে বিস্মৃতির অন্ধকারে পড়ে স্মরণের সূর্য্য। লগ্ন আসে জীবনে। রাত্রির পলগুলো যায় আলোর মালা হ'য়ে। সুরু হয় অভিসার।

চলল নরেন দক্ষিণেশ্বরে। নিয়ে যাচ্ছে সুরেশ মিত্তির। নিয়ে যাচ্ছে গাড়ীতে ক'রে। মনে কত কথা। কত ভাব। কত চিন্তা। যেন ঝড় জেগেছে চিত্তাকাশে। চলল সূর্য্য, চলল চন্দ্রের অভিসারে।

এমন যার আকুলতা। এমন যার কান্না। সে পাবে না ঈশ্বর দেখতে!

ঘরের ভেতর ব'সে রামকৃষ্ণ। হঠাৎ চম্‌কে উঠলেন। চম্‌কে উঠলেন, ছায়া দেখে।

কে এলো রে ?

কার ছায়া পড়ল দরজায় ?

এমন বলিষ্ঠ ছায়া তো দেখেনি কোনদিন ! চঞ্চল হ'য়ে গেল ঠাকুরের মন।

কার ছায়া ? এমন মায়াঘন ! শান্ত বীর ! কে ? কে এলো ?

দাঁড়িয়ে নরেন।

উষ্কখুষ্ক চুল। ঢুলু ঢুলু ভাব, যেন মনে হয় ভাবের মাতাল। আধোবোজা চোখ। তারই মাঝ দিয়ে বিচ্ছুরিত হোচ্ছে প্রখর দীপ্তি। ময়লা একখানা চাদর গায়ে। নেই বাইরের দিকে কোন খেয়াল। নেই বেশে বাসে বাহার। ঠাকুর তাকান আর ভাবেন—

ভাবেন, একমনে—এ-যে স্বতন্ত্র। সকলের থেকে বিযুক্ত। কেবল যুক্ত হবার বাসনা ব্যাকুল মন সত্য সুন্দরের সঙ্গে। তাই তো রে, এ যে মুক্ত আত্মা! উদাসীন ভাব। ধূলিতে চলে, কিন্তু লাগে না ধূলি পায়। দেহে তো প্রচুর শক্তি। তাই ব'লে মায়া নেই কায়ার জন্যে। চারিদিকে আসক্তির প্রহরীরা সজাগ। নরেন তার মাঝে নিরাসক্ত। ওরে, কে ? কে তুই ? এমন অরূপ রতন কেমন ক'রে বেড়ে উঠল বিষয়ী লোকের আবাস-ভূমি কলকাতায় ?

এ-যে মুক্ত মানুষ। মুক্ত প্রাণ। পঞ্চ কোষের উর্দ্ধে।

আর পারলেন না ঠাকুর। আকুল মন ব্যাকুল হোল। বললেন—"আয় বোস্ এখানটায়।"

মাদুর পাতা। বসল সবাই। কিন্তু নরেন তার মাঝে আলাদা। তার দিকেই কেবল তাকিয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কি কথা বলবেন ? সকল কথা যেন ভেসে গেছে আবেগের স্রোতে। আনন্দে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে কণ্ঠ। একটু সামলে নিয়ে বললেন ঠাকুর। বললেন, নরেন—"একটা গান ধর।"

গান ধরল নরেন।

কি গান ?

"মন চল নিজ নিকেতনে।"

এ তো গান নয় ! এ যে মান। মান করেছে নরেন তার স্বজনের 'পর। আহা কি অপুর্ব্ব ! যেমন সুর, তেমন কণ্ঠ।

গান শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাব লাগিয়ে দিয়েছে নরেন। ঠাকুর বললেন,—"আর একখানা গা।"

"যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে—.
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥"

এ-কি গান না প্রশ্ন? সুর না সন্ধান? পদ না বিলাপ?

ঠাকুরের মন-যমুনায় ঝড় জাগিয়ে দিয়েছে নরেন।

লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ধরলেন নরেনের হাতখানা। এক টান। নিয়ে এলেন উত্তর দিকের বারান্দায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে এলো নরেন।

বাইরে থেকে বন্ধ হ'য়ে গেল দরজা। দুজনে বসলেন মুখোমুখী। বসল মানস-যাত্রী, বিরহের যমুনা-পুলিনে।

১১

হেমন্তের বিদায় অভিসার। প্রকৃতি অববুদ্ধ। কিন্তু আবেশ অবস। শান্ত আকাশ। বাতাসের গতি মন্থর।

আর নদীটি?

বইছে ধীরে—চুপে! যেন কাঁদছে। কেবল মাঝে মাঝে দু-একটি লহর দিচ্ছে তপোবন। ভাবস্নিগ্ধ ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশ। সবাই যেন রহস্য অবলোকনে দাঁড়িয়ে—

দাঁড়িয়ে আছে অনড়, ধীর, স্থির হ'য়ে।

কেন?

সাত ঋষির এক ঋষি নেমে এসেছে। নেমে এসেছে অখণ্ডের রাজ্য থেকে দক্ষিণেশ্বরে। বসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের তপতীর্থে। বসেছে নরেন—বসেছে রামকৃষ্ণের সম্মুখে। জানতে এসেছে ঈশ্বর-তত্ত্ব।

ঐরাবত যদি দেখতে পেত তার দেহটি, তবে কি আর বন্দী হ'য়ে রইত ইন্দ্রেয় দুয়ারে? বিশ্বনাথের ছেলে নরেন্দ্রনাথ এখনো দেখেনি তার স্বরূপ। হয়নি তার আত্ম-দর্শন। তাইতো এসেছে ছুটে। ছুটে এসেছে জানতে ঈশ্বর আছে, কি নেই?

লোকেরা বলে ঈশ্বর আছে। তার কৃপা আছে। আর আছে দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি। কাঁদলে এসে চোখ মুছিয়ে দেয়। মেঘমেদুর মনের নভে জ্বালিয়ে দেয় আলো। ডাকলেই এসে হাজির হয় চোখের সামনে।

কিন্তু কেউ তো বলতে পারলে না—ঈশ্বরকে দেখেছে কিনা। মহর্ষিও বলতে পারলে না। তাই তো নরেন ছুটে এসেছে সুরেশ মিত্তিরের সঙ্গে। ছুটে এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঈশ্বর আছে, কি নেই জানতে।

রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে ব'সে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর নরেন। কেবল চোখে চোখে ভাব-বিনিময় হচ্ছে দুজনে। যেন নীড়ের ছানাটির মত চাইছে নরেন থেকে থেকে। চাইছে ঠাকুরের দিকে।

একি!

হঠাৎ চম্‌কে উঠল নরেন। চম্‌কে উঠল ঠাকুরের কান্না শুনে। একি! তুমি কাঁদছ?

নীরবে চোখের জল ফেলে কাঁদছেন রামকৃষ্ণ।

যেন জননীর অঙ্কে শিশু তার অভিমানের কান্না কাঁদছে। আবেগের প্লাবনে ভেসে গেছে বাক্‌শক্তি। প্রেমের প্রণয়-প্রত্যাশায় ওঁরা দুজনেই নির্ব্বাক। তাই তো ভাবের ভাবনায় কেবল জলের জোয়ার। বারির বন্যা।

মেঘ ডাকলে কি হয়? বিজুলী চমকায়। সুরু হয় বাত্যা। কে তখন শান্ত করে তাকে? স্ফটিকস্বচ্ছ নির্ঝর। বাঁধন-হারা বর্ষণ। ফুটন্ত চিনির রস কখন যায় মৌন হ'য়ে? যখন তার দানাগুলো খণ্ড থেকে অখণ্ডে জমাট বাঁধে।

নরেন আর ঠাকুরের হয়েছে তাই। বলছিলেন ঠাকুর—"তুই এখনো এলি না?"

আর, নরেন খুঁজছে ঈশ্বরকে যে দেখেছে—তাকে। দু'ধারা এসে মিলেছে এক নদীর মোহনায়। দুটি ধারা মোহনায় মিলনের আগে যত ছুটোছুটি। কিন্তু যেই মিলন হোল? অমনি যেন হ'য়ে গেল শান্ত। এখনো ঠাকুর কাঁদছেন।

নরেন তো হতবাক্। কি বলবে সে? কেনই বা কান্না? কেনই বা অশ্রু? এ তো আচ্ছা বিপদ!

একটু নড়ে বসলেন ঠাকুর। কি যেন বলবেন।

নরেন উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকাল। বললেন ঠাকুর—"এতদিন কোথায় ছিলি?"

চম্‌কে উঠল তরুণ সন্ন্যাসী। নতুন যুগের প্রতিনিধি।

বিচার ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী। প্রত্যক্ষের সাধক নরেন্দ্র তাকিয়ে, ভাবছে। ভাবছে নরেন—কি প্রশ্ন করলে? যেন কত পরিচিত কণ্ঠ। কত কাছের কথা।

শিহরণ জাগল নরেনের দেহে মনে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ আত্মা। তা কি কেবল দুটি জীবনের?

না

তবে?

যুগের বুকেও জেগেছে কম্পন। জাতির জীবনেও বুঝি একটা বিদ্যুৎ গেল চম্‌কে।

বলল আবার সেই করুণস্নিগ্ধ কণ্ঠে—"তোর কি মায়া দয়া নেই? এত দিন পরে আসতে হয়! কত ক্ষণ থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে

বছর আমি তোর জন্যে ব'সে আছি, তোর তা খেয়াল নেই। তোর মনে পড়ল না আমাকে।''

কি নিষ্ঠুর তুই! আমি যে কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছি। সারাদিন তোর ভাবনা ভেবে কেটে গেছে। রাতে কি ছাই চোখে ঘুম আসত। কেবল তোর আভাতি। তোর কণ্ঠ। আমি রাত জেগে কাটিয়ে দিতেম। কতদিন চম্‌কে উঠেছি। ভেবেছি, তুই এসেছিস্।

দেখেছি তোকে। ধরতে গিয়েছি। অমনি তুই মিলিয়ে গেলি নিষুপ্তি অন্ধকারে। রাত্রির গভীরে। ওরে, "বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাব। প্রাণের কথা আর কাউকে বলতে না পেরে এই দ্যাখ, আমার পেট ফুলে রয়েছে। এইবার তুই এসেছিস্, এবার বাহির দুয়ারের কপাট লেগে ভেতর দুয়ার খুলে যাবে। তুই এসেছিস্, তার মানে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম করতে এসেছে। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বিশ্রাম।" নরেন তাকিয়ে থাকে অবাক্-বিস্ময়ে।

আবার বললেন—"মাকে সেদিন অনেক ক'রে বললাম। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন ক'রে রইব পৃথিবীতে? কার সঙ্গে কইব কথা? কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি হলো জানিস না বুঝি?"

চম্‌কে উঠল নরেন। তাকাল উৎকণ্ঠা নিয়ে।

"মাঝ রাতে তুই এলি আমার ঘরে। আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি —আমি এসেছি।''

নরেন ভাবে—এ-যে বদ্ধ পাগল। এমন উন্মাদ তো কখনো দেখিনি। বলল নরেন—"কই আমি তো কিছু জানি না। আমি তো আমার কলকাতার বাড়ীতে তখন বেশ ঘুম মারছি।''

কি বলছেন আপনি?

ধীরে ধীরে হাত জোড় করলেন ঠাকুর। এগিয়ে এলেন নরেনের কাছে। বলতে লাগলেন গদগদ কণ্ঠে,—"তুমি জানো না বৈকি! তুমি যদি না জানলে তবে আর জানবে কে। আমি জানি প্রভু, তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে শরীর ধারণ করেছ। এসেছ জীবের দৈন্য, দুঃখ, কান্না-হাহাকার দূর করতে।"

নরেন ভাবে—এ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। লোকে কী আর মিথ্যা বলে। —দক্ষিণেশ্বরে আছে এক পাগ্‌লা বামুন। আবোল তাবোল বলে। কাঁদে। থাকে না আপন পর জ্ঞান।

ঠিকই বলে। তা না হ'লে আমার মত একটা সামান্য লোক দেখে কেউ এত কাঁদে! সিমলের দত্তবংশের ছেলে আমি। বিশ্বনাথ দত্ত আমার পিতা। এর মাঝে আবার সাত ঋষির প্রকাশটা পেল কি ক'রে? একি মানুষের কথা? পাগল তো পাগলই। আবার বদ্ধ পাগল বললেও ভুল নেই কিছু।

শুধু শুধু কতকগুলো সময় নষ্ট হোল নরেনের। এখন যেন যেতে পারলে বাঁচে সে।

উঠি উঠি ভাব। কিন্তু উঠতে তো পারছে না! একি হোল! দেহের বলটুকু যেন সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। একটু নড়ে বসবার শক্তিটুকুও নেই। কি হোল? এমন হোল কেন?

মুখে বলছে উঠি উঠি, কিন্তু মন তো সাড়া দিচ্ছে না।

ওগো তুমি কে জানি না। জানতে দাওনি ব'লে রয়েছি দূরে। কিন্তু যদি দূরেই রাখবে, তবে কেন এমন সম্মোহন? এমন আকর্ষণ? স্পর্শে শীতলতা। কথায় কাব্যের নেশা। ভাবে মুগ্ধ প্রকাশ। কে তুমি?

বললেন ঠাকুর—"তুই একটু বোস্। খাবার নিয়ে আসি।" চললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। চললেন খাবার আনতে নরেনের জন্যে। ছুটে এলেন চকিতে। মনে ভয়—যদি নরেন চলে যায়!

মাখন, মিছরি আর সন্দেশ।

বললেন—"খা, হাঁ কর।"

নরেনের যেন কেমন লাগল। বাইরে সব বন্ধুরা ব'সে। তাদের না দিয়ে নরেন কেমন ক'রে খাবে? বলল তাই—বলল নরেন—"বন্ধুরা রয়েছে বাইরে। তাদের না দিয়ে.........।"

একটু অমত প্রকাশ ক'রে বলল—"দিন আমার হাতে। ওদের নিয়ে এক সঙ্গে খাই।"

কে শোনে তা। বললেন ঠাকুর—"হবেখন, ওরা খাবেখন পরে—আগে তুমি খাও।" দিতে লাগলেন নরেনের মুখে পুরে খাবারগুলো।

তুমি খেলেই ওদের পেট ভ'রে যাবে।

গর্ভবতী খেলেই শিশুর ক্ষুধা মিটে যায়। তুমি যে যুগের জননী। জাতির ধাত্রী। আছে তোমার মাঝে মাতৃভাব। আবার পিতৃশক্তিও জাগ্রত রয়েছে অন্তরখানা ভ'রে। ধাত্রী হ'য়ে সেবিকা সাজতেও পটু। সারথী হ'য়ে রথ চালাতেও সিদ্ধহস্ত। খেয়ে নেও সবটুকু খাও।

অবাক্ বিস্ময় নরেনের চোখে। প্রতিবাদ করতে আর পারল কৈ? খেয়ে ফেলল খাবারগুলো। রইল না একটুও অবশেষ।

"এবারে বল্,—বল্ আবার আস্‌বি। দেরী করবি না একেবারে......।"

মাথা কাত ক'রে সম্মতি জানায় নরেন।

বললেন আবার ঠাকুর,—"ঠিক তো? কিন্তু দেখিস্, একা-একা আস্‌বি।"

"আসব।"

যেন কত তৃপ্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। আনন্দে উদ্বেল হৃদয়। বলতে লাগলেন আবার,—"আর শোন্, একটু বেশী বেশী আসবি। প্রথম আলাপের পর বরং একটু ঘন ঘনই আসে। কেমন, আস্‌বি তো?"

একটি স্পষ্ট প্রত্যুত্তর—"চেষ্টা করব।"

চলে এলো দুজনে ঘরে। তাকাতে লাগল নরেন। তাকাতে লাগল একদৃষ্টে রামকৃষ্ণের দিকে। যেন সূর্য্যের সম্পাত হয়েছে সাগরের বুকে।

ভাবে নরেন—

ভাবে একমনে—পাগল যদি, তবে এমন ক'রে কান্না কেন ঈশ্বরের জন্যে? পাগল তো কখনো ঈশ্বর-বিরহে ব্যাকুল হয় না! এমন আট-সাট কথা! এমন কাব্য-মধুর ছন্দ! এ আবার কেমন পাগল? এমন তো হয় না পাগলের! তবুও একটি প্রশ্ন। একটি জিজ্ঞাসা—

"ঈশ্বরকে দেখা যায়?"

নিশ্চয়ই। "তিনি আছেন, তাকে দেখা যাবে না? যখন তিনি আছেন, তখন দ্রষ্টব্য হ'য়েই আছেন।"

আছেন তিনি জগৎ জুড়ে। অণুতে, অনিয়ানে, জলে, পলে, পত্রে, পুষ্পে। সর্ব্বত্র তাঁর আভাস প্রকাশ।

তিনি নেই তো জগৎ নেই। আর, তিনি আছেন তো জগৎও আছে।

এ যেন সব জেনে শুনে ব'সে আছে। একেবারে প্রত্যক্ষ, প্রজ্জ্বলন্ত, প্রস্ফুট। ঈশ্বরময় চরাচর। তাঁর প্রকাশ যেমন অন্তরে, তেমন বাইরে। অপূর্ব্ব বিশ্বাস। অচলা অনুভূতি।

প্রণাম করল নরেন।

দাঁড়াল উঠে, এবারে আসি!

বাড়ীতে ফিরে এলো নরেন। সেই নিভৃত নিরজন পুরী। রুদ্ধ দ্বার। অন্ধকার। তারই মাঝে নরেন ব'সে ব'সে ভাবছে। ভাবছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।

কি দেখে এলো সে? চোখের সীমানায় তবে কি সীমাতীত এসে কায়া ধ'রে দাঁড়াল? ব্যথা ও কান্নার সুরে কে এসে ছন্দ জুড়ে দিল! দিল আঁধার সায়রে জ্বালিয়ে দীপান্বিতার আলো! অশান্তির রুদ্ধ বুকে পথ ক'রে দিল কে নির্ম্মুক্তির। নিঃসঙ্গ জীবনে এ-যে সঙ্গীর সুস্পষ্ট পায়ের শব্দ! অপূর্ণতার রাজ্যে পরিপূর্ণতার স্বাচ্ছন্দ্য। বাসনাপঙ্কিল মর্ত্তভূমিতে এ-যে প্রেমের আকাশ-গঙ্গা। পাগল বা কি ক'রে এমন হয়?

ভাবনায় পড়ল নরেন।

কিন্তু পাগল নাইবা কেন?

যে জ্ঞানের অগম্য, যার নেই কায়া। নেই আকার। সে আবার কেমন ক'রে আসে দর্শনে? আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই ঈশ্বর। কিন্তু সে রূপে ধরা দেয় কি ক'রে! আত্মার কি আকার আছে যে ধরা দেবে বাইরে?

সব ভুল। সব ভ্রান্ত। তার যে জন্ম নেই—মৃত্যু নেই।

নেই তার কোন মূর্ত্তি। যে অবিনাশী নির্ব্বিকার, তার আবার আকার কি?

সিদ্ধান্ত নির্ভুল। দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলো নরেন, দেখে এলো এক বদ্ধ পাগল। শিকল-ছেঁড়া উন্মাদ।

১২

অনেক যুক্তি, অনেক তর্ক।

তারপর?

গভীর আসক্তি। অধীর আকুলতা।

মন যেন ডেকে বললে—যা, আবার দেখে আয় তাঁকে। 'দেখে আয় সেই দক্ষিণেশ্বরের মূর্ত্তিমান ধর্ম্মকে।'

চলল নরেন। চলল হেঁটে হেঁটে একটি মাস পরে।

নীল নভে দোয়েল, কোয়েল আর কাক, কোকিলের নীড়ে ফেরার পাখনার ঝাপট। পশ্চিমের দিগন্তে স্তিমিত সূর্য্য। গঙ্গার বুকে শান্ত সঙ্গীত। নরেন জিজ্ঞেস করে ডেকে। জিজ্ঞেস করে পান্থ জনে—আরে, ও ভাই, দক্ষিণেশ্বরে যাব কোন্ পথে বলতে পারো?

পথ দেখিয়ে দিল। সুরু হোল আবার চলা। চলছে তো চলছেই। কিন্তু পথের তো আর শেষ নেই!

ক্লান্তিতে গতি আসে শ্লথ হ'য়ে। ঝিমু ঝিমু ভাব। ঘাম ঝরে গায়। মুখখানা গেছে লাল টক্‌টকে হ'য়ে। এখানে পা ফেলে তো পড়ে গিয়ে ওখানে। শিথিল ছন্দ। শ্রান্ত শরীর। এতো পথ! এতো দুর!

বুঝতে পারেনি নরেন। এসেছিল সেদিন সুরেশ মিত্তিরের গাড়ীতে ক'রে। কত সময় বা লাগল। সুড় সুড় ক'রে পৌঁছে গেল গাড়ী। কিন্তু আজ যেন কেবল হেঁটেই চলেছে।

ভাবল নরেন—না, আর পারছি না চলতে। এবারে ফিরে যাই! কি হবে এমন ক্লান্তিতে ক্ষয়ে! কি হবে এমন সাধ্যাতীত শ্রম ক'রে! একটা পাগ্‌লা বামুন কি করবে আমার?

মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। ফিরে আসবে নরেন।

কিন্তু একি!

যেন সঙ্গীতের মত ছন্দ মধুর হ'য়ে ধ্বনিত হোল অন্তরে—

—তুই আসবি ব'লে গেলি, এখনো সময় হোল না?

আবার সুরু হোল অভিযান।

—ও ভাই, এই পথেই তো দক্ষিণেশ্বর—না?

—হ্যাঁ। ঠিক পথ ধরেছ। নেই ডান-বাঁ। সোজা হেঁটে গেলেই দক্ষিণাচল। শান্তির স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়। মুক্তির মহাতীর্থ।

আপ্রাণ হাঁটছে নরেন। হাঁটছে অশ্রান্ত পদ-সঞ্চারে।

তক্তপোশটিতে ব'সে আছেন রামকৃষ্ণ। উঁতি উঁতি চাইছেন বাহির পানে। যেন কার পথ চেয়ে ব'সে আছেন আকুল হ'য়ে। শূন্য ঘর। কেউ নেই। কার সঙ্গে কইবেন ছুটি কথা! তাই বুঝি মনের মানুষটির আগমন-প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে চেয়ে আছেন বাতায়নের দুয়ার খুলে।

পদশব্দ.........

চঞ্চল হ'য়ে উঠল রামকৃষ্ণের অন্তর। মুহূর্ত্তে বড় হ'য়ে গেল চোখ ছুটি। আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠল মন।

—তুই এসেছিস্! আয়—আয়!

নরেন ঘরে ঢুকল। রইল ঠায় দাঁড়িয়ে।

—ইস্! শুকিয়ে গেছে মুখখানা। খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি? তা তো হবেই, পথ তো কম নয়। খাবি কিছু? ও-কি, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

—বোস্।

কোথায় বোসবে। সমস্তটুকু আসনই জুড়ে রেখেছেন রামকৃষ্ণ। একটু জায়গা না পেলে কেমন ক'রে বসবে?

—বোস্। আমার পাশটিতে বোস্।

কুণ্ঠা লাগে নরেনের। সঙ্কোচ আসে। কেমন ক'রে গাঁ ঠেস্ দিয়ে বসবে নরেন। তাই দাঁড়িয়েই রইল ঠায়।

—বারে! কি হোল! বোস্ এসে।

বোসল এবারে। কিন্তু কেমন কেমন লাগে যেন। একটু একটু সরে যায় নরেন। কিন্তু শূন্য স্থানটুকু অমনি পূর্ণ ক'রে দেন রামকৃষ্ণ। নীরব ছুজনে। চলছে শুধু ভাব-বিনিময়।

অন্তরে চলছে এমন বিরহ তাপিত তপন ও ইন্দুর প্রেমঘন খেলা। আর বাইরে?

মুখর ভক্তবৃন্দ। মুখর তারা কীর্ত্তনানন্দে।

অস্ত নামে পাটে। পথ হ'য়ে আসে জনহীন। বিজন বনানীর বুকে চঞ্চল অনিল-নিস্বন। দিবাবসানের ব্যথায় বিধুর বনরাজি। গঙ্গার বুকে কুলু-কুলু কলতান। এলো ঘনিয়ে সন্ধ্যার ধূসরিমা আকাশ-পথে। মন্দিরে বেজে

উঠল ঘণ্টা? সন্ধ্যারতির ঘণ্টা। বন-বধুর অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে এখনো দেখা যায়, দেখা যায় সূর্য্যের শেষ আভাটুকু। দিনের বুকে পড়ে রাত্রির কালো ছায়া।

দু-জনে ব'সে। ব'সে আছেন রামকৃষ্ণ আর নরেন্দ্রনাথ। নির্ব্বাক। কিন্তু মনে তাঁদের জাগরণের জয়গান। শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইছেন। গলা ছেড়ে নয়—পঙ্‌ক্তি গুণে। ঘুমন্ত দিনকে জাগাতে হবে। কিন্তু কে জাগাবে? নরেন্দ্রনাথ। কেমন করে? মায়ের আশীর্ব্বাদে। কোথায় পাবে তা? পাবে এই পতিতপাবনীর দুয়ারে। ভবতারিণীর রাঙ্গা পায়।

কিন্তু নরেনের জ্ঞানের দেউলে আনতে হবে ভক্তির জোয়ার। কান্নার অশ্রু।

উঠে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। তির্য্যক্ দৃষ্টি নরেনের 'পর।

কি দেখছেন চেয়ে চেয়ে?

অপরূপ রূপ। মধুর যৌবন। আবিলতা শূন্য। চোখে বিদ্যুৎ প্রদীপ্তি।

ভাবে বৈরাগ্য। দৃষ্টিতে অনুসন্ধান। কণ্ঠে উদ্‌গীথ। অন্তরে মহাজিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক এমন একটি রতন চাই! ও পারবে না তো কে পারবে? কে পারবে জগজ্জনকে জাগরণের জয়গান শোনাতে?

উঠলেন আসন ছেড়ে। দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। হঠাৎ ডান পা খানা তুলে দিলেন নরেনের কাঁধে।

কি যেন হয়ে গেল। শুক্তির আগল ঠেলে বেরিয়ে এলো মুক্তির আলো। চলমান পৃথিবী। ঘূর্ণিত ধরণী। সব কিছুই অস্থায়ী। পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘর, বাড়ী, দেয়াল, দোর। কোথায় যাচ্ছে? ঐ ঊর্দ্ধে। নীলনভে। নিঃসীমের রাজ্যে সব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় মর্ত্ত্য আর কোথায় স্বর্গ, এ যে অবিভক্ত। অখণ্ড। সব যেন মিলে মিশে একাকার। ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নরেনের সংজ্ঞা। শক্তিহীন দেহ।

আর্ত্তনাদ করে উঠল নরেন।

হৃদ্-বিদারণ আর্ত্তি—"ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা-বাপ আছেন।"

হেসে দিলেন রামকৃষ্ণ। তাই নাকি! ও, খবর লইনি ব'লে অভিমান করেছিলি। কথা বলিস নি। ওরে, কি হবে অন্যের খবর জেনে?

তোর খবর জানলেই যে সব খবর জানা হয়ে যাবে।

ধানের পানসি ভাসিয়ে কেউ কি পাটের হাটে নাও ভিড়ায়? ধানে বীজ আছে। গাছ জন্মাবে। কিন্তু পাট তো পট্টবাসের সামগ্রী। আভরণের ইন্ধন। আমি তো আভরণ চাই না রে। চাই মনের ছায়া। আর অনুরাগের হাওয়া। "তবে থাক, এখন থাক, একেবারে কাজ নেই। কালে হবে। আস্তে আস্তে হবে।"

নিয়ে এলেন নরেনকে সহজে। নিয়ে এলেন অখণ্ড থেকে খণ্ডে। শূন্য থেকে ভূমিতে। মুহূর্ত্তে সব ঠিক হয়ে গেল। নরেন ফিরে পেল সম্বিৎ। ভাবতে লাগল—এ কি সাধন শক্তি—না সম্মোহন? নিশ্চয় সম্মোহন! দাঁড়াল নরেন। যেতে চাইল পালিয়ে। ভয় হোল মনে—বুঝি গুণ-জ্ঞান জানে। কি জানি আবার কি করে ফেলবে। এর চেয়ে পালান ভালো।

কিন্তু একজন বামুনের ভয়ে পালিয়ে যাবে—

পালিয়ে যাবে বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ?

না! সে তো হবার নয়!

যদি পাগল হ'য়ে থাকে তো পাগলের শেষ দেখতে হবে। দেখতে হবে সম্মোহন হলেও তার অন্ত। আর যদি সত্য শক্তির ক্ষণেক স্ফুরণ হয়ে থাকে, তবে সে শক্তির সন্ধান না করে ফিরবে না নরেন।

যে পাষাণ গলিয়ে দিল মুহূর্ত্তে, তাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না পাগল বলে!

বিচার, যুক্তি. বিশ্লেষণ। তারপরে সিদ্ধান্ত। চাই সন্দেহের নিরসনে সুখ-কর উত্তরণ। ভাব জমল আবার। কত কথা। কত আলাপন।

এ কথা সে কথা। অবশেষে বললেন রামকৃষ্ণ—এখন চলে যাবি? নরেন ভাবে প্রকাশ করে—যেতে হয় না এখন?

হ্যাঁ, তোর ঘরে তো বাপ, মা আছে। যাবি বৈকি।

কিন্তু একি! রামকৃষ্ণ কান্না সুরু করে দিলেন।

—ওরে তুই চলে যাবি? তুই চলে যাবি মানে দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসবে। আমি একা হয়ে পড়ব। তাই না?

সব ব্যথা সওয়া যায়। সব ভুলে যাওয়া যায়। কিন্তু বিরহ ব্যথার দহন থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্ট। শোকদগ্ধ মন দুদিন পরে বসে, বসে আবার তার ভাঙা ঘর সাজিয়ে। কিন্তু মোহমুগ্ধ মন একবার আঘাত পেলে আর ফিরে আসে না। ফিরাতে কেউ পারে না।

যাবি এখন ?

হ্যাঁ, এখন আসি !

যেন বজ্রপাত হোল।

যাচ্ছিস সত্যি ? "কিন্তু আবার শিগ্‌গির করে আসবি তো, যেমন নতুন পতি ঘন ঘন আসে তেমনি আসবি বেশী বেশী। ওরে তোকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই।"

আসবি তো ?

হ্যাঁ। আসবো।

১৩

বি. এ. পড়তে পড়তে শিখছে আবার এটর্ণী ব্যবসা নরেন।

নিমাইচরণ বসুর কাছে আইন শিখছে।

বিশ্বনাথের ইচ্ছা, ছেলেকে আইনজ্ঞ করে তুলবে। তার পরে সংসার তুলে দেবে ছেলের হাতে। নিষ্কৃতি পাবে বিশ্বনাথ। নিষ্কৃতি পাবে সংসারের ভাবনা থেকে।

কিন্তু নরেন যে দক্ষিণেশ্বরে যায়, যায় সেই পাগলা বামুন শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-প্রচ্ছায়।

এ খবর কী বিশ্বনাথ জানে?

জানবে না কেন! কিন্তু বলছে না কিচ্ছু। কেবল পরিজনবর্গ একদিন বললে, হ্যাঁরে নরেন, একটা পাগলা বামুনের সঙ্গে এত কী কথা তোর?

ঐ পাগলা বামুন যে নরেনের হৃদয়-ফলকে লিখে দিয়েছে মায়ের নাম। আর সে আখরের গা থেকে বের হচ্ছে উজ্জ্বল প্রদীপ্তি। নরেন কিছু না পেলে কী এমনি এমনি যাচ্ছে সেখানে?

পরীক্ষা এসে গেছে। পড়ায় একটু মন দিয়েছে নরেন। নামল সবে সন্ধ্যা, ঘরে বসে পড়ছে নরেন। হঠাৎ কে যেন ডাকল।

—বিলে।

—কে? ও আয়, ঘরে আয়।

এসেছে নরেনের এক বন্ধু। বসেই সুরু করে দিলে উপদেশ দিতে। কি ছাই কেবল দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিস? যাতে করে সংসারে 'সুখ-সুবিধা' আসে, তাই ভাব। ঐ পাগলা বামুন তোর কি করবে?

এ বয়সে কি ধর্ম্ম করা শোভা পায়? লোকে বলবে তোকে ভীরু। বলবে পাগল। নরেন বলল, বলল একটু বিরক্তির মন লয়ে—"আমার মনে হয়, সন্ন্যাসই মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল অনিত্য সংসারের পশ্চাতে সুখ-লালসায়, ইতস্তত: ধাবমান হওয়ার চেয়ে সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যং শিবং সুন্দরম্‌কে পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর।"

দুর্ব্বলের চোখে প্রতীয়মান হয় ধর্ম্ম ভীরুতার লক্ষণ বলে। বীর্য্যবান করে তাঁর স্তুতি বন্দনা।

বললেন একদিন রামকৃষ্ণ—

বললেন নরেনকে,—"নরেন্দ্র, তুই কি বলিস! সংসারী লোকেরা কত কি বলে, কিন্তু দ্যাখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে, কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তখন তুই কী মনে করবি?"

বললে নরেন,—"আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।"

তর্ক বাধল্। তুমুল তর্ক জুড়ে দিলে নরেন বন্ধুর সঙ্গে। অবশেষে বললে বন্ধু—"দেখ নরেন, তোমার যে প্রকার বুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল, তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারতে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস তোমার মাথা খেয়েছেন। যদি ভাল চাও, তাহলে ঐ পাগলের সঙ্গ পরিত্যাগ কর। তা না হ'লে তোমার সর্ব্বনাশ হবে।"

আগুন ধরিয়ে দিল বন্ধু, দিল ধরিয়ে আগুন নরেনের আত্মায়। বন্ধু-প্রীতি তার চটে গেল। চুপটি করে রইল নরেন। চুপটি করে রইল একটি কথাও না বলে।

কিন্তু বন্ধু কী আর ছাড়ে? নানা প্রশ্ন। নানা জিজ্ঞাসা। নরেন সইতে পারল না আর। বলল—"ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝতে পারছ না, আর বলব কি, আমি নিজেও তাকে সম্যক্ বুঝে উঠতে পারিনি। তবু ঐ সরল, সৌম্যকান্তি মহাপুরুষকে আমি ভালবাসি কেন, তা বলতে পারি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের জীবনের রূপকার। তার অন্তরের বৈকুণ্ঠ।

বুঝল বন্ধু নরেনের মনের ভাব। অপ্রস্তুত হোল। পেল লজ্জা। তবুও যাবার বেলায় বলে গেল—

বলে গেল নরেনকে,—"পরমহংসের সঙ্গদোষেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

তা হোক। মাথা কেন শুধু, রামকৃষ্ণ দিয়েছেন নরেনের মন খারাপ করে। লাগিয়ে দিয়েছেন নেশা। হরি-কথার নেশা! গাজিপুর থেকে লিখেছে চিঠি। চিঠি লিখেছে নরেন—"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না। এখন সিদ্ধান্ত এই যে রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব্ব অহেতুকী দয়া, সে ইণ্টেন্স সিম্প্যাথি বদ্ধ জীবনের জন্য এ জগতে আর নাই।"

ওদিকে তো সুরু হয়েছে আবার কান্না। রামকৃষ্ণ কাঁদছেন। কাঁদছেন তাঁর নরেনের জন্য।

ওরে, তুই আয়। বলে গেলি আসবি, কিন্তু সময় কি তোর হোলো না? আমি যে আর রইতে পারছি না। আমার মনের আনন্দের ভাগ তোরে কিছু না দিতে পারলে যে তৃপ্তি নেই। আয়, আয় নরেন। সবাই এলো। কেবল তুই এলি না! যেমন বৈশাখের রিক্ত মাঠে আসে বারির বন্যা, তুই তেমনি আয় আমার মনের দিগন্তে বসন্তের বার্ত্তা নিয়ে।

"ওহে নরেনের খবর জানো? সে কেমন আছে?" আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন রামকৃষ্ণ। জিজ্ঞেস করলেন রামদয়ালের কাছে।

রামদয়াল বললে—"অত ভাবনা কেন? ভালো আছে।"

—ভালো আছে নরেন, ঠিক জানিস? সেই যে গেল, আর এলো না তো! বলে গেল, আসবে!

মন ভেঙ্গে পড়েছে। নরেনকে যেন না হোলেই নয়। বললেন আবার তাই—বললেন রামদয়ালকে,—"এখানে অনেক দিন আসে না। তাকে দেখতে বড়ই ইচ্ছা করছে। কেন সে আসে না—আসতে বোলো একদিন।"

আচ্ছা, কেন সে আসে না? আমি তো নরেনকে কিছু বলিনি। তবে কেন মান করে রইল! একটু আসতে বলবে তাকে? রামদয়াল সম্মতি জানাল।

মিট্‌মিটিয়ে জ্বলছে একটি আলো। বাইরে অন্ধকার। কথা বলছেন রামকৃষ্ণ। কথা বলছেন রামদয়াল আর বাবুরামের সঙ্গে। কিন্তু ছাই জমছে না। ফাঁকা ফাঁকা ভাব। উন্মনা মন। অধীর ব্যাকুল চিত্ত। এ কথা সে কথা। অবশেষে বলে ফেললেন মনের আসল কথা।

নরেন ভালো আছে তো?

—বললেম তো, নরেন খুব ভালো আছে।

রাত হোল। অনেক রাত। ডেকে বললেন রামকৃষ্ণ—বললেন—"ওরে তোরা এখন খেতে বস। দশটা যে বেজে গেল।" শেষ হোল খাওয়া। গেল শুতে সবাই। বাবুরাম আর রামদয়াল শুল বারান্দায়, এক সঙ্গে। রইল রাখাল রামকৃষ্ণের সঙ্গে।

রাখালকে রামকৃষ্ণ বলেন গোপাল। রাখাল যেন ব্রজের ব্রজলাল। কখনো জড়িয়ে ধরে রামকৃষ্ণের গলা। জড়িয়ে ধরে সোহাগ ভরে নৃত্য করে। কখনো চেপে বসে কোলে। একটু শঙ্কা নেই। নেই দ্বিধা বা আড়ষ্ট ভাব। কত আপনার জন যেন।

হবে না কেন?

ভক্ত আর ভগবান—এ যে অভিন্ন হৃদয়। অখণ্ড তাঁদের সত্তা।

শুয়েছেন রাখালকে বুকে জড়িয়ে রামকৃষ্ণ। কিন্তু চোখ দুটি যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত রইল জেগে। ঘুম তো আসে না।

নিশীথ নিরালায় একমনে ভাবছেন—

ভাবছেন রামকৃষ্ণ নরেনের কথা।

উঠে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ডেকে বললেন—"ওগো, তোমরা ঘুমুলে?"

ওরা বললে—"না, ঘুমুইনি।"

জেগে আছে ওরা। জেগে আছে কৃপাময়ের মন্দিরে। জেগে আছে সমুদ্র-শিয়রে দীপস্তম্ভটির মত।

হক্‌চকিয়ে লাফিয়ে উঠল সবাই। দেখল, ঠাকুর উলঙ্গ। কাপড়খানা বগলে করে এদিক সেদিক তাকাচ্ছেন। উলঙ্গ, অস্থির। দুই চোখে অশ্রুর নির্ঝর। মুখে যেন বেদনার কালো মেঘ। টল্‌ছেন। টল্‌ছেন আর বলছেন ওদের ডেকে—"ওগো, আমার ঘুম আসে না। নরেনের জন্যে আমার প্রাণের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। যেন কে গামছা নিংড়োচ্ছে বুকের মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারিস?"

"আজ্ঞে, ভোর হোক। তাকে সংবাদ দিয়ে আসবো।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই করো। শুধু একটিবার একটু চোখের দেখা। তাকে মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে থাকতে পারি না।"

কাঁদছেন রামকৃষ্ণ। কাঁদছেন ভক্তের বিরহে বিধুর অন্তরে। এ কান্নার কি আর শেষ আছে?

এ যে ভালোবাসার কান্না। অনুরাগের আকুলি।

বলল আবার ওরা। বলল রামকৃষ্ণকে—রাত পোহাক। যাব নরেনকে ডেকে আনতে।

একটু যেন আশ্বস্ত হোল মন। ধীরে ধীরে ফিরে এলো সম্বিৎ।

ষ্টীমারে করে বেড়াতে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে আছে একদল ব্রাহ্ম ভক্ত। চলছে ষ্টীমার। চলছে জলে খলখলিয়ে। নামলেন ষ্টীমার থেকে। চাপলেন গাড়িতে। এলেন সুরেশ মিত্তিরের বাড়ীতে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল নরেনের কথা। অমনি গুণ-গুণিয়ে উঠল মধুকর। বললেন—খবর দে নরেনকে। এ যেন কান্ত ভাব। বিরহের উজান খেলে অন্তরে। নরেন যেন তার মাঝেই সন্তরণ করছে।

ঐ যে এসেছে! নরেন এসেছে!

একটা হৈ-হৈ রব উঠল।—নরেন এসেছে! নরেন এসেছে! রামকৃষ্ণকে এসে প্রণাম করল নরেন।

একটু মুচকি হাসলেন রামকৃষ্ণ। এত যে আবেগ, আকুলতা তার যেন কোন প্রকাশ নেই আর।

বললেন কাছে ডেকে—"আজ কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

তারপর?

যেন চোখে, মুখে একটি ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল,—যদি তুই থাকতিস। দ্যাখ, তুই নেই। মনে হয়েছে যেন কিচ্ছু নেই। যাক্। তুই এসেছিস। আয়, কাছে এসে বোস।

গান, বাজনা, আনন্দ। বেশ জমকালো সভা। তারপরে নরেনের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়।

—আবার আসবি বল, আসবি তো?

—হ্যাঁ, আসবো।

১৮

ওরে তুই কি আমায় ব্যথা দিয়েই আনন্দ পাস—

পাস কি দহন জেলে দিয়েই তৃপ্তি ?

যদু মল্লিকের বাগানবাড়ী। পত্রপুষ্পের ঘন বিথার। নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য। তার মাঝে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ। চোখে জল। কণ্ঠে আবেদন। বক্ষে অনুরাগ। ভাবে মদির আবেশ। কাঁদছেন রামকৃষ্ণ। কাঁদছেন হাক দিয়ে নরেনকে ডেকে ডেকে। ওরে, তুই কি আর আসবিনে ?

বললে বামুন ভোলানাথ,—"মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্য আপনি কেন এত অধীর হন ?"

নেহাত একটা সাধারণ ছেলে। তার জন্য এত কান্না !

—সে কি কথা গো !

হ্যাঁ, নেহাতই একটা সাধারণ ছেলে তো।

—না রে না। "যেমন গাইতে, তেমন বলতে কইতে, তেমনি আবার লেখা-পড়ায়। রাত ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়। হুঁস থাকে না। সে কি যে-সে ? তার ভেতরে একটু মেকি নেই—বাজিয়ে দেখগে—টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি—দেড়টা দুটো পাশ করেছে হয়তো, ব্যস ঐ চোখ কান টিপে কোন রকম পাশ করতেই যেন সব শক্তি বেরিয়ে যায়। ব্রাহ্ম সমাজে ভজন গায় সে—আর-আরদের মতন নয়, সে সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানী। বুঝলে, ধ্যান করতে বসে সে জ্যোতি দেখে। সাধে কি আর নরেনকে এত ভালবাসি।"

কিন্তু নরেন এসে বললে কি ?

বললে—"অপনি ঈশ্বরের রূপটুপ যা দেখেন তা আপনার মনের ভুল।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ঠাকুর। বিস্ময় লাগে। বিশ্ব দোলে বক্ষ মাঝে। ঘনিয়ে আসে ঘোর।

বললেন রামকৃষ্ণ,—"বলিস কিরে। কথা কয় যে।"

মুচকি হাসি। যেন মেঘের বুকে একফালি চাঁদ জাগে। বললে আবার নরেন—"কথা কয় না কচু !"

আবার যেন বিজন বনে দোলে মলয় হাওয়া। মর্ম্মরিয়ে ওঠে তরু। জাগে নদীর বুকে ঢেউ।

…"মা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন, চলেন, কথা কন।"

নরেন হেসে জবাব দেয়—"মাটির প্রতিমা নড়বে চরবে কি!" যেন কাচা ধানের ডগার শিষে এলো দখিন হাওয়া--

দ্বন্দ্ব দোলার অন্ধকারে দোলে স্বাতীর মালা।

কাঁপছে যেন অবিশ্বাসে মেঘ-মেদুর বুক।

—তবে কি নরেন যা বললে তা ঠিক!

না! "নিজের চোখ কানকে অবিশ্বাস করব?"

নরেন বলে—"মাথার গরমে ছায়া দেখেন আপনি, বুঝি বা অপচ্ছায়া।"

আলেয়ার আলো?

"তুই বললেই হোল?"

যেমন দিনে জাগে সূর্য্য। রাতে ওঠে চাঁদ। তেমনি আমার মাও সত্য। সত্য আমার কালো মেয়ের আলোঝরা হাসি। কথা বলে। ভালোবাসে। ডাকে আমায় কাছে। ডাক দিলেই স্নেহক্ষরা স্নিগ্ধ হাসি হাসে। আহা, কি রূপ! যেন ফেননিভ ঢেউয়ের বুকে চুনি পন্নার মেলা।

যেন হিমমলিন গিরিচূড়ায় কনকোজ্জ্বল হাসি।

প্রতিবাদ করে নরেন—"আপনি বললেই বা হবে কেন?"

নেই যার স্থিতি, রীতি, কায়া, ছায়া, দেহ—

তাকে কেমন করে মানব বলুন? "পশ্চিমের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অনেক জায়গায় চোখ কান এমনি করে প্রতারণা করে। আপনিও যে প্রতারিত হচ্ছেন না তার প্রমাণ কি? কে বলবে সমস্ত আপনার চোখের কানের ভ্রান্তি নয়?"

—তুই বলছিস! "সমস্ত আমার চোখ কানের ভুল!"

মায়া-করুণ দৃষ্টি—

যেন হরিণ-শিশুর মতো।

প্রবল ফাটল বুকের মাঝে—যেন ফসল-রিক্ত মাঠ।

নরেন বলছে! নরেন বলছে!……

"সব আমার চোখ কানের ভুল!"

কান্না এলো চোখে।

নরেন তো মিথ্যা বলার ছেলে নয়! প্রতারণা, ছল, চাতুরী কাকে বলে জানে না তো নরেন!

—তবে কি মা তুই নেই?

সব কি তবে মরুর বুকে বালুর আলো?

উন্মনা মন। ছুটলেন রামকৃষ্ণ—

ছুটলেন ভবতারিণীর মন্দিরে।

আকুল ব্যাকুল চিত্ত। নেই কোন জ্ঞান। উদাস মন।

—মা, বলে দে। বলে দে মা. সত্যি করে বলে দে—

আর রাখিস না ছলনার জালে আকীর্ণ করে আমার পথ। তুই কি তবে নেই?

"মা, এ কী হল? এসব কী মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তুই শুধু পাথরের মূর্ত্তি? তুই অচল, অনড়? তুই বোবা, বধির?"

যেন মেঘের বুকে ঝিলিক জাগে। প্রাণযমুনায় ওঠে সঘন দোলা। কিরণ জাগে রবির। খিলখিলিয়ে হাসে এলোকেশী। বললে ডেকে—"ওর কথা শুনিস কেন? কিছুদিন পরে ও নিজে দেখতে পাবে ঈশ্বরীয় রূপ। সব কথা সত্যি বলে মানবে।"

সত্যি? সত্যি মা?

আর কি ভাবনা। ছুটে এলেন নরেনের কাছে ঠাকুর। বললেন ধমক দিয়ে "শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিলি। চলে যা, তুই আর এখানে আসিস্‌নে।"

নরেন নেমে এলো ঘর থেকে বারান্দায়।

আহা, ব্যথার বিষে মলিন তনু—

মেঘের মতো কালো।

কার?

শ্রীরামকৃষ্ণের।

কেন?

এত কান্না। তার পরে নরেনের দর্শন। সেই নরেনকে বললেন—

"চলে যা তুই, আর এখানে আসিস্‌নে।"

নরেন চলে গেল! বুঝি দুঃখ পেয়েছে। করেছে অভিমান। একটি কথাও বললে না। নীরবে পথে নেমে গেল।

কান্না এলো রামকৃষ্ণের।

ওরে, শুনলি না মনের কথা? মুখে বললেম, আর অমনি চলে গেলি! আমি কি তোরে না দেখে থাকতে পারি? তোর কথা ভাবতে ভাবতে রাতের ঘুম চলে যায়। চোখ ফেটে কান্না আসে। কবে তুই আসবি ভেবে চেয়ে থাকি পথ পানে, তা কি তুই দেখলি না? আয়! ফিরে আয়রে নরেন।

অনেকগুলো দিন গেল। নরেন আসে না। ব্যাকুল হয়ে গেল রামকৃষ্ণের মন। আর পারলেন না রইতে নীরবে। যাত্রা করলেন—

যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার পথে। নরেনকে একটিবার দেখবেন তাই।

—রববার। নরেন আড্ডা জমিয়েছে হয়ত কোন বন্ধুর বাড়ী। তা হোক। কোথায় আর যাবে? ব্রাহ্ম-সমাজে নিশ্চয় আসবে ভজন গাইতে।

একটু তৃপ্তির হাসি হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

—তবুও আজ দেখতে হবে নরেনকে। স্পর্শ করতে হবে তাকে। জুড়াতে হবে আমার দর্শন শোভন আকুতি। নেই বাসনা। নেই কামনা। শুধু কেবল নরেনকে দেখবার ইচ্ছা মনে। মা, পূর্ণ কর আমার মনস্কাম। নিয়ে চল নরেনের কাছে।

ব্রাহ্ম ভক্ত নরেন। কত ভজন গান করে। মুগ্ধ হয়ে যায় সবাই।

ব্রাহ্মসমাজের খাতায় লিখিয়েছে নাম। বেশ ছেলে।

নাম লিখিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের খাতায় রাখালও।

একদিন হোল এক কাণ্ড। রাখাল করল কালীঘরে প্রণাম।

চোখ পড়ল নরেনের। আর যায় কোথায় রাখাল। নরেন গিয়ে ধরল তাকে,—"এ তোমার কি কাণ্ড?"

"কেন, কি হোল?"

—কি হোল মানে? "……এটা মিথ্যাচার নয়?"

"কোন্‌টা?"

"এই মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করা?"

রাখালের কণ্ঠ এলো আড়ষ্ট হয়ে। ভাবতে লাগল,—ছাই, নরেন আবার দেখে ফেললে!

বলল আবার নরেন,—"তুমি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে সই করে দিয়ে আসোনি? বলে আসোনি নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভজনা করবে না? মানবে না দেব-দেবী?"

এই উগ্র ব্রাহ্ম ভক্তের অভিসারে যাত্রা করলেন রামকৃষ্ণ। যাত্রা করলেন সমুদ্রের অভিসারে শশী।

ভজনালয়।

ব্রাহ্মসমাজের ভজনালয়।

ভাষণ দিচ্ছে আচার্য্য। ভাষণ দিচ্ছে বেদীতে বসে।

হঠাৎ এসে ঢুকে গেলেন রামকৃষ্ণ। একদম ভেতরে।

হৈ হৈ কাণ্ড।

পাগল হ'য়ে উঠল সবাই। দেখবার জন্যে ছুটল যে যার আসন ছেড়ে।

কিন্তু কোন অভ্যর্থনা জানাল না কেউ। বললে না আচার্য্য একটি বার বসতে।

কেন?

রামকৃষ্ণ নাকি ওদের সমাজে ধরিয়ে দিয়েছে ভাঙ্গন। ছুটিয়ে নিয়েছে কেশব আর বিজয়কে।

কে পারে কার মন ভাঙ্গতে? এ তো মানুষের কাজ নয়! মন ভাঙ্গাতে পারে মনমাঝি। পারাপারের কাণ্ডারী।

নরেনের মনটা চনমন হয়ে ওঠে। বিতৃষ্ণা আসে ওদের ব্যবহার দেখে। ছুটে এলো রামকৃষ্ণের কাছে। যেন কক্ষচ্যুত ধূমকেতু। রামকৃষ্ণ তো নরেনকে দেখেই আত্মভোলা হয়ে গেলেন। হারিয়ে গেল তাঁর সংজ্ঞা। হোল নির্ব্বিকল্প সমাধি।

ভীড় বেড়ে গেল আরো। একদম ঠাকুরের পর ঝুঁকে পড়ল সবাই। দেখছে তারা নির্ব্বিকল্প সমাধির স্বরূপটি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোগুলো গেল নিভে। কে যেন দিল নিভিয়ে।

নরেন পড়ল ঝাঁপিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাকুরকে রক্ষা করতে। লক্ষ জনার শক্তি সংহত হোল তার দেহে মনে। ধরল রামকৃষ্ণকে জাপটে বুকে। নিয়ে এলো বাইরে। ডাকল গাড়ি। উঠল দুজনে। এরপরে সুরু হোল নরেনের শাসন।

"কেন আপনি এসেছিলেন এখানে?"

—কেন এলাম তা জানিস না তুই? এলাম তোকে দেখতে।

"সে জন্যে এখানে আপনি আসবেন, এই ব্রাহ্ম সমাজে?"

—ওরে সমাজ কিরে? সবই এক সমাজ। এক অখণ্ড রাজ্য।

"এখানে ওরা আপনাকে সম্মান দেখাল, না অভ্যর্থনা করল?"

—সে কিরে ? অভ্যর্থনা করবে কি ? আমি কি অভ্যর্থনা পেতে এসেছি। আমি এসেছি তোকে একটি বার দেখতে। তুই এলি, এই তো আমার অভ্যর্থনা।

"ঘর অন্ধকার করে পালিয়ে গেল সকলে। আমার জন্যে আপনি কেন এ অপমান নিতে এলেন ? আপনার অপমানে আমার বুক ফেটে যায়।"

—আমার জন্যে তোর বুক ফেটে যায় ? আত্‌কে উঠলেন রামকৃষ্ণ।

কত আনন্দ। কত আবেগ। চোখ ফেটে কান্না এল রামকৃষ্ণের।

—আমার জন্যে নরেনের বুক ফেটে যায়। আমার অপমানে নরেনের কান্না আসে। কিসের অপমান ?

"অপমান ছাড়া আর কি। ওরা আপনাকে বোঝে না, বোঝবার ওদের সাধ্যও নেই—ওদের এখানে আসবার আপনার কি দরকার ! আমাকে ভালো-বাসেন বলে সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে ?"

—প্রেম তো থাকে না জ্ঞান বিচারের অপেক্ষায়। মান অপমানের উর্ধ্বে তার আসন।

"ভালোবাসেন বাসুন, কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল রাখেন না কেন ?"

ওরে, ভালোবাসা তো খেয়ালের দাসত্ব করে না। সে যে মুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র। যেখানে তার জুড়ি, সেখানে তার আনাগোনা।

শ্রীরাধা ভালোবাসত শ্রীকৃষ্ণকে। জল আনতে যেত ছল করে। যেত কালিয়া দীঘির ঘাটে। বলতো মনে মনে। ওগো, কোথায় তুমি একটিবার দেখা দাও !

এদিকে তো জটিলা, কুটিলা কট্‌মটিয়ে তাকায়। বলে কত নিন্দার কথা। কিন্তু ছাই, সে দিকে তার খেয়াল আছে কি ?

ওদের যা খুশী বলুক। রামকৃষ্ণ দেখেছেন নরেনকে। বললে নরেন—"কিন্তু ভালোবাসার পরিণাম কি ? শেষে ভরত রাজার মতন আপনার না দশা হয়। ভরত হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়ে জন্মেছিল, আপনার না শেষ পর্য্যন্ত—"

একটু ভাবনায় পড়লেন রামকৃষ্ণ। বললেন—"তুই এক একটা এমন কথা বলিস যে বিষম ভাবনা ধরে যায়।"

"আমি ঠিকই বলি।"

—তুই বললি।

ছুটে যান শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণীর দুয়ারে।

—মা, আমায় উপায় বলে দে। দে আমায় পথ দেখিয়ে। আমি যে নরেন না হ'লে থাকতে পারি না। ওকে না দেখলে আমার বুক ভেঙে যায়। আমি কাঁদি। ও, আমার কে? কেন এমন আকুল হয় ওর জন্মে প্রাণ। বল, বল মা, নরেন আমার কে?

ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ। হাসতে হ'সতে ফিরে এলেন।

"যা শালা, তোর কথা আর লই না। মা সব বলে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—"

"কি বলে দিলেন?"

"বলে দিলেন, তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই অত ভালো-বাসিস—"

হোক না ভরত রাজার দশা। কয় জনে তাকে ডাকতে পারে? তোকে ডাকতে ডাকতে যদি তোর মাঝেই মিলে যাই, সে তো কত আনন্দের। আমি নারায়ণ হয়ে যাব যে।

অভিভূত হোল নরেন। তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে রইল জাহ্নবীর দিকে ব্রহ্মপুত্র।

ওগো, এ তোমার কি খেলা? বুঝতে দাও। অবগাহন করতে দাও তোমার প্রেম-তরঙ্গে। আনন্দ-ঘন শীতল নির্ঝরে ধুয়ে মুছে যাক আমার মনের মালিন্য। হোক আমাদের প্রভাস যাত্রা সুরু।

নরেনের নেমন্তন্ন। এসেছে ভবনাথ চাটুজ্জের বাড়ী।

শেষ হয়ে গেছে পরীক্ষা। বি. এ. পরীক্ষা। এখন আর কে পায়!

বেশ জমকালো আড্ডা।

সকালে এ বন্ধুর বাড়ী। বিকেলে ভবনাথের বাড়ী। বেশ কাটছে দিন। মনের আনন্দে, ক্লান্তির অবসানে নরেন এখন ভারমুক্ত উড়ন্ত বিহগ।

সঙ্গে জুটেছে আবার সাতকড়ি আর দাশরথি সান্যাল।

কখন এসেছে বরাহনগরে। যাবার নামটি নেই।

বেশ কাটছে দিন। গান, বাজনা আর আড্ডা।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল।

শুয়েছে সবাই।

এখন রাত কত?

আন্দাজ দুটো।

সারাদিনের শ্রম, তার ওপর একটু অপরিমিত আহারে ঘুমটুকু বেশ পাকা হয়েছে। গভীর ঘুমে ওরা নিমগ্ন। নিমগ্ন ভবনাথ চাটুজ্জে, সাতকড়ি লাহিড়ি, দাশরথি সান্যাল আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত। নিঝুম নিশিঘন রাত গভীরে সুখনিদ্রায় নিদ্রিত চার বন্ধু।

বাইরে সজাগ নিশাচর। শৃগালের নিশীথ চীৎকার। প্রহরীর সতর্ক হাঁক। আর সজাগ রয়েছে শিমলের দত্ত ঘরের সবাই।

কেন?

বিশ্বনাথ দত্ত আর বেঁচে নেই। শেষ হয়ে গেছে তাঁর জীবনের খেলা। নেমে এসেছে সান্দ্র স্তব্ধতা। হার্টফেল করেছে বিশ্বনাথ।

শিমলের আকাশে, বাতাসে, আঁধারে, আলোতে কেবল কান্নার রোল। বেহাগ রাগ। সকরুণ আর্তি।

শেষ ঘুমে ঘুমন্ত বিশ্বনাথ। অনন্তের অঙ্কে সুখনিদ্রায় শায়িত।

খবর গেল—

খবর গেল বরাহনগরে ভবনাথ চাটুজ্জের বাড়ীতে। নরেনের কাছে।

—বাবা আর নেই। হার্টফেল করল এই মাত্র।

লাফিয়ে উঠল নরেন। সম্ভ নিদ্রার বৃন্ত থেকে উৎকলিত হোল একটি চেতনার কুসুম। মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল সুখশয্যার আরাম আমেজ। সমস্ত শিরায় শিরায় হিম প্রবাহ। মুখখানা গেছে ম্লান হয়ে। বিষাদের সমুদ্রটা উঠল গর্জ্জন করে।

নরেন নীরব। স্তব্ধ। ধীর। শান্ত।

নেই বাক্‌শক্তি। মুহূর্ত্তে সব আশার প্রদীপগুলো গেল নিভে। স্পন্দিত হয়ে উঠল অন্তরে শুধু একটি বিষাদ করুণ আর্ত্তি—বাবা নেই! বাবা নেই!

মৃত্যু প্রতীক্ষা করে না। অবসর দেয় না। কেবল তার মর্জ্জি মতলব। সময় হোলেই হোল। আর অপেক্ষা নেই—। নেই বিন্দু বিরতি। মানুষের অশ্রু যেন তার আনন্দের সরোবর।

নির্ম্মম আঘাতে নরেনের নয়নে এলো না জল।

পাষাণ হৃদয়। ভাবল নরেন—আর বসে থেকে কি হবে! উঠে দাঁড়াল।

বলল ভবনাথ—"দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।"

বিপদের দিনে ভবনাথ এসে দাঁড়াল সার্থক বন্ধুর মতো। ভবনাথ নরেন বৈ জানে না কিছু। সুখে, দুঃখে, হাসিতে, কান্নায় ভবনাথ নরেনের নির্ব্বিশঙ্ক সাথী।

বললেন একদিন রামকৃষ্ণ,—"জন্ম-জন্মান্তে তুই নরেনের জীবন-সঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।"

চলল ভবনাথ, চলল নরেনের হাত ধরে দুঃখের শিয়রে, শোকের সমুদ্র সৈকতে।

ক্রন্দসী জননী। আঁচল লুটায় তার ধূলিতে। সীমন্তিনীর সিঁথির পারে সন্ধ্যার অন্ধকার। নয়নের তারা তটে বিষাদের ঘনচ্ছায়া। আর মরণের কালো দ্বারে সকরুণ আবেদন। —ওগো এ কী করলে!

কিন্তু নেই কোন সাড়া।

"রাত্রিদিন ধুক ধুক
তরঙ্গিত দুঃখসুখ
থামিয়াছে বুকে।"

কাঁদছে ভাইবোনেরা। কাঁদছে মৃত পিতার দেহটি ঘিরে ঘিরে। এ যেন আষাঢ়ের আকাশে ঘন বারি বরিষণ। যেন মরণের দ্বারদেশে জীবনের আবেদন। আহা, কাচা কাচা কচিমুখে বেদনার কি বিলাপ!

নরেন দাঁড়িয়ে।

দাঁড়িয়ে আছে ধীর স্থির, স্থাণুর মত তাকিয়ে।

যেন বোশেখের আকাশে একখানা ঝড়ো মেঘ।

কত কথা। কত গান। কত আশা। কত স্বপ্ন তার বুকে। সব এক এক করে মিলিয়ে গেল—

মিলিয়ে গেল অশান্তির অন্ধকারে। নেমে এলো জীবনে শীতরাত্রির উলঙ্গ প্রহরগুলো।

হাল-ভাঙ্গা পাল-ছেড়া তরীর মতো নরেন উদ্‌ভ্রান্ত। অশান্ত। বিমূঢ়। চোখ ফেটে কান্না এলো।

একটা আর্ত্ত চীৎকার করে উঠল—বাবা নেই!

কে টানবে সংসারের বোঝাই তরী! সৌভাগ্যের বেদীমূলে দুর্দ্দিনের অন্ধকার প্রহর গুলো এসে আছড়ে পড়ল। দুঃখ দৈন্যের পলগুলো উঠল সজীব হয়ে। উঠল অভাব অনটনের ছোঁয়া পেয়ে। ছোট ছোট ভাইবোন। আর অভাগিনী জননী। সে তো কম নয়। পাঁচ সাতটি অন্নরিক্ত মুখ। হাঁ করে তাকিয়ে আছে নরেনের দিকে।

এটর্ণী বিশ্বনাথ তো রেখে যায়নি এক আধলাও। উপরন্তু রয়েছে কিছু দেনা। আয়ের দিগন্তে ফসল-রিক্ত মাঠ। কিন্তু ব্যয়ের সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ। স্রোতের উচ্ছ্বাস।

কে করবে নরেনকে সাহায্য?

কেউ এসে দাঁড়াল না। যারা ছিল বিশ্বনাথের একান্ত অনুরাগী, তারা সরে গেল দূরে। আত্মীয় স্বজন দুর্দ্দিনের আভাস পেয়ে করল আত্মগোপন। বিশ্বনাথের ভাত, জল, পান তামাকে যারা মানুষ হয়েছিল, তারা ভুলেও একবার দেখে যায় না নরেনের অবস্থা দূর থেকে।

বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথের আজ সম্বল শুধু—নগ্ন পদ, ছিন্ন বসন, অভাবের হাহাকার, আর চোখের সম্মুখে দিগন্ত-বিসারী মরু সাহারা।

"আর কেউ নেই?"

কে? কে এমন প্রশ্ন করলে?

আঁতকে উঠল নরেন। তাকাল এদিক ওদিক। না, কেউ নেই তো!

আবার হাঁটল পথে।

সেই প্রশ্ন। সেই জিজ্ঞাসা শুনল যেন আবার নরেন—"আর কেউ নেই?" আবার থমকে দাঁড়ায়।

আছো? তুমি কি আছো হে প্রভু? যদি থেকে থাকো, তবে এত কান্না কেন? এত দুঃখ দীর্ণ ঊষর মরুপথে জীবনের ভাঙ্গা রথ কেন? কেন এমন রুক্ষ রিক্ত মধ্যাহ্নের তপ্ত শুষ্ক নিশ্বাস?

তুমি আছো তো ভালো। কিন্তু এমন নিষেধ হয়ে কেন? সর্ব্বত্র প্রত্যাখ্যান। সর্ব্বত্র হতাশা। আর তো চলছে না রথ। প্রিয়জন দূরে গেছে। আফিসে আফিসে নিষেধের নির্দ্দয় প্রত্যাখ্যান—না চাকুরী নেই। অন্যত্র দেখুন। মা, ভাইবোনদের মুখে অন্ন নেই। নেই বস্ত্র। কেবল কান্না আর কাকুতি। তবে কি তুমি দুঃখের শিয়রে ভালোবাসো সুখের হাসি হাসতে? ভালোবাসো কি ঝড়ের বুকে তরী ভাসিয়ে দিয়ে অসহায় মানুষদেয় আর্ত্ত করুণ হাহাকার শুনতে? ওগো, আঘাত হেনে মহৎ করবে বলে, এত ব্যথা কি সয় গো। উন্মোচন কর নৈরাশ্যের অবগুণ্ঠন। সন্ধান দাও ছায়াঘন বীথি পথের।

সহসা নরেনের মন আবার অভিমানী হ'য়ে উঠল।

দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হলেও আর সে করুণ কান্না কাঁদবে না। চাইবে না করুণা। মাগবে না ভিক্ষা কারো কাছে। দহন জ্বলে, জ্বলুক। বীরের মত সহ্য করবে নরেন তার জ্বালা।

হানো হানো তোমার রুদ্র শেল। জ্বালাও দহন দীপ্ত বহ্নি। ঢালো দুঃখের পাত্র পূর্ণ করে ব্যথার অশ্রু। শুধু শক্তি দাও সইবার। বল দাও বইবার। পারি যেন সইতে তোমার দেয়া আঘাত। পারি যেন বইতে তোমার দেয়া প্রত্যাখ্যান।

এমনি সময় কে যেন বলল—"বাবু, আসুন।" চমকে উঠল নরেন। ফিরে তাকালো। দেখল সেই পুরোনো বন্ধু—সেই বাবার আমলের গাড়োয়ান। যাচ্ছে গাড়ি চালিয়ে। দাঁড়াল নরেন।

বলল আবার গাড়োয়ান,—"কোথায় যাবেন?"

দ্বিধাহীন প্রত্যুক্তি,—"পয়সা নেই। যাব না।"

"তাতে কি! আসুন! আমি নিয়ে যাব।"

সায় দিল না নরেনের মন। শ্রমের দাম না পেলে কেমন করে চলবে তোমার?

—না, না, তুমি যাও। আমি হাঁটব রিক্তহাতে। নগ্ন পদে। দগ্ধ পথে।

কশাল চাবুক ঘোড়ার পিঠে গাড়োয়ান।

একটা বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল।

নরেনের মনের ক্রান্তিবৃত্তে এসে আছড়ে পড়ল বিস্মৃতির সমুদ্রটা। চেতনার অন্তরাল থেকে উঁকি দিল অতীতের আশা-দীপ্ত ভাষাগুলো। যেন জ্বলছে। জ্বলছে আগুন আখরের মত নরেনের চিত্তপটে।

"কোচোয়ান হব।"

মারবো চাবুক জড় যুগের বুকে। মারবো জাগরণের চাবুক। ছিঁড়ে আনব তামসিকতার অন্ধকার থেকে প্রদীপ্ত সূর্য্যকে।

সব কথাগুলো সজাগ হয়ে উঠল নরেনের স্মরণে।

ওরে মন, তবে কি তুই একটা রঙ্গিন ফানুস? আশা বুঝি স্বপ্ন। আদর্শ বুঝি বিলাস। আর আগ্রহ বুঝি তারই একটা উন্মত্ত প্রকাশ?

১৭

ক্ষুধা-ক্লিষ্ট মুখ। অন্ন-রিক্ত প্রাণ। শুকিয়ে গেছে দেহ। পড়েছে মুখে কালির আলিম্পন। চতুর্দ্দিকে নিরাশার সাহারা। হতাশার ব্যর্থ নিঃশ্বাস। নিঃসত্ত্ব প্রাণ। কেমন করে আর বাঁচা যাবে? কোন্ পথে চললে দু-মুঠো অন্নের হবে সংস্থান?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে নরেনের চোখে ঘনিয়ে আসে ঘোর। দেখে যেন আঁধারের প্রারব্ধ যৌবন। দেখে কষ্টের ভ্রূ-ভঙ্গি। ত্রাসের বিকট রূপ।

স্নান করতে গেল নরেন। তবুও একটু শান্তি। ভালো করে স্নান করল নরেন। এলো ঘরে। পরল সেই ছিন্ন বসন। গায় দিল ছেঁড়া জামাটি। নগ্ন পা। চোখে মুখে সমুৎকণ্ঠা। পেট জ্বলে যাচ্ছে ক্ষুধায়। চাইতে পারল না মার কাছে ভাত। ভাবল নরেন, ভাবল—যদি ও খেতে বসে, তবে থাকতে হবে মাকে আজও উপোস করে। মনে করল, বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে। থাকবে বসে মুক্ত দিগন্তে। ডাকবে প্রাণের মানুষটিকে।

এগিয়ে এলো দরজার কাছে নরেন। মা আটকে দাঁড়াল পথ। বললে—"একি, স্নান করে উঠেই চললি কোথায়?"

নরেন বলল—"নেমন্তন্ন আছে।"

—কোথায়?

"বন্ধুর বাড়ীতে।"

ভুবনেশ্বরীর মন ভরে যায় আনন্দে। নিঃশ্বাস ফেলে স্বস্তির।

ভাবে মনে মনে, ভাবে ভুবনেশ্বরী—এ যে ঈশ্বরেরই আশীর্ব্বাদ। তা না হ'লে এমন বিপদের দিনে বন্ধু বা নেমন্তন্ন করবে কেন? ছেড়ে দিল পথ। ঘর থেকে নেমে এলো নরেন।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছে?

আর যাবে কোথায়! রৌদ্র-দগ্ধ পথ ধ'রে হাঁটছে, হাঁটছে নরেন নগ্ন পায়, সন্তর্পণে। এঁটে যাচ্ছে পায়ের নীচে গলা পিচ। অসহ্য লাগে। তবুও নরেন হাঁটছে। হাঁটছে গড়ের মাঠের দিকে।

অবসন্ন দেহ। ঝরছে ঘাম। চোখ দুটো ডুবে গেছে কোটরে। কাঁপছে সমস্ত শরীর। ক্ষুধায় ম্লান হয়ে গেছে মুখ। বসে পড়ল নরেন। বসে পড়ল একখণ্ড ঘাসের গালিচায়। এলিয়ে দিল দেহ। নেমে এলো চোখ ফেটে

ন্না। এ যেন মনের আকাশ থেকে আষাঢ়ের বাদল ঝরছে, ঝরছে অঝোরে। ঘনিয়ে এলো ঘোর। চোখে নামে তন্দ্রা। একটু আনমনা হয়ে পড়ল নরেন।

কে যেন ডাকল। হক্‌চকিয়ে উঠল নরেন। তাকাল ফিরে।

—ও! আয়।

নরেনের এক বন্ধু। এসেছে নরেনকে একাকী ব'সে থাকতে দেখে। বসল নরেনের পাশে। শুরু ক'রে দিলে যত সব উপদেশ। সে কত ভাব। কত ভক্তি যেন বন্ধুর অন্তরে।

ঈশ্বরের নাম বলতে বলতে চোখ যায় বুজে। ধরল একটি গান। সহ্য হোল না নরেনের। সহ্য হোল না বন্ধুর ধূর্ত্তামি।

ঝাঁজিয়ে উঠল, "নে নে, রাখ তোর ব্রহ্ম নিঃশ্বাস।"

সংসারে যার প্রচুর আছে, তারা বিলাস ক'রে শরণ লয় ঈশ্বরের। মিথ্যা আবরণ দিয়ে জনতার চোখে ধূলি দিয়ে চলে। নিজের হীনতাকে ঢেকে রাখে সযত্নে। আবার সভায় দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করে দুঃখীর জয় গান। মন্দিরে ঢুকে শুরু করে কান্না। কিন্তু এক মুঠো আহারের জন্যে হয়ত শত শত প্রাণ অসহায় আবেদন রেখে মরে যায় নীরবে, মরে যায় তাদেরই দুয়ারে মাথা কুটে। বাইরের আঙ্গিনায়।

বন্ধুর গান থেমে গেল। রুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠ। অপলক আঁখি পাতে প্রত্যক্ষ করল নরেনকে। শুনতে লাগল তার অভিমানের বিলাপ—"যারা খেয়ে পরে সুখে আছে, তাদেরই ভালো লাগে ব্রহ্ম নিঃশ্বাস। ইজিচেয়ারে শুয়ে টানা পাখার হাওয়া খাচ্ছে আর ভাবছে, ব্রহ্ম নিঃশ্বাস খাচ্ছি। আর ক্ষুধার তাড়নায় যার মা-ভাইয়েরা কষ্ট পাচ্ছে, দোরে দোরে ঘুরে একটা চাকরি জোটাতে যে পাচ্ছে না, তার কাছে আর ব্রহ্ম নিঃশ্বাস নেই, বজ্র নিঃশ্বাস।"

ধর্ম্ম হয় না আত্মাকে প্রতারণা করে। সুখের পালঙ্কে শুয়ে বিলাসের মোহ মুগ্ধ মন স্পর্শ পায় না তাঁর।

এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

এসেছেন কলকাতায় ঈশান মুখুজ্জের বাড়ীতে।

খবর দিল এসে নরেনকে—

খবর দিল মাষ্টার মশাই,—যেতে বলেছেন ঠাকুর।

নরেনের মন সজাগ হয়ে ওঠে। ভাবে, কি হবে গিয়ে সেখানে। পারবেন কি ঠাকুর আমার দৈন্যের বোঝাটা নামিয়ে দিতে? পারবেন মা ভাই-বোনদের ক্ষুধা-ক্লিন্ন মুখে দু-মুঠা অন্ন তুলে দিতে?

তবুও নরেন গেল—

গেল রামকৃষ্ণের সমীপে।

নরেন বসে। এলেন ঠাকুর এগিয়ে। দেখতে লাগলেন ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখতে লাগলেন রামকৃষ্ণ, নরেনের শীর্ণ শুষ্ক দেহখানা।—ইস্! ব্যথায়, ক্ষুধায় বিমর্ষ মুখ! আহা, নরেনের কষ্ট। ভাত পায় না নরেনের মা, ভাই, বোনেরা।

কি কথা বলবেন। চুপ করে রইলেন কিছুটা সময়। বললেন তার পরে,—"ওরে, ঈশানকে তোর কথা বলেছি।......একটা কিছু জোগার হয়ে যাবে হয়তো।"

নরেন ভাবল,—আশ্বাস দিল কত লোক। দিল কত উপদেশ। কিন্তু সমাধান তো হোল না এখনো। ভোর হোল না রাত্রি। একটু হাসল নরেন।

চলে গেলেন ঠাকুর ওপরে।

নরেন যেন শুনল—

শুনল, কে যেন বললেন,—"তুমি আগে অত গাইতে, এখন তত গাও না কেন?"

চমকে উঠল নরেন। ভাব-বিহ্বল হয়ে গেল অন্তর। ধরল একটা গান। গান ধরল নরেন তার অন্তর-বীণায় ঝঙ্কার দিয়ে।

বুঝি শুনতে চেয়েছিলেন ঠাকুর নরেনের কণ্ঠ-সঙ্গীত। তাই বুঝি দুঃখ-মুখর অন্তরে দিলেন নীরব একটি ইঙ্গিত। শুনতে লাগলেন গান—

গান শুনতে লাগলেন রামকৃষ্ণ মহাতৃপ্তি ভরে।

নরেনের মন মুহূর্তে গেল ভরে।

ভরে গেল আনন্দের অমিয় লহরে।

ওগো, তুমি তো শুধু সুখ-সমৃদ্ধিরই মহাজন নও। নও তো আরাম ঐশ্বর্য্যের সুখ-সম্ভার। তুমি আছো, আছো, যেমন ধনে, মানে, যশে—তেমনি বিষাদের বালুমরু তীরে, আর ব্যর্থ আশার সুখহীন দুঃখ-নিকেতনেও। আছো জীবনের প্রদোষ লগ্নে, কাজল প্রহরে। এসো, এসো তুমি দুঃখের বেশে আমার অন্তরে।

দুঃখ আমার হোক চির সাথী—
আসুক আঁধার দুখভরা রাতি,
হাসি মুখে নেব তোমার দানের হার—
দুখ যামিনীর বুকে হোক মোর জীবনের সঞ্চার।

এসো, এসো তুমি বিষাদ-ঘন মুরতি ধরে।

ভয় পাব না কো।

তুমি যদি আসতে পারলে অমাবস্যার নিশীথ রাত্রির মত—তবে আমার ভয় পাবার কি আছে গো ?

তুমি যদি দুঃখের শিয়রে সুখের হাসি হেসে শান্তি পাও—তবে আমি কেন কাঁদব ?

দুখের শিয়রে সুখের হাসিটি
ফোটে যদি তব মুখে—
আমি কেন তবে কাঁদিব হে নাথ
রহিব আমিও সুখে।
তোমার রাজ্যে তব দেয়া কাজে
পাঠালে আমায় সাজিয়ে যে সাজে
তাহাতেই মোর মিটেছে তৃষ্ণা প্রভু,
মিনতি আমার শুধু অনিবার দূরে যেও না কো কভু।

* * * *

ঘুম থেকে সজাগ হয়ে নরেন বলে—বলে ঈশ্বরের নাম।

মুখ করে ওঠে ভুবনেশ্বরী,—"চুপ কর। ছেলেবেলা থেকে কত ভগবান ভগবান করলি, ভগবান তো সব করলেন।"

তোর 'পর তাঁর দয়ার কী আর সীমা আছে ? তাই তো এক গ্রাস ভাত জোটে না।

কথাগুলি বিঁধে গেল ছুরির ফলার মত—

বিঁধে গেল নরেনের বুকে। চঞ্চল হয়ে উঠল মন। অভিমানে, দুঃখে নীরব হ'লো নরেন। ভাবতে লাগল মনে মনে—তবে কী ঈশ্বর শুনতে পায় না দুঃখীর ক্রন্দন! শুনতে পায় না কী আর্ত্তের হাহাকার! তবে তিনি কেমন করে করুণাময় ?

হে ঈশ্বর, তুমি যদি দয়ার সিন্ধু, তবে কেন এত ব্যথা, এত হাহাকার দিয়ে রেখেছ ঢেকে ? আমি তোমাকে নির্দ্দয় বৈ কি বলব, বলো ? এত কান্নায়ও যে সাড়া দেয় না, বিগলিত হয় না যার অন্তর, সে নিষ্ঠুর দেবতা নয় তো কি !

ছুটে গেল নরেন, ছুটে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। দাঁড়াল মুখোমুখি। বলল,—"বলুন ঈশ্বর কিসে দয়াময় ?"

চোখ তুলে তাকালেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কি আভাসিত হোল সে দৃষ্টিতে ?

আভাসিত হোল নরনের হৃদয় দেউল।

আর ?

শুদ্ধ পরাৎপর আনন্দঘন তনু।

একটু হাসলেন রামকৃষ্ণ।

ওরে, সে কি কথা গো। জানিস না বুঝি, রাত্রির শেষ যামে আলোর আবির্ভাব। সুখ তো সন্ধ্যার সন্ধান। দুঃখের সহচারী। প্রথমে দুঃখকে জয় কর, সুখ আসবে স্বেচ্ছায়। দুঃখ ভোগ করলে তো দুঃখীর দরদী আসবে !

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হোলে লোককে কি করতে হয় ? এক পা, দু' পা করে করে সিঁড়ি ভাঙ্গা। তার পরে চূড়ারোহণ। মানে তীর্থপতির দর্শন, স্পর্শন। তেমনি আঁধার রাত্রির অবসানে প্রভাতেয় অরুণোদয়। ঈশ্বর নেই কিরে ? তাঁর কাছে যেতে হোলে ঝাঁপ দিতে হবে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে। পার হোতে হবে দুঃখের রাত্রি। ব্যথার দহনে করতে হবে আত্মশুদ্ধি। তারপরে মহাবুদ্ধি, মহাজ্ঞানের সুধা-সমুদ্র। ঈশ্বরের দিঠি।

তা হোক। নরেন নোয়াবে না মাথা। আত্মসমর্পণ নয়, চায় সে আত্মদর্শন। দুর্ব্বল মনে ভাগ্যের পায় মাথা কুটে কি হবে ? মাথা উঁচু করে আত্মপ্রত্যয়। আত্মানুসন্ধান। ভাবমার্গে আরূঢ় হোল নরেন্দ্রনাথ।

ঠিক এমনি সময় বের হোল ভুবনেশ্বরী—

বের হোল তাম্রপাত্র হাতে করে পুজার ঘর থেকে। সামনে প'ড়ে গেল নরেন। আড়ষ্ট হোল ভুবনেশ্বরী। পেল লজ্জা।

কেন ?

মনে পড়ল সেদিনকার কথা। বলছিল না নরেনকে ?—"চুপ কর। ছেলেবেলা থেকে কত ভগবান ভগবান করলি, ভগবান তো সব করলেন।"

একটু থমকে দাঁড়াল। বলল তারপরে,—"আমাকে একখানা চেলি বা গরদ কিনে দিতে পারিস? আর তো এটা পরা যায় না।"

মার পানে চোখ তুলে তাকাল নরেন। অবাক হোল। ভাবল,—কেবল মুখেই বীতস্পৃহা। অন্তরে যে অন্তরের অভিসার। কিন্তু নরেন চেলি দেবে কেমন করে? টাকা কোথায় পাবে? মোটা ভাত মোটা কাপড় জোটে না, তার 'পর আবার চেলি! বড় আঘাত পেল নরেন। মার পুজার কাপড় নেই!

—দিন গেল। এলো রাত। অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু না, কিছুতেই পারল না একখানা চেলির ব্যবস্থা করতে। জীবনে এর চেয়ে আর দুঃখের কী আছে। বুড়ো মা, দুদিন পরে আসবে তার পরপারের ডাক। পারল না নরেন মায়ের সামান্য একটি চাহিদা মেটাতে। সামর্থ্যহীন নরেন মরতে লাগল মরমে। মন গেল ভেঙ্গে। ভালো লাগে না আর সংসার। যাত্রা করল, যাত্রা করল দক্ষিণেশ্বরে।

"ওরে তুই এসেছিস? শোন, কাছে আয়।" দাঁড়িয়ে নরেন। দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণের সম্মুখে।

—আয়, কাছে আয়। "নে এই মিছরির থালা আর গরদখানা নিয়ে যা—"

—কি হবে?

"গরদখানা তোর মাকে নিয়ে দেগে।"

—কেন?

"তার আহ্নিক করার চেলি ছিড়ে গেছে। সে এ গরদ পরে আহ্নিক করবে।"

কেমন করে একথা ভেসে এলো দক্ষিণেশ্বরে?

কে বললে? কে এসে দিলে এ সংবাদ?

ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে গেল নরেন।

ওগো, তবে কি তুমি মরমী? রাখ বুঝি মানুষের মরমের কান্নার, কাকুতির সংবাদ।

কেবল আত্মাটিকে আত্মীয় জানলেই হোল। মুখে যা খুশি বল গে। কি হবে মুখের কথা শুনে? আত্মাটিকে নিয়েছেন চিনে। চিনে নিয়েছেন ঠাকুর। মনের খবর রাখবে না তো কি!

আবার বললেন রামকৃষ্ণ—

বললেন নরেনকে,—"তোমার নিজের জন্যে বলছি না, তোমার মার জন্যে।"

হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নরেনের মন। আত্মসম্মানে লাগল কঠিন আঘাত। দাঁড়িয়ে মরব। তবু মাথা হেঁট করে আত্মবিক্রি নয়। শুষ্ক পত্রের মত হব ধূলিতে ধূসরিত, তবু হাত পেতে ভিক্ষা মাগব না! উলঙ্গ হয়ে রইব গৃহকোণে, কিন্তু দানের দক্ষিণায় উপকৃত হতে চাই না।

"মার জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষা করতে যাব কেন?"

"ভিক্ষা?"

"তা ছাড়া আর কি—"

একটু হাসলেন রামকৃষ্ণ।

এক পা অভাবের বিশুষ্ক মরুবুকে। আর এক পা প্রয়োজনের খরস্রোতে। তবুও নরেন হবে না কৃপাপ্রার্থী। কিছুতে নেবে না রামকৃষ্ণের দেয়া গরদ।

—না, না, গরদ আমি নেব না।

--সে কি? আবার হাসলেন রামকৃষ্ণ।

ওরে, সাধে কী আর তুই নরেন্দ্র? ...."আমরা হলুম নর, আর তুই যে নরের ইন্দ্র।"

—নরের রাজা বলে, নরের দেয়া ভিখ্ নিবিনে বুঝি?

রামকৃষ্ণের দান করল প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যান করল নরেন হেলায়।

হয়ত কত আনন্দ পেত ভুবনেশ্বরী। দুঃখের শিয়রে দাঁড়িয়েও একটু তৃপ্তির হাসি হাসত। আনন্দে আপ্লুত হয়ে যেত দেহ মন।

তা হোক। ভিক্ষায় কি আর পেট ভরবে? হবে কি দানে দারিদ্র্য দূর? চলে এলো নরেন। চলে এলো বাড়ীতে।

রামকৃষ্ণ ডাকলেন রামলালকে।

এলো রামলাল।

বললেন রামকৃষ্ণ,—"কাল সকাল করে খেয়ে চলে যাবি কলকাতায়।"

রামলাল বলল,—কোথায় যাব আবার?

"সেই শিমলের নরেনের বাড়ীতে।"

—কেন?

"বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝবি নরেন নেই ঘরে, সটান তখন চলে যাবি তার মার কাছে। ঠিক তার হাতে এই গরদখানা আর

মিছ্‌রির থালা দিয়ে আসবি। বুঝলি? বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। কি পারবি তো।"

—নিশ্চয়। সম্মতি জানাল রামলাল।

আবার বলতে লাগলেন রামকৃষ্ণ—"দেখিস বাইরে থেকে যেন ডাকাডাকি করবি নে। চোরের মত যাবি। ধীরে ধীরে মন্থর পায়। সাবধান, বাড়ীর কর্ত্তা টের পেলে কিন্তু হাঁকিয়ে দেবে। আর পারবিনে ঢুকতে বাড়ীতে। দেখিস অন্যের হাতে গিয়ে যেন না পড়ে। নরেন টের পেলে কিন্তু দরজা বন্ধ করে দেবে।"

একহাতে পট্টবাস, আর একহাতে সুধা পাত্র। হাঁটল রামলাল, হাঁটল কলকাতার পথে। চাদরের নীচে করে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে রামলাল সন্তর্পণে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রামলাল—তাকিয়ে আছে গৌরমোহন ষ্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়ীখানার দিকে।

দূরে দাঁড়িয়ে রামলাল—

দাঁড়িয়ে আছে একটি গ্যাসপোষ্টের কাছে। ভাবছে মনে মনে—তবে কী নরেন আজ বাড়ী থেকে বের হবে না? কত সময় তো রইলেম দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখনো নরেন গেল না!

হঠাৎ আঁত্‌কে উঠল রামলাল। ঐ—ঐ যায় নরেন! সেই নগ্ন পা। জীর্ণ বসন। ছিন্ন জামা।......স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রাম। ঢুকল গিয়ে ঘরে। চলে গেল ভুবনেশ্বরীর কাছে।

—নমস্কার মা।

—সুখে থাকো বাবা! কি খবর?

"আপনাকে এই মিছ্‌রির থালা আর গরদের কাপড় পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর।"

ভুবনেশ্বরীর চোখে এলো জল। হাত পেতে নিল দয়াময়ের দয়ার দান। আবেগে, অনুরাগে নীরব ভুবনেশ্বরী। কেবল শুধু বললে—বললে ভুবনেশ্বরী, —"তবে কি তুমি অন্তর্য্যামী! তা না হলে এখানে কি কথা হোল বিলের সঙ্গে, তাই দক্ষিণেশ্বরে অমনি টেলিগ্রাম হয়ে গেল?"

ওগো অন্তর নিবাসী, মৌনের মুখরতা, থেকো তুমি আমার সুখে, দুঃখে, অভাবে, অনটনে। যেমন বিরামহীন তরঙ্গে উদ্বেল হয় উদধি, ঠিক তেমনি

তোমার পায়ের শব্দ যেন শুনি আমার হৃদয়ে নিরন্তর। অন্তর আমার লেগে থাকে যেন তোমার নাম-সুধায়।

নরেন এসে দেখল—

দেখল মা বসে আছে পট্টবাস পরে।

এ কি করুণাঘন কারুণ্য! যেখানে প্রত্যাখ্যান, সেখানেই তোমার বিজয় নিশান। যেখানে অবজ্ঞা সেখানেই দেখি তোমার আলো, প্রজ্ঞা। কে তুমি, কে তুমি সুররাজ, সব সুর দিয়ে বেঁধে রেখেছো মনের বীণা। যে তন্ত্রীটিতে আঘাত লাগে, যে সুরে গান বাজে, অমনি তুমি ওঠো নৃত্য করে। ঝরে চোখে জল। ওগো, আর রেখো না অন্তরায়। এবারে নেমে এসো তুমি আমার হৃদয় দেউলে।

বারে বারে বাজতে লাগল সেই ছন্দ-মধুর কথাটি—বাজতে লাগল নরেনেব মনে—"তোর জন্যে বলছি না। তোর মার জন্যে।"

ওগো, কি সাধ্য আমার, তোমার দানের ভার বইতে পারি। কোথায় পাত্র আমার তোমার দেয়া ধন রাখতে পারি! শক্তি দাও। দাও, দাও আমায় তুমি তোমার পতাকা বইতে। দাও তোমার নিরুপাখ্য সুখস্পর্শ।

দেহকে বঞ্চিত করে নেই আত্মার তৃপ্তি। কি বসে আছিস চুপটি করে ঘরের কোণে? দারিদ্র্য-দুঃখে ম্লান হয়ে থাকলে কি হবে রে? চল, আমাদের সঙ্গে চল। মুহূর্তে কেটে যাবে তোর মনের মালিন্য। ফুটবে মুখে আনন্দের হাসি। এক চুমুকেই বিশ্বানন্দ।

বন্ধুদের পাল্লায় পড়েছে নরেন। বরাহনগরের বন্ধু। করছে তারা নরেনকে প্রলুব্ধ। প্রলুব্ধ করছে নেশা করে মাতাল হবার জন্যে।

—না ভাই! আমি যাব না। তোরা যাগে।

—সে কি! তুই না গেলে যে জম্‌বে না। তুই গাবি গান। আনবি সবার মনে আনন্দের বন্যা। ভাব না হলে যে ভাবানন্দ ভোগ করা যাবে না রে। কি বলছিস? চল, উঠে পড়।

—শুধু গান গাইতে হবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু গান গাবি তুই।

—বুঝে দেখ ভাই! শেষে যেন......

—পাগল নাকি রে?

চলল নরেন। চলল ভোগ-সমুদ্রের পারে ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করতে। চলল আনতে কামিনীর কামনায় প্রেমের প্লাবন। সেই কামশূন্য প্রেম। কৃষ্ণ-ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।

কিন্তু একি! অবাক হয়ে গেল নরেন। অবাক হয়ে গেল একটি অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী দেখে। দাঁড়িয়ে নরেনের সম্মুখে। নয়নে মায়ামদির। অধরে রক্তের আলিম্পন। দেহে ঐশ্বর্য্যের বিকৃত প্রকাশ। আর যৌবন-সমুদ্রে উচ্ছল তরঙ্গ। বসেছিল নরেন! বসেছিল একাকী।

পাঠিয়ে দিল বন্ধুরা। পাঠিয়ে দিল সুন্দরীকে নরেনের ত্যাগী মনে ভোগের সামগ্রী তুলে ধরতে। ভেঙ্গে ফেলতে তার সংযমের দৃঢ় বাঁধ!

নরেন তো দেখে অবাক! বুঝল সে, বুঝল—এ খেলা তো বন্ধুদের নয়। এযে মহামায়ার ছলাকলা। কি হবে তাতে। নরেন দৃঢ়। তার মনে অবিরত সেই আদিভূতার নাম গান। কিন্তু নারী তো বুঝল না তা। দেখল না নরেনের নরোত্তম রূপ। ছড়িয়ে দিল তার দেহের শোভন লোভন ঐশ্বর্য্য। ইঙ্গিতে জানাল আমন্ত্রণ।

নরেন স্থির। ধীর। শান্ত ও সমাহিত।

কি লোভে লাভ করবে বারবধূ—

লাভ করবে নরের রাজা নারায়ণকে ?

জিজ্ঞেস করল নরেন,—"তোমার নাম কি ?"

· বাক্‌হীন ব্যঞ্জনা। ভাষাহীন চাঞ্চল্য। কথা বলল না নারী।

জিজ্ঞেস করল নরেন—

জিজ্ঞেস করল আবার,—"তোমার বাবার নাম কি ? বাড়ী কোথায় ?" নীরব রাত্রির মত সান্দ্র স্তব্ধ নারী। ঐশ্বর্য্যের অহংকারে মদমত্ত মন।

বললে আবার নরেন,—"কেন এলে এপথে ? নিজের কথা একবার ভাবো। ভবিষ্যতের কথা ? কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ? নিত্য ভিক্ষায় তনু রক্ষণই সাধনা। কিন্তু যখন আর ভিক্ষে মিলবে না ?"

স্থির হোল নয়ন নারীর। বিমোহিত প্রাণ। তাকাল চোখ তুলে। যেন মধ্যাহ্নের নভোনীলে অসহায় বিহঙ্গম। গলে যাচ্ছে তাপে, তেজে,—গলে যাচ্ছে দেহ। এলো মনে ত্যাগ। ঘৃণা হোল, হোল ঘৃণা জীবনের 'পর।

মুনির ধ্যান ভেঙেছিল নারী। ভেঙেছিল তার লাস্য-ললিত নৃত্যছন্দে। তপ ভুলে জপ করেছিল মুনি, জপ করেছিল নারীকে। দিয়েছিল শ্রীচরণে ভক্তির অর্ঘ্য। কিন্তু নরেন যে মুনির মুনি। কি জপ করবে ? কার পায় দেবে তার ভক্তির মাল্য ?

বলল আবার,—"যখন থাকবে না এই শরীর, কি সম্বল নিয়ে তুমি যাবে ওপারে ?"

বিদায় নেবে যখন যৌবন বসন্ত থেকে বাসন্তী চেতনা, তপ্তরক্তে হিমঝরা শীতলতা আসবে যখন নেমে, তখন কি দিয়ে ভোলাবে তুমি নরের চিত্ত ?

ফিরে গেল নারী। ফিরে গেল নরেনের কাছ থেকে। বলল গিয়ে বন্ধুদের কাছে—"অমন লোকের কাছে পাঠাতে আছে ?"

এমন হয়েছিল আর একবার।

দুঃখ, দৈন্যে নরেন দিশাহারা। অশান্তির ঝড় বইছে জোড়। নেই কোথাও কেউ। কেবল ধু ধু করে নিরাশার মরু সাহারা। এমনি দিনে এলো এক তরুণী। দেহে অনিন্দ্য কান্তি। উচ্ছল যৌবন। সুঠাম দেহ। চাইল নরেনকে—চাইল তার ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে নরেনকে অর্ঘ্য দিতে।

কেবল কি দেহ, রূপ আর যৌবনই? না। প্রচুর অর্থের অধীশ্বর করতে চাইল নরেনকে। দেবে নিঃশেষে সব দান করে। দূর করবে নরেনের অভাবের হাহাকার। বিনিময়ে শুধু চাইল সুন্দরী, চাইল নরেনের আতপ্ত আলিঙ্গন। পাঠাল প্রস্তাব।

—আমায় গ্রহণ কর। ধন্য কর তোমার দেহস্পর্শে।

কিন্তু নরেন করল প্রত্যাখ্যান। দিল সরিয়ে দূরে।

আসল স্বয়ং নারী। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে জানাল তার মনের আর্ত্তি। বলল মাথা কুটে নরেনের চরণে।

কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস। নরেন স্থির, ধীর। শান্ত। গম্ভীর। তার অন্তর-দেউলে চলছে—চলছে তখন শুধু ত্যাগ, তিতিক্ষার আকুল আর্ত্তি।

—ওগো, এ তোমার কেমন ছলনা! আর আমায় ভ্রান্তির অন্ধকারে করে দিও না দিশেহারা। তুমি আমার অন্তরে আস। ঘুচিয়ে দাও সকল অন্তরায়। জাগ্রত হও আমার হৃদয় দেউলে। আমি তোমাতেই তন্ময় হয়ে যাই। এগুলো হোল সাধকের জীবনের স্খলন মুহূর্ত্ত। পরীক্ষা নিরীক্ষার সমস্যা-সঙ্কুল পথ। জীবনের শুভ মুহূর্ত্তটির আবির্ভাবের পূর্ব্বে এমন অনেক মায়ার ছায়া আসে।—

আসে শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্তের জীবনে। কখনো ভোগের, কখনো রাগের-অনুরাগের, আবার কখনো বা লোভ-লালসার মোহিনীমায়া বিস্তার ক'রে সাধককে পরীক্ষা করেন নানা ভাবে।

যে সইল, সে রইল। আর যে ভুলে গেল, হোল তার পতন। নরেন রয়েই গেল। রয়ে গেল তার মন-যমুনার পুলিনে বংশীধ্বনি শোনবার জন্যে।

মায়া মোহিনী, লোভ লালসা অনিত্য। নরেন রইল অধীর আকুলতা লয়ে নিত্য শুদ্ধের খোঁজে। মরমীর আগমন প্রতীক্ষায়।

কিন্তু দিকে দিকে রটে গেল নরেনের কুৎসা। সে নাকি গেছে খারাপ হয়ে। মদ আর নারী এই নিয়ে দিন কাটছে নাকি তার।

কেউ থাকে অবাক চোখে তাকিয়ে। কেউ বা ফেলে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস। আবার হাসে কেউ মুখ গুজে মহা আনন্দে। নরেন ভ্রষ্ট। নরেনের ঘটেছে চরিত্রে দোষ।

ভবনাথ গিয়ে কেঁদে পড়ল রামকৃষ্ণের চরণে। বললে,—"নরেনের এমন হবে, একথা স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিনি।"

আগুন ধরে গেল রামকৃষ্ণের আত্মায়। অগ্নিমূর্তি হয়ে তেড়ে এলেন ভবনাথের কাছে। বললেন,—"চুপ কর শালারা, মা বললে সে কখনও অমন হতে পারে না। আর কখনও ও কথা বলবি তো তোদের মুখ দেখব না।"

অভাবে পড়েছে বলে যা খুশী বলবি তার নামে! তোরা কি জানিস তার? কত দুঃখ, কত অভাব তার সম্মুখে। চলছে নরেন তার সঙ্গে লড়াই করে। সইছে কত কষ্ট। নীরবে মুখ বুজে বরণ করছে পীড়ন। মুখে এলো আর বলে দিলি? দুর-হ। দুর-হ বলছি। ঠাকুরের চোখ সিক্ত হোল জলে।

কথাগুলো নরেন শুনল যেন কার কাছে। ভ'রে গেল তার অন্তর। ভ'রে গেল দিব্যানন্দে। এলো চোখে জল। কেঁদে কেঁদে জানাল প্রণাম। প্রণাম জানাল নরেন তার মনের মরমীকে।

ওগো, তুমি জানো, জানো আমার মনকে। তাইতো তুমি মনোময়। তুমি আছ বলে আমিও আছি। আছি তোমার চরণ-পদ্মের স্নিগ্ধ প্রভা নিরখি।

নরেনের কথা নিয়ে আর কেউ ভিড়তে পারল না রামকৃষ্ণের কাছে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল এসে বললে—বললে কিনা,—"এমন বুদ্ধিমান ছেলে আমি খুব কম দেখেছি।" কার কথা বলছ রে?

আর কার কথা বলবে, নরেনের,—"এই বয়সে এত পাণ্ডিত্য অথচ কি নম্রতা। এ সমস্ত ছেলে যদি ধর্ম্মের জন্যে এগিয়ে আসে তো দেশের অনেক কল্যাণ হবে।"

নৃত্য করেন রামকৃষ্ণ। নৃত্য করেন আনন্দে, আবেগে অধীর আকুল চিত্তে।

মহেন্দ্র বললে, অমন ছেলে আর দেখিনি। ঠিকই ধরেছে ডাক্তার। অমন একটি লাখে কটি মেলে? "ওর জন্যেই তো এবারে এখানে আসা।"

নরেন কি যে-সে? ও যে শুচিতার শুক্তিকা। ও আধার ভরা মণি, মুক্তা। রামকৃষ্ণ জীবন-সংহিতার বেদ স্তোত্র।

১৯

হালহারা মাঝি নরেন সংসার-সাগরে। ছেড়া পাল। ভাঙ্গা তরী। কেমন ক'রে পার হবে দুঃখের দরিয়া? এক একটা দিন কাটে—কাটে যুগের মন্থর বিরতি নিয়ে। আসে রাত। চুপি-চুপি নয়—আসে গর্ব্বিত শির উত্তোলন করে। প্রলয় ক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মত দুঃখের মালা জপে জপে।

শিরায় শিরায় সঙ্কোচন। পদ বিক্ষেপ শ্লথ। মনে প্রাণে দগ্ধ মরুর হাহাকার। ঝড়ের রাতের হা-হুতাশ।

তবে কি দুঃখ থেকে মুক্তি নেই?

নেই দহন থেকে শান্তি? আকুল নরেন। আর চলছে না দেহ। এর চেয়ে জীবনের উপান্ত দিনটি অনেক সুখপ্রদ। অনেক মধুময়। এ কেমন মায়া? এ কিসের মোহবাঁধন? হঠাৎ জ্বলজ্বল করে ওঠে নরেনের মন! আভাসিত হয় যেন কার প্রতিচ্ছবি। ভাব-গম্ভীর নরেন। দেখে, দিব্য কান্তি, সুন্দরের প্রতিভাসিত দীধিতি। তন্ময় নরেন। শোনে কান পেতে। কে যেন ডাকছে, ডাকছে সেই পুরানো পরিচিত কণ্ঠে—ওরে তুই আয়। তোকে বিনে যে আর থাকতে পারছিনে।

প্রাণের পরিধিতে উজ্জ্বল প্রেম, কিন্তু সঙ্কল্পে পাষাণ প্রতিজ্ঞা। কিছুতে যাবে না নরেন। যাবে না রামকৃষ্ণের কাছে। মান করেছে। হয়েছে অভিমান।

কেন?

বলি, এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত অভাব, এত হাহাকার—তবু কি তাঁর অবসর হয় না একবার চোখ তুলে তাকাবার! যদি না তিনি ফিরে তাকান, তবে নরেন কেন সাড়া দেবে তাঁর ডাকে? তবু মন টানে—টানে মন যমুনার উজান বায়। ছুটে যেতে চায়। চায় যেতে হওয়ার মত গতির রথে চড়ে। কেমন করে থাকবে নরেন ঘরে? কিন্তু ডাক না এলেও যে যাবে না সে।

এমনি দিনে এলো রামলাল। পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। নরেনের খবর জানতে পাঠিয়েছেন। বলল রাম,—"ওহে, বলে এলে ঠাকুরকে বুধবার যাবে। কত বুধবার চলে গেল, তবুও তোমার দেখা নেই!" বললে নরেন,—"যাব বলে তো ঠিক করি, কিন্তু সংসারের ঝামেলায় হয়ে ওঠে না দাদা!"

—"আমি তোমায় নিয়ে যাব সঙ্গে করে। আজই চলো।"

গেল ধুয়ে মুছে মান অভিমানের মালিন্য। তেজ, বীর্য্যের কাঠিন্যে এলো করুণার নির্ঝর। নির্গলিত হোল অন্তর। বললে,—চলো!

দক্ষিণেশ্বরের তপোবন।

দাঁড়িয়ে আছেন রামকৃষ্ণ। প্রণাম করল নরেন। লাগল ধুলি ললাটে। মুছিয়ে দেন রামকৃষ্ণ। আহা কি স্নেহ ! কি অনুরাগ। হঠাৎ চোখ পড়ল রামকৃষ্ণের—

চোখ পড়ল নরেনের টেরিকাটা মাথাটির দিকে।

—সে কি গো ! এমন টেরি কেনে গো ? "তোর আবার এসব কেন ?" এলোমেলো করে দিলেন সিঁথি। গোছাল জীবনে এনে দিলেন অগোছাল ভাব। দেহমুখো মনকে করে দিলেন মনমুখো। বললেন,—"আজ এখানে থাকবি তো ?"

যেমন চাতক তাকিয়ে থাকে ঘননীল আকাশের দিকে—ঠিক তেমনি রইলেন চোখ তুলে নরেনের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণ। না, এলো না মুখে। সজাগ হয়ে উঠল নরেনের মনে—সজাগ হয়ে উঠল বিস্মৃত দিনের সেই পরম ক্ষণগুলো—পরশন। দরশন। আর সমাধি।

জ্যোতি। আভাতি। আর ব্রহ্ম উপলব্ধি।

যিনি অন্তর্যামী, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, তার কাছে নরেন কেমন করে লুকোবে তার আসল ইচ্ছাটি ? দ্রষ্টার দৃষ্টির অন্তরালে নয় তো নরেনের মনটি।

বললে নরেন—"থাকব।"

আনন্দে অধীর উদ্বেল রামকৃষ্ণ। গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন রামলালকে—"ওরে রামলাল, নরেন আজ থাকবে। তোর খুড়িকে খবর দে। ভালো করে খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। হিন্দুস্থানী রুটি আর ছোলার ডাল।"

কেবল কি তাই বলেই ক্ষান্ত ?

মমতাময়ের প্রাণে সর্ব্বঢালা স্নেহ। বান ডেকেছে করুণার সাগরে। স্নেহের শীতল শান্ত সিন্ধুতে জেগেছে আবেগের ঢেউ। ডাকলেন অন্নদা গুহকে। বললেন—"তুই তো নরেনের বন্ধু। জানিস্ তো ওর বাবা মারা গেছে—"

বজ্রাহত হোল অন্নদা। নত করে রইল মাথা।

বলতে লাগলেন আবার রামকৃষ্ণ,—"ওদের বড় কষ্ট। দিন চলে না। এখন বন্ধু-বান্ধবরা যদি কিছু সাহায্য করে তো বেশ হয়।" বেঁচে যায়, তা না হোলে কেমন কোরে সইবে এমন অভাব ?

নরেন শুনল সব কথাগুলোই। রেগে তো আগুন। কেন রামকৃষ্ণ অন্নদার কাছে বললেন ? কি জন্যে এ আবেদন ?

অন্নদা গেলে পরে এলো নরেন—

এলো শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। দাঁড়াল মুখোমুখি। বলতে লাগল দুঃখে ও অভিমানে নরেন,—"কেন, কেন আপনি ওর কাছে ওসব কথা বলতে গেলেন?"

—"কেনে গো, তাতে কি হয়েছে।"

কিছু হয়নি? আমার দুঃখ নিয়ে আমি আছি। কারো কাছে কি ভিখ মাগতে গিয়েছি গা?

—বলি তুই অত রাগ করছিস কেনে? অন্নদা যে তোর বন্ধু।

—থাক না।

—তার কাছে তো বললেম। কি হয়েছে তাতে?

নরেন বললে—"কি হয়েছে মানে? আমার দুঃখ দৈন্যের কথা যার তার কাছে ব'লে ব'লে বেড়াবেন? আমার কি একটা মান নেই? আমি কি ভিখারী?"

আর পারলেন না রামকৃষ্ণ ধৈর্য্যের সীমানায় বন্দী রইতে। সইতে পারলেন না নরেনের হৃদবিদারণ অভিমানের আর্ত্তি। জল এলো তাঁর চোখে। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলতে লাগলেন নরেনকে,—"ওরে তুই ভিখারী হবি কেন? আমি ভিখারী হব। আমি দ্বারে দ্বারে ভিখ মাগব তোর জন্যে। যেমন তোর কাছে আমি প্রেম ভিখারী, তেমনি নগরবাসীর কাছে করব আমি তোর স্বাচ্ছন্দ্য ভিক্ষা।

বড় দুঃখ পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—দুঃখ পেলেন নরেনের অভাব দেখে। নরেন আর একটি কথাও বলল না। মান করেছে নরেন ঠাকুরের 'পর। ঠাকুর মান করলেন তাঁর ভবতারিণী 'পর।

ওরে পাষাণী, তোর চোখে দেখতে পাস না কি নরেনের অভাব? পারিস না একটা ব্যবস্থা করে দিতে? দুঃখের কালো মেঘে ছেয়ে গেছে তার চিত্তাকাশ। ম্লান হয়ে গেছে তনু। শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। নরেনের হেমকান্তিকে গ্রাস করেছে দুঃখের অমাবস্যা। একবার চোখ মেলে তাকা। তাকা তুই একবার নরেন্দ্রের দিকে। দূর করে দে ক্ষুধার কান্না। অভাবের হাহাকার। আর যে পারছে না রে। এবারে বিগলিত হোক তোর পাষাণ হৃদয়। নরেনকে বাঁচা। পথ করে দে।

সুরেশ মিত্তির এসে আবার বললে—বললে কিনা—"ভগবান তো ভক্তকে দেখবেন। নইলে তাকে ন্যায়পরায়ণ বলি কি করে?"

—তাই তো রে সুরেশ! ঈশ্বরের ভাব বুঝি এমন সাধ্য কি? তিনি যে ভাব অভাবের ঊর্ধ্বে। নির্গুণ। ত্রিগুণাতীত।

"যখন এই কথা ভাবি, তখনই কাঁদি। ঈশ্বরের কার্য্য বোঝার জো নাই।" ওগো, তুমি সহজ হয়ে এসো। এসো রূপে রূপময় হয়ে। বললেন রামকৃষ্ণ—

বললেন নরেনকে একটা গান ধরতে।

কিন্তু বসল নরেনের মন বেঁকে। ভাবতে লাগল নরেন—ভাবতে লাগল —কি হবে এই মরাস্রোতের মন্থরতায় নিষ্প্রাণ হয়ে থেকে? কি হবে গান গেয়ে! কি হবে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে? কে শুনবে প্রাণের কান্না? বুঝবে কে হৃদয়ের তন্হা? তাই অভিমানে দুঃখে গান গাইতে নরেন হোল নারাজ। বললে—"কাজ আছে, ঘরে যাই।"

কিন্তু ঘরে আর যেতে পারল কৈ। কার সঙ্গে করবে নরেন অভিমান? এ অভিমানের যে বড় জ্বালা। বড় দহন।

গান শুনতে চেয়েছেন ঠাকুর। নরেন গান না গেয়ে কি পারে? ধরল একটি প্রাণমাতানো সংগীত।

ঠাকুর তো অমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

কেবল কি তাই?

দেখলেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঘন তনু। বললেন ঠাকুর—বললেন ভাব থেকে স্বভাবে ফিরে,—"দেখলুম লাল জ্যোতি। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে শিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, মা ওকে মায়ায় আবদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।"

তাই তো অমন হোল। আটকে পড়ল নরেন মোহের বাঁধনে। প্রত্যক্ষ করছে তাই দুঃখ। কান্নার সঙ্গে পরিচিত হোল সহজে। অভাবের হাহা-কারে ধুকে ধুকে মৃত্যু বরণ করছে, মৃত্যু বরণ করছে নিত্যি কতবার।

কিন্তু নরেন তো এ খেলা খেলতে চায় না! তার মন চায় ঘরের বাঁধন ছিন্ন করে ত্যাগের তপে মগ্ন হোতে। কি করে তা হবে?

ভোগ স্পৃহা না থাকলেও মায়ার খেয়া তো পার হতে পারেনি নরেন! যাই, যাই মনে করেও পিছু ফিরে তাকায়। তাকায় নরেন মায়ের বিষাদঘন মুখ পানে। তাকায় ভাই-বোনদের ক্ষুধা ক্লিন্ন জলভরা চোখের দিকে।

আর তো হয়ে ওঠে না যাওয়া। ফিরে আসে নরেন। ফিরে আসে ঘরে। আসে মায়া মোহের আসক্ত আলয়ে।

বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

বললেন,—"বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে কিছু হবে না।"

কিন্তু নরেনের কামিনী কোথায়? কোথায় তার কাঞ্চন?

এ যে নিরাসক্ত ভাব। সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী।

কিন্তু ওর ত্যাগের দুয়ারে যে মায়ার প্রহরী। তারা যে দাঁড়িয়েছে পথ আটকে। ছাড়ছে না। দেবে না যেতে, যেতে দেবে না মা, ভাই ও বোনেরা।

ঠাকুর ভাবলেন—তবে কি নরেন জড়িয়ে পড়বে সংসারে? ভয় হোল শ্রীরামকৃষ্ণের।—যদি নরেন সংসারী হয়ে যায়? যায় যদি ভোগের সুখ-সায়রে ত্যাগের কথা ভুলে?

ওগো, তুমি নরেনকে মায়ার আবরণ দিয়ে আটকে রেখেছ বলে করো না তাকে সংসারাসক্ত। সংসারে থেকেও যেন নরেন হয় নিরাসক্ত। পঙ্কে থেকেও যেন নরেনের প্রকাশ হয় পঙ্কজের মতো।

বড্ড ভাবনা। রামকৃষ্ণের দিন-রাত্রির নিদ্রাকে নিয়েছে কেড়ে। নরেন বৈ যে তাঁর কিচ্ছুতেই চলবে না। কেমন করে ধরে রাখবেন নরেনকে?

নিঝুম পুরী।

রাত্রি গভীর।

নেই কোথাও কিছুর সাড়া। ভেসে আসছে মাঝে মাঝে—ভেসে আসছে ছায়াকুঞ্জের ঘন নিস্বন। আসছে যেন ক্লান্ত দেহ 'পরে শ্রান্তিহারা শান্তি ছড়িয়ে।

ডাকলেন রামকৃষ্ণ নরেনকে।

এলো নরেন। নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ—

নিয়ে গেলেন নরেনকে নির্জ্জনে।

আর কেউ নেই। আছে শুধু নীলিমার চাঁদ। বনের নিস্বন। আর নদীর মৃদু দোলন।

কত কথা। কত ভাব রামকৃষ্ণের। নরেনকে বলছেন তাঁর মনের কথা —যত দিন আমি আছি, থাকতে হবে তোমাকেও সংসারে। ধৈর্য্য না ধরলে চলবে কেনে গো! এখানে আসা কেনে? শুধু কি খেলাবার বাঁশী নিয়েই এলি? জীবনকে উজার করে দিবিনে? যে তোকে পাঠালে, তার গুণগান গাবিনে? অনেক কাজ আছে গো। আগে বুঝে নে সংসারকে। তারপরে তো বিবাগী হবি! আমার জন্ম হোল কেনে তা জানিস্? কেবল তাঁর দেয়া কাজ করবার জন্যে। আমার সাথে সাথে তুইও ধরবি গান। ওরে, তুই আমার রথের সারথি। জগৎকে শোনাবি তুই ভারতীয় সাধনার শাশ্বত বাণী।

শোনাবি তাদের—সাম্য, সত্য, শান্তি ও মুক্তির জাগরণী সংগীত। ব্যস্ত হোসনে। ব্যস্ত হোসনে তুই! আরো কত কথা বলতে লাগলেন। রাত এলো ভোর হ'য়ে। ডাকল কাক। পুবের আকাশে হোল অরুণোদয়।

নরেনের মন আনন্দে ভরপুর। দুঃখাতীত হর্ষের হিল্লোলে নরেন ভেসে চলল তৃপ্তির আনন্দ লোকে। মধুময় হয়ে এলো প্রভাত। কাটল ঘোর। অবসান হোল দ্বন্দ্বের। অপসৃত হোল বিষাদের ছায়া। মুছে গেল মালিন্যের মেঘ। ভাবতে লাগল নরেন—ভাবতে লাগল মনে মনে—কে পাগল! কে উন্মাদ! না না, এতো পাগল নয়। এর স্পর্শে যে দূর হয় মনের আগল। রাত্রির স্বপ্নে ফোটে প্রভাতের প্রসূন।

ওগো, ভুলের বন্যায় তোমাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেম, দিয়েছিলেম অন্তর থেকে নির্ব্বাসনে! অপরাধ নিও না। হে মনোমুগ্ধকর, হে লোচন, লোভন, স্বজন, সুন্দর, তুমি এসো, এসো আমার অন্তরে। হোক তোমার স্থির বসতি আমার হৃদয় দেউলে। আমি লেগে থাকি তোমার চরণ প্রচ্ছায়। হয়ে যাই তোমাতে লীন।

ফিরে এলো নরেন বাড়ীতে। ফিরে এলো আনন্দের তরঙ্গ হিল্লোলে ভেসে ভেসে। দেখে এলো চর্ম্ম চোখে সাক্ষাৎ ধর্ম্মকে। নিয়ে এলো প্রণতির দীক্ষা। বুঝে এলো—রামকৃষ্ণ বৈ আর দ্বিতীয় নেই। রামকৃষ্ণ মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ। সত্য, সাম্য, স্নিগ্ধ। পিতা, মাতা, সখা। সাথী, বন্ধু, ভ্রাতা। এক আধারে সর্ব্বরূপের সমন্বয়। এক ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ।

২০

চিদাকাশে হয়েছে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়। আর ভাবনা কিসের? এবারে তুলে দাও আমার প্রেমের তরণীতে মুক্তির বৈজয়ন্তী। ভাবের সমুদ্রে জাগুক অহৈতুকী ভক্তির ঢেউ। ভেসে ভেসে যাক তরী, যাক প্রপঞ্চের কূল ছেড়ে বাক্য মনের অগোচরে। নিত্য সুখের পথে। চাইনে ঐশ্বর্য্য। চাইনে সাম্রাজ্য। কেবল তোমার পদ পাত হোক আমার হৃদয় দেউলে। দাও, দাও, দাও আমাকে তোমার নিরুপাধিক করুণা। নির্ব্বেদ সাধনা।

নরেনের বৈরাগী মনে কে যেন বাজায় একতারা।

মন নেই সংসারে। চায় না মায়াবদ্ধ হোতে প্রাণ। নির্লিপ্ত ভাব। জ্ঞান, অজ্ঞানের উর্ধ্বে চলে তার অভিসার। যেতে চায় সেই শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন সুখ নিকেতনে।

কিন্তু মায়ার গুহা থেকে উন্মুক্তির অভিলাষী হোলেই কি মুক্তি মেলে?

না।

তবে?

চাই যে কর্ম্মের শেষ। মুক্তি নেই বিধাতার বিধান না শেষ ক'রে। মুক্তি মেলে না তাঁর দেয়া কাজের অবশেষ রেখে।

তাই তো আবার জড়িয়ে পড়ল—

জড়িয়ে পড়ল নরেন সংসারে।

মামলা করেছে জ্ঞাতিগোত্ররা। নাবালক, বিধবার সম্পত্তি। এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

কিন্তু নরেন তো নীরব থাকার ছেলে নয়। সহ্য করবে না সে অন্যায়কে। দাঁড়াল সে-ও রুখে। দাঁড়াল নিষ্কাম ভাব লয়ে অন্যায়কে উচ্ছেদ করতে।

মুষড়ে পড়ল ভুবনেশ্বরী।

—ওগো, এ তোমার কেমন খেলা? দুঃখ, দৈন্যের জীর্ণ জীবন লয়ে নিত্যি মরি, তার 'পর আবার একি বিপদ ঘটালে গো! কি তোমার অভিপ্রায়? বুঝি ভিটে ছাড়া করে ক্ষান্ত হবে?

যিনি বিপদের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়েছেন, তিনিই আবার উত্তরণের পথটি রেখেছেন খুলে।

নরেনের পাশে এসে দাঁড়াল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নামী ব্যারিষ্টার। দেশজোড়া নাম। বিপদের দিনে এমন বন্ধু, সে তো ঈশ্বরের করুণা বৈ মেলে না!

চলল মামলা। নরেন যেন শক্তি পেল দ্বিগুণ। কে হারাবে তাকে? জজ সাহেব মুগ্ধ হয়ে গেল! মুগ্ধ হোল নরেনের মুখে প্রশ্নের স্পষ্ট প্রত্যুত্তর শুনে। পড়ছিল নরেন তখন আইন। আনন্দে অধীর হয়ে জজ সাহেব বললে--

বললে কিনা,--"যুবক, কালে তুমি একজন ভালো উকীল হবে।"

কেবল তাই বলেই ক্ষান্ত রইল না জজ। রায় দিয়ে দিল নরেনের পক্ষে।

হাত তুলল বিপক্ষের এটর্ণী। বলে ফেললে জজসাহেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে,—"জজ সাহেবের সাথে আমিও একমত। আইনই আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।"

দেবতার রাজা ইন্দ্র! আর নরের রাজা নরেন্দ্র। সে কেমন করে হবে পরাভূত?

আনন্দে অধীর নরেন। ছুটে এলো মার কাছে। সে কি চিৎকার! দূর থেকে ডেকে ডেকে বলছে—বলছে নরেন মাকে,—"মা বাড়ী বেঁচেছে।" জিত হয়েছে মামলায়।

* * * *

মামলায় তো জিত হোল! কিন্তু অভাবের ঘরে তো স্বভাব ফিরে এলো না! এলো না তো দৈন্য দুঃখের হাহাকারে স্বাচ্ছন্দ্যের স্বীকৃতি! এখনো ভাই-বোনদের ক্ষুধার কান্না, মায়ের অসহায় দৃষ্টি নরেনকে বড় পীড়া দিচ্ছে।

কিন্তু কে পারে এই দুঃখ দীর্ণ হাহাকারে শোনাতে অভয়ের বাণী? কে দিতে পারে এই নিশীথ রাত্রির বুকে স্পষ্ট স্বচ্ছ পথের ইঙ্গিত? কে—কে পারে দুঃখের সম্পূট ভরে দিতে আলোর ময়ূখে?

সহসা ঝলমল করে ওঠে নরেনের মন। আভাসিত হোল দক্ষিণেশ্বর-গঙ্গা-মন্দির! দেখল, তারই কোল জুড়ে বসে আছেন কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

মনে করল নরেন, যাবে সেখানে। বলবে সব কথা খুলে। চাইবে করুণা।

চলল নরেন অগতির গতির কাছে—দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ-সমীপে।

—তুই এসেছিস! আয়!

সর্ব্বঢালা স্নেহ।

প্রণাম করল নরেন। নিবেদন করল মনের দুঃখ নীরবে—নিবেদন করল রামকৃষ্ণের শ্রীচরণে।

ভাবতে লাগল নরেন—আজ আর যাব না ফিরে। অভিমান নয়। একটা সুরাহা করে তবে নিশ্চিন্ত হব।

অটল বিশ্বাস। অবিচল আস্থা—নিশ্চয় পারবেন ঠাকুর দূর করতে আমার মা, ভাই-বোনদের ক্ষুধার কান্না।

বলে ফেললে নরেন,—"আপনার মাকে একবারটি বলুন।"

"কি বলব ?"

"মা, ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না।"

অভাবের পীড়নে নরেন অসহায়। এসেছে আজ একটা যা হয় কিছু করে যেতে। বলল আবার,—"ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয় আমার, আপনার মার কাছে সুপারিশ করুন একটু– "

স্নেহ শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঠাকুরের চোখে। তাকালেন নরেনের দিকে। বললেন—"ওরে, আমি কোন দিন মার কাছে কিছু চাইনি, তবু যাতে তোদের একটু সুবিধে হয়, সে জন্যে অনুরোধ করেছিলেম। কিন্তু তুই তো আমার মাকে মানিস না। তাই মা তোর কথায় কান দেয় না। আমার মা তোর কে ?"

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল নরেন। রাগে, দুঃখে, অভিমানে নরেন নীরব।

এমনি কাটল কিছুটা মুহূর্ত্ত। বলল তারপরে, বলল নরেন—"আমার কে না কে, তাতে কি আসে যায় ? আপনার তো সব।"

"ওরে ওকথা যে আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। কখনো হয়নি। ও সব বিষয়ে কথা বলতে পারিনা—"

"ও সব বাজে কথা ছাড়ুন। একটা সংসার শেষ হয়ে যাচ্ছে অভাবের তাণ্ডবে। না খেতে পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা মরণের দিকে। আর আপনি বসে থাকবেন আপনার আদর্শ লয়ে ? বলি, এ আপনার কেমন ভাব ? বিষয় কথা পারবেন না বলতে ?" জোর করে ধরল নরেন রামকৃষ্ণকে, —"আপনাকে বলতেই হবে।"

"তুই মাকে মানিস না, তাই তোর এত কষ্ট। তুই নিজে গিয়ে মার কাছে বল।"

"সে আমি পারব না। আমার জন্যে আপনাকেই বলতে হবে।"

কাছে ডাকলেন নরেনকে রামকৃষ্ণ। বললেন চুপি চুপি, কানে কানে–"আজ মঙ্গলবার। রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তার পরে মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি······তিনি—ইচ্ছাময়ী। ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে কিনা করতে পারেন ?"

নরেনের চোখে মুখে মুখে সমুৎকণ্ঠা। বলল নরেন,—"সত্যি ?"

"—হ্যাঁ সত্যি। তুই দ্যাখই না চেয়ে।"

কত কথা, কত আশা নরেনের মনে। ভোর হবে দুঃখের রাত্রি। আসবে ফিরে সচ্ছলতা। নরেন লাভ করবে মায়ের আশীষ ! পূর্ণ হবে তার মনোবাঞ্ছা। ঘর ভরে যাবে সুখ-সম্পদে। থাকবে না আর অভাব। থাকবে না তাকিয়ে ভাইবোন দু'মুঠা অন্নের জন্যে। কাঁদবে না মা। দেখতে হবে না আর ক্ষুধা-ক্লিষ্ট, অন্নরিক্ত অসহায় বিষাদ ঘন মূর্ত্তি গুলো। একবার, কেবল একটি বার মা বলে ডাকতে হবে। বলতে হবে দুঃখের কথা। চাইতে হবে স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, স্বভাব। নরেন তাই করবে। ডাকবে মাকে। বলবে মা, একবার মুখ তুলে তাকা। দূর করে দে আমার যাত্রাপথের কণ্টক। মুক্ত করে দে আমায় বন্ধন থেকে। দে মা আমায় উন্মুক্তির আনন্দ। দে, আমায় তোর নামে পাগল হয়ে যাওয়ার সমুৎকণ্ঠা।

২৭

পড়ন্ত বেলা।

বিদায় বিসারী সূর্য্য। রক্তাভ রং‌টুকু তার ছড়িয়ে পড়েছে আদিগন্তে। গঙ্গার অঙ্গে লাল চেলি। দিনান্তের অন্ধকার এলো। এলো ক্রমে গাঢ় ঘন হ'য়ে। আকাশে খণ্ড বিক্ষিপ্ত মেঘ। পড়েছে তাতে দিবাকরের আরক্ত আঁখির দৃষ্টি।

সন্ধ্যারতির মধুর বাদ্যধ্বনিতে মুখর মন্দির। রোমাঞ্চিত বীথিবন। ছন্দ-মধুর গঙ্গা। নেমে এলো, এলো নেমে ধরণীর কোলে শুভ রাত্রি। এলো মঙ্গল মুহূর্ত্ত। "

এক প্রহর অতীত প্রায়। স্তব্ধ নিঝুম কালী মন্দির। রাত্রির ধারা নামে ধীরে। নীরব রাত্রির মৌন মুহূর্ত্তগুলো যেন সজীব। দূরে—বহু দূরে গঙ্গার ওপার থেকে ভেসে আসছে চঞ্চল অনিল নিস্বন। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দু একটি পাখীর কণ্ঠে মধুর কাকলী।

নরেন দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে। স্পন্দিত প্রাণ। অন্তরে উৎকণ্ঠা। পায়চারি করছেন রামকৃষ্ণ। কেবল কী তাই?

গান গাইছেন। আহা কি মধুর! কি মিষ্টি! কি না অপূর্ব্ব সে কাঁদোন ধোয়া কণ্ঠ!

আজ যে তাঁর জীবনে এসেছে শুভলগ্ন। কেমন করে থাকবেন নীরব? নরেন এসেছে। এসেছে নরেন মার কাছে তার মনের কথা বলতে। দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনটনের নালিশ জানাতে। এসেছে মায়ের মাতৃরূপ দর্শনে আত্মপ্রত্যয় করতে। মা, মা বলে ডাক দিতে।

সমুন্নত দেহ। অজানুলম্বিত বাহু। প্রশস্ত ললাট, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দেহ কান্তি, আয়ত দীপ্ত আঁখিতারা। ঋজু দীঘল অঙ্গ শোভা। ধীর গম্ভীর। তাকালেন একবার রামকৃষ্ণ, তাকালেন নরেনের দিকে।

বললেন,—"যা এবারে শ্রীমন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর। তারপর চা প্রাণ ভরে।"

চলল নরেন—

চলল স্বপ্ন দোলার দোলায় আন্দোলিত শিশুটির মত। যেন নেশায় ধরেছে। টলছে পা। কাঁপছে দেহ। কি দেখবে! কোথায় যাবে! কি শুনবে,

ভেবে ভেবে নরেন মাঝে মাঝে হয়ে যায় নিরিন্দ্রিয়। ঘনিয়ে আসে ঘোর, আবার আলোর সন্দীপন। আশা ভরা অন্তর। এগিয়ে যায় সম্মুখের দিকে নরেন।

দীপ জ্বলছে মন্দিরে। উজ্জ্বল নয়—স্তিমিত।

ছায়াচ্ছন্ন ক্ষীণপ্রভ দীপশিখায় অর্দ্ধালোকিত মায়ের মন্দির। নরেন যাচ্ছে এগিয়ে, এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মন্থর পদবিক্ষেপ। কত আশা তার অন্তরে,—মৃন্ময়ী কথা বলবেন চিন্ময়ী হয়ে। উঠবেন পাষাণী স্নেহস্নিগ্ধা প্রাণময়ী হ'য়ে। আসবে জড়ত্বে মমত্ব। পাষাণ ফলকে ফুটবে জ্যোছ্‌নার রজত প্রভা।

চলল নরেন।

মনের দুই কুলে উচ্ছল তরঙ্গ। একদিকে সংশয়। আর এক দিকে আনন্দ।

ভবতারিণীর মন্দির।

দীপ জ্বলছে। জ্বলছে ধূপ। ছড়িয়ে পড়ছে তার স্নিগ্ধ সুরভি। কেউ নেই। বুঝি ঘুমন্ত সবাই। নরেন দাঁড়িয়ে। সম্মুখে ভবতারিণী। কি দেখছে নরেন তার জাগর চোখে?

দেখছে নিশীথ নিরালয় অপার্থিব মাতৃরূপ। আলো, কান্তি, দিব্য ভাতি। সুন্দর, স্নিগ্ধ, স্নেহ, শান্তি। সমুজ্জ্বলা নির্ঝরিণী। সদা হাস্যময়ী। বিশ্ব-ব্যাপিনী। সংসার সমারূঢ়া। দুঃখ নেই। দৈন্য নেই। নেই শোক- তাপ, ক্লেশ ও হাহাকার।

কি চাইবে নরেন?

কি চাইবে এমন ভুবন-মোহিনী সনাতনীর কাছে?

সংসার, মায়া, মোহ মুহূর্ত্তে গেল তলিয়ে। এপারের খেয়া খুলে যেতে চাইল মন ওপারে। ঐ আলোকতীর্থে, অখণ্ডের ব্রহ্মাণ্ডে। তন্ময় নরেন্দ্রনাথ। ভাববিহ্বল চিত্ত। প্রণাম করল। প্রণাম করল ভক্তি বিনম্র চিত্তে। চাইল শুধু, দেহের যবনিকা ভেদ করে ছুটে যেতে, ছুটে যেতে চাইল সেই অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখাটির দিকে। বলল শুধু,—"মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—"

ফিরে এলো নরেন। ফিরে এলো রামকৃষ্ণের কাছে। ঢুলু ঢুলু ভাব। যেন আকণ্ঠ পান করেছে ভাব কারণ। মাতাল হয়েছে। লুপ্তপ্রায় বাহ্যজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাকালেন—

তাকালেন নরেন্দ্রের দিকে। বললেন,—"কি রে গিয়েছিলি মার কাছে? কি চাইলি?"

কি আর চাইবে?

চাইল নরেন আত্মজ্যোতি। আর সেই জ্যোতির্লোকে দেখতে চাইল নরেন—দেখতে চাইল 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'কে। দাঁড়িয়ে নরেন নীরব মুখে। নিষ্পলক দৃষ্টি। যেন নিথর রাত্রির ঘন যাম।

রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করছেন—

প্রত্যক্ষ করছেন নরেন্দ্রের নরোত্তম রূপ। বললেন—"কি আশ্চর্য্য, সব ভুল হয়ে গেল। এখন কী হবে।"

কি যেন বলতে চাইল নরেন। কিন্তু এলো না মুখে ভাষা। বাকপটু মুখর নরেন্দ্র গেল নীরব হয়ে।

বললেন আবার রামকৃষ্ণ—"যা, যা ফের যা।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়াল নরেন।

পিছু থেকে ডাকলেন রামকৃষ্ণ। দাঁড়াল নরেন। এলো এগিয়ে। বললেন রামকৃষ্ণ,—"গিয়ে ফের প্রার্থনা কর। মনের কথা মাকে বলবি না তো কাকে বলবি? কেন ভুল হবে? মাকে গিয়ে বল, মা আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে— দে মা আমায় সুখ, শান্তি, অর্থ আর ঐশ্বর্য্য।"

চলল নরেন, চলল আবার শ্রীমন্দিরে। এবারে কি দেখল নরেন?

সেই কনক-কিরণ উজ্জ্বল হাসি। বিসারিত মলয় মধুর করুণা।

কি বলবে?

সর্ব্বব্যাপিনী বিশ্বরূপে মা প্রকাশিত। শক্তি. শান্তি, স্বস্তি। আবার প্রলয়, সংহার, সৃষ্টি। সর্ব্বভূতে বিরাজিতা। সর্ব্বলোকে, সর্ব্বকালে, এপারে ওপারে তাঁরই অভয় অঙ্ক। তাঁরই কোলে খণ্ড, অখণ্ড, দ্যুলোক, ভূলোক, জন্ম-মৃত্যু। কিসের অভাব? কিসের দুঃখ? নরেন তো মার কোলছাড়া নয়। বলল আবার, জানাল যুক্ত করে মিনতি কাতর প্রার্থনা,—"জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—"

বলা হোল না এবারেও—বলা হোল না দুঃখ, দৈন্যের কথা। এলো ফিরে—

ফিরে এলো নরেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে। বললেন রামকৃষ্ণ,—"কি রে, এবার চেয়েছিলি ঠিক ঠিক?"

নরেন বললে,—"পারলুম না। এলো না মুখ দিয়ে।"

"সে কি কথা?"

একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন রামকৃষ্ণ। বললেন,—"তুই কি আনাড়ি না অকাট?" নরেন বললে,—"মাকে দেখা মাত্রই কি রকম একটা আবেশ আসে। যা চাইব বলে ভেবেছিলুম তা আর মনে এলো না।"

"দূর ছোড়া! নিজেকে একটু সামলে নিবি। গোড়াতেই তলিয়ে যাবিনে। সামলে নিয়ে চার দিক বুঝে সমঝে মাথা ঠাণ্ডা করে চাইবি। যা, আরেক বার গিয়ে চেষ্টা কর। এমন সোনার সুযোগ আর আসবে না।"

চলল নরেন আবার।

শ্রীমন্দির। দৃঢ় হয়ে ঢুকল নরেন—

ঢুকল মন্দিরে।

কি দেখছে এবারে?

সেই দুর্জ্ঞেয় স্বরূপা। অচিন্ত্য মহিমা। মঙ্গলময়ী মা বিরাজিতা আকাশে, বাতাসে, আলোকে, অনলে। মা প্রসন্না, সর্ব্বোত্তমা কল্যাণী। মোক্ষরূপে মা প্রকাশিতা। জ্ঞান, ধ্যান, মোক্ষ, সত্য, ব্রহ্ম, ভূমা স্ফুরিত হচ্ছে—স্ফুরিত হচ্ছে মার ষড়ৈশ্বর্য্য বিশ্বব্যাপী। দেহজ্ঞান, দেহবুদ্ধি রূপে মা মহামায়া। আবার মনোময় শক্তি স্বরূপে মা মনোরমা। চৈতন্য রূপে মা চিত্তস্নিগ্ধা। সর্ব্বরূপা, বৃত্তিরূপা, নিখিল জগতের প্রাণিগণের পরমারাধ্যা। দুঃখনাশিনী, পাপ-সংহারিণী, অশিবে উন্মাদিনী, ভীমা, ভয়ঙ্করী মা।

কি ভিক্ষা চাইবে? কোন্ ধন কুড়িয়ে নেবে নরেন মায়ের পাদপদ্ম থেকে?

ওগো, চাই না ধন, মান, ঐশ্বর্য্য। চাই না সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সংসার। কি হবে ঐশ্বর্য্যে, সাম্রাজ্যে! কেবল অচলা বিশ্বাস এনে দে অন্তরে। দে আমাকে রাগানুগা ভক্তি। পবিত্র করে দে মনপ্রাণ। পবিত্র করে দে মা, আমায় মাতৃমন্ত্রের আকুলতায়। এনে দে আমার হৃদয়-মরুতে কান্নার কলতান। আমি তোর পাদপদ্ম ধৌত করে দেব আমার আকুল কান্নার বারিবন্যায়। আর চাই না কিছু, শুধু ভক্তি, বিশ্বাস। আর দে আমায় শিশুস্নিগ্ধ সারল্য। দে আমায় নির্ব্বেদ সাধনা। নিরুপাধিক করুণা। আমি তোর গান গেয়ে, তোর নাম কীর্ত্তন করে জাগিয়ে তুলি, জাগিয়ে তুলি সুপ্তিমগ্ন অন্তরকে। ঘরে ঘরে, জনে জনে, পথে প্রান্তরে, আকাশে, অনিলে আমায় বলতে দে—বলতে দে মা—ইন্দ্রিয়ের পরেও তুই সমুজ্জ্বলা। করুণাময়ী।

ফিরে এলো নরেন। ফিরে এলো স্পর্শাতীতের হর্ষ লয়ে বুকে। শুনে এলো অনন্ত মৌনের বাণী। দেখে এলো আদিভূতা সনাতনীর মধুর মোহন রূপ। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন রামকৃষ্ণ,—"কিরে, চাইলি এবারে?"

বললে নরেন,—"চাইতে লজ্জা করল।"

"লজ্জা করল!"

যেন আঁৎকে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপরে আবার একটু হাসলেন। বললেন,—"লজ্জা করল!"

ওগো, আর ছল করো না। দিয়েছ এনে দুর্ল্লভকে সুলভ করে। দিয়েছ স্পর্শনে, দর্শনে। ইন্দ্রিয়ের পারে পেয়েছি জ্যোতির্ম্ময়ী জ্ঞানদায়িনীকে সকল কামনার নিবৃত্তির শতদলবাসিনীকে। আনন্দময়ী, বিশ্বব্যাপিনী দেবী। সকল চাওয়া পাওয়া স্তব্ধ হ'য়ে গেছে তাঁর চরণতলে। ধ্যান-নিমীলিত চোখে নয়, দেখেছি জাগর চোখে, দেখেছি আত্মজনকে। ভূমাকে। অবগাহন করেছি রস-সমুদ্রে। কেমন করে বলব বল, আমায় ঐশ্বর্য্য দে। স্বাচ্ছন্দ্য দে। দে মা আমায় মুক্ত করে দুঃখের দহন থেকে? আমি যে দেখেছি চন্দ্রিকার রূপ-ঐশ্বর্য্য। পেয়েছি এক আধারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে। ওগো. তুমি নিষ্কম্প দীপশিখার মত অনির্ব্বাণ হয়ে থেকো আমার অন্তরে।

নরেনের দিকে তাকিয়ে রামকৃষ্ণ হাসলেন। একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। ডাকলেন তাকে কাছে। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন পিঠে, বুকে। আশীর্ব্বাদ করলেন বারে বারে। বললেন চুপি চুপি—ওরে, তোর কি আর দুঃখ থাকতে পারে? তুই মাকে জেনেছিস। দেখেছিস দু-নয়নে মায়ের মধুর রূপ। অর্পণ করেছিস তোকে তুই মায়ের শ্রীচরণে। তোর ভার মা নিয়ে নিলেন। বললেন কি জানিস? মা বলে দিলেন, তোদের মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না কোন দিন।

মন নেই সেদিকে। নরেন চলে উজানে। অনিত্য সংসার থেকে নিত্যধামের অভিসারে তন্ময় মন। বললে নরেন। বললে,—"আমায় মার গান শিখিয়ে দিন্।"

—মার গান শিখবি?

হ্যাঁ, "আমায় মার গান শিখিয়ে দিন্।"

"কোন্টা শিখবি?"

—শিখিয়ে দিন্ সেই—"'মা ত্বং হি তারা—' গানটি"। নৃত্য করে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর। বীণায় বাজল ছন্দ-মধুর সুর। জাগল বীথিবনে বনতান। নদীবুকে রিন্‌ঝিন্ কলতান। লোকে লোকে বাজে জয়ডঙ্ক।

'মা ত্বং হি তারা—
ত্রিগুণ ধারা পরাৎপরা।'

ঘুম নেই—ঘুম নেই, নিশীথ রাত্রির চোখে ঘুম নেই।

পাখী ডাকে বনে। নদী বহে ধীরে। সমীরণে পুলকিত শিহরণ। নরেন গান গাইছে—গাইছে রামকৃষ্ণের শেখানো গান। এ তো গান নয়, যেন মন্ত্র। শব্দ হয়ে যায় ব্রহ্ম। রাত গেল ভোর হয়ে। ভোর হোল সঙ্গীতের সুরে সুরে। কাক ডাকল। পুবের আকাশে পড়ল দিবাকরের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। যুগ ও জীবনের যোগযুক্ত আত্মা। আর নরেন তার সেতুবন্ধ। রামকৃষ্ণের স্পর্শে নরেনের জ্ঞান-মিনার নিমজ্জিত হোল ভক্তির সমুদ্রে। দ্বৈত, অদ্বৈতের মিলন হোল। ঘুচে গেল সাকার নিরাকারের ভেদজ্ঞান। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিল নরেন।

২২

মুক্ত মন। শুদ্ধ আত্মা।

উড়ে চলে দূরে, অনন্তে। নিয়ত ভাসে নরেন আনন্দের অমিয় লহরে। ভাসে মুক্ত, শুদ্ধ পবনে।

যোগযুক্ত হয়ে যায় চিত্ত—

যায় সেই পরম ঈপ্সিতের সঙ্গে। বলে,—"সমাধি-সুখ লাভ করব, মাকে জানব, নিরবধি দর্শন করব।"

এর চেয়ে আর কি আছে প্রেয়? এমন অবাচ্য অনুভূতির কাছে আর কোন্ ধন লাগেরে? নরেন ডুব দিয়েছে সেই আত্ম-রতির সুখ সায়রে। ডুব দিয়েছে অনন্তে, অসীমে।

দৃঢ় মন।

পবিত্র সঙ্কল্প। নির্ম্মল অভিসার। নিষ্কাম তন্‌হা।

ইন্দ্রিয়কে রাখে নরেন দাবিয়ে। বিশ্বাস, শুধু আত্মবিশ্বাসের 'পর ভর করে ছুটে যায় দক্ষিণেশ্বরে।

সেই বীথিকুঞ্জ। ছায়া মেদুর বনমঞ্জীর। পঞ্চবটী।

মন আকুল হয়ে যায়। ছুটে যেতে চায় নরেন বিল্বতরুমূলে। বসতে চায় ধ্যানে। দেখতে চায় আবার সেই মাতৃরূপ।

রামকৃষ্ণ বলেন,—ওরে, তোর কি হোল? "পড়াশুনো ছেড়ে দিবি নাকি?"

নরেন বললে—"মশাই, যদি এমন একটা ওষুধ পাই যা খেলে এ পর্য্যন্ত যা কিছু শিখেছি সব ভুলে যেতে পারি, তা হলে প্রাণটা যেন বাঁচে।"

বললেন রামকৃষ্ণ,—"দেখ, সাধন কালে আমার অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হয়েছিল, তা কোন কাজে লাগেনি; তুই নে, কালে তোর অনেক কাজে লাগবে।"

তাকাল নরেন। তাকাল ঠাকুরের দিকে। যেন সমস্তখানা আকাশে একটি তারার আঁখি সম্পাত।

বলল,—"ওতে ভগবান লাভ করবার কোন সুবিধে হবে কি?"

"না, তা হবে না বটে, কিন্তু ঐহিকের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকবে না।"

চমকে উঠল নরেন। চোখে মুখে বিস্ময়ের প্রতিফলন। বাঁকফেরা নদীর মত নরেনের মন বসল ফিরে। বুঝল নরেন ঠাকুরের ছলনা। ঐহিক বাসনার লোভে লোভী করতে চাইছেন ঠাকুর।

ত্যাগী শ্রেষ্ঠ ত্যাগের আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠল।

বলল,—"তবে ওতে আমার প্রয়োজন নেই।"

—সংসার চাই না। ভোগ, বিলাস, আরাম, ঐশ্বর্য্য চাই না। কেবল পড়ে থাকতে চাই মায়ের পাদপদ্মে। নিরন্তর দর্শন করতে চাই অপার্থিব রূপ। লেগে থাকতে চাই মায়ের নামে। তুমি আমায় তাই দাও। দাও আকুলতার তীব্র তৃষ্ণায় বিরহ বিধুর করে। ভেঙ্গে যাক ভোগ লালসার কারাদুর্গ। ছুটে যাব অসীমে। সুদূরে। অনন্তে।

যেন দুরন্ত ঝর্ণার ধারা চলেছে—

চলেছে উন্মুখর হয়ে পরমার্থের সন্ধানে।

ভাব-বিভোর নরেন। আত্মার আত্মীয়ের খোঁজে নরেন আত্মহারা, ভাব-ভোলা।

* * * *

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায়। গলরোগ। কঠিন পীড়া। দিন দিন বেড়েই চলেছে। খেতে পারেন না কিছু। একটু রুচি নেই মুখে। ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে দেহ। দুর্ব্বলতা বেড়ে চলেছে।

ভক্তবৃন্দ নিয়ে এলো তাঁকে কলকাতার উপকণ্ঠে—নিয়ে এলো কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে।

প্রকৃতি এখানে ঐশ্বর্য্যময়ী। ছায়া মেদুর পরিবেশ। বড় ভালো লাগল রামকৃষ্ণের।

এলেন শ্রীমাও। সন্ন্যাসী শিষ্যরা তো আছেই। আছে—রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, তারক ও লাটু। গৃহী ভক্তরাও এসেছে—

এসেছে, বলরাম, গিরিশ, ঈশান ও রামচন্দ্র।

এলো বালক সন্ন্যাসীরাও—

এলো স্কুল কলেজ ছেড়ে। পড়ে থাকে তারা বাড়ীঘর ভুলে।

জেগে থাকে শঙ্কাকুল মন লয়ে।

সেবা করে যাচ্ছে সবাই মিলে।

ওদিকে ছেলেদের বাবা, মা ও পরিজনবর্গ যে যার ভাবনা নিয়ে মগ্ন।

দেখতে আসে তাদের সুকুমার সন্তানদের। মনে তাদেরও শঙ্কা। তবে তা ঠাকুরের জন্যে নয়—

শঙ্কা, অন্ধের সন্তানদের জন্যে।—কি জানি, আর বুঝি ঘরে ওরা ফিরবে না!

এমন কত ভাবনা তাদের মনে।

ছেলেরা এসে সব কথা খুলে বলে নরেন্দ্রনাথের কাছে—

বলে,—আমার বাবা এসেছিলেন আমাদের ফিরিয়ে নিতে ঘরে। মা তো কেঁদে কেঁদে আকুল।

নরেন বললে,—ওরা যখন আসে, আমাকে ডেকে দিস। আমি কথা বলব 'খন।

ঠাকুরের অবস্থা দিন দিন বড় জটিল হয়ে এলো। শ্রীমা নিজ হাতে সেবা করছেন। এসেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী। আছে তাদের সঙ্গে স্ত্রী-ভক্তরাও। সেবার ত্রুটি নেই—

নেই ওষুধ পত্রের বালাই।

কিন্তু কি হবে তাতে?

যোগী যেন বসেছেন মহাযোগে। আর ফিরবেন না যেন ভাবের ঘর থেকে স্বভাবের সংসারে।

ওরা যে দিকে তাকায়, দেখে যেন আঁধারের প্রারব্ধ যৌবন। প্রাণ ওঠে কেঁদে।

দিনের পর আসে রাত। ভোর হয় রাত। দিনের বুকে পড়ে বিষাদের হিম-মলিন ছায়া।

মন ভেঙ্গে পড়ে সবার।

নরেন ঘুরে ঘুরে যায়। করুণ আঁখি পাতে প্রত্যক্ষ করে ঠাকুরের অঙ্গ-কান্তি। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে কাতর ভাবে তাকায় নরেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে।

বড় বিপদে পড়েছে নরেন। গ্রহণ করবেন না ঠাকুর নরেন্দ্রের সেবা। অনেকবার এগিয়ে গেছে নরেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ কিছুতেই সম্মতি জানালেন না।

বললেন—ওরে, "তোর পথ আলাদা।"

সে কি?

বুঝি বা রামকৃষ্ণের স্মরণে সজাগ হয়ে ওঠে নরেন্দ্রের ঋষিকল্প রূপ। অপূর্ব্ব দর্শনের ধ্যানগম্ভীর দেবদুর্লভ মূর্ত্তি।

তাই বুঝি অমন ভাব।

বহু কষ্টে নরেন তার আকুল মনকে আটকে রাখে রুদ্ধ কারার অন্তরালে। দেখাশোনা করে ঠাকুরের পথ্যাপথ্য, সেবা, শুশ্রূষা। একটু ত্রুটী ঘটতে দেয় না কোন কাজে।

তারপরে আবার সতীর্থদের নিয়ে বসে—

বসে শাস্ত্র আলোচনা করতে। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম পুস্তক খুলে কত চর্চ্চা, কত অধ্যয়ন চলতে থাকে।

এ যেন এক মহাভাবের মন্দির। ভাব-সাম্যের দ্যোতনায় কাশীপুরের মঠ হয়ে উঠেছে জ্ঞান মিনার। ভক্তভ্রমর গুনগুনিয়ে আসে, আসে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুক্ষরা প্রেম মদিরা পান করতে। আহরণ করতে আসে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যে যার মত ধ্যান, জপ ও কীর্ত্তন করে চলেছে—

কিন্তু নরেন?

নরেন একাগ্রচিত্তে চিন্ময় তনু শিব সুন্দরের স্মরণ সোহাগে ভেসে ভেসে যাচ্ছে—

ভেসে যাচ্ছে আলোর রাজ্যে।

ভাষা-মৌন এ ভাব-তরঙ্গ। বর্ণনাতীত এ উৎকণ্ঠা।

ঘন যাম। রাত্রির প্রহরগুলো নামে। নীরব নিথর চতুর্দ্দিক। কেবল জাগে আকাশে তারা, বনে মলয়, আর গঙ্গায় সঙ্গীত।

আর সব নীরব।

চলল নরেন—

চলল কাশীপুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে। চলল পঞ্চবটী মূলে।

কেন?

ধ্যান করতে। নিভৃতে নির্জ্জনে দুটো প্রাণের কথা বলতে। এমনি কেটে গেল কত রাতের পরে রাত।

ঠাকুরের শরীর একটু ভালোর দিকে। ভক্তবৃন্দকে বৈষ্ণব কথা শুনাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। বলছেন, কেমন করে বৈষ্ণব হওয়া যায়। ভক্তবৃন্দ তাকিয়ে আছে অপলক নয়নে।

ঠাকুর বলছেন,—"তিনটি বিষয় পালন করলে বৈষ্ণব হওয়া যায়—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পুজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম ও নামী অভেদ জেনে সর্ব্বদা অনুরাগের সাথে নাম করবে। সেইরূপ ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ

ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্ব্বদা সাধু ভক্তদের শ্রদ্ধা ও পুজা করবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার—একথা ধারণা করে সর্ব্বজীবে দয়া—"

বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

বিরতি।

একটু ফিরে এলো জ্ঞান।

বললেন আবার,—"জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি। দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

বনের বেদান্তকে আনো ঘরে। শুষ্ক কঠোর বেদান্ত জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দাও ভক্তি ও ভালবাসার অনন্ত উৎসটি। বনে গিয়ে কি হবে? এই মহামানবের তীর্থ ছেড়ে কোথাও যাবার দরকার নেই! জগৎ মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় খণ্ড—যদি সেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী জগদ্ধাত্রী, জগজ্জননী এসে ধরা দেন। ওরে, এ মাটিকেও খাঁটি করে তোলা যায়। ধরা দেয় এসে বিশ্ব ক্ষুদ্র চিঠিতেও। কেমন করে? যদি থাকে সাধনা। থাকে যদি প্রাণ। অনুভূতি। আর অনুরাগ।

সংসারের সকল কাজের ভেতরে প্রত্যক্ষ করতে হবে মঙ্গলময়ীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। কর্ম্মমুখর মানুষ চলুক তার কর্ম্মপথে। ঝরুক তার গায়ে ঘাম। দেখতে হবে ঐ ঘর্ম্মাক্ত রক্তমাংসের দেহধারী জীবটিকেই শিবজ্ঞানে। প্রত্যক্ষ করতে হবে তার মাঝে অনন্তকে। জীবের জীবনেই শিবের বসতি। তার সেবা। নরনারায়ণের পূজা। চিদানন্দময় ঈশ্বরের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি কর মানুষের দেহ ব্রহ্মাণ্ডে। মন তবে হয়ে যাবে শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত। দয়ার মন নিয়ে নয়—সেবার পবিত্র প্রবৃত্তি দিয়ে নারায়ণের পুজন, ভজন কর।

ডেকে বললেন এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ—ডেকে বললেন ভক্তদের—সময় হয়েছে, তোদের সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে।

এলো সে শুভ দিনের পবিত্র লগনটি।

দিলেন রামকৃষ্ণ সকলের হাতে গৈরিক বসন। ডাকলেন নরেন্দ্রকে। দলপতি নরেন। ওরে ডাকবে না তো আর কারে ডাকবে?

বললেন—"তোমরা সম্পূর্ণ নিরভিমান হয়ে ভিক্ষার ঝুলিস্কন্ধে রাজপথে ভিক্ষা করতে পারবে কি?"

এক বাক্যে জানাল সম্মতি।

তরুণ সন্ন্যাসীর দল পরল গৈরিক। মুণ্ডিত করল মস্তক। স্কন্ধে নিলো ভিক্ষার ঝুলি। বের হোল পথে। ভিক্ষা মাগ্‌তে লাগল দ্বার হোতে দ্বারে।

কোথায় যৌবন, আর কোথায় বিলাস, আলস, আরাম?

সব অর্পণ করেছে তারা—

অর্পণ করেছে ঠাকুরের শ্রীচরণকমলে। ঈশ্বর উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায় মায়া মোহের বাঁধনকে ফেলেছে ছিড়ে। পারেনি ওদের গতিছন্দকে ম্লান করতে মায়ের আঁখিজল। প্রিয়ার বাহুডোর। আর পিতার স্নেহ-বন্ধন। ওরা এসেছে অন্তরের দীপ জ্বেলে অনন্তের সন্ধান জানতে। নিয়ে এলো ঝোলা ভরে ভিক্ষা।

রামকৃষ্ণের কি আনন্দ আর ধরে!

—হবে, হবে, তোদের হবে। মাকে জানবি, মাকে দেখবি, মাকে পাবি।

ভোগ হোল সেই ভিক্ষালব্ধ অন্নে।

সুরু হোল তাদের জীবনে ত্যাগ, তিতিক্ষার সাধনা।

নরেন তাদের মধ্যে প্রধান। আলোচনা করে অতীত যুগ নিয়ে। ভেসে উঠে তার ধ্যান-মানসে ভারতের ঋষিকুল। তন্ময় হয়ে যায় নরেন তাঁদের কথা বলতে বলতে।

সংসারে এসেও যারা হোল না সংসারী, মায়া মোহ ভোগ বিলাসে রইল না যারা আবদ্ধ হয়ে, নরেনের স্মরণ হয় তাঁদের কথা। বিভোর মন অবগাহন করে ভাব সমুদ্রে। সতীর্থদের কাছে বলে, বলে সেই ত্যাগ, তিতিক্ষার জ্বলন্ত, জাগ্রত প্রতীক ভগবান বুদ্ধদেবের কথা।

—মানুষের দেহতরী নিয়ত আবর্ত্তিত হচ্ছে। আবর্ত্তিত হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা দুঃখের পাকে পাকে। ভব-সাগরের একটানা স্রোত চলেছে মানুষের জীবন-তরীকে বিধ্বস্ত করে। সুখ নেই। শান্তি নেই। নেই ভোগ বিরতির লক্ষণ। কান্না, আর্ত্তি, বেদনা—এই তো সংসার। জীবকুলের জীবনকে নির্ম্মম পেষণে টানছে কেবল প্রবৃত্তির পথে। তাই তো এতো দুঃখ, এতো ক্লেশ।

ভগবান বুদ্ধের মন উঠল কেঁদে। মানুষের দুঃখে তাঁর অন্তরে জাগল সাড়া। পরলেন রাজপুত্র ছিন্ন কন্থা। ত্যাগ করলেন সংসার। ঐহিক প্রহারের উজানে বসলেন মুখ ফিরিয়ে। ধরলেন হাল উজানে। প্রবৃত্তির পথকে রুদ্ধ করে যাত্রা করলেন, যাত্রা করলেন তিনি নিবৃত্তির দেশে। যেখানে নেই হাহাকার। নেই কান্না, কাকলি, বেদনা আর্ত্তি। সেই জন্ম-মৃত্যুর উর্দ্ধে মহা

তীর্থের কূলে গিয়ে ভিড়াবেন তাঁর তরী। সুরু হোল তাঁর জীবনে এক মহা যাত্রা—

সুরু হোল ব্রহ্মবিহার।

ব্রহ্মবিহার কি ?

বললেন বুদ্ধদেব—'মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে

এবংপি সব্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।'

মাতা যথা পুত্রকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, রক্ষা করেন, ঠিক তেমনি প্রেম, মৈত্রী ও ভালোবাসা জন্মাবে সবার অন্তরে সর্ব্বলোকের জন্যে।

শাট্যায়নীয়োপনিষৎ বলেন—

'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।'

মনই মানুষের বন্ধন। আবার মনই মানুষের মুক্তি।

সাধন করতে হবে মনের। ডুব দিতে হবে মনের গহনে। ভাসতে হবে আত্মানন্দে।

আবার মহাযান বৌদ্ধেরা চললেন 'পরাবৃত্তির পথে'। এই পরাবৃত্তির পথ ধরেই যেতে হয় 'উর্দ্ধ স্রোতে'। লাভ করতে হয় বুদ্ধত্ব। 'মহাযান-সুত্রালঙ্কার' গ্রন্থে বুদ্ধের বিভুত্ব লাভের অপূর্ব্ব বর্ণনা রয়েছে। বলেছেন সেখানে—

'পঞ্চেন্দ্রিয়পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরং।..........

মনসোঽপি পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরং।......

বিকল্পস্য পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরং..........

প্রতিষ্ঠায়াঃ পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরং।...........

মৈথুনস্য পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরং।.........

বুদ্ধের বিভুত্ব লাভ হোল—

বিভুত্ব লাভ হোল এই 'পরাবৃত্তির' পথে।

প্রবৃত্তির পথ থেকে নিবৃত্তির পথে ফিরে এসো। একেবারে মোড় ঘুরে দিক পরিবর্ত্তন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে ফিরিয়ে দিতে হবে বিপরীত মুখে। তার পরে হাল ধরে উজানে চালাতে হবে তরী। ফিরিয়ে আনতে হবে মনকে—ফিরিয়ে আনতে হবে মনকে স্থূল জৈবিক জাঁকজমক থেকে। জানতে হবে অন্তরকে। জ্বালতে হবে দীপ পরাবৃত্তির পথে। এইতো বুদ্ধের বাণী।

নরেন ভগবান বুদ্ধের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল চোখ। আবেগে, অনুরাগে তন্ময় নরেন। শরণাগত হোল ভগবান বুদ্ধের। আকুল হয়ে গেল মন। যাবে নরেন বুদ্ধগয়ায়। সঙ্গে যাচ্ছে তারক (স্বামী শিবানন্দ) ও কালী (স্বামী অভেদানন্দ)।

যাত্রা করল তিন সতীর্থ—

যাত্রা করল বুদ্ধগয়ার পথে। কেউ জানে না। কেবল তিনজন ওরা গভীর রাত্রির নির্জ্জনতায় পার হয়ে এলো গঙ্গা। বালী ষ্টেশন থেকে উঠল রেলগাড়িতে।

এপ্রিলের রুদ্র দিন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। এলো ওরা গয়ায়। স্নান করল অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীতে। যাত্রা করল তারা—যাত্রা করল বোধিসত্বের পবিত্র মন্দির দর্শন করতে।

এলো তিন বন্ধু—

এলো বোধিদ্রুম মূলে। নরেন বসল ধ্যানে। বসল তারক আর কালীও। কেটে গেল অনেকটা সময়। ফিরে এলো ওরা চেতনার মহাতীর্থ থেকে, ফিরে এলো কালী ও তারক।

কিন্তু নরেন এখনো ধ্যানস্থ। দুই চোখে গড়িয়ে পড়ছে জল। অবাক হয়ে গেল কালী আর তারক।

ডাকল ওরা নরেনকে।—ওগো, কি হোল ? কাঁদছ কেন ?

এ তো কান্না নয়—

আনন্দের রসবন্যা।

ভাঙ্গল নরেনের ধ্যান। ওরা জিজ্ঞেস করল বারে বারে—জিজ্ঞেস করল,—

কেন কাঁদছিলে ?

বলল না কিছু নরেন।

এদিকে তো কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে বিষাদের কালো ছায়া। সতীর্থ-দের চোখে জল। নরেনকে খুঁজে খুঁজে তারা হয়রান হয়ে যাচ্ছে। নেই কালী আর তারকও। চলে গেল কত দিন, কত রাত্রি। কিন্তু ওরা যেন আর পথ খুঁজে পায় না। অবশেষে অগতির গতি, সেই মানসপতি শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে হাজির হোল তারা। বলল অশ্রুসজল নয়নে—পাওয়া যাচ্ছে না নরেনকে। কালী আর তারকও নেই !

একটু হাসলেন রামকৃষ্ণ। তাকিয়ে রইল ওরা মহা উৎকণ্ঠা নিয়ে। বললেন অভয় দিয়ে—"ব্যস্ত হোসনে; সে ফিরে এলো বলে; তার কি এ জায়গা ছেড়ে থাকবার যো আছে?

অন্তর্যামী রাখেন তার মনের মানুষের খোঁজ। বসে আছেন জাল ছড়িয়ে। টান দিলেই উপস্থিতি। এ এক মহা আকর্ষণ। মহামিলন তীর্থ। এখানে না এসে কি আর উপায় আছে। ফিরে এলো নরেন, ফিরে এলো কালী আর তারক। পড়ে গেল আনন্দের সাড়া।

—নরেন এসেছে! নরেন এসেছে!

কি নিয়ে এলো নরেন বুদ্ধগয়া থেকে?

নিয়ে এলো প্রণতির দীক্ষা, আত্মসংহতি, আর প্রভুপদে অবিচল বিশ্বাস।

কিন্তু মন কি হয়েছে শান্ত?

না!

কেন?

চায় নরেন আত্মদর্শন! আত্মোপলব্ধি।

তীব্র তৃষা! তীব্র তন্‌হা নরেনের অন্তরে। যেন ঝড় খেলে যাচ্ছে প্রবল বেগে। কিন্তু পথ না মাড়িয়ে কে কবে পেরেছিল উঠতে কৈলাশ ধামে? নরেন মানে না সে কথা। অনাদি কালের স্রোতে ভেসে ভেসে একদিন তার তটতীর্থে উপনীত হবার লোক নয় নরেন।

—আজই চাই। এখনই পেতে হবে।

পাগল মন। মানে না ছন্দ। রাখে না অপেক্ষা ধ্বনির প্রতিধ্বনির। বলে কিনা—দর্শন, আর সমাধি। চাই সেই মধুর রূপের দর্শন।

অধীর আকুলতা। কঠোর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।

কাশীপুরের বাগান বাড়ী। প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি। সম্মুখে নরেন্দ্রনাথ। ধ্যানস্থ যোগিবর। রুদ্র সন্ন্যাসী করছে রুদ্রের তপস্যা। বহুক্ষণ অতীত প্রায়। হঠাৎ নরেন উঠল চমকে। যেন অনুভব করল নরেন—

অনুভব করল, যেন এক মহাশক্তির জাগরণ হয়েছে তার অন্তরে। ঘটেছে দিব্য শক্তির স্ফুরণ।

চমকে উঠল আবার।

দেখছে নরেন রামকৃষ্ণকে—

দেখছে, একটু স্পর্শের হর্ষে অনেক বন্ধ্যা মনে ফলেছে ফসল।

পাষাণ অন্তরে এসেছে করুণার বিগলিত ধারা।

তবে কি তা নরেন্দ্রের অধিকারেও এলো ?

কিন্তু বিচার না করে বিশ্বাসই বা করবে কেমন করে ? পরীক্ষা করে তবে তো আস্থা স্থাপন।

সম্মুখে এক সতীর্থ ধ্যানস্থ। নরেন করল পরীক্ষার প্রথম পাত্র তাকেই। স্পর্শ করল। চমকে উঠল সতীর্থ। একটা তড়িৎ তরঙ্গ খেলে গেল তার দেহ-মনে। খণ্ডে দর্শন হোল অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের। ভাণ্ডে এসে ধরা দিল বিশ্ব! মুহূর্ত্তে তার দ্বৈত সত্বা মিলিয়ে গেল অদ্বৈতের অনন্তে। সাকারবাদী হয়ে গেল জ্ঞানযোগী। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনলেন নরেনের কাণ্ড। ডাকলেন নরেন্দ্রনাথকে। বললেন একটু রুষ্ট হয়ে,—"না জমতেই খরচ ? আজ ওর কি অনিষ্টটা করলি বল দিকি ?"

প্রথমে সঞ্চয়। তার পরে লুট বাহার। যমুনা বহত উজান। জমা হোল না এক কণা, খরচ করে বসলি দাতার মতো। ছিঃ ছিঃ, অমন করতে আছে ?

শিখিয়ে দিলেন নরেনকে—

শিখিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ শক্তি আধান করবার কৌশলটি।

কথায় কথায় বলেন ঠাকুর—

বলেন কিনা নরেন আমার "সাক্ষাৎ নারায়ণ—জীবোদ্ধারের জন্য দেহ ধারণ করেছে।"

কিন্তু নারায়ণ যে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে, আনত শিরে।

কেন ?

কৃপা চায়। চায় দয়া।

—ওগো, তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি চাই আমার অন্তরে। নেমে এসো তপ্ত মন-মরুতে শ্রাবণের ধারা বর্ষণের মতো।

গভীর রাত্রি। কেউ নেই জেগে। নরেন দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণের সম্মুখে। শুয়ে আছেন ঠাকুর। রোগজীর্ণ দেহ। কিন্তু নিদ্‌হারা নয়ন। নরেন দাঁড়িয়ে তাঁর শিয়রে। দাঁড়িয়ে আছে যেন সমুদ্র শিয়রে দীপ-স্তম্ভটির মত।

এত রাত্রে কেন ?

নির্ব্বিকল্প সমাধি চায় নরেন। এসেছে তার অন্তরের অতৃপ্ত বাসনায় অনন্তের অভিসার কামনা করে। দৃঢ় মন। আজ নরেন আর ফিরে যাবে

না। বলবে। চাইবে। যেমন করে হোক আদায় করবে ঠাকুরের কাছ থেকে অনন্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথ।

বললেন রামকৃষ্ণ,—"কি চাস তুই নরেন?"

নরেন বললে—"শুকদেবের মত সর্ব্বদা নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকতে চাই।"

বীতস্পৃহ ভাব নরেনের সংসারের 'পর। চায় না সে খেলাবার বাঁশী নিয়ে আর কাটাতে দিন। এবারে আরূঢ় হবে সে সুন্দরের ধ্যানে। ভুলে যাবে বাহ্য জগৎ। চলবে তার মানস অভিসার।

কিন্তু রামকৃষ্ণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করতে লাগলেন নরেনকে।

বললেন,—"ছি ছি! তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস? এ তো তুচ্ছ, অতি হীন কথা। নারে, অত ছোট নজর করিস্‌নি। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজাও খাব। সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নিগুর্ণভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্ত্তির ভিতর ঐহিক সম্বন্ধ বোধেও ভোগ করি। এক-ঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর। একাধারে জ্ঞানী আর ভক্ত দুই-ই হ।"

নরেনের কান্না এলো। সিক্ত হোল দুটি চোখ অশ্রুতে। বললে কি না, —"নির্ব্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না, আর যদি তা না হয়, তবে আমি ও সব কিছু করতে পারব না।"

চোখ রাঙ্গিয়ে বলেন ঠাকুর—"তুই কি ইচ্ছায় করবি, মা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। তুই না করিস তোর হাড় করবে।"

আবার কাঁদছে নরেন। ব্যাকুল মন। আকুল বাসনা।—ওগো, চোখ রাঙ্গিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেও আর যাব না। মাথা হেট করেছি তো আশীষ কেড়ে নিলেও নিয়ে যাব। তুমি আমায় উপেক্ষা করো না। দিও না আমার তীব্র তৃষায় বিরতির ছেদ টেনে। শুধু একবার, একবার পেতে দাও মধুর মাধুরী। সুন্দরের দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মনে জাগে আকুলতা। চোখে এল জল। নরেনের কান্না, যেন ব্যথার অঙ্কুশ হয়ে বিঁধে যায় তাঁর অন্তরে। আর পারলেন না রামকৃষ্ণ নিজেকে সামাল দিতে।—এমন আকুলতা লয়ে কেউ তো আসে না! বলে না

তো, আমায় শুকদেবের মত থাকতে দিন্ সচ্চিদানন্দঘন আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে !

"আচ্ছা যা, নির্ব্বিকল্প সমাধি হবে।"

ভয় জাগে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে— যদি নরেন সমাধি-মগ্ন হয়ে চলে যায়, যায় যদি আত্মমুক্তির মোহনায় ? ওর যে অনেক কাজ বাকী ! শুধু নিজের মুক্তি কামনায় বিভোর হোলে চলবে কেন !—ওরে, এ সংসারে যারা মানুষ হয়ে এসেও পেল না মানুষের পবিত্র অধিকার, যারা বঞ্চিত, যাদের কথা কেউ শোনে না, কান্নার অশ্রু মুছিয়ে দিতে একখানা হাতও প্রসারিত হয় না, সেই সবহারাদের মাঝে এসে তুই দাঁড়া। যুগযুগ ধরে যারা নিজেদের মুখের গ্রাস দিয়ে পুষ্ট করেছে ধনীর মেদ মজ্জা, দেহের রক্ত জল করে যুগিয়েছে আরামের শয্যা, বিলাসেব ঐশ্বর্য্য—যারা এক হাতে মৃত্যুকে রুখে আর এক হাতে ভরে দিয়েছে সর্ব্বশোষী-দের অন্নের গোলা, কাঞ্চনের ভাণ্ডার, তুই এগিয়ে আসবিনে তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে ? আসবিনে তুই সেই মৃত্যুপথযাত্রীদের মরণ মিছিলকে রুখতে ?

দিগন্ত বিসারিত ছায়াশীতল পল্লব প্রফুল্ল বনস্পতির মত ছড়িয়ে দে, ছড়িয়ে দে তোর ছায়া মধুর শান্ত স্নিগ্ধ শাখা প্রশাখা। ওরা আসুক, তাপিত লাঞ্ছিতের দল—

আসুক খরতপ্ত নিদাঘের দাবদাহ থেকে তোর প্রশান্ত প্রচ্ছায়। তাদের পথ দেখিয়ে দে ! তাদের জাগরণের মন্ত্র শোনা ! ডেকে ডেকে বল—এবারে আত্মজাগৃতি চাই, চাই মুক্তি আর স্বাধীনতার মুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র অধিকার।

কেবল মুক্তি মুক্তি করছিস স্বার্থপরের মত ? "নিজের মুক্তি কামনা, সেও ত কামনা, সেও ত স্বার্থপরতা। নিজের জন্য সমাধি সুখ লাভ, সেও ত নিছক ব্যক্তিগত কথা। বিপুল বিশ্বে নিরবধি কালপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায় ?.........তুই হবি বিরাট বটবৃক্ষের মত, শত সহস্র যোজন বিস্তৃত হবে তোর শাখা প্রশাখা।

সংসারে যারা দুঃখ-পীড়িত দুর্ব্বল, ব্যথিত আর্ত্ত যারা, তারা এসে তোর জীবন-মহীরুহে স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার শক্তি লাভ করবে। সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত হবে তোর জীবন। তোর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে সংশয় পীড়িত নর-নরী সাহস সঞ্চয় করবে, বল লাভ করবে।"

স্মরণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণীকে।

বললেন ছল ছল নয়নে,—"ওর অদ্বৈত অনুভূতি তোর মায়াশক্তি দিয়ে আবরণ করে রাখ মা, আমার ওকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

—ওকে তুই ঘরছাড়া করিসনে মা। দিসনে ভুলিয়ে জগৎ সংসার।

*   *   *   *

সন্ধ্যা সমাচ্ছন্ন ধরণী—

রাত্রির ধারা নামে ধীরে। ঘনিয়ে এলো ঘোর। ক্রমে লীন হয়ে গেল দিনের দ্যুতি। কাশীপুরের বাগান বাড়ী হয়ে গেল অন্ধকার। নরেন বসেছে ধ্যানে। তন্ময় সে। নেই বহির্বিশ্বের দিকে কোন খেয়াল। আত্মরতির সুখ সায়রে নরেন নিত্য সুখে মগ্ন। ক্রমে হোল তার নির্ব্বিকল্প সমাধি।

মায়ার ছায়া নেই। নেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। সব যেন এক এক করে মিলিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্তে, শূন্যে।

নরেনের অন্তর যেন আলোকোজ্জ্বল শরৎপ্রসন্ন নৈশাকাশের মত। কেবল অনুভূতির অশরীরী সূক্ষ্মতা। ভাবমগ্ন নরেন। মহাভাবের তরঙ্গ সায়রে সুন্দরের সঙ্গম-সুখে নরেন আত্মভোলা।

কেটে গেল বহুক্ষণ।

হঠাৎ ভেসে এলো—

ভেসে এলো সতীর্থদের কর্ণে নরেন্দ্রের কান্নার কাকলি।

নরেন কাঁদছে। অঝোরে ঝরছে চোখের জল।

অবাক সবাই। তাকায় এদিক সেদিক!

—কে, কে কাঁদে? এ যে নরেন!

এলো সবাই এগিয়ে, এগিয়ে এলো নরেনের কাছে। বলছে নরেন ভাবের ঘোরে,—"গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল?"

ত্রস্ত হরিণের মত ছুটে এলো গোপাল্।

বললে,—"কেন নরেন, এই যে!"

এমনি কেটে গেল রাত্রির এক প্রহর।

আবার বললে নরেন,—"আমার শরীর কোথায় গেল?"

আবার কান্না।

ওরা ছুটে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। বললে সব কথা খুলে। একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন ঠাকুর। রইলেন চুপটি করে। তারপরে আবার একটু হেসে

হেসে বলতে লাগলেন,—"বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ ঐ রকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন করে তুলছিল।"

ফিরে এলো নরেন অর্দ্ধবাহ্য দশায়। উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়াল ধীরে ধীরে। টলছে এখনো। নয়ন মুদে আসছে থেকে থেকে। ঢুলু ঢুলু ভাব।

এলো শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

মন মায়াশূন্য হোলেও নরেন অনুভব করল—

অনুভব করল, কে যেন টানছে তাকে পিছু পানে। নিয়ে আসছে বাস্তব জগতের ধূলি-ধূসরিত পথে।

ফিরে এলো নরেন। প্রণাম করল শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে। বললেন ঠাকুর,—"কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। এখনকার মত তবে চাবী দেয়া রইল, চাবী আমার হাতে; কাজ শেষ হলে খুলে দেয়া হবে।"

মহামানবের সাগর তীরে নেমে এলো নরেন। করল আত্মোৎসর্গ মানবের কল্যাণ সাধনে। আত্মোৎসর্গ করল জীব-সেবার পবিত্র ব্রতে।

"বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় কর্ম্ম করিব, অপরোক্ষানুভূতি-লব্ধ সত্য প্রচার করিব।"

বললে আবার নরেন,—"সেদিন দেহাদি বুদ্ধির এককালে অভাব হয়েছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরছিলুম। এইরূপ সমাধি কালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের' ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়,—যেন মহাসমুদ্রের জল আর কিছুই নাই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।"

জীবনের অভিসারে প্রেমিকের আগমন হোলে
জেগে ওঠে সুপ্ত শক্তি নিত্যশুদ্ধ 'সহস্রার' দলে,
আমির 'অহং' টুকু নিয়ে যায় আলো বিধুনন
মনে হয় 'ব্রহ্ম' আমি, আমি নিত্য—'তুমিময়' আমিও তখন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—"এই যে ছেলেটিকে দেখছ, এ জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী, এর মত ছেলেরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা কখনও কামিনী কাঞ্চনের মায়ায় বদ্ধ হয় না।"

আবার বললেন—"নরেন আমার শুকদেব, শঙ্কর, ও যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামী বললেন—"স্বামিজীর মধ্যে ঋষির সমাধিতৃষ্ণা, শুকের মায়ারাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের ভক্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল; তাই

ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া এক এক বার এক এক নামে অভিহিত করিতেন।"

রামকৃষ্ণ বলেন—"জীব চার প্রকার—"

কি, কি ?

"বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।"

বদ্ধজীব কি ?

"বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষু জীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না।" আর মুক্ত ও নিত্য জীব ?

"মুক্তজীব,—যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়, যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়-বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্ব্বদা হরি-পাদপদ্ম চিন্তা করে। নিত্যজীব—"যেমন নারদাদি; এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।"

তবে নরেন কোন্ জীব ?

ছিল মুক্তজীব। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে হয়েছে নিত্যজীব। হোল মুক্তে নিত্যে সমন্বয়।

আর কেন ? পাল তুলে দাও আকাশে। ভেসে আসছে মলয় অনিল। কী হবে আর চোখ বুজে ধ্যান করে ! ঝড়ের রাতে শক্ত করে ধরো, ধরো তোমার হালের বৈঠা। অন্ধকারের গাঢ় মেঘ অপসৃত হয়ে যাক। আসুক আলোর দীধিতি। অবসাদ-গ্রস্ত মানুষেরা জাগুক। মানুষের দাবী নিয়ে এগিয়ে যাক। এগিয়ে যাক তন্দ্রামদির আচ্ছন্নতার বাঁক কাটিয়ে মুক্তির মোহনায়। বিস্মরণের মঞ্জুষা ভরে যাক চেতনার রস-সুধায়।

২৪

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। জুলাই মাস।

বিষণ্ণ আকাশ। বর্ষণমুখর দিন, মেঘমন্দ্রিত রাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায়। কথা বলেন ফিস্ ফিস্ করে। রুচি নেই মুখে। কিচ্ছু পারেন না খেতে। কেবল জল বার্লি। তা গিলতেও কষ্ট হচ্ছে। বিষে, ব্যথায় জর্জ্জরিত গলা।

বললেন এক সময়—"ওরে, একখানা পঞ্জিকা নিয়ে আয়।"

ওদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। নিয়ে এলো পঞ্জিকা।

বললেন রামকৃষ্ণ, "—এখন পড় দেখি—"

শুনছেন আবিষ্ট চিত্তে। শুনছেন দিন তারিখগুলো শ্রীরামকৃষ্ণ। হঠাৎ বললেন থাম্‌তে।

কোথায়?

সেই শ্রাবণ সংক্রান্তির বাদল-ঝরা দিনে।

বেজে উঠল ব্যথার বাঁশী। ভক্তদের চোখে এলো জল। বুঝল তারা, বিদায়-গোধূলি প্রত্যাসন্ন। দিনরাত জেগে থাকে ভক্তবৃন্দ—জেগে থাকে অতন্দ্রিত প্রহরীর মত রামকৃষ্ণের শিয়রে।

নরেন যেন নীড়হারা নিশার পাখীটি। মন ভেঙ্গেছে। মুখে নেই অন্ন। ঘুম নেই চোখে। উন্মাদ, অশান্ত নরেন। ছুটে যায় বাগানে। ছুটে যায় গভীর রাতে। তাকায় এদিক ওদিক। দেখে রাত্রির অপচ্ছায়া—দেখে মৃত্যুর বিকট ভঙ্গি। মন যায় আরো ভেঙ্গে। থাকে না বাহ্য জ্ঞান।

সংজ্ঞাহীন নরেনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "রাম, রাম"।

রাতের ঘুম ভাঙ্গে—

জাগে বনে মর্ম্মরী। নদী কাঁদে কলনাদে। ডেকে যায় পাখী। নরেন ছুটে চলেছে বনে বনে। খেয়াল নেই। নেই বাহ্যজ্ঞান। আবার সেই কণ্ঠ—"রাম রাম"।

ভাবছে নরেন—

ভাবছে, যদি রাম নামে ঠাকুরের রোগজীর্ণ দেহে একটু শান্তি আসে।

রাত যত গভীর হয় নরেনের কণ্ঠ যায় তত বেড়ে।

এখন রাত কত ?

শেষ যাম। বইছে উষার স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া। দু'একটা পাখী ডেকে গেল। পুবের আকাশে পড়েছে আসন্ন আলোর আল্পনা।

হঠাৎ চম্‌কে উঠলেন রামকৃষ্ণ। ভেসে এলো সেই কণ্ঠ।

—এমন গহন ঘন রাতে কে ডাকছে গলা ছেড়ে ?

ডেকে তুললেন সবাইকে ঠাকুর। বললেন—ওরে, তোরা কোথায় গেলিরে! রাত যে ভোর করে দিলে। ঐ শোন, এখনো—"রাম রাম বলে চীৎকার করছে। সারাটা রাতই বুঝি অমন ছুটাছুটি করেছে। যা, নরেনকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।"

ঘর্ম্মাক্ত দেহ। অশ্রুসিক্ত নয়ন। কণ্ঠে রাম নাম। ভাববিহ্বল নরেন। এখনো কাটেনি তার নেশার ঘোর।

ওরা ধরে নিয়ে এলো নরেনকে—

নিয়ে এলো ঠাকুর সমীপে।

ডাকলেন ঠাকুর,—"হ্যাঁরে, তুই অমন কচ্ছিস কেনে? ওতে কি হবে?"

তাকাল নরেন।

বললেন আবার রামকৃষ্ণ—"দ্যাখ, তুই এখন যেমন কচ্ছিস এমনি বারটা বছর (আমার) মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি বাবা!"

বজ্রাহত হোল নরেন। তার অন্তরের প্রদীপ্ত শিখাটি যেন স্তিমিত হয়ে এলো। অবসন্ন নরেন। শুনল ঠাকুরের বিদায় বিধুর বারতা।

দিন যায়। রাত আসে।

কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে নামে একটা হিমাক্ত স্তব্ধতা।

প্রাণ ঢেলে সেবা করছে ভক্তবৃন্দ—সেবা করছে শ্রীগুরুর শিয়রে দাঁড়িয়ে। কখন যে তামসী শর্ব্বরীর বুক চিরে উঁকি মারে প্রভাতের অরুণ, জ্ঞান থাকে না। আবার কখন যে রুদ্র দীপ্ত সূর্য্যটি স্তিমিত হয়ে শুয়ে পড়ে রাতের অঙ্ক, হুঁস থাকে না।

ঠাকুর ডাকলেন নরেনকে। নরেন এলে দ্বার রুদ্ধ করে দিতে বললেন রামকৃষ্ণ। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কত কথা বলেন নরেনকে—এমনি তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হোল। দোর খুলে বাইরে এলো নরেন। এমন ডাক প্রায় প্রত্যহই ডাকেন ঠাকুর নরেনকে এখন।

দিন এসেছে ফুরিয়ে। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা মাস। এলো শ্রাবণ।

ডাকলেন রামকৃষ্ণ নরেনকে।

নরেন এলো—

এলো যেন বিষণ্ণ আকাশের বুকে গোধূলির মন্থর আভাসের মত।

এ যেন নদীর বুকে ভাঁটার শব্দহীন প্রবাহটি।

আজ কি বার?

শুক্রবার।

তারিখ?

২৯শে শ্রাবণ।

বসল নরেন ঠাকুরের পদ-প্রচ্ছায়। কথা বলছেন, শেষ কথা বলে যাচ্ছেন নরেনকে। হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন ঠাকুর।

নরেন দেখছে তখন—

দেখছে, জ্যোতিঃঘন তনু শিবসুন্দর সম্মুখে। দেহে উজ্জ্বল কান্তি। নয়নে প্রশান্ত প্রদীপ্তি। চরণে চারুচন্দ্রিকার প্রকাশ। বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটি তড়িৎ শলাকা। হয়ে গেল আলোয় আলোময় চতুর্দ্দিক। তার মাঝ থেকে সূক্ষ্ম একটি তেজঃরশ্মি স্পন্দিত হয়ে ক্রমে এসে ঢুকল নরেনের দেহমধ্যে। তন্ময় নরেন। লুপ্ত হোল তারও বাহ্যজ্ঞান।

কেটে গেল অনেকটা সময়।

ফিরে এলো নরেনের চেতনা। কি দেখছে নরেন এবারে?

দেখছে, শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন।

অবাক্ নরেন। তাকিয়ে আছে নিবিষ্ট চিত্তে।

বললেন রামকৃষ্ণ—ওরে. "আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হোলে পরে ফি[illegible] যাবি।"

নীরব নরেন। তার চোখেও জল।

আবার বললেন ঠাকুর—"দেখ্ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দি[illegible] যাচ্ছি। কারণ তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালোবে[illegible] যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে এক স্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দে[illegible] তার ব্যবস্থা করবি।"

বজ্রদৃঢ় নরেন উঠল মর্মরিয়ে বোশেখের তরু-পল্লবের মতো। এ যেন মরুর বুকে বারির বন্যা। থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে তার দেহ। চলে এলো নরেন সেখান থেকে।

এক ভক্ত এনে দিলে এক টুকরো কাগজ নরেনকে।

লেখা রয়েছে—"নরেন লোকশিক্ষা দিবে।"

বৈরাগী মন। আর চায় না আবদ্ধ থাকতে। উড়ে যেতে চায়—ঐ দিগন্ত-বিসারী নীলনভ কোণে।

বললে নরেন—"আমি পারব না।"

অন্তিম কণ্ঠে বললেন ঠাকুর—"করতেই হবে, তোর ঘাড় করবে।"

৩১শে শ্রাবণ।

রোববার।

গভীর রাত্রি।

মা সারদামণি বসে আছেন ঠাকুরের পার্শ্বে। ভক্তবৃন্দ পলকহীন নয়নে তাকিয়ে ঠাকুরের দিকে।

নরেন দাঁড়িয়ে।

ভাবছে নরেন—

ভাবছে একমনে,—"আচ্ছা, উনি তো অনেক সময়ে নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই সময় যদি বলতে পারেন 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।"

ওগো, কর আমার প্রশ্নের সমাধান। আভাসিত হও আমার ধ্যান মানসে। যদি তুমি অন্তর্য্যামী, তবে আমার অন্তর নিরুদ্ধ প্রশ্নের জবাব দাও। তোমার সত্য স্বরূপ স্ফুরিত হোক আমার দেহ-মনে। আর দোলায়ো না সংশয় সন্দেহের বিভ্রমে। ঠাকুর বুঝলেন নরেনের মন।

বলতে লাগলেন,—"এখনও তোর জ্ঞান হোল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।"

এখনও খুঁজ্‌ছিস শব্দার্থ? ওরে, মর্ম্মার্থ খোঁজ। অন্তরকে জান। হংসের মতো জলটুকু ছেড়ে ক্ষীরটুকু নে। নে, পিঁপড়ের মতো ধূলি ফেলে চিনিটুকু।

যেন বজ্রপাত হোল কক্ষ মধ্যে। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল নরেন। গঙ্গা থেকে যেন একটা খ্যাপা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল, আছড়ে পড়ল প্রবল বেগে।

নরেনের চোখে এলো জল। নিথর রাত্রির মত তাকিয়ে রইল ঠাকুরের দিকে।

গম্ভীর রাত। মিলিয়ে যায়নি এখনো তারার আভাতি। জোনাকীর দীপান্বিতা জ্বলছে বন-বীথির ফাঁকে ফাঁকে। পুবের আকাশ থেকে আছড়ে পড়ছে এসে গঙ্গার হিমাক্ত হাওয়া। সবাই সজাগ। বিনিদ্র রাত্রির কোলে অতন্দ্র শোক-শান্ত ভক্তবৃন্দ। কেবল প্রবল কম্পন জেগেছে দেহ-মনে।

মহাযোগী মহাধ্যানে হোল সমাধি-মগ্ন।

রাত এগারোটা।

ওরা আর্ত্তনাদ করে উঠল। উঠল চীৎকার করে।

কত কীর্ত্তন। নাম গান। কত না কান্না—

কিন্তু আর ভাঙল না সে অনন্ত মগ্নতা। জীবন-মুক্ত তাপস মহাধ্যানে নিমগ্ন হোলেন। চলে গেল তাঁর অশরীরী আত্মাটি দিব্য ধামে। অনন্ত লোকে।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

২৫

গঙ্গার বুকে কলনাদ। বনের বুকে মর্ম্মরী। কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে স্তব্ধ, শান্ত নীরবতা।

শান্তি নেই কারো মনে। যে দিকে তাকায়, দেখে যেন আঁধারের যৌবন। বিষণ্ণতার মালিন্য।

গৃহী ভক্তবৃন্দ আসে। বসে আসর জমিয়ে। বলে ঠাকুরের প্রসঙ্গ! কখনো গান। কীর্ত্তন। আবার কখনো ধ্যান, সাধন। কখনো বা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কাব্যের আলোচনা। এমনি করে কাটছে দুঃখের দিনগুলো।

বলল একদিন নরেন,—"লোকে ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলে—সে সব আংশিক সত্যমাত্র। যে যেমন আধার সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে আলোচনা কচ্ছে। ঐরূপ করাটি মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তদের মধ্যে এরূপ যদি কেউ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলেছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বলছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেহ বলছেন—চৈতন্যদেব নারদীয় ভক্তি প্রচার কত্তে জন্মেছিলেন, কেহ বলছেন—সাধন-ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ। কেহ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুনবি,—ও সব কথায় কান দিবিনে। তিনি যে কি, কত কত পূর্ব্বগ অবতারের জমাট বাঁধা ভাব-রাজ্যের রাজা, তা জীবনব্যাপী তপস্যা করেও এক চুল বুঝতে পাল্লুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়।

যে যেমন আধার তাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন, তার ভাব-সমুদ্রের এক বিন্দু উচ্ছ্বাসের ধারণা কত্তে পেলে মানুষ তখনই দেবতা হয়ে যায়। সর্ব্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকে বোঝ, ইনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়।"

কী গভীর ভক্তি, কত সুন্দর করে বলছে নরেন্দ্রনাথ। কেটে গেছে অনেকটা সময়, তবু কেউ উঠছে না। শুনছে নিবিষ্ট মনে।

ভগবান আসেন ভক্তের আকুল কান্নায় সাড়া দিয়ে। আসেন তিনি পাপক্ষত দুনিয়ায় সত্যের দীপ জ্বালতে। মোহান্ধ মানুষের মনে চেতনার চন্দ্র চন্দ্রিকা হয়ে।

এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম্মের শ্মশান শিয়রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে। শ্রীগৌরাঙ্গ এনে দিলেন মর্ত্তের বুকে ভাবের প্লাবন। ভক্তি-রস বন্যা। ঘরে ঘরে প্রচারিত হোল মহানাম। উদ্‌যাপিত হোল মহাব্রত। মুক্তি পেল মানুষ, মুক্তি পেল পাপপঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে।

বুদ্ধদেব দেখিয়ে গেলেন পরাবৃত্তির পথে উজানে নাও বেয়ে—দেখিয়ে গেলেন মনুষ্য জন্মের চরম সফলতার পথটি। নেমে এলেন রাজপুত্র—

নেমে এলেন কাঙ্গালের কান্নায় পথের ধূলিতে। লাভ করলেন নির্ব্বাণ।

কিন্তু আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ?

তিনি এলেন সমন্বয়ের মহামন্ত্র নিয়ে—'যত মত, তত পথ।'

যার যেমন খুশি ডাকুক। কিছু আসে যায় না তাতে। অখিল মধুরের অধিপতি সবার ডাকেই সাড়া দেন। কেবল পথের দ্বন্দ্ব। কিন্তু উত্তরণ হবে সেই একই তীর্থে। মিলতে হবে গিয়ে একই মহাসমুদ্রে!

বদ্ধপুকুরে যখন জোয়ার আসে, তখন কী হয়?

কিছুটা জল আসে মাটি চুয়িয়ে। কিছুটা আসে সহজ সরল পথে পুকুরের নির্দ্দিষ্ট রাস্তায়। আবার কিছুটা আসে কূল ছাপিয়ে প্লাবন জাগিয়ে। কানায় কানায় ভরে যায় পুকুর। চেনা যায় না এপার ওপার। তখন আর সমুদ্রে পুকুরে ভেদ থাকে না। মিলন হয়ে যায়।

তেমনি ভক্তের অন্তর-সমুদ্রে যখন জেগে ওঠে তন্‌হার তরঙ্গ, তখন সে ধেয়ে যায়। পড়ে গিয়ে মহাসমুদ্রে। সেখানে পুকুরের জল, আর বিলের জলের ভেদ নেই। নেই নদীর স্রোত আর ঝর্ণার ধারায় প্রভেদ। সে ভাণ্ডে বিরাজিত ব্রহ্মাণ্ড। সে খণ্ডে অনন্তের অখণ্ড। সবাই এক। সবাই একই ভাবে ভাব-মৌন।

নীরব হয়ে শুনছে সবাই। শুনছে নরেনের মুখে ঠাকুরের কথা। উঠি উঠি করেও আর ওঠা হচ্ছে না তাদের।

লোকেরা বলবে, তিনি তো মানুষ হয়েই এসেছিলেন। মানুষের কাছে তিনি যদি না মানুষ হয়ে আসেন, তবে তাকে চেনা যায় কি করে? ভক্তের দুয়ারে যে ভগবান আসেন ভিখারীর বেশে। কিন্তু তাকে চিনবার উপায় কি?

চর্ম্মচোখ বুজে মর্ম্ম চোখটি খুলে বস। দেখ তাঁর রূপ। দেখ জীবরূপে তোমার সম্মুখে শিব করেছেন আত্মপ্রকাশ। দেহধারী, দেহ ছাড়ি বসেছেন হৃদ্‌বিহারী হয়ে।

জীব যে ঈশ্বরের প্রতিভাস। ব্রহ্ম বিরাজ করেন জীবের আকারে, জীবের জনতায়। ঐ জীবোপাসনা করতে করতেই ব্রহ্মে সমাহিত হওয়া যায়।

কমলাকান্তের মা, রামপ্রসাদের কন্যা, রাঘবানন্দের স্ত্রী এরাও জীবরূপে এসেছিলেন ভক্তের সম্মুখে।

কিন্তু এরা কারা ?

নারায়ণী। ভগবতী। দেবী।

শক্তি সংহত থাকে চিত্তে। তাকে জাগ্রত করতে পারলে দেখা যায় নরোত্তম রূপটি। চেনা যায় নররূপী নারায়ণকে। মানুষ দেখে কি বুঝবে? বুঝবে কি চোখ দিয়ে চেয়ে চেয়ে? নিয়মকে লঙ্ঘন করেন না তাঁরা। নরোত্তম হোলেও নর হয়ে আসেন তিনি নর-রাজ্যে। বিরাজ করেন ব্রহ্ম ব্রজের কানু হয়ে। খেলেন লীলা খেলা। শক্তির বেহিসেবি খরচ নেই। তিনি তো ভেদ রেখে আসেন না, আসেন তিনি ভেদ ঘুচাতে। ঈশ্বর যদি ঈশ্বর হয়েই নামতেন ধরায়—তবে কি আর মানুষের সঙ্গে জমত তাঁর প্রেমের খেলা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মানুষ হয়ে এলেন। যে তাকে দেখতে জেনেছে, সে হয়েছে ধন্য। আধার ভেদে তাঁর প্রকাশ।

কিন্তু তাঁর স্বরূপ দেখবার উপায় কী ?

সাধন, ভজন আর রমণ। রামকৃষ্ণ প্রেমে রমণ। তবেই দিব্য দর্শন।

এমনি মধুর আলোচনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সাতটি দিন। মাতৃহারা শিশুর মত ওরা অসহায়। কারো চোখে জল। কেউ বা পড়েছে ঘুমিয়ে। কারো বা হয়নি খাওয়া। শৃঙ্খলার ভাব নেই কারো জীবনে। প্রাণ যেন আর রইতে চায় না দেহের খাঁচায় আবদ্ধ।

নরেন পড়ল বিষম ভাবনায়। কেমন করে রাখবে ওদের ধরে। মন নিয়ত এই নিয়েই ভাবে। জানায় ঠাকুরের কাছে আকুল কান্না।—ওগো, তোমার ধন যদি তুমি না রাখো, তবে আমি কেমন করে পারি তাদের ধরে রাখতে ?

রাত গভীর। পায়চারি করছে নরেন, পায়চারি করছে নিঝুম পুরীতে। বাইরে কেউ নেই। শব্দহীন দিগন্ত। জেগে নেই কেউ। নরেন আর এক জন গুরুভাই দুজনে শুধু বাইরে। বিষণ্ণ মন। ভাবছে নরেন, কেমন করে ধরে রাখবে সবাইকে। কি করে রক্ষা করবে ঠাকুরের আদেশ।

এমনি সময় দেখল—

দেখল নরেন, তার দৃষ্টিপথের ক্রান্তিবৃত্তে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। চমকে উঠল।

কে? ভ্রান্তির ছায়াছবি?

না।

তবে?

এ যে দিব্য দেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে—

দাঁড়িয়ে আছেন নরেনের সম্মুখে।

তবুও নরেনের সন্দেহ।—একি চোখের ধাঁধা?

এমনি সময় নরেনের সাথীটি উঠল কেঁদে। বললে—"নরেন, দেখ, দেখ।"

—তবে তোর চোখেও পড়েছে?

হ্যাঁ, ঐ দেখ, আমার শ্রীগুরু, শ্রীরামকৃষ্ণ।

দিয়ে গেলেন ঠাকুর অভয়—

অভয় দিয়ে গেলেন নরেনকে।—নির্ভয় চিত্তে এগিয়ে যাও। অটল থাকো সঙ্কল্পে। জয় মা, জয় মা।

কিছু দিন যেতে না যেতেই ছেড়ে দিতে হোল কাশীপুরের বাগানবাড়ী। ভাড়ার মিয়াদ শেষ হয়েছে। এখন কোথায় যাবে? কেমন করে সবাই মিলে থাকবে একঠাঁই?

ঠাকুরই দিলেন উপায় করে।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ভাড়া করলেন একখানা বাড়ী। ওরা কাশীপুর ছেড়ে চলে এলো বরাহনগরের নতুন বাড়ীতে।

কিন্তু দেখা দিল নতুন সমস্যা।

গৃহী ভক্তরা দিতে লাগল বালক সন্ন্যাসীদের কানে ঘরে ফেরবার মন্ত্র। বলতে লাগল তারা,—"উহারা এখনো বালক, সারা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদিগের নিকট কত আশা ভরসা আছে। অতএব এদিক ওদিক ভাসিয়া বেড়ান অপেক্ষা উহারা বরং গৃহে ফিরিয়া যাউক।"

ফিরে গেল কেহ কেহ ঘরে। আবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল একদলে—বি, এ, পরীক্ষা শেষ হোলেই ফিরে আসব দাদা!

নরেন দিগ্‌ভ্রান্ত পাখীর মত উদ্‌ভ্রান্ত।

অভিভাবকগণ চাইছে যে যার ছেলেকে ফিরিয়ে নিতে ঘরে।

নরেনের দোহাই দিয়ে বলছে তারা—দেখিস না নরেনকে, সেও তো সংসার করছে।

বড় বিপদের মধ্যে পড়েছে নরেন। অন্তর নিরুদ্ধ দহন জ্বালায় নিজেই সে নিয়ত জ্বলে পুড়ে মরছে।

এমনি দিনে দেখা দিল আবার ঠাকুরের দেহাবশেষ নিয়ে আর এক কলহ। গৃহী ভক্ত আর বালক সন্ন্যাসীদের মধ্যে বেধে গেল গোল। রাম দত্ত এবং আরো কয়েকজন গৃহী ভক্ত বললে,—"তোমরা সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, কখন কোথায় থাকবে, তার স্থিরতা নেই। শ্রীগুরুর দেহাবশেষ আমাদের কাছে প্রদান কর, আমরা তা যথাস্থানে সমাহিত করে মন্দির নির্ম্মাণ করব।"

বালক সন্ন্যাসীরা বসল বেঁকে। তারা বলল—গঙ্গার কূলে সমাহিত করব ঠাকুরের দেহাবশেষ।

দুই দলে বাঁধল দ্বন্দ্ব। দেখা দিল তীব্র কলহ। রাম দত্তও কিছুতে ছাড়বে না। আবার বালক সন্ন্যাসীরাও নীরবে সহ্য করবে না।

শশী আর নিরঞ্জন আঁকড়ে রাখল পূত, পবিত্র দেহাবশেষের পাত্রটি। কে চায় এমন বুকের ধন ছেড়ে দিতে?

নরেন দেখল, এ ত বড় কলঙ্কের কথা। লোকেরা করবে নিন্দা। বলবে, ঠাকুর যেতে না যেতেই ভাঙ্গন ধরেছে ওদের মধ্যে। বলল তাই নরেন বালক সন্ন্যাসীদের ডেকে—

"তোরা কি মনে করিস ঠাকুরের দেহাবশেষ অধিকারে থাকলেই তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হওয়া যায়, না উহাই তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ? যদি আমরা তাঁহার প্রকৃত শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া বিবাদ করা অপেক্ষা বরং আমাদের উচিত তাঁহার উপদেশানুযায়ী জীবন গঠন করা। আয়, আমরা সেই চেষ্টা করি।"

সম্মত হোল শশী।

নিয়ে এলো শ্রীগুরুর পূত পবিত্র দেহাবশেষের পূর্ণকুম্ভটি রাম দত্তের কাঁকুরগাছির বাগানে। অবসান হোল দ্বন্দ্বের। সমাহিত করল শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ।

দীর্ঘ দিন কেটে গেল। সে এক-দু বছর নয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে নরেন নিয়ে এলো তা বেলুড়ে। করল সমাহিত।

সুরু হোল আবার নরেনের অভিযান।

বাড়ী বাড়ী দিতে লাগল হানা। বালক সন্ন্যাসীদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে কিনা দুশ্চর তপস্যা! বলতে লাগল নরেন,—ওরে, তোদের পরীক্ষা তো হয়ে গেল, এবারে ফিরে আয়।

"সন্ন্যাসী সঞ্চয়ের কথা ভাববে না, কাল কি খাব—এ চিন্তা করবে না।"

নরেনের এমন ভাব দেখে ছেলেদের অভিভাবকরা তো তেঁতে আগুন। তারা নরেনকে ভয় দেখিয়ে, ধম্‌কে বলে দেয়—আর এসো না তুমি আমাদের বাড়ীতে।

কিন্তু নরেন কি আর দমে?

শত বিঘ্নকে দলে যায় নরেন। বাধাকে করে অতিক্রম। ছেলেদের কানে কানে শুনিয়ে আসে ত্যাগের মন্ত্র।

ফলে হোল কি?

প্রিয়জনদের কাছে হোল অপ্রিয় নরেন।

কিন্তু বালক সন্ন্যাসীরা আসতে লাগল ফিরে—ফিরে এলো মঠে। নরেন'ও আর বাড়ী যায় না এখন। বেশ জমিয়ে বসল আসর। ঘরছাড়া বৈরাগীর দল ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হোল। ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্ম্মের ফেনিল তরঙ্গে। রিক্ত সন্ন্যাসীর দল। কপর্দ্দক শূন্য। দ্বারে দ্বারে ভিখ্ মেগে দিনেরটা দিন জোগার করে যাচ্ছে। এমন করে আর ক' দিন বা চলবে? বড় ভাবনা হোল নরেনের।

যিনি করেছেন ঘরছাড়া, তিনি আবার করে দিলেন পথ।

বলরাম বসু, গিরীশ ঘোষ, মহেন্দ্র গুপ্ত আর সুরেন মিত্তির এরা সবাই এলো এগিয়ে ওদের পাশে।

বললে সুরেন মিত্তির,—"ভাইরে! তোরা কোথায় যাবি? তোদের কোথাও যেতে হবে না, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে না।"

নরেনের বুকে এলো বল। এমন আশ্বাস শুনে দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে লাগল নরেন! যারা এখনো আসেনি ফিরে মঠে, তাদের বাড়ী গিয়ে হানা দিল নরেন।

বলতে লাগল তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে,—"তোরা সব কি জীবনটা একজামিন দিয়েই কাটাবি ঠিক করেছিস? এই কি তাঁর উপদেশ পালন করা। এই কি তাঁর মনোমত কাজ। এই জন্যেই কি তিনি এত কষ্ট সহ্য করে গেলেন! সন্ন্যাসী হয়েছিস, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিস, তবু এক্‌জামিন পাশ করে সংসারের উন্নতি কামনা করিস? ত্যাগ ও ভোগবাসনা কি এক সঙ্গে থাকতে পারে। ধিক্ তোদের। শীগ্‌গির ওসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মঠে চল।"

ধীরে ধীরে ওদের স্মরণ নেপথ্যে সজাগ হয়ে ওঠে ঠাকুরের দেবদুর্লভ মূর্ত্তি। ভুলে যায় সংসার। চলে আসে মঠে।

কিন্তু বাসনা শেষ না হোলে তো ত্যাগী হওয়া যায় না।

দু-দিন যেতে না যেতে আবার মুখ ফেরায় ঘর পানে।

প্রাণ টানে মায়া মোহে।

নরেন আবার শোনায় ত্যাগের মন্ত্র।

দৃঢ় হোল মন। সঙ্কল্প নিলে—যাব না আর ফিরে ঘরে।

বাপ, ভাই মঠে আসে—

আসে ফিরিয়ে নিতে যে যার পুত্র ও ভাইদের।

কিন্তু ওরা স্পষ্ট করে বলে দেয়,—"আমরা ঘর ছেড়ে এসেছি, এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব।"

শশীর বাবা এসে বললেন, তোকে যেতেই হবে ঘরে।

শশী বললে—"যে একবার ঘর ছেড়ে এসেছে, তার কাছে সংসার বাঘের বাসা।"

আর উপায় কি! চোখ মুছতে মুছতে তারা চলে যায় বাড়ীতে। নিন্দা করে নরেনের। বলে কিনা—"এই ছোঁড়া হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। এরা সবাই বাড়ী গিয়ে দিব্যি পড়াশুনা করছিল, এ-ই ওদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল এখানে, আর দিতে লাগল যত কু-পরামর্শ।"

নীলকণ্ঠ বিষ পান করে সানন্দে। তবুও তাঁর আরব্ধ কর্ম্মের একচুল অবশেষ রেখে যাবে না সে।

বালক সন্ন্যাসীদের নেশা লাগিয়ে দেয় নরেন। ওরা সঙ্কল্প নেয় মনে মনে —'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'

কিন্তু এমন হোলে তো চলবে না।

শশী নিয়ে নিলে মঠের ছেলেদের ভার। মায়ের মত শশী ছেলেদের করে দেখাশুনা।

শুধু মা কেন?

ভৃত্য, পাচক, সেবক, রক্ষক, সবই শশী। ঠাকুর যখন ছিলেন, শশী থাকত তাঁর সেবার দাস হয়ে সারাক্ষণ। করত পূজা, আরতি, ধ্যান, জপ। ঘর-বাড়ী ভুলে গিয়েছিল সহজেই। নিয়ত ঠাকুরের নামে লেগে থাকত সে। এখন আবার পড়েছে ছেলেদের নিয়ে। কে না খেয়ে পড়ে আছে, কার শরীর খারাপ হয়েছে, কে বসে রাত ভোর করছে ধ্যান করে, সবার পিছে শশীর জাগর প্রহরা।

কখনো মন্দ বলে, কখনো স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে সন্ন্যাসীদের জীবনকে ছন্দ মধুর করে তুলল শশী (রামকৃষ্ণানন্দ)।

শশী দিল নিষ্কাম সাধকদের জীবনে কর্ম্মের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। বহুজন হিতায় উদ্বুদ্ধ করল সন্ন্যাসীদের।

*　　　*　　　*　　　*

রাত ভোরে নরেনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"হে অমৃতের পুত্রগণ। অমৃত পান করবার জন্যে তোরা জাগ্রত হ —জাগ্রত হ।"

সজাগ হয়ে যায় সবাই। বসে ধ্যানে। শেষ হয়ে যায় তপ, জপ। মিলিত হয় গিয়ে দানাদের ঘরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আদর করে সুরেনকে ডাকতেন দানা। বলতেন ঠাকুর, 'দানা আমার শিবের অনুচর।'

সত্যিই দানা দানেও মহান, প্রাণেও মহান।

মঠ বাড়ীতে চলছিল যখন উপবাস, তখন দানার দানের হস্তই রক্ষা করেছিল সন্ন্যাসীদের।

গোপনে গোপালকে দিয়ে পাঠিয়ে দিত মঠের আহার্য্য। গোপাল ছিল দানার অনুচর। সরবরাহ করত মঠের খবরাখবর। একদিন বলল গিয়ে গোপাল—

বললে সুরেনের কাছে,—"আজ সমস্ত দিন মঠে উপোস গিয়েছে।" অমনি প্রশ্ন করে বসল সুরেন—কি কি লাগবে তার হিসেব এনেছিস? নে, টাকা নিয়ে যা। সাবধান, ওরা যেন টের না পায়।

ধামা ভরে বাজার করে ফিরল গোপাল মঠে। জিজ্ঞেস করল সবাই—কোথায় পেলি এসব?

গোপাল বললে,—"ও, এসব একজন ভদ্রলোক পাঠিয়ে দিলেন। আমি তো কিছুতেই নেব না। তিনি ভারী পীড়াপীড়ি কর্ত্তে লাগলেন। কি করি, কাজে কাজেই নিয়ে আসতে হোল।" অবাক হয়ে ভাবে সবাই—প্রভুর কি অপার মহিমা।

নরেন যখন জানতে পেল সুরেন মিত্তিরের কাণ্ড, তখন একদিন বলল শরচ্চন্দ্রের কাছে—"সুরেশ বাবুর নাম শুনেছিস ত? তিনি এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বরাহনগর মঠের সব খরচপত্র বহন কর্ত্তেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্ম তখন বেশী ভাবতেন। তাঁর ভক্তি বিশ্বাসের তুলনা হয় না।"

সুরেশ আবার কে?

ঠাকুর কখনো কখনো সুরেনকে ডাকতেন সুরেশ বলে। কত অভাব অনটন গিয়েছে। সুরেশ না হলে কে চালাত মঠের খরচ? "বরাহনগরে এমন কত দিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে ত নুন জোটে না। দিন কতক হয়ত শুধু নুন ভাত চললো, কাহারও গ্রাহ্য নেই। জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন ভাত-এই মাসাবধি চলেছে। আহা সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি?"

ওদিকে মঠের সন্ন্যাসীরা এমন সাধন ভজন শুরু করে দিলে যে শরীর তাদের দিন দিন লাগল ক্ষীণ হতে। নরেন পড়ল ভাবনায়। বলল একদিন,—"তোরা কি মনে করেছিস সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি?—তা হয় না রে! রামকৃষ্ণ পরমহংস পৃথিবীতে একটাই জন্মায়, একবারই আসে।"

একটু মন্থর হয় গতি। চোখ মেলে তাকায় বাইরের পৃথিবীর দিকে। কিন্তু আবার দু দিন যেতে না যেতে ডুবে যায়—

ডুবে যায় স্বজন সোহাগে।

নরেন বললে আবার, বললে চোখ রাঙিয়ে, ধমক দিয়ে—"ঠাকুরের মুখে পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের কথা শুনেছিস ত? তোরা হচ্ছিস সেই পিঁপড়ে আর ভগবান চিনির পাহাড়। তোদের এক একটা দানা পেলেই পেট ভরে যায়, কিন্তু মনে কচ্ছিস পাহাড়টা শুদ্ধ টেনে নিয়ে যাবি।"

ওরে, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে আত্মজনকে পাওয়া যায় না।

মুখে অনেক উপদেশ দিচ্ছে নরেন, কিন্তু শশী ডেকে তো হয়রাণ। সবার খাওয়া হয়ে গেছে। নরেন আসছে না। শশী গিয়ে দেখে, নরেন ধ্যানাসনে তন্ময়। ডাকল শশী—ওরে, তোরা কি এমনি করে করে দেহপাত করে দিবি। খেতে আয় নরেন!

রাত পোহাল। নরেন বসে সবাইকে নিয়ে। আলোচনা করে ভারতীয় দর্শন; পুরাণ, শাস্ত্র নিয়ে। কখনো বৌদ্ধ, কখনো শৈব, আবার কখন শাক্ত, বৈষ্ণব তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে করতে নরেন বলে—সবধর্ম্মের ভাব খুঁজে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝে। তাই তো ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধক।

"এমন দিন শীঘ্রই আসবে যেদিন বুঝতে পারবি যে, লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচাবার জন্মে পরমহংসদেব কি করেছেন।"

* * * *

আটপুর গ্রাম। স্বামী প্রেমানন্দের বাড়ী।

আয়োজন করেছে উৎসবের—

আয়োজন করেছে প্রেমানন্দের মা। সবাইকে জানাল আমন্ত্রণ। গুরুভাইদের নিয়ে নরেন এসেছে আটপুরে। আনন্দের কি আর সীমা আছে!

দিন ফুরাল। আকাশের নীল সামিয়ানায় ফুটল তারার ফুল। গভীর হোল রাত। প্রাঙ্গণে জ্বলছে ধুপ-দীপ। ছড়িয়ে পড়ছে তার স্নিগ্ধ মদির গন্ধ আকাশে, বাতাসে।

নরেন বসেছে ধ্যানে। বসেছে গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে।

হঠাৎ ভাঙ্গল তার ধ্যান। বলতে লাগল যীশুর জীবনের কথা। যীশুর পরে তাঁর প্রিয় ভক্ত সাধু পল সম্বন্ধে বলতে বলতে চলে এলো নরেন শ্রীরামকৃষ্ণে। "জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক। মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা। বৃথা বিদ্যার গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। উৎকৃষ্টতম মতবাদ অথবা সূক্ষ্মযুক্তি সমন্বিত তর্কের আবশ্যক কি? ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর আদর্শ জীবনই অনুকরণ করবো। একমাত্র ভগবল্লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য।"

অবাক বিস্ময় সবার চোখে। যীশুকে ঘিরে এত কথা কেন? পরে শুনল তারা, শুনল সে রাত্রিটি ছিল যীশুর জন্মরাত্রি।

আটপুর থেকে চলে এলো নরেন তারকেশ্বর। দু-একদিন থেকে তারপরে ফিরে এলো সবাই বরাহনগরে।

২৬

ঘর নেই, তবুও সংসার বন্ধন।

মোহ নেই, তবুও মায়ার ছায়া।

—এ তোমার কেমন খেলা? এ কোন্ আত্মনিগ্রহ?

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম বাণী—"নরেন, এদের তুই দেখিস্।"

দেখ্তে বলে ছলে আটকে দিলেন নরেনকে—আটকে দিলেন রামকৃষ্ণ। করলেন নরেনকে এক অখণ্ড সংসারের সংসারী।

কলকাতায় গিয়েছিল নরেন। ফিরে এসে শুনল—সারদা নেই মঠে। কোথায় যেন চলে গিয়েছে না বলে।

বড় ভাবনায় পড়ল নরেন।—তাই তো রে, এখন কি হবে! আকুল হোল তার মন। যেন কান্না আসে। বললে ডেকে রাখালকে—বললে নরেন,—"রাজা, তুই তাকে যেতে দিলি কেন? দেখ্ দিকি, কি মুস্কিলেই পড়া গেল। ছোড়াটা যে ভারি ভাবিয়ে তুললে! এ আবার বেশ এক মায়ার সংসারে বাঁধা পড়েছি দেখ্ছি।"

কবির মনে ভাব জমলে আসে কাব্য—কাব্য আসে ছন্দ সুরের লহর নিয়ে। যান্ত্রিকের মনে সুর এলে বাজে যন্ত্র—যন্ত্র বাজে মধুর সুরে। আর ভক্তের প্রাণ আকুল হলে আসেন ভগবান—ভগবান আসেন তাঁর রাজাসন ছেড়ে ভক্তের পর্ণকুটিরে। আবার প্রিয়জনের মন আকুল হোলেও কিন্তু ব্যাকুল হয় স্নেহ-ভাজন। তত্ত্ব করে। খবর নেয়। লেখে চিঠি। জানায় কুশল।

চিঠি এসেছে সারদার। লিখেছে নরেনকে। কে যেন পত্রখানা এনে দিলে নরেনের হাতে। অমনি ফেলল খুলে। পড়তে লাগল নিবিষ্ট চিত্তে।

কি লিখেছে?

লিখেছে—"আমি হেঁটে বৃন্দাবনে চললেম, এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, কারণ মনের গতি বদলে যেতে পারে। আগে বাপ, মা ও বাড়ীর সকলের স্বপ্ন দেখতাম, তারপর মায়ার মূর্ত্তি দেখলাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি, বাড়ী ফিরে যেতে হয়েছিল, তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, তোর বাড়ীর ওরা সব কোত্তে পারে—

ওদের বিশ্বাস করিসনে।" এবার বললে রাখাল, বললে নরেনকে,—"আমি নিজেও মনে কচ্ছি একবার তীর্থভ্রমণে বেরুবো।"

ঝাঁজিয়ে ওঠে নরেন—"হাঁ, তা যাবে বৈকি! ঐ রকম ভবঘুরের মত বেড়ালেই ভগবান সশরীরে দেখা দেবেন আর কি!"

সকলের মনেই তীর্থভ্রমণের তীব্র বাসনা। কেবল কী রাখাল একা আকুল হয়েছে? বায়না ধরেছে লাটু আর যোগানন্দও। যাবে তারা বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে যাবে শ্রীমার সঙ্গে। কক্ষচ্যুত ধুমকেতুর মত এক এক করে সরে যাচ্ছে যে যার কক্ষবৃত্ত থেকে। নরেনই বা আর কেমন করে থাকবে? যাদের জন্যে ঘর বাঁধা, তারাই যদি কেউ না রইল—তবে নরেনের বা এমন কী আকর্ষণ আছে?

অধীর হোল তার মন। আকুল হয়ে গেল চিত্ত। কেমন করে এই উড়ন্ত আত্মাকে পোষ মানাবে নরেন দেহ-পিঞ্জরে! এ যে দুরন্ত পাখী। দুরন্ত তার পক্ষ বিধুনন। নরেন তো তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারলে না।

ডাকছে ঐ দিগন্তশায়ী মহাসমুদ্র। হাতছানি দিচ্ছে যেন কে নীলাকাশের অ-থৈ থেকে। কেমন করে থাকবে নরেন কপোত-কুটিরে—কেমন করে রইবে সে রুদ্ধ কারার অন্তরালে— বরাহনগরের বাগান বাড়ীতে?

শঙ্কিত হোল গুরুভাইরা।—তবে কি নরেনও চলল! যদি নরেন চলে যায়, তবে ওরা থাকবে কার প্রচ্ছায়? ওরাও দিল পাখীর মত পাখা মেলে আকাশে। যাত্রা করল মঠ ছেড়ে। নীরবে, গোপনে, রাত গভীরে ফেরারী আসামীর মত নরেনের চোখের ডগার 'পর দিয়ে যেতে লাগল এক এক করে।

নরেনের মন গেল ভেঙ্গে।

—আর কেন? এবারে মন তুইও চল। চল এ সীমা ছেড়ে চলে যাই। যেখানে দেখা হবে না কারো সঙ্গে, পোড়া মন আর জ্বলবে না ব্যথার আগুনে, চল, এমন এক নিশ্চিত শান্তি তীর্থে চলে যাই।

আহ্বান করল নরেনকে অসীমের আকাঙ্ক্ষা।

ওরা সবাই যাবে। কেবল জেগে থাকবে একজন—

জেগে থাকবে সমুদ্রশিয়রে মহাসঙ্গীতের অপেক্ষায়। আসবে ফিরে, ফিরে আসবে আবার সেই জাহ্নবীর স্নেহ বায় বীথিবুকে। মহাভাবের দ্যোতনায় উঠবে আবার স্বভাব-মধুর হয়ে দক্ষিণেশ্বর। রয়ে গেল শশী। শশী মঠের তন্দ্রাহীন প্রহরী। নিশ্চিত সু-স্থির কেন্দ্র।

উত্তর কালে বললে নরেন—"আমি সকলের প্রাণে আগুন জ্বেলেছিলুম—সকলকে মঠ ছাড়িয়ে ভিক্ষাবলম্বী সন্ন্যাসী করেছিলুম—পারিনি শশীকে। শশীকে জানবি—মঠের মেরুদণ্ড স্বরূপ।"

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ। শেষের দিক।

মনের আকাশে সঙ্কল্পের অরুণোদয় হয়েছে নরেনের। বিভ্রমের ঢেউ ভেঙ্গে উপস্থিত হয়েছে সে শুভ যাত্রার বন্দরে।

রিক্ত হস্ত। পরনে গৈরিক। ঝোলা স্কন্ধে। হস্তে লাঠি—সম্বল মাত্র এই। যাত্রা করল নিরালম্ব সন্ন্যাসী—

যাত্রা করল মহাভারতের অন্তহীন দুর্গম পথে। বলে গেল—"এই শেষ যাত্রা, আর ফিরছি না।"

এলো কোথায় ?

কাশীধামে। হিন্দুর পবিত্রতম তীর্থে।

উঠল দ্বারকদাসের আশ্রমে। যোগ, ধ্যান, আরাধন ও কীর্ত্তনে কাটে নরেনের দিন। ভিক্ষে করে ঝোলা কাঁধে। তাই দিয়ে চলে দিনের আহার। দর্শন পড়তে পড়তে সমাহিত হয়ে যায় চিত্ত। সমাধি হয় তার। নরেন ডুব দেয় ভাব-সাগরে।

সন্ধ্যা নামে। নরেন চলে আসে ভাগীরথীর তীরে। বসে শিলাসনে। নয়ন ভরে দেখে অপূর্ব্ব তরঙ্গমালা। দূরে বাজে আরতির শঙ্খ। ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে মিলে যায় ভাগীরথীর কুলু কুলু শব্দ। অপূর্ব্ব লাগে নরেনের কাছে। তাকিয়ে থাকে অপলক নয়নে। সহসা মনে পড়ে ফেলে আসা দিন—সেই গঙ্গার কলোচ্ছ্বাসোচ্ছল দক্ষিণেশ্বর। পঞ্চবটী। আর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন তনু। একে একে সব এসে আভাসিত হয় মনের ক্রান্তিবৃত্তে।

হায়! হায়! কোথায় সে স্মৃতিমধুর মাধুরী। কোথায় সে প্রেমস্নিগ্ধ স্নেহাঞ্চল!

নেই সে মহামেলা। নেই রামকৃষ্ণের অঙ্কে ছোট্ট শিশুটি হয়ে নরেন। সে আজ নেতা। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তরুণ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। উদ্‌ভ্রান্ত যাত্রীর অন্তরে মহান কর্ত্তব্যের আহ্বান। ডাক এসেছে, ডাক এসেছে আর্ত্ত, পীড়িত, নির্য্যাতিত ভারতের সীমানা থেকে। বিনিদ্র রাত্রি কাটে স্বামিজীর, কাটে দুঃখ, দহন, বেদনা ঘন রাত্রি। এক মহৎ কর্ত্তব্য তার সম্মুখে। স্কন্ধে

কবির অন্তরে মেঘমল্লার। সামনে দিগন্ত বিসারিত বনরাজিনীলা। অবরুদ্ধ হৃদয়-দুর্গে যুগধর্ম্মের ঈশানী পাবক।

জগৎ নবযুগাদর্শের জয়-যাত্রায় প্রস্তুত। নতুন যুগে নতুন ভারত করবে নব পদসঞ্চার। এঁকে যাবে পৃথিবীর বুকে চরণ-চিহ্ন। থমকে যাবে বিশ্ব। বিহ্বল বিস্ময়ে থাকবে তাকিয়ে, তাকিয়ে থাকবে মোহ-মুক্ত ভারতের চলমান গতি-বন্যার দিকে। সে ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে বিদ্রোহী বিবেকের চিত্তে।

ঐ সেই সনাতন ভারত। ভেসে আসছে বৈদিক যুগের উদ্‌গীথ। ভেসে আসছে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, মোগলদের মিলিত তীর্থ থেকে। অপূর্ব্ব। অপূর্ব্ব!

তন্ময় নরেন। তার ধ্যান-মানসে শ্রীগুরুর দিব্য রূপ মূর্ত্ত হয়ে উঠল। যেন নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেন। নরেনের যাত্রা পথে বাজালেন অভয় শঙ্খ।

সন্ধ্যা সেরে ফিরে এলো নরেন—

ফিরে এলো আশ্রমে।

রাত পোহাল। রক্তরশ্মি ছড়িয়ে পড়ল পুবের আকাশে। গাছে গাছে ফুটল ফুল। ধরল পাখীরা গান।

আজ যাবে নরেন দুর্গাবাড়ীর মন্দিরে। দর্শন করবে বিশ্বেশ্বর, বীরেশ্বর, সারনাথ। পায়চলার পথ। চলল নরেন হেঁটে হেঁটে। চলল দুর্গাবাড়ীর দুয়ারে।

একদল বানর এসেছে। তেড়ে আসছে তারা নরেনকে। একটু বিচলিত হোল নরেন। ত্রস্ত পদসঞ্চারে পথ পেরিয়ে চলল। কিন্তু পারল না নরেন পারল না বানরদের এড়াতে। ধরে ফেলল বানরদল নরেনকে।

শুনল এমনি সময় নরেন, কে যেন বলছে ডেকে, বলছে—"থামো, থামো বানরদের সামনে দাঁড়াও।"

থমকে দাঁড়াল নরেন। পালিয়ে গেল বানরদল। এসেছিল দেখতে যুগাধিনায়ককে। দেখে গেল তারা নব যুগের নবীন সন্ন্যাসীকে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল একদিন নরেন্দ্রের। বে আলাপ জমল। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে হোল অনেক কথ ভূদেব গেল অবাক হয়ে। বললে লোকের কাছে—

বললে ভূদেব নরেন সম্বন্ধে—"অদ্ভুত! এই বয়সে এতদূর জ্ঞান ও ব দর্শিতা। ইনি কালে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হবেন সন্দেহ নেই।"

এর পরে দেখা হোল শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে। কতবার কতদিন শুনেছে নরেন—

শুনেছে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই শিবোপম ঋষির কথা। আজ নরেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করল নরেন—"জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ আছে কি?"

তখন ছিলেন মৌন ব্রতে তিনি। বুঝিয়ে দিলেন তাই ইঙ্গিতে, সঙ্কেতে, বুঝিয়ে দিলেন,—ভেদ বোধ তো আপন অন্তরে। সংহত কর মনকে। সপে দাও আপনাকে ইষ্টনামে। যাবে চলে ভেদ বোধ। সব এক। ব্রহ্ম বৈ কিছু দেখবে না। জীবনেও তখন ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি স্ফুরিত হবে।

আবার প্রণাম করল নরেন। চলে এলো।

কোথায়?

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দজীর আশ্রমে।

এখানে এসে হোল এক বিষম কাণ্ড—

সে কি?

যোগী পুরুষ, জ্ঞানী তাপস ভাস্করানন্দজী নরেনের দেহ-কান্তি দেখে গেলেন মুগ্ধ হয়ে। বলছিলেন তখন তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্মের আদর্শের কথা শিষ্যদের কাছে। নরেনকে দেখে যেন আর একটু জোড় হোল। একটু পরীক্ষার ছলে বললেন তিনি—

বললেন—"কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে কিনা সন্দেহ।"

নরেন শুনে তো আগুন,—"কি বলেন মশাই? এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যারা সম্পূর্ণরূপে কাম-কাঞ্চনের বন্ধন থেকে বিমুক্ত—কারণ সন্ন্যাস ধর্ম্মের মূল ভিত্তিই যে ওই।"

একটু হাসলেন ভাস্করানন্দজী। বললেন—"তোম লেড়কা হো ক্যা জান্‌তা?"

এ যেন মস্ত অবিশ্বাসের কথা। নরেনকে চান উড়িয়ে দিতে। নরেন জুড়ে দিল তর্ক।

সবাই তো ত্রস্ত। কি করছে তরুণ সন্ন্যাসী! যার প্রচ্ছায় এসে শত লক্ষ ধনী, দরিদ্র করছে একটু করুণা ভিক্ষা, নত করছে মাথা তাঁর পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক শক্তি দেখে, বলি, তাঁর সঙ্গে তর্ক!

কিন্তু নরেন নির্ভীক।

তার যা বলবার বলে গেল—

বলে গেল তেজোদীপ্ত কণ্ঠে।

একটু হেসে বললেন তার পরে—

বললেন ভাস্করানন্দজী—"এর কণ্ঠে সরস্বতী আরূঢ় হয়েছেন। এর হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয়েছে।"

কে শোনে সে কথা। নরেন বেরিয়ে এলো—বেরিয়ে এলো আশ্রম থেকে নরোত্তম, নরপতির মত।

কাশীবাসী আর হতে পারল না নরেন। ফিরে এলো বরাহনগরে। ফিরে এলো কাশী থেকে।

২৭

দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসেছে নরেন। আনন্দের কী আর সীমা আছে মঠবাসীর? কাণ্ডারী-বিহীন তরী যেন চলল আবার স্রোতের উজানে বাঁক কেটে। মুখর হয়ে উঠল মঠ। পাল তুলে দিলে তারা আকাশে।

কত উপদেশ, কত না উৎসাহ দিতে লাগল নরেন সবাইকে। মহাতীর্থের তীর্থরজ অঙ্গে মেখে নরেনও যেন হয়ে গেছে তীর্থ-পতি।

—জানতে হবে দেশকে। বুঝতে হবে তার বেদনা, তার অভাব। কোটি মৌন জন-মানসের খবর জেনে তবে যাত্রা। মুক্তি কামনা তো আছেই। কিন্তু আপন মুক্তির সঙ্গে ওদেরও দিতে হবে মুক্তি এনে। যারা অসহায়, যাদের চোখের জলের খবর নিলে না কেউ, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের জলঝরা চোখ দিতে হবে মুছিয়ে। জীবের সেবায় আত্ম-মুক্তি লাভ করতে হবে। সেবার মাঝেই শান্তি, তৃপ্তি। জীবকে দেখতে হবে ব্রহ্ম স্বরূপ। জীবের জীবনেই যে ব্রহ্মের বসতি। সতীর্থ ও ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করে নরেনের শ্রবণ-মঙ্গল উপদেশ।

কিন্তু কয়েকটা দিন যেতে না যেতে আবার যেন শুনল নরেন—শুনল বিশ্বনাথের আহ্বান। আকুল হোল প্রাণ। চলল নরেন মঠবাড়ী ছেড়ে আবার কাশীধামে।

কাশী থেকে এলো নরেন সরযূনদীর তীরে—অযোধ্যায়।

এই সেই স্থান—যেখানে রত্নাকর হয়েছিল রূপান্তরিত বাল্মীকিতে। মহাকবির কাব্যরণিত ছন্দের মত রয়েছে সাজান, সাজান রয়েছে অযোধ্যার অন্তঃপুর। পিতৃসত্য-পালক পুত্রের পবিত্র পদচিহ্ন। সেই বনযাত্রার পথ। সবই যেন সজীব, প্রাণবন্ত, জীবন্ত।

আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্র। আদর্শ পতির মহীয়সী পত্নী। আর আদর্শ ভ্রাতৃরূপের জলন্ত স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে—সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে নরেনের চিত্তাকাশে।

এই সাধন-সিদ্ধ ভূমিতেই পদসঞ্চার করেছিলেন বশিষ্ঠ। লাভ করেছিলেন ব্রাহ্মণত্ব বিশ্বামিত্র। এখানে এসেই জনক রাজা দাঁড়িয়েছিলেন, দাঁড়িয়েছিলেন জানকীর হাত ধরে।

সব কথা সজাগ হয়ে উঠল নরেনের মনে। বিভোর হয়ে যায় নরেন। অপলক নয়নে প্রত্যক্ষ করে অযোধ্যার ধুলি-মাটি।

মনে পড়ে বাল্যের লীলাভূমি শিমূলের স্মৃতি। মনে পড়ে কোচোয়ানের কথা। তারপরে প্রেমের জীবন্ত, জাগ্রত বিগ্রহে অনাদর, অবহেলা। কান্না এলো। ভেসে গেল চোখ দুটি আবেগের অশ্রুতে।

কিছুদিন কাটল এখানে। রামাইত সন্ন্যাসীর সঙ্গে রামনাম কীর্ত্তনে কেটে গেল অনেকগুলো দিন। যাত্রা হোল সুরু। এলো নরেন অযোধ্যা ছেড়ে আগ্রায়। এলো তাজবিবির সমাধি শিয়রে।

তাজমহল। সাজাহানের অমর কীর্ত্তি। আজও অমলিন তাজ। বিরহিণী যমুনা চলেছে, চলেছে প্রেমের অমরা সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে। চলেছে তাজ-বিবির গা ছুঁয়ে কোন্ দূর দিগন্তে মহাকালের কোলে যেন।

মোগল দুর্গ। আহা, কত না কীর্ত্তির সমারোহ। শিল্পবোধের উজ্জ্বল আভাস এখনো সমুজ্জ্বল। চোখে জল এলো নরেনের। আগ্রা থেকে যাত্রা করল নরেন শ্রীবৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নিকেতনে। রিক্ত হস্ত। ধুলি-ধূসরিত অঙ্গ কান্তি। যেতে যেতে দেখল নরেন—দেখল কে যেন পথের ধারে বসে করছে ধূমপান। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে কাঠ হয়ে। যেন আর চলতে চায় না দেহ। ক্লান্তি এলো নেমে। একটু নেশা করতে পেলে এখন মন্দ হোত না।

এগিয়ে গেল নরেন—এগিয়ে গেল সেই লোকটির কাছে। বাড়াল হাত। চাইল একটু নেশা করতে। কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে সরে গেল লোকটি দূরে। বললে সম্ভ্রমভরে—"মহারাজ, হাম ভঙ্গী হ্যায়।"

নিরাশ হোল নরেন। সুরু করল চলতে। কিন্তু একটি প্রশ্নের অঙ্কুর উদ্গম হোল তার অন্তরে। ভাবতে লাগল নিবিষ্ট মনে—"সারা জীবন আত্মার অভেদ বিচার করে শেষে জাতিভেদের পাঁকে পড়লাম! ছি,ছি,এখনও সংস্কার!"

থম্‌কে দাঁড়াল নরেন! এগিয়ে এলো মেথরের কাছে। বললে এসে নরেন—"বেটা, হাম্‌কো জলদী একঠো ছিলাম ভরকে দো।"

গিরীশ ঘোষ বলেছিল একদিন নরেনকে—

বলেছিল—"তুই গাঁজাখোর,তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কল্‌কে টেনেছিলি।"

নরেন বললে—"না, জি, সি, সত্যিই আমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। সন্ন্যাস নিয়ে পূর্ব্বসংস্কার দূর হয়েছে কি না, জাতি

বর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে দেখতে হয়! ঠিক ঠিক সন্ন্যাস ব্রত রক্ষা করা মহা কঠিন, কথায় ও কাজে এক চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই।" তাই পরীক্ষা করে দেখলাম, আমি ভেদ ভুলতে পেরেছি কি না।

পৌঁছে গেল নরেন শ্রীবৃন্দাবনে। এলো রাধাকুণ্ডে। দাঁড়িয়ে নরেন। পরনে একমাত্র সম্বল কোপীন। কুণ্ডের জলে কৌপীন ধুয়ে রোদে রাখল। নামল নরেন রাধাকুণ্ডের পবিত্র সলিলে অবগাহন করতে। সমাপন হোল স্নান। কিন্তু পারে উঠে পড়ল এক মহা বিপদে। কৌপীন নেই! অবাক হয়ে গেল নরেন! বড় অসহায় হয়ে পড়ল। এমন উলঙ্গ হ'য়ে কেমন করে নরেন যাবে নগরাভ্যন্তরে! এমনি সময় চোখ পড়ল নরেনের, চোখ পড়ল একটা গাছের 'পর। দেখল কৌপীন ঝুলছে। কোথায়?

বানরের হাতে গাছের শাখায়।

এ'ত বড় বিপদের কথা?

বৃন্দাবনে এসে কি তবে গোপীদের অবস্থা হোল নরেনের! এগিয়ে গেল নরেন বৃক্ষচ্ছায়ে। তাকাল করুণ নয়নে।

কিন্তু বিনিময়ে পেল কি?

বানরের বিকৃত দন্তশ্রী।

কেবল কি তাই?

দাঁতে, নখে কোপীন শতছিন্ন করে ফেলে দিল নীচে।

অভিমান হোল নরেনের। এলো চোখে জল।

বলতে লাগল মনে মনে--

বলতে লাগল রাধাকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে—রাধারাণী. এই ছিল তোর মনে? আচ্ছা বেশ, যাব না আর ফিরে. ফিরে যাব না লোকালয়ে। চলব বনপথে। দেখব, ভক্তের প্রতি তোর কেমন দয়া। আসবি কিনা বহন করে আমার যোগক্ষেম।

এমনি সময় পিছু থেকে যেন কে ডাকল। সে দিকে তাকাল না নরেন। অভিমানে, দুঃখে চলছে তো চলছেই। লোকটি এলো ছুটে। বলল—চলুন স্বামিজী, আমার ঘরে চলুন।

কিন্তু মানুষের কৃপায় ঢাকবে না নরেন তার লজ্জা। দেখবে আজ ঈশ্বরীর ঐশ্বরিক শক্তি।

আগন্তুক কিছুতেই ছাড়ল না স্বামিজীকে। নিয়ে গেল ঘরে। পরাল নতুন কাপড়। খাওয়াল মহা সমাদর করে।

ফিরে এলো আবার রাধাকুণ্ডে।

কি দেখল নরেন ?

দেখল এসে, রয়েছে কৌপীন পড়ে—

পড়ে রয়েছে যেমন ছিল তেমন।

অবাক হয়ে গেল নরেন। বিমুগ্ধ চিত্ত। আনন্দ ঘন রসরঙ্গে নরেনের প্রাণ উঠল নৃত্য করে। তন্ময় মনে গান ধরল—কৃষ্ণ গুণগান। চোখে ঝরতে লাগল জল। হৃদয়ে লাগে দোলা। আত্মভোলা নরেন রাধাকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে—ওগো, তোমার লীলা খেলার সাথী হতে পারি, এমন সাধ্য কি ? তোমার রসলীলায় আমায় টানলেও যে আমি বুঝি না। দাও তোমার দর্শন। এসো আমার হৃদয়ে। তীর্থান্বিত কর আমার অন্তর।

বৃন্দাবনে এসে পেল নরেন লীলাময়ের লীলাস্পর্শ। ধন্য মানল। পরিতৃপ্ত হোল। যাত্রা করল সেখান থেকে।

আকাশে এখনো তারার আভাতি। মুছে যায়নি রাত্রির কালো লেখা। ডাকেনি ভোরের পাখী। সূর্য্য উঠবার দেরী আছে অনেক।

দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসেছে নরেন।

ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ। বিশুষ্ক তনু। চলছে না আর পা। বসল নরেন, বসল একটি বটবৃক্ষচ্ছায়।

বলি, এ কোন্ গ্রাম ?

হাতরাস।

নরেন বসেছে তো বসেছে। উঠবার নামটি নেই। চোখ বুজে আসে। ছেড়ে দিয়েছে দেহ। রাত। তবুও ক্লান্ত দেহ থেকে ঘাম ঝরছে অঝোরে।

এমনি সময় কে যেন যাচ্ছিল পথের ধার দিয়ে। চোখে পড়ল তার—চোখে পড়ল তরুণ সন্ন্যাসীকে।

চমকে উঠল। দাঁড়িয়ে গেল। ভাবতে লাগল আপন মনে—এ কে ? নয়নে অরুণ-দীপ্তি। অঙ্গে অনিন্দ্য কান্তি। পরনে গৈরিক। স্কন্ধে ভিক্ষার ঝোলা।

কে এ ? যেন রাতের আঁধারে আলোর ঝলক।

মন্ত্র-মুগ্ধের মত এগিয়ে এলো পথিক।

এগিয়ে এলো তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে। করল প্রণাম। বলল—"আপনাকে ক্ষুধিত ও শ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে।"

বলল সন্ন্যাসী—"হ্যাঁ, আমি ক্ষুধিতই বটে।"

তবে—"দয়া করে আমার ঘরে চলুন ; সেখানে বিশ্রাম করবেন।"

একটু মৃদু হাসল সন্ন্যাসী। তারপরে হাঁটল পথিকের পিছু পিছু।

হাতরাস রেল ষ্টেশনের এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার। সারাটা রাত কেটে গেছে কর্ম্ম-স্থানে। ফিরছিল ভোর রাতে ঘর-পানে। পথে দেখা হয়ে গেল যুগ-জনকের সঙ্গে। নিয়ে এলো ঘরে।

আহারান্তে শুয়েছে সন্ন্যাসী। শিয়রে দাঁড়িয়ে শরৎ। দু-একটি কথা বলছে। শরৎ মুগ্ধ। সম্মোহিত। বলল অবশেষে,—"বহুদিন থেকে আত্ম-জ্ঞান লাভের স্পৃহা হৃদয়ে ছেয়ে আছে ; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যখন দয়া করে আপনি দর্শন দিয়েছেন, তখন আমাকে কৃপা করে আত্মজ্ঞান প্রদান করুন।"

একটি গান ধরল সন্ন্যাসী—

'বিদ্যা যদি লভিতে চাও
চাঁদ মুখে ছাই মাখ,
নইলে এই বেলা পথ দেখ।'

শরৎ কাঁদছে। কি বলবে, কি চাইবে, ভেবে আকুল শরৎ। বলল তার-পরে—বলল শরৎ,—"স্বামিজী, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য ; যা আদেশ করবেন, নির্ব্বিচারে তাই পালন করব।"

বলল না কিছু সন্ন্যাসী। কেবল মুমুক্ষু ভক্তের আকুলতাটুকু পরীক্ষা করছিল নিবিষ্ট মনে। ক্রমে ফিরবার দিন এলো ঘনিয়ে।

বলল একদিন শরৎ—"এ কি স্বামিজী, আপনাকে আজ বিষণ্ণ দেখছি কেন?"

"ওরে, এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র শক্তি, আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে ভাবিয়া হতাশ হইয়াছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন স্পষ্টতররূপে বুঝিতেছি—সনাতন ধর্ম্মের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম। হায়! ধর্ম্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! আর তাহার সঙ্গে অনশনক্লিষ্ট [illegible] কি মর্ম্মভেদী দুরবস্থা! ভারতকে পুনরায় ধর্ম্মের বৈদ্যুতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করিতে হইবে, তাহার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। কিন্তু উপায় কি, উপায় কি?"

বড় বিচলিত হয়ে পড়ল তরুণ সন্ন্যাসী। যেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম। কেমন করে উড়বে, কেমন করে বের হবে? কোন্ আকাশে গাইবে নতুন প্রভাতের সঙ্গীত!

পুঞ্জীভূত অন্ধকার। সঙ্কীর্ণতার পঙ্কিলাবর্ত্ত। ধর্ম্মের নামে অনাচার। দাসত্ব-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষ। দিকে দিকে হাহাকার, হতাশা। কান্না ও আর্ত্তি। মূর্চ্ছিত জাতটাকে যদি না জাগিয়ে তুলতে পারে. তবে যে সব সাধনা যাবে তার ব্যর্থ হয়ে।

শরৎ শুনছিল এতক্ষণ আবিষ্ট মনে। স্বামিজী থামলে পরে যেন চমক ভাঙ্গল। বলল শরৎ—"আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি না?"

"পারবে এই সত্যকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তুমি ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু সম্বলে পথে দাঁড়াইতে?"

শরৎ তাকাল চোখ তুলে। আবার শুনল—"তুমি কি প্রকৃত ত্যাগীর জীবনের দুঃসহ কঠোরতা সহ্য করিতে পারিবে?"

শরৎ বললে—"আপনার কৃপা হইলে আমি নিশ্চয়ই সহ্য করিতে পারিব। আমাকে আপনার শিষ্য করিয়া লউন।"

"কি দরকার?....ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান, এইটি মনে রাখিও।..... মাঝে মাঝে তোমার সহিত দেখা হইবে।" শরৎ ছাড়ল না স্বামিজীকে। বললে —আমায় দীক্ষা দিতেই হবে!

"তুমি সত্যই আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছ? আচ্ছা আমার এই ভিক্ষাপাত্রটি নিয়া ষ্টেশনের কুলিদের কাছ হইতে ভিক্ষা নিয়া আস দেখি।"

তন্‌হাকুল মন। মানে না মানা। ভিক্ষাপাত্র নিল শরৎ হাতে। গেল দ্বারে দ্বারে। বলল—দাও, আমায় ভিক্ষা দাও।

প্রফুল্ল হোল স্বামিজীর মন। আনন্দে নৃত্য করে চিত্ত। ডাকলেন শরৎকে, দিলেন নাম। এই শরৎই হোল স্বামিজীর প্রথম শিষ্য। চলল শরৎ স্বামিজীর সঙ্গে হৃষীকেশ।

সন্ন্যাসী হয়ে শরৎ নাম নিল স্বামী সদানন্দ।

হৃষীকেশের জল-বায়ুতে ম্যালেরিয়ার বীজাণু। স্বামী সদানন্দ পড়ল অসুস্থ হয়ে। বাধ্য হয়ে ফিরতে হোল স্বামিজীকে, ফিরতে হোল তাঁর মানস-পুত্র সদানন্দের রুগ্ন, ভগ্ন দেহটি নিয়ে বরাহনগরের মঠে।

ওরে, নরেন এসেছে—নরেন এসেছে।

সাড়া পরে গেল দিকে দিকে। মুখর হয়ে উঠল বরাহনগরের মঠ-বাড়ী।

নববলে বলীয়ান সন্ন্যাসী ফিরে এসেছেন—

ফিরে এসেছেন হৃষীকেশ থেকে বরাহনগরে।

বেদান্ত, উপনিষদ, যোগ, সমাধি এই নিয়ে আলোচনা চলছে জোড়।

এর পরে আবার সেবা, কর্ম্ম ও ভক্তি।

সন্ন্যাসীদের দু-কুলের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। আত্ম-মুক্তি, সে তো নিছক স্বার্থপরতার কথা। মুক্তি দিতে হবে সবাইকে। মুক্ত করতে হবে দেশকে।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষ। দুর্গতির অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত জনতা। ঐ দেখ, চেয়ে দেখ একবার বিকৃত আচার। প্রাণহীন অনুষ্ঠান। সংস্কার-সমাচ্ছন্ন জাতি। ভ্রান্ত আদর্শের দিকে কেমন করে ছুটে চলেছে।

দেখ, দেখ, তবুও যায়নি ভেসে, ভেসে যায়নি হৃদয়বৃত্তি। মুছে যায়নি ঈশ্বরকে জানবার তীব্র তন্‌হা মানুষের মন থেকে। তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে না? ধ্যান তো করতেই হবে। তাই বলে সবাইকে ঘুমন্ত রেখে নয়। ডেকে তুলতে হবে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে। সেবা করতে হবে তাদের। শিব জ্ঞানে জীবকে সম্মুখে রেখে মুক্তি সাধনায় তন্ময় হোতে হবে।

একটি বছর কলকাতায় থেকে সেবাব্রতে দীক্ষা দিলেন স্বামিজী সতীর্থ ও ভক্তদের। তন্ময় হয়ে শুনল সবাই, শুনল যুগ-বিপ্লবীর অগ্নিবর্ষী উপদেশ। —ঠাকুর তো আমাদের বলে যাননি চলে যেতে। তিনি বলেছেন, জনতার মাঝখানে থেকেই জীবসেবায় শিবের ধ্যান করতে। ওরে, তাঁর বাক্য লঙ্ঘন করি এমন সাধ্য কি?

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ। ফেব্রুয়ারী মাস। গেলেন স্বামিজী কামারপুকুরে। সেখান থেকে জয়রামবাটী। নিয়ে এলেন শ্রীগুরুর পদরেণু। আর নিয়ে এলেন শ্রীমায়ের আশীষ।

টানে মন ঘর মুখে। গেলেন স্বামিজী শিমলেতে। কিছুদিন রইলেন সেখানে। আবার এলেন ফিরে কলকাতায়।

পত্র লিখলেন কাশীতে প্রেমদাসের কাছে,—"নানাপ্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণের জন্ত যে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময় দেখিয়াছি। কিন্তু এবার অন্ত প্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই, এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত ৫।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্ন বাধার সহিত সংগ্রামে পরিপুর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পুর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।"

অন্তর-নিরুদ্ধ অনল। চায় উন্মুক্তি। বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে।

কিন্তু পথ কোথায়! কে দেবে জ্বালিয়ে আশার প্রদীপ?

লিখলেন আবার—"বিশেষ কলিকাতার নিকট থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। ইহাদের অবস্থা পুর্ব্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুর পরে বড়ই দুঃস্থাবস্থা। এমন কি কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্ব্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভুমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল— হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া যদিও সেই বাটীর অংশ পাইয়াছি—কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি —যে প্রকার মোকদ্দমার দস্তুর।"

"কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাহাদের দুরাবস্থা দেখিয়া রজো-গুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার স্বরূপ কার্য্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময় মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে,······কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া সমস্ত মিটাইয়া এ দেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি সেই আশীর্ব্বাদ করুন।"

প্রেমদাস দিয়েছিলেন স্বামিজীকে বেদান্ত ও অষ্টাধ্যায়ী। দিয়েছিলেন সর্ব্বঢালা স্নেহ।

যাত্রার সুচনা হোল। এলেন স্বামিজী গাজীপুরে। আছেন এখানে এক মহাযোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন। শুনেছিলেন স্বামিজী রামকৃষ্ণের কাছে, শুনে-ছিলেন অনেক দিন পওহারী বাবার কথা। দেখবার ইচ্ছা অনেকবার হয়েছিল স্বামিজীর। কিন্তু সময়ের স্রোত এসে কুলে না ঠেকলে কেমন করে হবে উত্তরণ? আজ এসেছে সে মহালগ্ন। এবারে দেখা না করে ফিরছেন না স্বামিজী।

গগন রায়ের বাড়ীতে থাকেন স্বামিজী। লোকজনে ভরে যায় গগনের বাড়ী। কত উপদেশ, গান, ভজনে কাটছে দিন। বেশ লাগে। মনটা এখানে নিত্যশুদ্ধের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে। বাইরের দরজায় খিল পড়ে যায়। অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে অন্তর। কেবল মনের সাধন আর আত্মার পুজন।

একদিন বলছেন স্বামিজী, বলছেন সংস্কার সম্বন্ধে—"পুরাতনের নিন্দা বা কঠোর সমালোচনা দ্বারা তাহার দোষ সংশোধন হইতে পারে না। সংশোধনের প্রণালী স্বতন্ত্র। অসীম প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। শিক্ষা দ্বারা ক্রমে সকলে আপনাপন অন্তরের মধ্যে বুঝিতে পারিবে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। তারপর আপনা হইতেই মন্দটা ছাড়িয়া ভালটা গ্রহণ করিবে। ……বৈদেশিক শিক্ষার মোহে ভুলিও না। দেশটাকে বোঝ, জাতিটাকে বোঝ ; জাতীয় জীবনের গতি, বৃদ্ধি ও প্রসার কোন্ দিকে, তার উদ্দেশ্য কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখী তাই দেখ।"……

ওরে, 'আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

আত্মশুদ্ধ কর মহাভাবের দ্যোতনায়। ভক্তির রসসমুদ্রে কর অবগাহন। বাইরে দরজার খিল এঁটে একবার অন্তরের দুয়ার খুলে বসো। শোন, তোমার মনের মৌন কি বলেন। কোন্ আলোতে জ্বালিয়ে দেন আশার দীপ-শিখা।

মুগ্ধ মনে শ্রবণ করে সবাই তরুণ সন্ন্যাসীর বাণী। উঠি উঠি করেও আর 'হয়ে ওঠে না। যেন নেশায় ধরে গেছে।

গগন রায় নিয়ে গেল স্বামিজীকে 'রস' সাহেবের কাছে। দু-দশ মিনিট কথা হোল দুজনে। অবাক হয়ে গেল সাহেব। এমন কথা আর তো শোনেনি সাহেব। বললে স্বামিজীকে—চলুন স্বামিজী, 'পেনিংটনের' কাছে।

জিলা জজ 'পেনিংটন'। এলেন স্বামিজী 'পেনিংটনের' কাছে—এলেন 'রস' সাহেবের সঙ্গে।

এখানে এসেও সেই এক ভাব। থৈ পেল না সাহেব তার জজিয়তি বিদ্যায়—থৈ পেল না তপঃসিদ্ধ তাপসের অন্তহীন পাণ্ডিত্যের।

বলল সাহেব—একটিবার ঘুরে আসুন স্বামিজী আমাদের দেশ থেকে। খরচা দিচ্ছি আমি

এর পরে পরিচিত হোলেন স্বামিজী—

পরিচিত হোলেন আর একজন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে। আলোচনা হোল বেদ, বেদান্ত নিয়ে। সাহেব হোল অবাক। দেখল বেদ-প্রসবিনী ভারতের যথার্থ সন্তানকে। ধন্য মানল। জানাল শ্রদ্ধা। হোল মুগ্ধ।

* * * *

মন কাঁদে স্বামিজীর—

মন কাঁদে পওহারী বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

কিন্তু দেখা তো হোল না!

কেন?

নির্জ্জন বীথিকুঞ্জ। তার মাঝে গুহা। থাকেন বাবা গুহার মধ্যে। আসেন না লোকালয়ে। কেটে যায় বছর বছর। কিন্তু তবুও তাঁর ভাঙ্গে না ধ্যান। নিমগ্ন হয়ে থাকেন তিনি জ্যোতির্ম্ময় দিব্য রাজ্যে। কেমন করে দেখা করবেন তার সঙ্গে?

ব্যথা পেলেন স্বামিজী। মন গেল ভেঙ্গে। ফিরে এলেন বরাহ-নগরে।

দিনরাত কেবল বাবাজীর ভাবনা। যেন স্বামিজীকে পেয়ে বসেছে পওহারী বাবার দর্শনাকুতি। কত কথা। কত অলৌকিক কাহিনী। আকুল মন যায় ব্যাকুল হয়ে। মঠ ছেড়ে আবার হোল যাত্রা সুরু। চলল মন অভিসারে—চলল পওহারী বাবার বন গুহায়।

নিত্য আসেন। আকুল মন। ঘুরে বেড়ান স্বামিজী—

ঘুরে বেড়ান পওহারী বাবার অভিসারে।

—দর্শন চাই। চাই তোমার চরণ ধুলি। জানতে চাই যোগমার্গে আরূঢ় হবার মন্ত্রটি।

দর্শন হোল না। কিন্তু পেলেন স্বামিজী তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব—"যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।"

আঁত্‌কে উঠলেন স্বামিজী। বললেন আকুল হয়ে—

"তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?"

—"গুরুকা ঘরমে নৌকা মাফিক পড়া রহো।"

স্থির লক্ষ্য হোক চিন্তামণির পাদপদ্ম, পাড়ি দেওয়ার তরণী কর শ্রীগুরুর উৎসঙ্গ।

মন চায় পাওহারী বাবাকে গুরু বলে মানতে। আকুল মনে ঝড় জাগে আবেগের। বললেন স্বামিজী—আমায় দীক্ষা দাও। এতটুকুন ঠাঁই করে দাও তোমায় পদপ্রচ্ছায়। আমি তোমাতে লেগে থাকি।

সম্মত হোলেন পাওহারী বাবা। দিলেন স্বীকৃতি। দীক্ষা নেবেন স্বামিজী পাওহারী বাবার কাছে।

রাত গভীর। শৃগালের নিশীথ চীৎকার। নিরন্ধ্র অন্ধকার। গাজিপুরের চোখে নামে ঘুম। আকাশে তারা জাগে। ভেসে আসে বাতাসের নিঃস্বন। স্বামিজী চললেন বাবাজীর কাছে।

কিন্তু একি! পা চলছে না তো! কাঁপছে কেন শরীর? ঝড় জাগবে? আকাশের ভালে ঝঞ্ঝার রক্তমেঘ। থম্‌কে দাঁড়ালেন স্বামিজী। একটা আবর্ত্তন হোল অন্তর-বিশ্বে। বিস্মৃত দিনগুলো এসে দাঁড়াল পথ রুদ্ধ ক'রে। মনের ক্রান্তিবৃত্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল আর একটি মহাতীর্থের ছায়া। আভাসিত হোলেন তীর্থপতি—শ্রীরামকৃষ্ণ। চমক লাগে। শিহরণ জাগে মনে।

কিন্তু তবুও হয় না চেতনার উদ্বোধন।

বললেন স্বামিজী—"একি? এরূপ হইল কেন? বুঝি এবার ভীষণ পরীক্ষার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলাম।"

রাত কেটে গেল। ফিরে এলেন ঘরে। মুছে ফেলতে চাইলেন মন থেকে—

মুছে ফেলতে চাইলেন রাত্রির ছায়া ভেবে দিশাহারা উন্মেষ। স্থির সিদ্ধান্ত, অটল সঙ্কল্প। আজ গেলে কাল দীক্ষা। শুয়ে আছেন গগন বাবুব উদ্যানে খাটিয়ার 'পর।

লেবুগাছের ঘন বিথার। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন স্বামিজী পাওহারী বাবার কথা। চিন্তার ঝড়ে আন্দোলিত হচ্ছে অন্তর। তন্ময় মন অবগাহন করছে ভাব-সাগরে। রাত্রির মৌন মুহূর্ত্তগুলোর মত স্বামিজীও মৌন।

এমনি সময় দেখলেন স্বামিজী—

দেখলেন, আবর্ত্তিত হচ্ছে রাত্রির অন্ধকার। স্পন্দিত হয়ে উঠেছে আর একটি ছায়াকুঞ্জ। পঞ্চবটী, মায়ের মন্দির। তারই কোল ছু য়ে যাচ্ছে জাহ্নবীর প্রবাহ।

তন্ময় হয়ে আরো ডুব দিলেন গভীরে। দেখতে লাগলেন—দক্ষিণেশ্বর, শিবমন্দির।

তারপর?

প্রেমঘনতনু শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে—

আহা, সে কি রূপ!

নয়নে স্নিগ্ধ দৃষ্টি। দেহে দিব্য কান্তি, যেন গলিত হেমদীপ্তি। দাঁড়িয়ে মুখোমুখি স্বামিজী। অসহায় শিশুর মত নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। "আমি কি অবিশ্বাসী, আমি কি কৃতঘ্ন! না না, তা কখনই হবে না। রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাবে না। প্রভু, দাস চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত, আর কাহারও কাছে নয়। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ।"

হে অপার দয়ানিধে, আর আমায় রেখো না বিভ্রান্তির কারা দুর্গে। করো না পরীক্ষার পত্রগুচ্ছ। এনো না চিত্তে চঞ্চলতা। তুমি করুণার অগাধ সিন্ধু, আমি তার মাঝে নিমজ্জিত কীট।

আর দীক্ষা নেয়া হোল না স্বামিজীর। পত্র লিখলেন গাজিপুর থেকে— "আর কোন মিঞার কাছে যাইব না। এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই·········।"

চল মন, ফিরে চল কাশীতে। শুনছ না? ঐ ডাকছেন বিশ্বনাথ। আর কী হবে পড়ে থেকে এখানে। এবারে যাত্রা কর। যাত্রা কর যাত্রীর মত। ভাবনা থেকে চলে আয় বিকাশে।

এমনি দিনে এক পত্র এলো—

পত্র এলো হৃষীকেশ থেকে। লিখেছে স্বামী অভেদানন্দ।

কি লিখেছে?

—অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি। তুমি একবারটি চলে এসো হৃষীকেশে।

কাশী যাওয়া হোল না। এলেন স্বামিজী হৃষীকেশ। উঠলেন এসে প্রমদা-দাস মিত্তিরের বাড়ীতে। ব্যবস্থা করলেন অভেদানন্দের চিকিৎসার। পথ্যা-পথ্যের সু-ব্যবস্থার ত্রুটি করলেন না। রেখে এলেন তার কাছে স্বামী প্রেমা-নন্দকে। বলে এলেন—দেখিস, যেন সেবা-শুশ্রূষায় ত্রুটি করিসনে। কখন কেমন থাকে জানাস কিন্তু।

এলেন চলে স্বামিজী প্রমদাবাবুর বাগান বাড়ীতে। সুস্থ হোল অভেদা-নন্দ। নামল মাথা থেকে চিন্তার বোঝা। এবারে যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন স্বামিজী।

কিন্তু কি?

খবর এসেছে কলকাতা থেকে।—বেঁচে নেই আর বলরাম। মায়ার বাঁধন ছিড়ে গেছে। চলে গেছে বলরাম ঠাকুরের স্মরণ পথ ধরে—চলে গেছে স্থিত-প্রজ্ঞের মত মুক্তির মহাতীর্থে। ঠাকুরের পদপ্রচ্ছায়।

বজ্রপতন হোল। ঘনিয়ে এলো আঁধার। দিগ্‌বলয় আচ্ছন্ন ব্যথার কুজ্ঝটিকায়। মুখর ভুবনে কেবল মৌনের কান্না।

—ওগো, তুমি কি আঘাত দিয়েই পাও তৃপ্তি? ভালোবাস কি দহন ব্যথার আগুন জ্বেলে দিতে বুকে?

স্বামিজীর দুটি চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা।

প্রমদাবাবু তো অবাক।—একি? সন্ন্যাসীর চোখে জল! ত্যাগীর বুকে মায়ার ছায়া? এ আবার কেমন ভাব?

এগিয়ে এলো প্রমদাবাবু স্বামিজীর কাছে। বলতে লাগল কত সান্ত্বনার কথা।— "একি স্বামিজী! আপনি সন্ন্যাসী, আপনার তো শোকার্ত্ত হওয়া শোভা পায় না।"

বললেন স্বামিজী—"আপনি কি মনে করেন সন্ন্যাসীর হৃদয় বলিয়া একটা জিনিষও থাকিতে নাই? প্রকৃত সন্ন্যাসী পরের জন্য সাধারণ অপেক্ষা অধিক অনুভব করেন। বিশেষ আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহি।.........প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিহীন সন্ন্যাসী জীবন আমার স্পৃহনীয় নয়।"

জীবের জনতায় যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মমুক্তির বাসনায়, শত লক্ষ বছরের গ্লানির উপল ঠেলে যারা এগিয়ে যায় দুঃখের পাণ্ডুলিপিতে মুক্তির অগ্নিস্বাক্ষর দিতে—তাদের চোখে মানুষের দুঃখে জল আসবে না তো কী?

স্থিতপ্রজ্ঞের দেশে চলেছেন স্বামিজী, কিন্তু ধ্যেয় বস্তু হোয়েছে সর্ব্বজীবের উন্মুক্তি। সন্ন্যাসী হয়েও অন্তরে দরদী। নিরাসক্ত হয়েও দুঃখের দুয়ারে ভিখারী।

মনের আকাশে ব্যথার জলমেঘ। কিচ্ছুতে পারছেন না ভুলতে বলরামকে। এ কি ভুলবার? স্নেহ দিয়েছে বলরাম মায়ের মত। দিয়েছে প্রাণ উজার করে। কিছু ভালো লাগে না। যেন দিগ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত স্বামিজী। চলে এলেন কলকাতায়। সান্ত্বনা দিলেন বলরামের শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে।

২৫শে মে। ডাক এলো সুরেন মিত্তিরের। চলে গেল সেও।

ব্যথার 'পর ব্যথা। কান্নার কি আর শেষ আছে?

আঁজল ভরে অর্থ দিয়েছে মঠে। রেখেছে সন্ন্যাসীদের এক ঠাঁই। বাঁচিয়েছে অর্দ্ধাহার, অনাহার থেকে। চলে গেল সেই দানে মহান্ সুরেনও!

শোকে মুহ্যমান মঠবাড়ী। পড়েছে নিরুপায় হয়ে। কে জোগাবে এখন মঠের খরচ? বড় ভাবনায় পড়লেন স্বামিজী। উপায় অবশ্য একটা করলেন পরে। কিন্তু রইলেন না আর কলকাতায় স্বামিজী। দু'-মাস মাত্র থেকে যাত্রা করলেন—

যাত্রা করলেন কলকাতা ছেড়ে।

স্থির হয়ে গেছে লক্ষ্য। আর নয় এখানে। কাটাতে হবে মঠের মায়া। যেতে হবে দূরে—বহু দূরে।

চঞ্চল হয়ে যায় মন—

চঞ্চল হয় মহাভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমার জন্যে। যাত্রা করলেন স্বামিজী। এলেন ঘুষুড়ীতে। আছেন এখানে শ্রীমা।

মায়ের আশীষ বৈ কিচ্ছু হবার নয়।

বললেন স্বামিজী শ্রীমাকে,—"মা, যে পর্য্যন্ত শ্রীগুরুর ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন

করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিব না ; তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।"

আশীর্ব্বাদ করলেন শ্রীমা।

শুনালেন অভয় বাণী। যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। জুলাই মাস।

এলেন স্বামিজী ভাগলপুরে। উঠলেন এসে মথুর সিংহের বাড়ীতে। কয়েক দিন মাত্র রইলেন। চলে এলেন সেখান থেকে দেওঘরে। সঙ্গে এলো স্বামী অখণ্ডানন্দজী।

দেওঘর থেকে কাশী। দেখা করলেন প্রমদাদাস বাবুর সঙ্গে। কিন্তু মন টানে যেন শুভ্র ধবল গিরিগুরু। ডাক এসেছে। ডাক এসেছে উত্তরের তুষার-কবরী হিমালয় থেকে। আর থাকা হোল না কাশীতে। যাত্রা করলেন।

এ কি তীর্থযাত্রা ?

না। তীর্থ ডাক দেয় সন্ন্যাসীকে সমাহিতির জন্যে। সংসারের আবর্ত্ত থেকে মোহ মুক্তির নিঃসঙ্গতার মাঝে। ডাক দেয় ঈশ্বর-ভাবে ভাবময় হয়ে মৌন হয়ে যেতে।

কিন্তু স্বামিজী বলে গেলেন কি ?

বলে গেলেন প্রমদাদাস বাবুকে.—"আমি যাইতেছি ; কিন্তু যতো দিনে না আমি সমাজের উপর বোমার মতো ফাটিয়া পড়িতে পারি, যতো দিন সমাজকে অনুগত ভৃত্যের মতো আমার অনুসরণ করাইতে না পারি, ততো দিন আমি ফিরিব না।"

জ্বেলে দিতে হবে স্থবির রাত্রির বুকে আলোর দীপ-মালা। ভুলতে হবে অজগর রাত্রির নিঃসীম পথকে উজ্জ্বল করে।

ডেকে যেতে হবে ঘুমন্ত পৃথিবীর গ্রাম, বন্দর, নগর ও জনপদকে। তাই এ যাত্রার সূচনা।

অযোধ্যা ছেড়ে এলেন স্বামিজী—

এলেন নৈনীতালে। অল্প দিনের বিরতি। রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থেকে যাত্রা করলেন বদরীর পথে।

রিক্ত হস্ত। নেই সে দিকে ভ্রূক্ষেপ। কেবল চলছেন তো চলছেনই স্বামিজী। কেটে গেল তিনটি দিন। পড়লেন ক্লান্ত হয়ে এবারে। আশ্রয় নিলেন—আশ্রয় নিলেন এক বেগবতী তটিনীর তীরে—অশ্বত্থচ্ছায়।

মন ভরে গেল প্রকৃতির অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে। অবগাহন করলেন খরবেগা পার্ব্বত্য নদীতে। উঠলেন তীরে। বসলেন সেই তরুচ্ছায়ে। বললে—"কি সুরম্য স্থান! ধ্যানের পক্ষে কি সুন্দর!" বলতে বলতে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন স্বামিজী। কেটে গেল অনেকটা সময়। ফিরে এলেন চেতনার মহাতীর্থ থেকে মায়ামুগ্ধ বিশ্বে। বললেন—"গঙ্গাধর, আজ এই অশ্বত্থ বৃক্ষতলে আমার জীবনের একটা অমূল্য ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার একটা প্রধান সমস্যার সমাধান হইয়াছে।"

"আমি আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি, বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহ মধ্যে আছে, দেখিলাম প্রতি পরমাণু মধ্যে বিশ্ব সংসার বিদ্যমান।"

তিনি আছেন অণুতে তনুতে। আছেন তিনি অণীয়ানেও।

ভাণ্ডে দর্শন করলেন স্বামিজী ব্রহ্মাণ্ড।

এ দর্শন হয় কার?

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির।

কিন্তু যা ইন্দ্রিয়াতীত, তাকে চোখে দেখা যায় কী করে?

'মনো ইমং দৈবং চক্ষুঃ—দৈব চক্ষে দেখা যায় তাকে। দেখা যায় মানস নেত্রে, ধ্যান চোখে।

স্বামিজী দেখলেন অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে—

দেখলেন মনশ্চক্ষে। অন্তর বিশ্বে।

এ অপূর্ব্ব দর্শন তাঁকে নিয়ে গেল এগিয়ে, এগিয়ে নিয়ে গেল অখণ্ড সৌন্দর্য্যের পূজারী করে। ক্ষুদ্র খণ্ডের মাঝেই অখণ্ডের অন্তহীন অস্তিত্ব। দীন, হীন, ব্যথিত আর্ত্তের ভেতরেই জগতের সুখ, সৌন্দর্য্য সুপ্ত।

দৃঢ় হোল মন। এ যেন তাঁর জীবনে একটি মহা ইঙ্গিত।

কিসের?

এই দীন দুনিয়ার মাঝেই ঐশ্বর্য্যের সাম্রাজ্য। জীব সেবার মধ্যেই ব্রহ্ম উপলব্ধির অঙ্কুর।

যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন আবার তিনি পায় চলার পথে। অযোধ্যা থেকে নৈনীতাল। নৈনীতাল থেকে বদরী, কেদার। বদরী, কেদার থেকে চলে এলেন আলমোড়ায়।

আম্বাদত্তের বাগান। রইলেন এখানে স্বামিজী। অখণ্ডানন্দ গেল সারদানন্দ ও কৃপানন্দকে খবর জানাতে।

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাও—

ঘুরে বেড়াচ্ছে হিমগিরির পথে পথে। তপোবৃদ্ধ ভারতের তীর্থে তীর্থে। দেখা হোল ওদের সঙ্গে। নিয়ে এলো স্বামিজী সমীপে।

চলে এলো সবাই মিলে বদ্রী সাহার বাগান বাড়ীতে।

শূন্যপ্রায় বরাহনগরের মঠ।

সবার মনে তীর্থ ভ্রমণের বাসনা। এক এক করে চলে এলো তারা। কেউ এলো হৃষীকেশে। কেউ বা হরিদ্বারে রচনা করল কুটির।

আবার কেউ চলে গেল আত্মমুক্তির সাধনায় গিরিগুহার অভ্যন্তরে।

আকুল হয়ে যায় বিবেকানন্দের মন। ইচ্ছে হয় হিমালয়ের নির্জ্জনতায় দু'-দণ্ড বসে থাকতে। চায় মন ছুটে যেতে যেন কোন্ দূরবিসারী ভাব-সমুদ্রে। রাত্রির অন্ধকারে একাকী আসেন তিনি। আসেন ধ্যান করতে।

কিন্তু সে সাধন মানসে কিসের প্রতিচ্ছবি?

নতুন যুগের নতুন স্বপ্ন বিস্তার।

কে যেন থেকে থেকে দিয়ে যায় ইঙ্গিত। স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি পথ।—প্রচার কর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। উদ্বুদ্ধ কর জগৎকে সেবার বৃত্তিতে। তুলে আন ভারতের মহাসমুদ্র থেকে আঁজল ভরে মণিমুক্তা। ছড়িয়ে দাও মুঠা মুঠা আর্ত্ত পীড়িতদের ঘরে ঘরে। নিশ্চল, তমসাবৃত যুগের জীবনে আন আলোর বন্যা। তারপরে মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মার আরাধনা।

ফিরে এলেন বিবেকানন্দ নির্জ্জনতার আনন্দ-লোক থেকে। এলেন বাস্তবতার রূঢ়-রিক্ত জগতে। তাঁর মনোরাজ্যের স্নিগ্ধ মধুর আবর্ত্তে জ্বলে ওঠে দুঃখহত জীবনগুলির বেদনার অভিশাপ। পৃথিবী ডাকছে স্বামিজীকে হিমালয়ের অকলঙ্ক রজত প্রভা থেকে। কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত ছিটকে পড়লেন, ছিটকে পড়লেন বিবেকানন্দ কোলাহল মুখর ধরণীতে। প্রত্যক্ষ করলেন দুঃখ পীড়িতদের লাঞ্ছনা। গ্রাম থেকে শহরে। প্রাসাদ থেকে পর্ণ-কুটিরে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন স্বামিজী—

দেখতে লাগলেন বনের অন্তরালের স্নিগ্ধ কুসুম রাজি।

সংবাদ এলো ক'লকাতা থেকে—

সংবাদ এলো বিবেকানন্দের কাছে।

কি ?

বেঁচে নাই আর বড় বোন। শেষ হয়ে গেছে তার মর্ত্ত্যের ধূলিখেলা। স্থান পেয়েছে সে সান্ত্বনার সুখ অঙ্কে। নিবৃত্ত হয়েছে তার শোক দুঃখের খেলা। চলে গেছে সে মুক্তির মহালোকে।

মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন তিনি। মনের ক্রান্তিবৃত্তে এসে সঞ্চার হোল শৈশবের দিনগুলো, জল এলো চোখে। কাঁদতে লাগলেন বিবেকানন্দ।

ওগো, এ তোমার কেমন খেলা ? ব্যথার বৃন্তে প্রসূন দেখবে বলে অনেক দুঃখের রাত্রি তো করালে পরিক্রমণ। কেবল আঘাত, কেবল দহন জেলে দিচ্ছ থেকে থেকে !

বড় ভেঙ্গে পড়লেন বিবেকানন্দ। এ খবর গেল বাড়ীতে। সন্ধান পেল বাড়ীর লোক বিবেকানন্দের নির্দ্দিষ্ট আবাসের। ভাবলেন বিবেকানন্দ—আর তো এখানে থাকা যায় না। মায়ার ছায়া এসে তবে যে আচ্ছন্ন ক'রে দেবে মনকে। যাত্রা পথে সৃষ্টি করবে প্রতিরোধ। তাই আবার সুরু করলেন যাত্রা। সঙ্গে চলল সারদানন্দ আর কৃপানন্দ দু'জনে। বদ্রীদাসের আশ্রম ছেড়ে যাত্রা করলেন গাড়োয়ালের পথে। পৌঁছলেন এসে কর্ণপ্রয়াগে। শরীর পড়ল অসুস্থ হ'য়ে। নিলেন শয্যা, কাটল তিনটি দিন একটি চটিতে। সুরু হোল আবার যাত্রা। এলেন রুদ্রপ্রয়াগে।

এ এক মহাশান্তির দেশ। প্রকৃতি এখানে ঐশ্বর্য্যময়ী। মন এখানে আকণ্ঠ পান করতে চায় প্রকৃতির রূপ-মাধুরী। স্তব্ধ, শান্ত, সমাহিত পরিবেশ। ভেসে আসছে দূর থেকে নির্ঝরিণীর ছন্দমধুর ঐক্যতান। মন যায় মগ্ন হয়ে। আভাসিত হয় ধ্যান গম্ভীর ছায়ামূর্ত্তির মত হিমালয়ের হিমস্নিগ্ধ চূড়া। একবারটি তাকালে চোখের পলক যেন আর পড়তে চায় না। আহা, কি অপূর্ব্ব। জীবন এখানে ছোঁয়া পায় অসীম আকাশের। দিগন্তের আহ্বান ভেসে আসে কানে। দূর দেয় হাতছানি। ব্যথা নেই। দুঃখ নেই। নেই দহন। অবসান হয়ে যায় সব জ্বালা। বিধুর অন্তর চায় ছুটে যেতে অনন্তের

অভিসারে। খোঁজে কৈলাস অধিপতির শান্ত স্নিগ্ধ আবাসটি। খোঁজে তাঁরই পাদপদ্ম।

রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে এলেন স্বামিজী শ্রীনগরে। বড় কষ্ট পেলেন পথে। জ্বর হ'য়েছিল। কিন্তু তবুও যাত্রা হোল না ব্যাহত। এলেন তিনি অলকানন্দাতীরে।

এঁকে বেঁকে চলেছে অলকার স্রোত। বড় ভাল লাগে দেখতে। দিনগুলো কাটছে যেন সে এক মহা তৃপ্তির মধ্যে। তুরীয়ানন্দ আশ্রম করেছে অলকার তীরে। এলেন স্বামিজী সতীর্থের আশ্রমে। এখান থেকে যাবেন তিনি বদ্রীনারায়ণ। যাত্রার আয়োজন করছেন। এমনি দিনে খবর এলো। খবর এলো, অখণ্ডানন্দজী পড়েছেন অসুস্থ হ'য়ে। আর কি যাওয়া হয়?

যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ দেরাডুনের পথে। দেরাডুন থেকে এলেন তিনি হৃষীকেশে। সুস্থ হ'য়ে উঠল অখণ্ডানন্দ। এবারে পড়লেন স্বামিজী নিজেই অসুস্থ হয়ে। হিম-ক্রোড়ের তুহিন শয্যা সহ্য হোল না স্বামিজীর। জ্বর হোল। প্রবল জ্বর। অবচেতন ভাব। গুরুভাইদের কী আর ভাবনার শেষ আছে? ঘুম নেই তাদের চোখে। মুখে নেই অন্ন। কেবল দিন যমিনী তাকিয়ে থাকে রুগ্ন সন্ন্যাসীর দিকে। অবস্থা যাচ্ছে দিন দিনই জটিল হ'য়ে। ভেঙ্গে পড়ল শরীর। দেহ গেল ক্ষীণ হয়ে। ক্রমে দেখা দিল শ্বাসকষ্ট। অবশেষে এক দিন পড়লেন সংজ্ঞাহীন হয়ে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাত পা। নিস্পন্দ। এ যেন ঠিক মৃত্যুর ইঙ্গিত। চলে যাবেন মনে হোল সবার। নাড়ী নেই। বইছে না শ্বাস। ঘাম ঝরছে অঝোরে। হয়ে পড়লেন স্বামিজী চেতনহীন। প'ড়ে গেল ছুটাছুটি। হাকডাক, কান্না-কাটি। শোকের সমুদ্রটা উঠল যেন গর্জ্জন করে। উঠল কান্নার রোল। এমন বিপদের দিনে কে আছে আর? কাকে ডাকবে ওরা? কে দেবে বিপদ থেকে উত্তরণের নিশ্চিত আশ্বাস? স্মরণ করতে লাগল সবাই, স্মরণ করতে লাগল শ্রীরামকৃষ্ণকে। কেঁদে কেঁদে নিবেদন করল অন্তরের আকুতি।

—ঠুক, ঠুক!

দুটো শব্দ হোল দরজায়।

কে যেন ডাকছে। খুলল দরজা। সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক সাধু। ওরা উঠল চমকে। তাকাল সাধুর পানে।

কে? কে তুমি? ঠাকুরেরই প্রেরিত প্রতিভূ। তাঁরই প্রতিনিধি। তা না হ'লে কি এমন হয়? স্নিগ্ধ, গম্ভীর মূর্ত্তি। সৌম্য, শান্ত দেহ দীপ্তি। অঙ্গে দিব্য কান্তি। তাকিয়ে রইল সবাই।

সাধুও যেন এতক্ষণ বসে কি দেখলেন, ধীরে ধীরে বের করলেন তাঁর থলে থেকে পিপুল আর মধু। দিলেন খাইয়ে। ফিরে এলো জ্ঞান। তাকালেন চোখ মেলে স্বামিজী। বললেন ক্ষীণ কণ্ঠে—"ভাই, তোমরা ভয় পাইও না, আমি মরিব না।"

কাজ শেষ না হোলে কে কবে পেরেছিল যেতে? সংসারে মানুষ আসে তো তাঁরই দেয়া কাজ করতে। কাজ শেষ না হোলে তো যাবার উপায়টি নেই। থাকতে হয় মানুষকে তাঁরই ডাকের অপেক্ষায়।

বললেন স্বামিজী—"অজ্ঞান অবস্থায় কি অনুভব করিলাম জান? এখনও আমার বহু কাজ বাকী আছে, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহত্যাগ হইবে না।"

এবারে যাত্রা করলেন স্বামিজী সেখানে থেকে কনখলে। এলেন ব্রহ্মানন্দ স্বামিজীর কাছে।

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করে চলে এলেন স্বামিজী সাহারানাপুর। সাহা-রানাপুর থেকে যাত্রা করলেন মীরাটের পথে।

ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়ী। আছেন এখানে স্বামী অখণ্ডানন্দজী। স্বামিজীকে পেয়ে তো মহাখুশী। কিন্তু তার রুগ্ন ভগ্ন শরীর দেখে বড় হতাশ হয়ে বলল—"স্বামিজীকে ওরূপ রুগ্ন শীর্ণ কখনও দেখি নাই। ঠিক যেন একখানা ছায়া মূর্ত্তির মত হইয়া গিয়াছে।"………

মীরাটে এসে মিলিত হোল স্বামিজীর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও কৃপানন্দ। এ যেন আর একটি বরাহনগর। মিলিত হোল এসে অদ্বৈতানন্দও। দিনগুলো কাটছে মহা আনন্দের মধ্যে। মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত—এই সব মহা মূল্যবান গ্রন্থ নিয়ে দিন কাটছে সকলের। তার পরে আবার ধ্যান, ভজন ও আরাধনা। আনন্দের বান ডাকল আনন্দ আশ্রমে। কিন্তু এ যে এক মায়ার সংসার হয়ে উঠছে। মায়ামুগ্ধ মনের অন্তরালে ছায়া পড়ছে আসক্তির। কেমন করে থাকবেন স্বামিজী এমন বন্দী-কারার অন্তরালে! ডাকলেন সবাইকে। বললেন—"আমার জীবনের ব্রত স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে আমি একাকী অবস্থান করব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।"

রেখো না আর মায়ার আবরণ দিয়ে ঢেকে। "গুরুভাইদের মায়া। ও-মায়া আরও প্রবল! এ মায়ার পাঁকে পড়লে কার্য্যসাধনের বহু বিঘ্ন ঘটবে। আমি আর কোন মায়ার বেড়ী রাখতে চাই না।"

১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। ফেব্রুয়ারি মাস। মীরাট থেকে এলেন স্বামিজী আলোয়ারে। শ্যামশ্রী মণ্ডিত আলোয়ার। পথের দুধারে ছায়া-শীতল সবুজ অরণ্য। তারই মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছেন স্বামিজী। এ যেন প্রকৃতির কোলে সুকুমার একটি শিশু। পৌঁছলেন এসে একটি হাসপাতালের কাছে। দাঁড়ালেন। চোখে পড়ল এক ভদ্রলোক, বললেন তাকে স্বামিজী—"এখানে সাধু সন্ন্যাসীর থাকবার কি একটু স্থান হতে পারে?"

বললেন ভদ্রলোক—"নিশ্চয়ই! আসতে আজ্ঞা হয়। আসুন।"

হাসপাতালের ডাক্তার। নাম ভদ্রলোকের গুরুচরণ লস্কর। নিয়ে এলো গুরুচরণ, নিয়ে এলো স্বামিজীকে ছোট্ট একটি বাড়ীতে। বলল—"আপাততঃ এখানে থাকতে কষ্ট হবে কি?"

—"কিচ্ছু না।" বললেন স্বামিজী।

রইলেন স্বামিজী সেখানে। গুরুচরণ ছুটে গেল উর্দ্দু স্কুলের ফার্সি মাষ্টারের কাছে। বলল গুরুচরণ—"মৌলবী সাহেব, এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ এখানে এসেছেন, দেখবেন তো শীঘ্র আসুন। এমন মহাত্মা সচরাচর দেখা যায় না।" এ যেন দীপ্তিমান তপন। নির্গলিত হিমাংশু। একবার চোখ পড়লে আর সে দৃষ্টি ফেরান যায় না।

এলো মৌলবী সাহেব। দর্শনেই বিমোহন। হাত তুলে জানাল সালাম। বসে গেল শান্তি প্রচ্ছায়। শুনতে লাগল স্বামিজীর সুধা-বিনিন্দিত বারতা। বেশ ভাব জমল। বললেন স্বামিজী—"কোরাণের একটি বিশেষত্ব যে, আজ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কেহ কলম চালাইতে পারে নাই। ১১০০ বৎসর পুর্ব্বেও ইহা যেমন ছিল, আজও ঠিক সেই ভাবে রহিয়াছে, কোথাও একটি নূতন কথা বসে নাই। প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ বিশুদ্ধতা রক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।"

ক্রমে ক্রমে ভিড় জমতে লাগল। কত লোক আসে। শুনে যায় মধুর উপদেশ। বললে একদিন এক শ্রোতা—"মহারাজ, আপ্ গেরুয়া পিহন্‌তে হ্যায় কেঁও?"

বললেন স্বামিজী—"ইয়ে ফকীরকে ভেক হ্যায়, সফেদ কাপড়া পিহনেসে গরীব লোক হম্‌সে ভিক মাঙ্গতে হ্যায়। লেকিন ম্যায় ত ফকির হুঁ। ভিক

কাঁহাসে দিউ? উস লিয়ে ম্যায় আপ গরীবোঁ কো ভেক বনায়া, যৈসে গরীবোঁ হম্ সে তফাৎ যায়, ইয়ে সমঝকে কি যো খুদ আপহি মাঙ্গনেওয়ালা হ্যায় উসে মাঙ্গনেকা কিয়া ফয়দা ?"

এমনি দিনে আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুরের কাছে সংবাদ গেল। কি? স্বামিজীর কথা। যেমন দেখতে তেমন তার জ্ঞানসমুদ্র। ধ্যানে, মননে, সঙ্গীতে, সাধনে এ যেন এক মহাযোগীর আবির্ভাব হয়েছে।

আমন্ত্রণ জানাল দেওয়ান বাহাদুর—আমন্ত্রণ জানাল স্বামিজীকে। মুগ্ধ হোল দেওয়ান আলাপ করে বিবেকানন্দের সঙ্গে। চিঠি লিখল মহারাজ বাহাদুরের কাছে—"এখানে একজন মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় তাহার অদ্ভুত অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। মহারাজ বাহাদুর এর সঙ্গে আলাপ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।"

চিঠি পেয়ে ফিরে এলো মহারাজ মঙ্গল সিংহ, ফিরে এলো রাজধানীতে। দেখা হোল স্বামিজীর সঙ্গে, করল প্রণাম ভক্তি-বিনম্র চিত্তে। প্রণাম করল মহারাজ মহাযোগীর চরণে। জিজ্ঞেস করল—"স্বামিজী মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, আপনি একজন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি ইচ্ছা করিলেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, তথাপি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন?"

জবাব দিলেন স্বভাব মধুর কণ্ঠে—"মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, আপনি রাজকার্য্য অবহেলা করিয়া দিনরাত্রি সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন?"

সভার লোকেরা তো ভয়ে কাঁপছে। ভাবছে তারা, বুঝি ঘটে যায় অঘটন। এত বড় প্রতাপশালী রাজার মুখের 'পর এত বড় কথা!

কিন্তু মহারাজ নীরব। বলল ক্ষণ পরে, বলল মঙ্গল সিংহ,— "কেন আমি ঐরূপ করি বলিতে পারি না, তবে হ্যাঁ, ঐরূপ করিতে ভাল লাগে।"

একটু হাসলেন স্বামিজী। তার পরে বললেন, "বেশ, আমারও সেই রকম, ফকিরী করে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে।"

আবার বলল মহারাজ—"আচ্ছা বাবাজী মহারাজ, এই যে সকলে মূর্ত্তি পুজা করে, আমার ওতে মোটেই বিশ্বাস নেই, তা আমার দশা কি হবে?"

বললেন স্বামিজী—"মহারাজ বোধ হয় রহস্য করছেন।"

—"না স্বামিজী, মোটেই নয়। দেখুন বাস্তবিকই আমি লোকের মত কাঠ, মাটি, পাথর, ধাতু এ সকল পুজা করতে পারি না। এতে কি পরজন্মে আমার নীচ গতি হবে?" উত্তর দিলেন স্বামিজী মধুর কণ্ঠে—"যার যেমন বিশ্বাস। নিজের বিশ্বাসানুযায়ী উপাসনা করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে কেন? মূর্ত্তি পুজায় আপনার বিশ্বাস নেই, মন্দ কি?"

মন মূর্ত্তি নিয়ে খুশী তো মূর্ত্তি পুজা কর। নয় নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনায় অন্তর সঁপে দাও। তাঁকে যেমন করে ডাকা যায় তেমনি রূপেই তিনি আভাসিত হন।

কিন্তু ভাবছে সবাই তখন—ভাবছে মনে, এ আবার কেমন কথা? যিনি শ্রীশ্রীবিহারীজীর মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তির সামনে করলেন প্রণাম, ভজন গাইতে গাইতে ভাসিয়ে দিলেন বক্ষ চোখের জলে, তার মুখে আবার এ কেমন কথা?

বেশ ভাবনায় পড়ল ওরা। বিস্ময়ের গাঢ় মেঘ সঞ্চার হোল চিত্তাকাশে।

সহসা ঘটল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কক্ষ গাত্রে একখানা আলোক-চিত্র টাঙ্গানো রয়েছে মহারাজের। একবার তাকালেন সেদিকে স্বামিজী। বললেন নামিয়ে আনতে। জিজ্ঞেস করলেন—"এ কার ছবি?"

বললে দেওয়ান—"মহারাজের।"

বললেন স্বামিজী—"দেওয়ানজী, এ চিত্রের ওপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর।"

চম্‌কে উঠল সবাই। কি আস্পর্দ্ধা! শিউরে উঠল সকলে। দেওয়ান তো গেল হতবাক হয়ে।

আবার বললেন স্বামিজী—"তোমাদের মধ্যে যে কেহ এর ওপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর। ইহা তো একখণ্ড কাগজ ব্যতীত আর কিছুই নয়? ইহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে তোমাদের কি এত আপত্তি?"

বললে দেওয়ান আড়ষ্ট কণ্ঠে—"স্বামিজী, আপনি এ কি আদেশ করিতেছেন? ইহা আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি—ইহার প্রতি আমরা কি রূপে অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারি?" বললেন স্বামিজী—"কেন, মহারাজ ত আর সশরীরে ঐ চিত্রে বিদ্যমান নাই। উহাতে না আছে তাঁহার চাল-চলন। উহা তো একখণ্ড কাগজ মাত্র। ইহা সত্ত্বেও তোমরা উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে এত ভয় সঙ্কোচ বোধ করিতেছ কেন?"

নীরব মৌন রাত্রির মত সবাই স্তব্ধ। তাকিয়ে আছে অপলক নয়নে। যেন পলক আর পড়ে না চোখের। এমনি সময় বললেন স্বামিজী—"ভয়

কেন? এই ফটোতে তোমরা মহারাজের ঐ সাদৃশ্যটুকু, ঐ ছায়াটুকু দেখিতে পাইতেছ। উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে গেলেই তোমাদের অনুভব হইতেছে যেন স্বয়ং মহারাজের গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা হইতেছে।"

বললে দেওয়ান—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে।"

এবারে তাকালেন স্বামিজী মহারাজের দিকে। বলতে লাগলেন ধীরে ধীরে—"মহারাজ, দেখুন—যদিও এই চিত্রটি আপনি নহেন,.......তথাপি ইঁহারা উহাকে ঠিক আপনার মতই ভাবেন, কারণ উহাতে আপনার প্রতিবিম্ব বিদ্যমান। সুতরাং এক হিসাবে ঐ চিত্রের সহিত আপনার কোন প্রভেদ নাই। উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র আপনার স্মৃতি ইহাদের চিত্তপটে জাগিয়া উঠে—অনুভব হয় যেন আপনি স্বয়ং সম্মুখে বিদ্যমান—সে জন্য সকলেই প্রকৃত মহারাজকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, এই চিত্রকেও সেইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখেন। ভগবদ্ভক্তও প্রস্তর বা ধাতু-নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে এই ভাবে দেখেন। তাহারা প্রস্তর বা ধাতু নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে উপাসনা করেন না, উহার মধ্যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কোন লীলার ভাব প্রত্যক্ষ করেন।......আমি বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও দেখি নাই মূর্ত্তি পূজক বলিতেছে,—'হে প্রস্তর, আমি তোমার উপাসনা করি। হে ধাতু, আমার প্রতি সদয় হও। মহারাজ, সকলেই সেই এক পূর্ণ পরম ব্রহ্ম সত্তার উপাসনা করিয়া থাকে এবং তিনিও ভক্তের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাহার নিকট আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করেন। পাষাণ বা ধাতু মূর্ত্তি দেখিলে সেই চিন্ময় ইষ্টকেই মনে পড়ে, তাই ভক্ত ঐ মূর্ত্তির এত সম্মান করেন। মহারাজ, আমিত' এই ভাবে দেখি, অপরের কথা বলিতে পারি না।"

কথা বলতে বলতে ভাব মগ্ন হয়ে পড়লেন স্বামিজী। ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে দিব্য স্নিগ্ধ জ্যোতি। এগিয়ে এলো মঙ্গল সিংহ মন্ত্রমুগ্ধের মত। যুক্ত করল হাত। বলতে লাগল—"প্রভো! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বর্ণ সত্য। আমি এত দিন অন্ধ ছিলাম। কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজ আমার চক্ষু খুলিল।"

মঙ্গল সিংহের অন্তরে জেগেছে ঝড়। লুটিয়ে পড়ল স্বামিজীর পদ প্রচ্ছায়। বলল আবার—"স্বামিজী! কৃপা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

আশীর্ব্বাদ? একটু মৃদু হাসি চুমু দিয়ে গেল স্বামিজীর চোখে মুখে। বললেন—"পরমাত্মা ব্যতীত কেহ কাহাকেও অনুগ্রহ করিতে পারে না। তিনি

অসীম করুণাসিন্ধু। আপনি তাঁহার শরণাগত হউন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করিবেন।" চলে এলেন স্বামিজী।

দেওয়ানকে বলল মহারাজ ডেকে—"দেওয়ানজী! এমন মহাত্মা আর কখনও আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। ইহাকে কিছু দিন এখানে রাখিতে পারেন না ?"

জবাব দিল দেওয়ানজী—"বলিতে পারি না মহারাজ, কারণ ইনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি।.....তবে আমি চেষ্টার ক্রটি করিব না।"

দেওয়ানজী স্বামিজীর কাছে জানালেন অনুরোধ। বললেন একান্ত দীন ভাবে—ওগো, তোমার পদপাত যখন হয়েছে একবার, তখন তার স্থির স্থিতি হোক আরো কিছু কাল।

পারলেন না উপেক্ষা করতে স্বামিজী। রইলেন সেখানে। কিন্তু একটি সর্ত্ত আদায় করলেন স্বামিজী—

বললেন দেওয়ানকে—ধনী, দীনদের জন্য খুলে রাখতে হবে তোমার সিংহদ্বার। ভুলতে হবে ভেদ। সম দৃষ্টিতে সেবা করতে হবে মানুষের। দিতে হবে তাকে পরিতৃপ্তির আনন্দ।

সম্মত হোল দেওয়ান। ভেঙ্গে গেল তার আভিজাত্যের মঠ-মিনার। খুলে গেল সদরের দরজা। গ্রহণ করল কেউ কেউ শিষ্যত্ব। স্বামিজী বললেন তাদের অধ্যয়ন করতে সংস্কৃত। যাত্রার করলেন আয়োজন। কিন্তু শিষ্যবৃন্দ বলে বসল—নিয়ে চল আমাদের। যাব তোমার সঙ্গে।

এড়াতে পারলেন না স্বামিজী। যাত্রা করলেন ওদের নিয়েই। এলেন আলোয়ার থেকে পাণ্ডুপোল অবধি। রইলেন রাত ভর হনুমানজীর মন্দিরে। ভোর হোল। মহাবীরজীর পুজা করলেন বিবেকানন্দ। বললেন শিষ্যদের ফিরে যেতে ঘরে। ওরা চলে এলো, চলে এলো চোখের জলে স্বামিজীর চরণ পদ্ম ধৌত করে। উপনীত হোলেন স্বামিজী জয়পুরে।

এদিকে তো অখণ্ডানন্দ স্বামিজীকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। সহর থেকে গ্রামে। বন থেকে পাহাড়ে। মঠ থেকে মরুতে। এ যেন পরশ পাথর খুঁজছে খ্যাপা। বিরহের অনল জ্বলে বুকে। চোখে ঝরে কান্নার অশ্রু। এলো অখণ্ডা-নন্দ জয়পুরে। শুনল এসে এখানে, শুনল অখণ্ডানন্দ—আছেন এক সন্ন্যাসী। যেমন তার বিদ্যা, তেমন জ্ঞান। প্রাচ্য, পাশ্চাত্যের ভাষা বলেন অনর্গল।

হঠাৎ যেন মনটা উঠল চনমন করে। ভাবল অখণ্ডানন্দ, এ নিশ্চয় স্বামিজী।

বলি, কোথায়? কোথায় আছেন তিনি?

জয়পুরের রাজবাড়ী।

এলো অখণ্ডানন্দ রাজপ্রাসাদে। দেখা হোল স্বামিজীর সঙ্গে। কিন্তু বললেন স্বামিজী—"তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভাল কর নাই। সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান কর।"

নির্ম্মম উক্তি। কিন্তু না করে বা উপায় কি? ত্যাগীর মনে আবার মায়ার ছায়া সঞ্চার হতে দেবেন না তিনি। তাই চোখের জল রেখে ফিরে আসতে হোল অখণ্ডানন্দকে।

স্বামিজী এলেন নীলকণ্ঠের মন্দিরে। বহু দিনের প্রাচীন স্বাক্ষর বহন করছে নীলকণ্ঠের মন্দির। সঙ্গে সাথীরা আছে। বলতে লাগলেন স্বামিজী, বলতে লাগলেন, সমুদ্র মন্থনে বিশ্বনাথের বিষ পানের রহস্য—"সমুদ্রটা হচ্ছে মায়া-সমুদ্র। এই রূপ রস গন্ধাদিময় বিচিত্র জগৎ হচ্ছে মায়ার রচনা। এখানে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর নানারূপ ভোগ্য পদার্থ আছে, সে সকল পদার্থ যতই ভোগ কর, পরিণামে তা থেকে হলাহল উদ্‌গীর্ণ হবে। সে হলাহল আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট তা ব্যর্থ, নিস্তেজ। ভূমানন্দে মগ্ন সন্ন্যাসী মায়ার কুহকে প্রতারিত হন না, বরং দেবাদিদেব শঙ্করের ন্যায় ইন্দ্রিয়-ভোগ তৎপর জীবকুলকে মরণাদি ভয়াবহ অবস্থায় সাহায্য করেন ও তাদের উদ্ধার সাধনার্থ স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। তিনি মায়াকে বিনাশ করে মৃত্যুর কবল হতে জগৎকে রক্ষা করেন, সকলকে দেখান যে মায়াজয়ী পুরুষ মৃত্যুকেও জয় করতে সমর্থ।" কথা বলতে বলতেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন স্বামিজী। কিছুটা সময় কাটল অমনি। ফিরে এলো জ্ঞান। এমনি করে কাটল সে দিনটি।

রাত কাটল। হোল ভোর। এলেন স্বামিজী নারায়ণীতে। বছর বছর মেলা মেলে এখানে। কতলোক আসে। রাজপুতনার গ্রাম, বন্দর থেকে লাখো লাখো লোকের হয় সমাগম। আসে তারা দেবীর পূজা দেখতে। স্বামিজীও এলেন দেখতে, দেখতে এলেন পবিত্র দেবীস্থান। বিদায় দিলেন ভক্ত বন্ধুদের। উপনীত হোলেন স্বামিজী বসওয়া রেল ষ্টেশনে। সেখান থেকে জয়পুর। পরিচয় হোল এক বিখ্যাত বৈয়াকরণের সঙ্গে। অধ্যয়ন করলেন স্বামিজী পণ্ডিতের কাছে পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ী। কিন্তু ঘটেছিল এখানেও একটু বিস্ময়ের ব্যাপার। বসলেন স্বামিজী অধ্যয়ন করতে। কেটে গেল তিনটি দিন। স্বামিজী যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রথম সূত্রটির

ব্যাখ্যা নিয়েই বেঁধেছে বিষম গোল। চার দিনের দিন বললে পণ্ডিতজী, বললে স্বামিজীকে,—"স্বামিজী, আমার শঙ্কা হইতেছে, যখন তিন দিনেও প্রথম সূত্রের অর্থ আপনার বোধগম্য করাইতে পারিলাম না, তখন আমাদ্বারা আপনার বিশেষ উপকার হইবে না!"

বড় লজ্জা পেলেন স্বামিজী। সঙ্কল্পে হোলেন দৃঢ়। মন করলেন, যেমন করেই হোক উদ্ধার করবেন এ ব্যাখ্যার মর্ম্ম। বসলেন একাকী নির্জ্জনে। পড়তে লাগলেন বারে বারে সূত্রটি। শব্দার্থ স্পষ্ট হয়ে উঠল মনশ্চক্ষুর সম্মুখে। ধরা দিল অনুভূতির রাজ্যে। অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করে চমকে দিলেন স্বামিজী, চমকে দিলেন পণ্ডিতজীকে। স্তব্ধ হয়ে গেল পণ্ডিতজী। তাকিয়ে রইল অবাক চোখে।

ভাবতে লাগল পণ্ডিতজী—এ কেমন করে সম্ভব?

বললেন স্বামিজী—"সঙ্কল্পই সব, মনে যদি আগ্রহ আসে, তবে কোন কাজ পড়িয়া থাকে না।"

ছেড়ে এলেন জয়পুর। আজমীরও ফেলে এলেন পিছে। পদার্পণ করলেন আবুপর্ব্বতের শিলা ক্রোড়ে। দর্শন করলেন প্রাণ ভরে তার রূপ-মাধুরী। বেশ লাগল এখানকার পরিবেশ। এমনি দিনে আবার দেখা হয়ে গেল এক মুসলমান উকিলের সঙ্গে। আলাপ হোল। নিয়ে গেল উকিল, নিয়ে গেল স্বামিজীকে সঙ্গে করে। আলাপ করিয়ে দিল বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে। অবশেষে মৌলবী এ খবর জানাল রাজাবাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনকে।

জগমোহন এলো। দেখা করতে গেল স্বামিজীর সঙ্গে। কিন্তু নিদ্রিত সন্ন্যাসী। দাঁড়িয়ে রইল জগমোহন। মনে তার মালিন্যের কালোমেঘ, চিন্তায় অপরিচ্ছন্ন ভাব। একমনে চুপি চুপি ভাবতে লাগল জগমোহন—সাধুর বেশধারী একদল চোর ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক। এও বুঝি তাদেরই একজন। ঘুম ভাঙ্গল স্বামিজীর। আলাপ করল জগমোহন। গেল মুগ্ধ হয়ে। জানাল প্রণাম। চাইল আলাপ করিয়ে দিতে মহারাজের সঙ্গে। বলল মুন্সী স্বামিজীকে—একবার চলুন স্বামিজী, মহারাজের কাছে।

বললেন স্বামিজী—"আচ্ছা, পরশু দিন হবে।"

কেটে গেল দুটো দিন। এলো খেতড়িরাজ, এলো মুন্সীর বাড়ীতে। প্রণাম জানাল মহারাজ। জিজ্ঞেস করল ভক্তি-বিগলিত অন্তরে—"স্বামিজী, জীবনটা কি?"

বললেন স্বামিজী—"প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ প্রকাশের নামই জীবন।"

আবার প্রশ্ন করল মহারাজ—"আচ্ছা স্বামিজী শিক্ষা কি ?" বললেন স্বামিজী—"কতগুলি সংস্কারকে অস্থি মজ্জাগত করার নামই শিক্ষা।"

কথা বলতে বলতে স্বামিজীর স্মরণে এলো শ্রীগুরুর বাক্য। বলতে লাগলেন কত না মধুর কথা। মহারাজ তো মুগ্ধ। চায় না মন আর ফিরে যেতে দেশে। স্বামিজীর চিন্তায় মহারাজের মনকে ছেয়ে ফেলল; বলল স্বামিজীকে—"চলুন স্বামিজী আমার রাজ্যে।"

জানালেন সম্মতি স্বামিজী। চলে এলেন মহারাজের সঙ্গে, চলে এলেন খেতড়িতে।

৩১

নিঝুম পুরী।

রাত দুপর। নিঃসীম, নিস্তব্ধ চতুর্দ্দিক। থম্ থম্ ক'রছে অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। জেগে শুধু একজন।

কে?

মহারাজ অজিত সিংহ।

কোথায়?

স্বামিজীর শিয়রে। হাওয়া দিচ্ছে চুপি চুপি। পা টিপছে ধীরে ধীরে। আবার কখনও বা অপলক নয়নে তাকিয়ে দেখছে স্বামিজীর তনু দীপ্তি।

হঠাৎ চম্‌কে উঠলেন স্বামিজী। বললেন—কে?

একটি শান্ত প্রত্যুক্তি—আমি।

ত্রিযামা রাত্রির স্তব্ধ প্রহরগুলি কেটে গেল এক এক করে। রাত প্রায় দিবসের বৃন্তে উন্মুক্তির আয়োজনে ব্যস্ত। কোন খেয়াল নেই অজিত সিংহের। সে যেন কোন এক আনন্দ-লোকের আকাশে দেখছে নব চন্দ্রের স্নিগ্ধতা। চেতনার তীর্থ তোরণের তাপস যে ধরা দিয়েছেন তার নয়নে। হৃদয়ের দেউলে যিনি ক্ষণ ভাতি, অজিত সিংহের জাগর দৃষ্টিতে যে হোয়েছে তাঁর স্থির স্থিতি। ছাই ঘুম কি আর আসে!

স্বামিজী শুতে যেতে বললেন তাকে। কিন্তু সেদিকে যেন কোন খেয়াল নেই তার। তন্ময় হোয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে ত' দাঁড়িয়েই আছে। আবার বললেন স্বামিজী, বললেন ঘুমোতে যেতে। এবারে যেন একটু চেতন হোল।

বিরহ-কাতর মনটা উঠল কেঁদে। বলল মহারাজ—"আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য। আপনি আমায় এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

দীক্ষা পেয়েছে পূর্ব্বেই। কিন্তু বড় ব্যথা তার অন্তরে। একটি ছেলে নেই তার। কে ভোগ করবে এমন ঐশ্বর্য্য! কার জন্যেই বা সঞ্চয়ের ভাবনা। ভাবছে তাই অজিত সিংহ—যদি গুরুর অশীর্ব্বাদ মেলে তো সবই সম্ভব। বলল এক সময়—"স্বামিজী, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার একটি পুত্র লাভ হয়।"........

আশীর্ব্বাদ করলেন আজন্ম-ব্রহ্মচারী। ত্যাগী করলেন ভোগের শিয়রে মন্ত্র উচ্চারণ। বললেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

অন্তর ভরে গেল তৃপ্তির সুধায়। ব্যথার মঞ্জুষায় এলো আনন্দের রসধারা।

চলে এলেন স্বামিজী। অনেক দিন ছিলেন খেতড়িতে। রাজপুতনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নারায়ণ দাসের কাছে অধ্যয়ন করলেন পাতঞ্জলির মহাভাষ্য। তার পরে চলে এলেন, চলে এলেন অজিত সিংহকে বড় কষ্ট দিয়ে।

কিন্তু আবারও যেতে হোল সেখানে।

কেন?

পুত্র হয়েছে মহারাজের। উৎসব-মুখর খেতড়ি। গুরু না গেলে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে না শুভ কর্ম্মের!

এলেন স্বামিজী খেতড়িতে।

দিকে দিকে আলোর ঝলকানি। পুষ্পস্তবকের বিচিত্র রঙ্গন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোচ্ছ্বাস। রাত্রি যেন রাত্রি নয়—উঠছে মদিরাময়ী হোয়ে।

বসল সভা। ধূপছায়া সন্ধ্যায় ভেসে আসছে গন্ধবহ সমীরণ। মন যায় বিভোর হোয়ে। তারপরে আবার রাজা-মহারাজার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ।

পুরীর অভ্যন্তরে গাইছে গান নর্ত্তকীরা। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। কণ্ঠে সুর-ঝঙ্কার। বেশ জমেছে সভা। উপভোগ করছে ভোগ-বিলাসের মহাজনেরা প্রাণ দিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। স্বামিজী উঠে দাঁড়ালেন। মহারাজ বিনীত কণ্ঠে যুক্ত করে বললেন—"স্বামিজী, এর একটি গান শুনিয়া যান।··· নিশ্চয় আনন্দ পাইবেন।"

কে শোনে কার কথা। ধীর পদ-বিক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগলেন স্বামিজী বাইরের দিকে। মহারাজের নয়নে জল। বক্ষে জেগেছে সমুদ্রের ঝড়। বোশেখের তরু পল্লবের মত কাঁপছে থেকে থেকে। নীলাকাশে লেগেছে যেন কালো কাজল। অন্ধকার আকাশে তারার আভাতি গেছে নিষ্প্রভ হোয়ে। স্থির, শান্ত, স্তব্ধ হোয়ে গেছে মলয় সমীর। মহারাজের সমস্ত চেতনার আকাশে আভাসিত হোয়েছে দুর্ভাবনার কালো মেঘ। অপরাধীর মত শুধু ভাবছে থেকে থেকে—কি করলেম, কি করলেম আমি!

ঠিক এমনি সময় ভেসে এলো স্বামিজীর কর্ণে—ভেসে এলো এক অপূর্ব্ব সুর। সেই বৈষ্ণব শিরোমণি সুরদাসের পদাবলীর একটি স্তবক। থমকে দাঁড়ালেন স্বামিজী। আহা কি কণ্ঠ! এ তো গান নয়, যেন ধ্যান। সুর নয়, যেন কান্না।

"প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যাঁয় নাম তুমারো।
এক লোহ পুজামে রহত' হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহী হোয়
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥"

আর একটু এগিয়ে এলেন স্বামিজী। নিবিষ্ট মনে বৈষ্ণব পদকর্ত্তার মধু রসে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলেন। এমনি সময় আবার শুনলেন—

"এক নদী, লহর, বহত মিলি নীর ভরো।
যব মিলিহে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥"

মুগ্ধ হোয়ে গেলেন স্বামিজী। সংস্কারাচ্ছন্ন মনের আকাশে জ্বলল চেতনার দীপ-শিখা। বড় ব্যথা পেলেন স্বামিজী। ভাবলেন আপন মনের দৈন্যের কথা। অনুশোচনার অনলে আহুতি দিলেন পুর্ব্ব সংস্কার।

ফিরে এলেন সভায়। দেখতে লাগলেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' ভাব—গম্ভীর বিবেকানন্দ, বললেন—"মা, আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনাকে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া যাইতে ছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলতেন—কি হয়রে সহবাসে? মনটা তার দুয়ারে ফেলে রাখলেই হোল।

হোক পতিতা। হোক ভ্রষ্টা। সেও মানুষ। পতিতার অন্তরায়তনেও বিশ্ব এসে প্রকাশিত হয়, যদি থাকে সাধনায় ঐকান্তিকতা। আকুল মন ব্যাকুল হোলে সব আবিলতা যায় ধুয়ে। তখন পতিতার ভেতরে স্ফুরিত হয় ব্রহ্মজ্যোতি।

শঙ্করাচার্য্যের মন থেকে ভেঙ্গে ফেলেছিল ভেদের পাঁচিল চণ্ডাল। আর বিবেকানন্দের মন থেকে মুছে ফেলল নর্ত্তকী তাঁর আজন্মের ভ্রান্ত ঘৃণাকে।

ভেদ ভুলল মন। সংস্কারের মেঘ হোল অপসৃত। জীবন যাত্রার পথে পেলেন জীবন-বেদের বাণী।

তিব্বতে গিয়ে লাভ করলেন আর একটি অভিজ্ঞতা। এখানে এক স্ত্রীর ছয় বর।

সে কি ?

এখানকার মেয়েরা এক সঙ্গে বিয়ে করে একাধিক পুরুষকে। তাদের মত আবার ভিন্ন। তারা বলে—"একটি মেয়েকে একার জন্মে রাখা। কি স্বার্থপরতা।"

কথাগুলি তাঁর মনকে নাড়া দিল। কঠিন কঠোর হোয়ে গেলেন মুহূর্ত্তে। ভাবতে লাগলেন—এ কি তবে নিশ্চিত কু-প্রথা নয়। সংস্কারের অন্ধ ভ্রান্ত পথে নতুন যুগের আলোকসম্পাত না করতে পারলে তো ভাঙবে না এই স্থবির জীবনের ঘুম! চনমন করে উঠল মন। কিন্তু সে তো এক দিনে হবার নয়। অতীতের বিরাট অনুমোদনকে ক্ষণিকের মত্ততায় ভেঙ্গে ফেলা যায় না। জুলুম করে মহৎকে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলেও বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। তাই দরকার হোল শিক্ষার। শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা ভেঙ্গে ফেলতে হবে কু-সংস্কারের কারাদুর্গ। মানুষের অন্তরকে করতে হবে সুন্দরের মন্দির।

খেতড়ি যাত্রা করলেন আজমীরের পথে। দু' একদিন রইলেন মাত্র। চলে এলেন আমেদাবাদে। ভিক্ষান্নে কাটছে দিন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন জৈন, হিন্দু ও মুসলমানের মন্দির ও মস্‌জিদ। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে যাত্রা করলেন কাথিয়াওয়াড়ের ওয়াডওয়াল নামক স্থানে। সেখান থেকে এলেন লিমড়ী। শুনলেন এসে এখানে, শুনলেন স্বামিজী, এখানে আছে এক সাধুর আবাস। খুঁজে বের করলেন। অভ্যর্থনা জানাল মন্দিরের সাধুরা। স্বামিজী গ্রহণ করলেন তাদের আতিথ্য।

কিন্তু এরা কেমন সাধু ?

কাটল দু' একটা দিন।

এদের কাজকর্ম্ম দেখে ঝিম ধ'রে গেল স্বামিজীর মাথায়। কু-কাজ করছে এরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে। বীজমার্গী এরা। কিন্তু অতীব নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্ম্মধ্বজী।

পাশের ঘরে থাকেন স্বামিজী। মন্ত্র পাঠ শোনেন নিত্যি। কিন্তু তা হচ্ছে ইন্দ্রিয় পুজার আরাত্রিক। আবার কখনও বা ভেসে আসে নারী কণ্ঠের

আর্ত্তনাদ। চম্‌কে ওঠেন স্বামিজী। ভীতিবিহ্বল হোয়ে যায় মন। ঘুম আসে না চোখে। রাত কেটে যায় বিনিদ্র নয়নে। মনে করলেন, আর থাকবেন না এখানে। দাঁড়ালেন উঠে। খুলতে গেলেন দ্বার। কিন্তু অবাক হোয়ে গেলেন স্বামিজী।

কেন ?

বাইরে থেকে তালা এঁটে দিয়েছে দরজায়। এবারে একটু ভয় হোল স্বামিজীর মনে। নিশ্চয়ই কিছু একটা উদ্দেশ্য রয়েছে এর পেছনে। তা না হোলে এমন করে কি বন্দী করে ? তবে কি ওরা একটা অঘটন ঘটাবে ! এমনি কত কথা ভাবছেন স্বামিজী। এমনি সময় এলো ওদের দলের প্রধান। বললে,—"তুমি একজন উচ্চদরের সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ তুমি বহু বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছ। এখন তুমি এই তপস্যার ফল আমাদের দান কর। আমরা একটি বিশেষ সাধনার অনুষ্ঠান করিতেছি। তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য তোমার ন্যায় একজন ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক। অতএব তুমি প্রস্তুত হও।"

সে কি কথা !

হ্যাঁ, প্রস্তুত হও।

কত কথা এসে উঁকি দিতে লাগল স্বামিজীর অন্তরে। তবে কি এরা পাপাচারী ? যদি তাই হয়, তবে তো বিরত হবে না—নরহত্যা থেকেও। নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ প্রহরগুলি যেন তাঁর চোখের সামনে বিভীষিকার মত এসে দাঁড়িয়ে যায়। বিচঞ্চল হোয়ে উঠল মন। স্মরণ করলেন শ্রীগুরুর নাম।

ওগো, আর কত দূরে নিয়ে যাবে। এ তোমার কেমন পরীক্ষা। তবে কি জীবন অন্ত করে দিতে হবে তোমার প্রশ্নের জবাব ?

সারাটা রাত আর ঘুম এলো না চোখে। সকাল হোল। এলো একটি ছেলে। নিত্যি আসে। আজও এসেছে। বড় প্রিয় স্বামিজীর এ ছেলেটি। স্বামিজী বললেন তার কাছে খুলে সব কথা। জিজ্ঞেস করল সে—আমি কিছু করতে পারি কি স্বামিজী ?

বললেন—"হাঁ, হাঁ বৎস, তোমার দ্বারাই আমার উদ্ধার হইবে।"

কেমন করে ?

কি যেন একটা দিয়ে বললেন স্বামিজী—"এই লও········মহারাজের হাতে দেবে। খুলে বলবে আমার কথা।"

বাহির পথে এসে ছেলেটি ছুটল ত্রস্ত পদসঞ্চারে।

কি দিলেন স্বামিজী ?

একখানা শিলালিপি।

সে কি ?

হ্যাঁ, মেটেসরার 'পরে লিখে দিলেন কাঠের কয়লা দিয়ে। আর যায় কোথায়। মুহূর্ত্তে এসে গেল প্রহরীর দল। পরিবেষ্টিত করে ফেলল সাধুর আবাস। ধরে নিয়ে এলো সবাইকে। শাস্তি হোয়ে গেল তাদের। মুছে গেল লিমড়ীর বুক থেকে পাপাচারীদের চিহ্ন।

কিছু দিন রইলেন স্বামিজী লিমড়ীতে। তার পরে যাত্রা করলেন। গুজরাটের মরুময় দেশ ঘুরে ঘুরে আমেদাবাদ, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওলা, প্রভাস হয়ে এলেন সোমনাথের মন্দিরের কাছে।

মনে পড়ে অতীতের দিনগুলো। সুলতান মামুদের লুণ্ঠিত সোমনাথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন কত কথা।

এবারে এলেন পোর বন্দরে। এখানে আছেন এক বিখ্যাত পণ্ডিত। নাম হোল তাঁর শঙ্কর পাণ্ডুরঙ। মহাভাষ্য অধ্যয়ন করলেন স্বামিজী, অধ্যয়ন করলেন পাণ্ডুরঙএর কাছে। আলোচনা করলেন বেদান্তের ব্যাস সূত্র।

এমনি দিনে দেখা হোল গোবর্দ্ধন মঠের জগদ্‌গুরুর সঙ্গে। এলেন শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মহারাজ। আহুত হোল এক বিচার সভার। আমন্ত্রণ এলো স্বামিজীরও।

তরুণ সন্ন্যাসী। কিন্তু একজন খ্যাতির সম্রাট। মানুষের মুখে মুখে তাঁর নাম।

পণ্ডিতগণ আজ তাকে পরীক্ষা করবে। পরাজিত করবে বাক্‌যুদ্ধে। সব বিরাট বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিতকুল বসে আছেন যে যার আসনে। আত্মগর্ব্বে মত্ত পণ্ডিতকুল করে বসল দু'একটি প্রশ্ন।

উঠে দাড়ালেন নব যুগের নবীন সন্ন্যাসী। এক এক করে সমাধান করে দিলেন জটিল জিজ্ঞাসার। অবাক বিস্ময় সবার চোখে মুখে। মন্ত্রমুগ্ধের মত পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ মনে মুক্ত কণ্ঠে করতে লাগল প্রশংসা। বলল পাণ্ডুরঙজী—"স্বামিজী! এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আপনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। আপনার উদার ভাবসমূহ আমাদের দেশের লোক অনেক বিলম্বে বুঝিবে। বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া আপনি

পাশ্চাত্য দেশে গমন করুন। সেখানকার লোক মহত্ত্বের ও প্রতিভার সম্মান করিতে জানে। আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপর সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিয়া অভিনব যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন।"

নীরব বিবেকানন্দ। রইলেন শুধু তাকিয়ে। তারপরে বললেন ধীরে ধীরে—"একদিন প্রভাসে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া দূর দিক্-চক্রবালে আলোক মণ্ডিত শীর্ষ তরঙ্গমালার নৃত্যভঙ্গী দেখিতেছিলাম, সহসা যেন মনে হইল এই বিক্ষোভিত সিন্ধু অতিক্রম করিয়া আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তাহা কি প্রকার সম্ভব হইবে বুঝিতে পারি না।"

* * * * * *

ত্রিগুণাতীত এসেছে। যাচ্ছিল তীর্থ ভ্রমণে। শুনল পথে, শুনল এক সাধুর মুখে—"পোরবন্দরে মহারাজের আলয়ে একজন বাঙালী পরমহংস অবস্থান করিতেছেন।"

মনে করল ত্রিগুণাতীত দেখা করবে পরমহংসের সঙ্গে। চাইবে কিছু অর্থ। রিক্তহস্তে কি তীর্থ ভ্রমণ চলে?

রাজবাড়ী। দরজায় দাঁড়িয়ে দু'জন সন্ন্যাসী। কিন্তু ঢুকতে দিচ্ছে না প্রহরীরা ভেতরে। অবশেষে লিখে পাঠাল ত্রিগুণাতীত—"আমরা দুইজন সাধু.........পরমহংসের সাক্ষাৎ প্রার্থী।"

ভাবছেন স্বামিজী—আবার এলো কারা?

দাঁড়ালেন এসে বারান্দায়। কিন্তু দেখলেন না কাউকে। নেমে এলেন। তারপরে তো অবাক। নিয়ে গেলেন স্বামিজী তাদের উপরে। কথা বলতে লাগলেন কত।

"ভাই সারদা! ঠাকুর আমার সম্বন্ধে যে সব কথা বলিতেন, যাহা আমি চপলতা বশত তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, এক্ষনে সেগুলির সত্যতা ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতেছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর যে শক্তি আছে, তাহা দ্বারা জগৎ ওলট পালট করিয়া দিতে পারি।"

নির্ব্বাক হোয়ে ওরা শুনছে। বলল এক সময় ত্রিগুণাতীত—"ভাই, আমি কয়েক জন সন্ন্যাসীর একান্ত অনুরোধে এখানে আসিয়াছি।......কিছু অর্থের দরকার, তা যদি তুমি রাজাকে কিছু বল...."

শুনে যেন বজ্রপাত হোল স্বামিজীর মস্তকে। বললেন, "ছিঃ ছঃ, তুমি টাকা চাহিতে আসিয়াছ? কেন? ভিক্ষা করিবে কি জন্যে?......একি হীন বুদ্ধি!... তুমি জান, আমি কখনও কাহারও নিকট অর্থের জন্য হাত পাতি না। আজ রাজ-প্রাসাদে আছি, কাল হয়ত দরিদ্রের কুটিরে গিয়া থাকিব। সন্ন্যাসীর তাতে কি আসে যায়।"

দু' এক দিনের মধ্যেই স্বামিজী পোরবন্দর ছেড়ে চলে এলেন দ্বারকায়। সেখান থেকে এলেন বরোদায়। উঠলেন দেওয়ান বাহাদুর মণিভাইর প্রাসাদে। এখানেও রইলেন না বেশী দিন। চললেন মধ্য ভারতের দিকে।

অন্তরে নিরুদ্ধ ঝড়। চলেছেন স্বামিজী মানুষের বিবেক খুঁজে খুঁজে। তাদের সুখ দুঃখের খবর জেনে। তাই তো তার আবাস হোল ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটির অবধি।

৩২

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। সেপ্টেম্বর মাস।

স্বামিজীর মনে দূর দেশের স্বপ্ন। দাঁড়িয়ে আছেন রেল ইষ্টিশনে। গাড়ী ছাড়বার সময় হোল। উঠলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায়। রয়েছে সেখানে আরও তিনটি যুবক। তারা তর্ক করছে পরস্পরে।—এ দেশের সন্ন্যাসী-গুলোই শেষ করে দিলে দেশটাকে। যত সব ভণ্ড, প্রতারকের দল।

প্রতিবাদ জানাল মাত্র একটি যুবক—ভুল কথা। ভারতের পবিত্র মৃত্তিকায় যুগে যুগে এলো কত মহামানব। রেখে গেল তারা মহাশান্তির বাণী। তাদের বাণী বয়ে চলেছে সন্ন্যাসী। যুগের বুকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সত্যের আলো।

এতক্ষণ বসে ছিলেন স্বামিজী শ্রোতা হিসেবে। এবারে একক যুবকটিকে সমর্থন করে বলতে লাগলেন—যথার্থই বলেছেন আপনি। যুগে যুগে কালে কালে ভারতে এলো কত সন্ন্যাসী। ভারতের জাতীয় জীবনে তাদের দান অসীম। যুগ ও জীবনে এনে দিল তারা মহামুক্তির মন্ত্র। প্রচার করল দক্ষিণের তরঙ্গ স্পন্দিত সমুদ্র থেকে উত্তরের তুষার-কবরী হিমালয় অবধি ভারতের চিরন্তনী বাণী। লক্ষ কোটি মানুষকে বাঁচাল বিপর্য্যয় থেকে। নিয়ে এলো মুক্তির মোহনায়। দিল তাদের কানে মনে সুন্দরের সঙ্গীত। অপসৃত হোল অন্ধকার। আলোয় আলোময় হোল দিক বিদিক। ফলে হয়েছে কি? ভারতবর্ষ তার আপন সত্বা লয়ে আজও জীবন্ত। কত মত,কত পথের জন্ম হোল। বহিরাগত শত্রু হানা দিল। কিন্তু কৈ, কেউ তো পারল না ভারতের অধ্যাত্ম চেতনায় ঘুণ ধরাতে?

ইংরেজীতেই বললেন এ কথাগুলি। একক যুবকটি গেল মুগ্ধ হোয়ে। পরিচয় নিল স্বামিজীর। বলল নিজের নাম স্বামিজীকে—বালগঙ্গাধর তিলক।

নামল এসে পুণা ইষ্টিশনে। স্বামিজীকে অনুরোধ করল তার বাড়ীতে যাবার জন্যে। সম্মত হোলেন সন্ন্যাসী। কয়েকটা দিন থেকে এলেন স্বামিজী বালেশ্বরে। এখানে একদিন পথে দেখা হোয়ে গেল স্বামিজীর শিষ্য লিমড়ীর মহারাজের সঙ্গে। বলল মহারাজ—"আর আপনাকে ছাড়িয়া দিব না, দয়া করিয়া আমার সঙ্গে চলুন, লিমড়ীতে আপনার স্থায়ী ভাবে থাকিবার সু-বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

কিন্তু স্বামিজী এখন কেমন করে যাবেন। তার সম্মুখে বিরাট কর্ম্মের ফেনিল সমুদ্র। কর্ত্তব্যের আহ্বান। বললেন তাই—"একটা অদ্ভুত শক্তি আমাকে জোর করিয়া ঘুরাইতেছে। ঠাকুর আমার স্কন্ধে এক মহান কার্য্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত সে কাজ না শেষ হইবে, ততদিনে বিশ্রাম করিবার আশা বৃথা।"

মারমাগামে এলেন স্বামিজী। সেখান থেকে বেলগামে এলেন। অতিথি হোলেন এক মারাঠা ভদ্রলোকের। বেলগামে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।—এক বাঙ্গালী সাধু এসেছেন। বনবিভাগের কর্ম্মচারী হরিপদ মিত্র এ খবর পেয়ে দেখা করতে এলেন। নিয়ে এলো হরিপদ তার বাড়ীতে স্বামিজীকে। দীক্ষা নিল স্বামী, স্ত্রী দু'জনে।

আর রইলেন না স্বামিজী সেখানে। এলেন বাঙালোর। যে দেখে, সে যায় মুগ্ধ হোয়ে। আলাপ হোল মহীশূরের দেওয়ানের সঙ্গে। খুশী হোয়ে আলাপ করিয়ে দিল দেওয়ান মহারাজ চামরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ার বাহাদুরের সঙ্গে। কথাবার্ত্তা শুনে রাজা বাহাদুর তো অবাক। এমন আর জীবনে কখনও শোনেনি। আকুল হোল মন। চাইলো পুজা করতে স্বামিজীকে। কিন্তু অসম্মত হোলেন স্বামিজী। রাজা বাহাদুরের বাড়ীতেই আছেন এখন স্বামিজী। বেশ কাটছে এখানে দিনগুলি। দেওয়ান বাহাদুর ডাকল একটি সভা। বেদান্ত বিচার সভা। কত সব পণ্ডিত এলো। বসল সভা। সুরু হোল বেদান্ত বিচার। ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল যুক্তি তর্ক। বাক্‌যুদ্ধ সুরু হোল। আর কতক্ষণ থাকবেন বসে স্বামিজী। দাঁড়ালেন উঠে। বলতে লাগলেন মধুর কণ্ঠে—বলতে লাগলেন অপুর্ব্ব করে বেদান্তের ব্যাখ্যা। স্তব্ধ হোয়ে গেল সবাই। মুগ্ধ হোল তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে বেদান্ত ভাষ্য শুনে। হোল দ্বন্দ্বের অবসান। পণ্ডিতমণ্ডলী আশীর্ব্বাদ করতে লাগল দু'-হাত তুলে। ভাঙল সভা।

যাবার দিন আগত। কিন্তু রাজাবাহাদুর চাইছে না যেতে দিতে। বলল তাই—"স্বামিজী! আপনার জন্য কিছু করিতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতাম। আপনি তো কিছুই গ্রহণ করিবেন না।"

বললেন স্বামিজী—"আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবল মাত্র ক্রন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেই উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। উহারা যেমন বর্ত্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প

ইত্যাদি শিক্ষা দিবে, বিনিময়ে আমাদেরও উহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে দিবার মত এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কি আছে?............সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম্ম প্রচার করিতে পাশ্চাত্য দেশে যাইব। যাহাতে এই আদান প্রদান সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ কামনায় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আপনার ন্যায় মহাকুল প্রসূত শক্তিশালী রাজন্য-বর্গ চেষ্টা করিলে অল্পায়াসেই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। আপনি এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।" এইটুকু পেলেই আমি খুশী।

পাশ্চাত্যে যাবার সমস্ত খরচা বহন করতে সম্মত হোল রাজাবাহাদুর। কিন্তু বললেন স্বামিজী, "এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। আমি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।.... এমন কি, তাহার পর কি করিব, কোথায় যাইব তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।"

যাত্রার আয়োজন করলেন স্বামিজী। নিয়ে এলো রাজাবাহাদুর কত না মূল্যবান উপহার। কিন্তু কিচ্ছু নিলেন না। শুধু কেবল একটি চন্দন কাঠের হুকো নিয়ে নিলেন স্বামিজী।

বড় ব্যথা পেল রাজাবাহাদুর। এত সব এনে তবে কি হোল! ম্লান হোয়ে গেল মুখ। চোখ ফেটে যেন কান্না আসে।

বুঝলেন স্বামিজী তার মনের ভাব। চেয়ে নিলেন পথের খরচাটা।

মনটা একটু খুশী হোল। কোচিন অবধি করে দিলেন একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট। আর দিয়ে দিলেন পরিচয় পত্র। প্রণাম করল রাজাবাহাদুর সাষ্টাঙ্গে। যাত্রা করলেন স্বামিজী।

*　　*　　*　　*

কোচিন।

অল্প কয়েকটা দিনের বিরতি। সেখান থেকে এলেন ত্রিবাঙ্কুরে। দিগন্ত বিসারিত আরব সাগর। তারই তটে ত্রিবাঙ্কুর। হুঁ হুঁ করে ছুটে আসে মৌসুমী বায়ু। গেয়ে যায় গান। বর্ষণ মন্দ্রিত আকাশ। বৃষ্টি ঝরে অঝোরে। প্রকৃতি পরে শুচিবাস। ডাকে ফসলের বান। মন যায় মুগ্ধ হোয়ে। কবি চিত্ত তন্ময় হোয়ে থাকে প্রাকৃতিক শ্যাম স্বপ্নে।

সুন্দরমন আয়ারের বাড়ীতে অতিথি হোলেন স্বামিজী। কে সে?

ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষক।

স্বামিজীকে এখানে রাখবার জন্যে তারা ব্যস্ত। কিন্তু আর তো থাকবার উপায় নেই। ডাক এসেছে। ডাক এসেছে দূর দিগন্ত থেকে। ডাকে কন্যাকুমারীকা।

এলেন ত্রিবান্দমে। তারপরে মাদুরা। পরিচয় হোল ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করল রামনাদের রাজা সেতুপতি। দু' একটা দিন যেতে না যেতে অবাক হোয়ে গেল রাজা, অবাক হোয়ে গেল ত্যাগী তাপসের মুখে দরিদ্র, পীড়িত ভারতের কথা শুনে। সংসার নেই। ভোগ-বাসনার আকাঙ্ক্ষা নেই। তবুও এমন দরদ, দুঃখীর জন্যে!

মাদুরা থেকে রামেশ্বর এলেন। দর্শন করলেন স্বামিজী শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি। তারপরে যাত্রা করলেন। কত মরু, কত নদী ফেলে এলেন পিছে। ধনীর রাজাপ্রসাদ থেকে দীনের ভাঙ্গা ঘরে বিশ্রাম করে করে পৌঁছলেন এসে কুমারীকা অন্তরীপে। প্রণাম করলেন দেবী মূর্ত্তির সম্মুখে। বসলেন শিলাসনে।

ঊর্দ্ধে দিগন্ত বিসারী নীল আকাশ। নিম্নে পরিশ্রমী মানুষের পবিত্রতম সৃষ্টি সম্ভার। পেছনে দুর্গমগিরি মরু পথ। সম্মুখে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ উদধি। এই তো ভারতবর্ষ। আর তারই সর্ব্ব শেষ তীর্থের উপলখণ্ডে উপবিষ্ট উদীয়মান সন্ন্যাসী।

তাকালেন চোখ মেলে। তাকালেন বহু বিচিত্র ভারত ভূমির দিকে। ধীরে ধীরে আবার এলো চোখ বুজে।

নির্জ্জন-নিরালায় বসে ভাবছেন স্বামিজী—

ভাবছেন শ্রীগুরুর কথা।

হে প্রভু, এলাম সারাটা দেশ ঘুরে। দেখলাম কত ধনীর ধন। কত বিলাস। কত না ঐশ্বর্য্য। আবার আর একদিকে দরিদ্রের ভাঙা ঘর। জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কাল দেহ। তাদের ক্ষীণকণ্ঠে মৃত্যুর হাহাকার। উচ্চ নীচে এমন ভেদের প্রাচীর কেন? কই গো, তোমার অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা আমি তো পারলেম না, পারলেম না তাদের জলঝরা চোখ মুছিয়ে দিতে? পারলেম না এনে দিতে তাদের সবাকার মনে নৈতিক আর আধ্যাত্মিক চেতনা। ওগো, ওরা সংস্কারের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভ্রান্ত আদর্শ লয়ে ভুল পথে যাচ্ছে। তুমি কি তা দেখ না? আমার যাত্রা শেষ হোয়ে গেছে। পৌঁছে গেছি এসে মহাভারতের উপান্তে। বড় ব্যথা। বড় দুঃখ!

এমনি ভাবনার আকাশে ডানা মেলে দিল মুক্ত বিহঙ্গ। ধ্যানস্থ হোয়ে পড়লেন। স্মরণ লোকে সজাগ হোয়ে উঠল অতীত ভারতের ঐতিহ্য। যেন এসে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে গেছে মনের নেপথ্যে—সেই জ্ঞান-গরিমার জ্বলন্ত স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল হোয়ে উঠল, সেই নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা!

আবার মন মগ্ন হোয়ে যায়। ডুব দিলেন গভীরে। ধীরে ধীরে আভাসিত হোল রূঢ়, রিক্ত, কঙ্কাল ভারতের বেদনা ঘন তনু। বিভ্রান্ত হোয়ে পড়েন স্বামিজী।

—এই কি সেই ভারত? "ছিন্ন বসন, যুগ যুগান্তর নিরাশাব্যঞ্জিত বদন নরনারী, বালকবালিকা।"

অশিক্ষা, সংস্কার, মোহ ঘোর। নির্ম্মম মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার হীনতম অভিযান। একের জয়যাত্রায় লক্ষ জীবনের রক্ত মোক্ষন। কোটি কণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকার—অন্ন দে, অন্ন দে বলে!

বজ্র দৃঢ় তরুণ সন্ন্যাসীর অন্তর কেঁদে উঠল। ডুকরে কাঁদলেন। প্রশ্ন করলেন নিজেকে নিজে—"আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ইহাদের অন্নে জীবন ধারণ করিয়া ইহাদের জন্য কি করিতেছি? দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছি! ধিক্! ধিক্!"

মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।"

আত্মসর্ব্বস্ব ধর্ম্মের কথা এদের কাছে দুঃসহ। দর্শনের সূক্ষ্মভাব ব্যাখ্যা মূঢ়তা। মুছে যায়নি তাদের অন্তর থেকে ধর্ম্মের নাম। লুপ্ত হয়নি বিবেক। কিন্তু শ্মশান শিয়রে জীবনের সু-স্থির স্বপ্ন কোথায়? কি লাভ হবে তপ্ত মরুতে মুঠা মুঠা বীজ বুনে? অন্নগত প্রাণ। অন্ন দিতে হবে নিরন্নের মুখে মুখে। স্খালন করতে হবে অশিক্ষার অন্ধকার। তা না হোলে তো অরুণোদয় হবে না!

কিন্তু তা কেমন করে হবে?

আবার ধ্যানস্থ হোয়ে পড়লেন স্বামিজী। সহসা যেন দেখলেন অন্ধকার আবর্ত্তিত হোয়ে স্ফুরিত হচ্ছে জ্যোতি। আলো, কেবল আলো। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে পথের সন্ধান। তন্ময় হোয়ে গেলেন তাপস। দেখতে লাগলেন নীল নিঃসীম জলরাশিতে তরঙ্গ বিক্ষোভ। স্পন্দিত হচ্ছে থেকে থেকে। তারই 'পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যঘনতনু। চলে যাচ্ছেন দূরে। দিগন্ত বিস্তৃত অন্তহীন অসীমে।

গেল সমস্ত শরীর ভার হোয়ে স্বামিজীর। পাষাণ মূর্ত্তির মত বসে। শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত প্রবাহ। ছুটেছে বিত্যুৎ বেগে।

কেবল কি তাই? আহ্বান করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—ওরে, আয়, আয়, আয়। ছুটে আয় উল্কার বেগে। আয় ছুটে সাত সাগরের বুক চিরে। চলে আয় পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তে। তার পরে ঘোষণা কর। তোকেই ঘোষণা করতে হবে মহাভারতের মহিমময় বারতা। তোর মুখেই শুনুক বিশ্ববাসী ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী। সাধনার ঐক্যে জগৎকে গ্রথিত কর মালার মত। ধর্ম্ম, মর্ম্মের জয় গানে মুখর করে দে যুগ ও জগৎ। সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহ্যের মঞ্জুষা নিয়ে আয়। ভয় নেই নরেন। শঙ্কা নেই বিশু। ঐ দেখ, দাঁড়িয়ে আছে তপোবৃদ্ধ ভারতের ঋষিকুল। আশীর্ব্বাদ করছেন তারা তোকে, মাভৈঃ মাভৈঃ। এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়......।

ভগ্ন স্তিমিত মনে জাগল অনল বন্যা। নিরুদ্ধ শক্তির হোল জাগরণ। গর্জ্জন করে উঠল সুপ্ত সিংহ। আজন্ম বৈরাগী ত্যাগী তাপসের কণ্ঠ ঘোষণা করবে লক্ষ কোটি মৌন মুখের পবিত্র অধিকার। অশান্ত সন্ন্যাসী ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্ম্মের ফেনিল তরঙ্গে।

সত্যের তরবারিতে খান খান করে দেব মিথ্যার বনিয়াদ। প্রচার করব বেদান্তের সার্ব্বভৌম বাণী। মুছে দেব অশ্রুসিক্তা, ছিন্ন-বসনা, অনবগুণ্ঠিতা মায়ের আঁখিধার। ফিরিয়ে আনব মা তোর লুপ্ত গৌরব। ওঠো, জাগো, মোছ মা আঁখিজল। আর ভয় নেই। আমরা এসেছি—এসেছি তোমার কোটি মৌন প্রতিজ্ঞা-গ্রথিত সন্তান—এসেছি প্লাবন ক্ষুব্ধ ভারতের সীমানা থেকে। এসেছি নতুন যুগে, নতুন দিনের সূর্য্যকে ছিঁড়ে নিতে রাত্রির বৃন্ত থেকে। আর ভয় নেই মা, অগ্নি ঝলসিত বিত্যুৎ বেগে লক্ষ কোটি মানুষ আমরা যাত্রা করেছি। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

হে আমার জীবন বেদের বেদকার, হে নবযুগ ধর্ম্মের অবতার, আশীর্ব্বাদ কর, পারি যেন তোমার দেয়া পতাকা বিশ্বের তোরণে উড্ডীন করতে।

মহাযোদ্ধা কুর্ণিশ করলেন জ্ঞানের তরবারি। প্রণাম করলেন ত্বঃখিনী জন্মভূমিকে। সূচনা হোল নব যাত্রার।

অবলুপ্তির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গিয়েছে—গিয়েছে কি মহাভারতের মহামানস-সম্পদ? এ রিক্ত নিঃসম্বল সন্ন্যাসীকে কেউ কি দেবে না—দেবে না কি ভারতের মাঙ্গলিক গাইতে একটি একতারা তুলে হাতে? মহা-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে একটা চকিত গর্জ্জন হোল। ঘোর কাটল।......

ফিরে তাকালেন স্বামিজী—

ফিরে তাকালেন কন্যাকুমারিকার পাদ-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সেই আবেগ-স্পন্দিত অনন্ত অশ্রান্ত ফেনিল জলরাশির দিকে। জল আর জল। কল কল ছল ছল ছন্দ। অবারিত উচ্ছ্বাস। যেন বলছে মন্ত্রিত কণ্ঠে—ওরে, তুই আয়-আয়-আয়! প্রণাম জানালেন বীর সন্ন্যাসী।

কাকে?

কন্যাকুমারিকার চরণ-প্রান্তে। করলেন যাত্রা। সেই পণ্ডিচেরীর পথে। চলছেন আর ভাবছেন কত কথা। মনের মধ্যাহ্ন আকাশে সঞ্চারিত হয় পোর-বন্দরের ছায়া। স্মরণ নেপথ্যে উঁকি মারে অগ্নি আখরের মত ফরাসী ভাষাবিদ পণ্ডিতের কথা—যাও, পাশ্চাত্ত্য দেশে যাও। প্রচার কর ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। "যাও, ঝঞ্জার বেগে উহাকে আক্রমণ কর এবং অধিকার করিয়া ফিরিয়া আস।"

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। এলেন স্বামিজী পণ্ডিচেরীতে।—

ধূপের সুরভি রহে না কো চাপা
মলয়ে ভাসিয়া চলে—
আপন গন্ধে আপনি সে হারা
সবারে ডাকিয়া বলে।

দিকে দিকে তার ডাক। সম্ভ্রমের আসন প্রতিষ্ঠিত ঘরে ঘরে। শ্রদ্ধা ভক্তির অর্ঘ্য লয়ে অগণিত লোক দাঁড়িয়ে।

কিন্তু একজন পণ্ডিত, দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বলল উল্‌টো কথা।

বাধা দিতে চাইল স্বামিজীকে।

একদম তর্ক দিল জুড়ে।

কেন?

বলছে ব্রাহ্মণ—"আমাদের এ সনাতন ধর্ম্মের সংস্কারের কোন আবশ্যকতা নাই। ম্লেচ্ছরা উহার কি বুঝিবে? উহাদের সংস্পর্শে শুধু জাতি নাশ হইবে মাত্র।"

সে কি আর চুপি চুপি বলছে? বিষম বিতর্ক।

স্বামিজী বলছেন কত বুঝিয়ে—

বুঝিয়ে বলছেন ব্রাহ্মণকে, এ অনুমান ভ্রান্ত। এমন গোঁড়ামির স্থান নেই ধর্ম্মে। ধর্ম্ম মানুষের মনোভূমির সম্পদ। সেখানে প্রেম-সাম্য-প্রজ্ঞা এদেরই স্থান।

কিন্তু তবুও নীরব হোল না ব্রাহ্মণ।

এবারে আর ধৈর্য্য রইল না। বিদ্রোহী বিবেক তার বিবেক মন্থনে অমৃতের ধারা বর্ষণ সুরু করলেন—আপনি যা বলছেন তা হবে কেন? মানুষ হয়ে যারা এলো—এলো যারা এই ধরণীর কোলে—তাদের প্রত্যেকের জন্য আমার সনাতন ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম নিয়ে যাবে মানুষকে সংকীর্ণতার পঙ্কিলতা থেকে হিমালয়ের ঊর্দ্ধ্ব শিরে। এ ধর্ম্ম মানুষের মনকে করবে লীলা-কমল। জ্বালিয়ে দেবে সত্য, প্রজ্ঞা, প্রেম ও মুক্তির দীপ-শিখা। জনে জনে পৌঁছে দেবে আত্মশক্তির অমর সঙ্গীত।

কার কি সাধ্য এ খর তরঙ্গে আনবে ক্লীবতার ছোঁয়া, অবসন্নতার মন্থর গতি। কে পারে আমার ধর্ম্মের জাতি নাশ করতে?

তবুও পণ্ডিত বলছে, 'কদাপি ন, কদাপি ন।'

আর কি করা। বিদ্রোহীর অন্তরে আগুন ধরে গেল। ডাক দিলেন অগ্নি সতেজ কণ্ঠে তরুণদের—তোমরা শোন, ধর্ম্ম কি সংস্কার বা প্রথা আচারের দাস? ধর্ম্ম যদি মানুষকে শিখায় কুসংস্কার, রাখে যদি লুকিয়ে সংকীর্ণতার আঁধারে, তবে তাই কি মেনে চলতে হবে? দেখ, দেখ সমাজকে। জানো কোথায় ধর্ম্ম। কোথায় চলছে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের হীনতম অভিযান। এসো, তোমরা বেরিয়ে এসো—বেরিয়ে এসো অতীত প্রথার গুহা থেকে মুক্ত বাতায়নে। এসো নির্ম্মল মন লয়ে সংশয় সমাচ্ছন্ন সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙ্গে। দেখ ধর্ম্মকে।

দেখ জীবন ও জগৎকে। আজিকার এ চলমান বিশ্বের বুকে আমার ধর্ম্ম কোন্ পতাকা উড্ডীন করছে, কি বাণী শোনাচ্ছে। শোন—শোন—কান পেতে মন ঢেলে শোন, এ ধর্ম্ম শঙ্কা থেকে শুভ অঙ্কের খোঁজ দিচ্ছে কি না। দিচ্ছে

কি না অখণ্ড মানবিকতার ইঙ্গিত, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ। কেবল হৃদয় বুভুক্ষুর খোরাক নিয়েই আত্মতুষ্টি নয়—এবারে আজান দিতে হবে, আজান দিতে হবে তমসার পারে দাঁড়িয়ে। অখণ্ড সুষমায় মানুষের মনকে করতে হবে আকাশের মত নির্ম্মল, পরিব্যাপ্ত। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে জীবনকে করতে হবে ছন্দ-মধুর। গাইতে হবে জাগরণের উদ্বোধনী সঙ্গীত।

যদি এ ধর্ম্ম তা না করে—যদি হাত ধরে নিয়ে আসে পিছু টেনে, তবে সবে দাঁড়াও। সরে দাঁড়াও এর সীমানা থেকে।

ওরে, দৃঢ় সত্যেরে কে কবে দাম না দিয়ে পেরেছে? যুগের দাবীকে মেনে চলতেই হবে। দিতে হবে আসন ছেড়ে। পুরাতনের অসত্য অশিবকে আঁকড়ে থাকবে এমন সাধ্য কি? যেন বজ্রঘোষের কণ্ঠে যুগধর্ম্মের অমোঘ বাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ঐ, ঐ আসে!

আসে চির লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত মানুষের দল। আসছে তারা তাদের পবিত্রতম মনুষ্যত্বের অধিকার জানাতে। গ্লানিজর্জ্জর উপেক্ষিত জীবনের দীনতম আবেদন নিয়ে নয়—আসছে দৃঢ় পদক্ষেপে সত্যের চিরন্তনী দাবী নিয়ে।

দিতে হবে স্থান ছেড়ে—

ছেড়ে দিতে হবে স্থান শত শত বছরের মৌন, মূক, দলিত মানুষদের। তারা জেগেছে। কেটেছে তন্দ্রা। মিথ্যা সুখের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। তাদের দ্বিধান্বিত দগ্ধ প্রাণ উদ্দীপ্ত হয়েছে শপথে। বুভুক্ষা, লাঞ্ছনা, অপমান ও অসম্মানে পদানত জনতার হয়েছে গাত্রোত্থান।

দিন আগত—

এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে প্রবুদ্ধ জনতার উন্মুখর মিছিল। তোমরাও এসো—

এসো তাদের সম্বর্দ্ধনা জানাতে।

এসো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক পথে চলতে।

সমাজের বুক থেকে মুছে দাও কলঙ্কের কালো দাগ।

নির্ম্মূল করে দাও অত্যাচারীর অভিশাপকে। ঠেলে দিও না দূরে—দিও না শূদ্রকে শূদ্র বলে। তাদের হীন নীচ বলে আজন্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না।

এসো, ধর্ম্মের উদার সার্ব্বভৌম স্বীকৃতি নিয়ে—

এসো, পতনোন্মুখ জাতীয় জীবনকে মুক্ত করতে। তাদের শিক্ষা-জ্ঞান ধ্যান ও সত্যের সন্ধান দিয়ে মানুষ করতে। ওরে, কার সাথে আভিজাত্যের বড়াই কর ? কাকে ছোট বলে পায়ে দলে চল ?

ওরাও অমৃতের পুত্র। ভগবানের সন্তান। যে অধিকার নিয়ে তোমরা এসেছো—তা ওদেরও আছে।

কিন্তু ওরা দরিদ্র।

তাই বলে কি দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে বঞ্চিত করবে ? চল তোমরা চল সবাই।

"সময় আসিয়াছে। ঋষিদের বিশ্বাস আবার প্রাণময় হইয়া উঠিবে, আপনা মধ্য হইতে আপনি আত্মপ্রকাশ করিবে।"

চললেন মুক্ত পুরুষ মানুষকে মুক্তির জয় গান শোনাতে।

৩৪

সময় চলেছে উড়ে—

চলেছে যেন ছুটো পাখা মেলে দিয়ে পাখীর মতন।

মাদ্রাজের প্রতি ঘরে ঘরে, প্রান্তে প্রান্তে জাগর চোখ। বিস্ময়-বিহ্বল, পলক-বিহীন দৃষ্টি।

কেন?

দেখছে তারা—

দেখছে অগ্নিগিরির পীত প্রকাশ। আসছে এগিয়ে, এগিয়ে আসছে রামনাদ থেকে মাদ্রাজে।

যেন ঝড় চলেছে—

চলেছে এ মর্ত্যভূমির ব্যথা বয়ে। চলছে আকাশ-গঙ্গার করুণা লয়ে, ভাগবত দ্যোতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে।

ঘোর ওদের কাটল।

প্রচার হয়ে গেল দিকে দিকে, প্রচার হয়ে গেল স্বামিজীর কথা।—ওরে সে "..এক অদ্ভুত ইংরেজী জানা সন্ন্যাসী।" দেখবি তো আয়।

এলো যুবা। এলো বৃদ্ধ।

কেবল তারা কেন?

ছাত্র এলো। এলো মা ও বোনেরা।

যোগ দিল তারা ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির আলোচনায়।

বসল সভা মাদ্রাজের ডেপুটি একাউন্‌টেণ্টের বাসায়।

নাম তার মন্মথ ভট্টাচার্য্য।

কত লোকের ভিড়। যেন ঝড় জেগেছে মাদ্রাজে। এসেছে প্লাবন মাদ্রাজের জন-মনে।

আসবে না কেন?

কে এসেছে?

এ যে যুগের বন্ধু। জাতির জনক। ঝড় জাগাবার জন্যই যে এসেছেন। এসেছেন ঘুম ভাঙ্গাতে—মোহরাত্রির ঘুম।

এক পণ্ডিত এসেছে সভায়। জিজ্ঞেস করল স্বামিজীকে - স্বামিজী. "প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ করায় কোন প্রত্যবায় আছে কি ?

বলেন স্বামিজী, "ত্যাগের হেতু কি ?"

বলল, "সময়াভাব।"

"কি ! সময়াভাব ?"

যেন আঁত্‌কে উঠলেন বিবেকানন্দ। বললে কিনা সময়াভাব! "প্রাচীনকালের সেই মহামহা আর্য্যঋষিগণ—যাহাদের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে গেলে তোমার জীবন ফুরাইয়া যায়--তাহারা সন্ধ্যাবন্দনার সময় পাইতেন, আর তুমি সময় পাও না ?" এমনি করেই জীবনকে পেলে না জানতে। মানবজীবনের পরম বস্তু যে ওখানেই। তাকে এতো হেলা ? কই গো, ভুল হয় না ত এক বেলা খেতে ? তবে কেন নিতে পারলে না হরিনামকে অঙ্গের ভুষণ করে ?

যদি জানতে চাও আত্মার আত্মীয়কে, চাও যদি সন্ধান পেতে মরমীর—তবে জাগ্রত কর, জাগ্রত কর অন্তর-নিরুদ্ধ শক্তিকে। হৃদয়-বৃত্তির হবে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সুন্দর হবে অন্তর মন ভক্তির স্নিগ্ধ রসধারায়। সব কাজের সেবা কাজ করে নেও তপ, জপ, ধ্যান আর আরাধনাকে। মানুষ হ'য়ে এলে—মানব-জীবনের সার্থকতা কোথায় জানবে না ? চেয়ে নেবে না প্রীতির স্নেহধারা, শুনবে না প্রেমের মন্ত্রবাণী, আর ভক্তির কথামৃত ? একবারটি আত্মস্থ হয়ে বসলেই হোল। দেখবে, মন যাবে সুন্দরের অভিসারে তন্ময় হয়ে। আনন্দের লহর জাগবে। নিত্য সুখে চিত্ত যাবে বিহ্বল হয়ে। জীবনে আসবে পরম ক্ষণ। ওরে এমন দুর্লভকে এতো হেলা ? এতো অবজ্ঞা ?

এসেছে এক বাঙ্গালী সাহেব।

বলি বাঙ্গালী সাহেবটা কি ?

চলনে বলনে ফিরিঙ্গীর ভাব। যেন কুণ্ঠা লাগে পিতৃ-পরিচয় দিতে। আবার বলছে কিনা—বৈদিক যুগ ভ্রান্ত ; মানে হয় না কিছু ওদের প্রথা আচার ও উপদেশের।

কে যেন ছুঁড়ে দিল বারুদখানায় একটি দিয়াশলাইর কাঠি।

উঠল জ্বলে। শব্দ হোল প্রচণ্ড।

কিসের ?

স্বামিজীর জলদ-মন্দ্রিত কণ্ঠের। —হিমালয়ের মত যার স্থিতি, সাগরের

মত যার বিস্তার, দিকে দিকে ক্ষরিত হচ্ছে যার করুণার রসধারা—তাকে বলছ তুমি নিরর্থক ?

আকাশের মত যার আদর্শ, মলয়ের মত যার ব্যাপ্তি—তার কোন মূল্য নেই তোমার কাছে ?

ছি! ছি! ছি!

"……তুমি কি তাদের উপদেশের কিছু জান ? তুমি কি বেদ কখনও দেখেছ বা তার একটি ছত্রও পাঠ করেছ ?"… আগে জান, বোঝ। তার পরে বিজ্ঞের হাসি হেসো।

লজ্জায় গেল মুখ চূর্ণ হয়ে। যেন সারাটা শরীর তার কাঁপছে। আর তো দাঁড়াতে পারছে না। বললে—আসি এখন স্বামিজী। সারাটা দিন কথা বলে বলে ক্লান্তি কার না আসে ?

কে না চায় একটু নীরবে বসে থাকতে ?

স্বামিজী ক্লান্ত দেহটি নিয়ে চললেন সমুদ্রতীরে—চললেন শ্লথ পদসঞ্চারে একটু মুক্ত বায়ুতে অবগাহন করতে। সন্ধ্যা-সমাচ্ছন্ন ধরণী।

গাঢ় হয়ে এলো আঁধার। দিনের সূর্য্য ঘুমিয়ে পড়েছে রাতের অঙ্কে। মায়ের মত স্নেহ-স্নিগ্ধ চাঁদ উঠেছে আকাশে।

দাঁড়ালেন স্বামিজী—

দাঁড়ালেন গিয়ে সমুদ্র-সৈকতে।

সমুদ্র। হু হু করে মাত্‌লা বাতাস দোল দিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। অশ্রান্ত ফেনিল জলতরঙ্গ। স্নায়ুগুলোর মধ্যে যেন একটা আশ্চর্য্য সেতু রচনা করে দেয়। মিল খুঁজতে গেলে অনেক—অনেক মিল আছে সমুদ্রে আর রক্তে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর তাই তো বাজে তারই কলমুখর ধ্বনি। কবির কাব্যাকাশে ঘোর ঘনিয়ে আসে। ঠিক এমনি সময় ছল ছল কল কল করে হেসে উঠল সফেন তরঙ্গমালা। অবচেতন মনে যেন কে হানল চেতনার চাবুক। ঐ—ঐ দেখ! আঁত্‌কে উঠলেন স্বামিজী। চাইলেন চোখ মেলে—কি দেখছেন ?

দেখছেন ধীবরদের। আর দেখছেন তাদের গর্ভধারিণী স্ত্রীলোকদের। সঙ্গে আছে ছোট ছোট সুকুমার শিশুরা। ওরা মাছ ধরছে। এমনি করে রাতভর মাছ ধরবে। সারাটা শরীর রাখবে জলে ডুবিয়ে। ভোর হলে তাই নিয়ে যাবে গঞ্জে হাটে। দুটো পয়সা পাবে। জীবিকার সংস্থান করবে। ছেলে মেয়ে ও মরদ নিয়ে দুটি অন্ন ভাগ করে মুখে দেবে।

কান্না কাতর আকুতি। আবেগ আকুল প্রাণ। দুঃখে ব্যথায় বলে উঠলেন স্বামিজী—"হা ভগবান! এই সকল হতভাগ্যগণকে কেন সৃজন করেছো? ওদের কষ্ট যে চোখে দেখা যায় না।"

মন চলে এলো কাব্য থেকে কথায়! স্বপ্ন থেকে বাস্তবে। নিঃসীম সমতলের দেশে বিসারিত হোল দৃষ্টি। "বল, বল প্রভু, কত দিন ধরে ওরা এমন কষ্ট ভোগ করবে!"

তোমার রাজ্যে কেন এত ভেদ! কেন এত শ্রেণীর অসাম্য। ওরা কি তোমার সৃষ্টি নয়? তবে কেন এমন দুঃখদিনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে ওদেরে! তমসার ঘোরে রাখলে ছলনার জালে আব্‌রে! মুক্ত কর, মুক্ত কর অভাবের কবল থেকে। একটু বিঘ্নহীন জীবনের স্নিগ্ধ ছায়া সঞ্চার কর। ওরা বাঁচতে শিখুক।

চোখে নামে জলের ধারা। সঙ্গীরাও কেঁদে ফেলে।

ওরে, তোরা জানিস না এদের কত কষ্ট। ক্লান্তি কি জানে না। দেহের অবসাদকে দিয়েছে নির্ব্বাসন। একটি দিনের জন্যেও বিরতি নেই। হাতে কাজ না করলে মুখে ভাত জুটবে না। তাই তো দেখ, চেয়ে দেখ, কি দুঃখটা না বরণ করছে। আছে আর একটা জাত।

যাদের সমাজ করল উপেক্ষা। নাম দিল পতিতা, পণ্যা, ভ্রষ্টা বলে। তারাও এমনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে থাকে। জেগে থাকে গ্লানিজর্জ্জর জীবনের উপকরণ নিয়ে দুঃখের তপস্যায়। কি অবজ্ঞাত জীবন! কি ভাগ্য করেই না জানি এসেছিল ওরা পৃথিবীর বুকে! কারুর ঘরে নেই ঠাঁই। সমাজ দিয়েছে নির্ব্বাসনে। লোকেরা দূর থেকে দেখে আর অবজ্ঞা অবহেলায় ধিক্কার দিয়ে পথে চলে।

কিন্তু কেন, কিসের জন্যে?

ওরা কি মানুষ নয়? এ পৃথিবীর মাটিতে কি ওদের এক বিন্দু দাবী জানাবার অধিকার নেই? কই, একবারটি জানতে ত মন চায় না—কেন এলো ওরা ঘরের শাসন ছেড়ে পরের অঙ্কশায়িনী হতে? দেহ বিক্রি করে যৌবনের বিনিময়ে দু-মুঠো আহারের সংস্থানে?

ওরে, তোরা জানিস না, ওদের বুকভরা ব্যথা। অনেক—অনেক দুঃখের শিয়রে দাঁড়িয়ে লড়াই করে তবে এমন হলাহল পান করেছে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হয়ে ওরা এসেছে এই পথে।

এদের জাগাতে হবে না? ফিরিয়ে আনতে হবে না ঘরে? "যদি অবনত ভারতকে আবার উন্নত দেখ্‌তে চাও, তবে এই সব হতভাগ্যদিগকে বুকে তুলে নাও। বেদান্তের রত্নরাশি ওদের মাঝে বিনা দ্বিধায় বিতরণ কর ও সমাজের রুদ্ধদ্বার খুলে ওদের ভিতরে প্রবেশ করতে দাও।"

ধর্ম্মে আবার গুপ্ত-বিদ্যা কেন রে?

এ পথ সরল, সহজ, সুন্দর—এ পথ মুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র।

এখানে লুকোচুরির ঠাঁই নেই। নেই গোপনতার কারবার। প্রত্যেকের মনে মন মিলিয়ে পেঁ।ছে দিতে হবে ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী। আত্মরতির সুখ সায়রে মুক্ত পবনে আত্মভোলা হয়ে নয়—সবাইকে নিয়ে দল বেঁধে অভিযাত্রা।

"গুপ্ত-বিদ্যা, অলৌকিক রহস্য, এ সকল দিকে ছুটিও না। শক্তি লাভ হইবে, সিদ্ধি লাভ হইবে, এমন মনে ভাবিও না। এমন কি নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত চাহিও না। শুধু পরের মুক্তি খোঁজ, ধর্ম্মের উদ্ধার কিসে হইবে অনুসন্ধান কর। ভারতীয় ভাব কি করিয়া সমুদয় জগতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে ভাবিয়া উপায় বাহির কর।"

মিলেছে সভা—

এসেছে কত জ্ঞানী গুণীর দল। তারা মন করেছে—

মন করেছে সবাই মিলে করবে স্বামিজীকে জব্দ। জিজ্ঞেস করবে নানা প্রশ্ন। চাইবে উত্তর।

কেবল কথা শুনেই ক্ষান্ত হবে না। বলবে তারাও অনেক কথা।

তা বেশ তো!

বললে এক অদ্বৈতবাদী—

বললে স্বামিজীকে—"আপনি বলছেন, আপনি ও ঈশ্বর এক—তবে ত আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যি এ সব দায়িত্ব কেটে গেল। এখন যদি আপনি কোন খারাপ কাজ করেন, তবে আপনাকে ঠেকায় কে?"

তা কেন? বললেন স্বামিজী—"যদি আমি ঠিক ঠিক বিশ্বাস করতেম ঈশ্বর ও আমাতে কোন প্রভেদ নেই—তা হলে আমা দ্বারা কোন কুকার্য্য হওয়া সম্ভবপরই নহে।"

মানুষের যখন ঘটে আত্মোপলব্ধি—

ঘটে যখন তার জীবনের স্বরূপ সত্যটি জানবার অনুভূতি, তখন সে বসে মুখ ফিরিয়ে। জাগতিক প্রবাহের দিকে চলে না তার নৌকা। অসীমের আনন্দে

আত্মহারা হয়ে সে চলে—চলে দিব্য জীবনের অভিসারে। বিশ্ব লীলায় লীলা-ময় হয়ে যায় তার চিত্ত। ব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ডরূপ দেয় তাকে মুগ্ধ করে। সে হয়ে যায় আত্মভোলা। তার কি আর কু-কাজ করার মত মন থাকে? বস্তু জগতের কান্না হাসি, খেলা মেলা যে তার কাছে মরুভূমির মতই হয়ে পড়ে দিক বিসারী। সে আর চায় না ফিরে পিছু পানে।

তারপরে কুকাজ করবে কখন?

আর একজনে বলছে—

বলছে একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে।

কি?

জীবের পক্ষে কি জীবাতীত সেই ব্রহ্মকে জানা সহজসাধ্য?

এ অসম্ভব কথা।

স্বামিজী বললেন—"আমি সে বাক্যমনের অগোচরকে জেনেছি।"

কিন্তু তা কেমন করে?

তনু, মন, প্রাণ ঢেলে একবার ডাক—

ডাক সেই মানস লোকের মানবকে।

তিনি আসবেন। আসবেন জীবনকে প্রাণধর্ম্মী করে তুলতে। ওখানেই ক্ষান্ত হবে না তার অভিযান। সখা হাত ধরে নিয়ে যাবেন মনোময় জীবনে।

তারপর?

তারপর চূড়ারোহণ। একেবারে অধ্যাত্ম জীবনে। হবে আত্ম-জিজ্ঞাসার মীমাংসা। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠলে পড়ে সমাহিত। অগোচরকে গোচরে পাওয়া। অজানাকে প্রত্যক্ষ করা। তা এমনি করেই এগোতে হয়। তবেই পাওয়া যায় তার সন্ধান। ইন্দ্রিয়ের মোহময় খেলাঘরেও আসেন তিনি লীলারসের রসময় হোতে। ভক্তের সাথে প্রেমের খেলা খেলতে।

কেন জানা যাবে না বাক্যমনের অগোচরকে?

তাকে জানতে হোলে, তাকে দেখতে হোলে একবারটি তার ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাও। তিনি আসবেন—

আসবেন আলোর দিশারী ঘনতম অন্ধকারকে আলো করে। আসবেন বাক্যমনের অতীত জনমনের আসনে। দিবেন দিব্য জ্যোতি। দেখবে তার

রূপ সর্ব্বময় বিরাজিত। শুনবে তার গান তোমার মর্ম্মমূলে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে। তুমি তন্ময় হয়ে যাবে।

দিন দিন বাড়ে লোকের ভিড়।

আসে তারা মনের অধীর আকুতি নিয়ে স্বামিজীর অমৃতোপম বাণী শুনতে, আসে যুবার দল—

শোনে কত জ্ঞানের কথা। হয়ে যায় বিহ্বল। গ্রহণ করে শিষ্যত্ব। ওদিকে মাদ্রাজের খৃষ্টীয়ান কলেজের অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু হেসে তো অস্থির।

বলে কিনা—ছোকরাগুলো সব কেমন হয়ে গেল? একটা সামান্য সন্ন্যাসীর দিকে পড়ল সবাই ঝুঁকে? লুটে পড়ল চরণ-প্রান্তে? ছি! ছি! এ আবার কেমন ভাব?

মোটে আমল দিচ্ছে না স্বামিজীকে সিঙ্গারাভেলু। ভাবছে মনে, ও আবার কি জানে। একদিন ডাকতে হবে বাক্-যুদ্ধে। আর ডাকাডাকি কি—

এলো একদিন নিজেই স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে।

কি দেখছে চেয়ে চেয়ে সিঙ্গারাভেলু?

দেখছে—প্রশান্ত বক্ষ। দ্যুতি বিচ্ছুরিত নয়ন। শান্ত স্নিগ্ধ দেহ কান্তি। এ যেন এক মহা প্রশান্তির সাগর সৈকত।

মুহূর্ত্তে যেন কি হয়ে গেল।

বিমুগ্ধ সিঙ্গারাভেলু। অন্তরে নিরন্তর কান্নার কলতান। চোখে তার অশ্রুর ধারা। যেন রিক্ত সে। নিঃসীম হিমরাত্রির মতো স্তব্ধ। শুধু জাগে আঁখিতারা। দেখে প্রাণ ভরে। মনে জাগে কত কথা—

ওরে এমন তো আর দেখিনি!

অনুতাপে জ্বলে তার প্রাণ।

ওগো, তুমি অপরাধ নিও না। ধরা না দিলে তোমাকে ধরি কি করে? তুমি দেখা দিলে বলে তো ধন্য হোল আমার দর্শন লোভন আকুতি। তোমাকে ভেবেছিলেম ছোট। ছোট ভেবে যে নিজেই ছোট হয়ে গেছি।

এবার করুণা কর। দাও আমায় তোমার সেবার অধিকার।

মন ব্যাকুল হলে আর কথা কি?

স্বামিজী তাকে গ্রহণ করলেন শিষ্য বলে। দিলেন নাম। আদর করে ডাকলেন 'কি ডি' বলে।

বলেন ঠাট্টা করে—'ওরে, 'কি ডি' এসেছিল জয় করতে, কিন্তু হয়ে গেল পরাজিত।'

তা তুমি যা খুশি বল। আমি তোমার দাসের দাস।

কত না গুরুভক্তি।

জীবনকে সঁপে দিল সিঙ্গারাভেলু গুরুর পাদপদ্মে। স্বামিজী বললেন তাকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের জন্যে। 'কি ডি' গুরুর আজ্ঞা করল শিরোধার্য্য। বের হোতে লাগল 'প্রবুদ্ধ ভারত'। এমনি করে জীবনের উপান্তে এসে কি ডি ত্যাগ করল সংসার। চলে গেল নির্জ্জনে। ভারতীয় আদর্শে ভারতবর্ষের রিক্ত সন্ন্যাসীদের মত একাকী জীবন উৎসর্গ করল পরমাত্মার অভিসারে।

দুর বিসারী মন। ডাক দিয়েছে বাইরের পৃথিবী।

বড় ভালো লাগে ভাবতে—

ভাবতে ভালো লাগে স্বামিজীর—

কি ?

পাশ্চাত্ত্য দেশে যাবে। প্রচার করবে সনাতন ধর্ম্মের বাণী। সবার কানে শোনাবে মোহমুক্ত ভারতের অভয় সঙ্গীত। ওরা কি মুগ্ধ হয়ে যাবে না, যাবে না মুগ্ধ হয়ে এমন শাশ্বত পীযূষ ধারা বর্ষণে ? অধীর আকুল চিত্ত কি ছুটে আসবে না ভ্রমরার মত ? চাইবে না কি দেখতে বিস্তীর্ণ তমসার পারে স্বর্গীয় আলোর ভাতি ?

নিশ্চয়।

কিন্তু সে দিন আসবে কবে ?

আর দেরি নেই। ঐ তো জেগেছে সাগর মথিত সূর্য্য। দিন আগত। নবারুণের কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। রক্ত রাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে স্বপ্নিল গোধুলি। রাত্রির বুকে কিরণ সম্পাত হয়েছে, কিরণ সম্পাত হয়েছে সূর্য্যের। পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তে জাগর দীপস্তম্ভ। আর স্বামিজীর মোহন স্বপ্ন তাকেই কেন্দ্র করে।

এক মহা মেলার আয়োজন হয়েছে। আসবে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী তাপসের দল।

তারা যে যার কথা কইবে। শোনাবে মধুর বাণী। শোনাবে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা ?

কোথায় ?

চিকাগোতে।

এ সংবাদ স্বামিজীর কাছে পোঁছল।

চঞ্চল চিত্ত। মানে না মানা। যেন বাঁধন ছিড়ে যেতে চায় সেই মহা সম্মেলনে। স্মৃতির ভেতরে মন্থন জাগে। প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে মনের নালে আকাশ প্রদীপ। রক্তের ভেতরে একটা অদ্ভুত গর্জ্জন। যেন মহাসমুদ্রের ফেনিল উচ্ছ্বাস।

কিন্তু—

কিন্তু এ কিসের গর্জ্জন, কিসের প্রদীপ।

তোমাকেই যেতে হবে। প্রচার করতে হবে মহাভারতের মহান্ বাণী।

তা কি সম্ভব?

নিশ্চয়ই।

ছেড়া ছেড়া ভাবগুলো রক্তের মধ্যে আবার মুহূর্ত্তে যায় মিলিয়ে। যেন জল-বুদ্বুদ। আবার চনমন করে ওঠে মন। অধীর হয়ে যান স্বামিজী। উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দেন মাদ্রাজকে—"এখন হিন্দু ধর্ম্মকে সমুদয় জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে। ঋষিদের এই ধর্ম্মকে আর সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না, জগৎময় ইহা ছড়াইতে হইবে।

সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন দুর্গ জীর্ণ হইয়াছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ইহাকে কোন রকমে রক্ষা করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিলে হইবে না……পূর্ণ উদ্যমের সহিত ইহার মহিমা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে হইবে।"

রিক্ত সন্ন্যাসীর মনে বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্ন।

এমন স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন আর একজন রাজর্ষি। হেলায় ত্যাগ করেছিলেন রাজ-ঐশ্বর্য্য। নেমেছিলেন দুর্গম পথে। সম্বল ছিল তার ভগবান বুদ্ধের মহান বাণী।

কে সে?

সম্রাট অশোক।

রক্তক্ষরা সংগ্রামের মধ্যে অশোক দেখেছিলেন তার পৈশাচিক রূপ। অগণিত মানুষের অন্তিম চীৎকারে তার অন্তর উঠেছিল আর্ত্তনাদ করে।

তাই ত্যাগ করলেন অস্ত্র। বিসর্জ্জন দিলেন রাজ-ঐশ্বর্য্য। শপথ করলেন, আর যুদ্ধ নয়। এবারে শান্তির শান্তি-স্তোত্র পাঠ করতে হবে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে। জয় করতে হবে বিশ্বচিত্ত।

কিসের দ্বারা?

ধর্ম্মের মর্ম্মবাণীতে।

এবারে আবার ঝড় জেগেছে, মন্থন জেগেছে ভারতের মহাসমুদ্রে। নিরুদ্ধ শক্তির খর বন্যায় তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে বিবেক চিত্ত।

যাবে, দেখবে, শোনাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের বাণী। সাম্যের শাশ্বত সঙ্গীত।

কিন্তু তা কেমন করে?

এলো—

এগিয়ে এলো মাদ্রাজবাসী কল্যাণী লক্ষ্মীর মত।

প্রসারিত করে দিল স্বাচ্ছন্দ্যের মুক্ত হস্ত।

যাও, যাও বীর, তুমি তোমার গর্ব্বিত শির তুলে পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুতে। উড্ডীন কর ভারতের গৈরিক পতাকা। দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, জনে জনে পৌঁছে দাও আত্মসত্যের বাণী। ভক্তির আগল ঠেলে মুক্তির মহামন্ত্র। দ্বারে দ্বারে ঘুরে সংগ্রহ করল অর্থ—

দিল এনে স্বামিজীর হাতে মাদ্রাজী বন্ধুরা। সে এক দু' টাকা নয়। পাঁচশো টাকা। কত আনন্দ। কিনা উৎসাহ। যেমন করে হোক স্বামিজীর স্বপ্ন সাধনায় তারা জ্বেলে দেবে সাফল্যের দীপ।

কিন্তু,—"আমি কি নিজের খেয়াল তৃপ্তির জন্য এ সব করিতেছি, না ইহার মধ্যে বিধাতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে?"

চঞ্চল মনে আবার জাগে ঝড়। বোশেখী ঝড়। রুদ্র মনে জাগে উন্মত্ত জিজ্ঞাসা। অনন্ত অবকাশ এসে মুহূর্তে সঞ্চারিত হয় চিত্ত-বৃত্তে। মরানদীর মত মন্থর হয়ে আসে উদ্দাম গতি। শ্লথ হয়ে যায় পদ-সঞ্চার।

ভীরু।

তবে কি, তবে কি আমি ভীরু?

না-না! ওরে মূঢ় মন, তোর মস্তক তোল আকাশে। তোর বক্ষে জাগুক সত্য শক্তি। তোর চরণ বন্দনা করুক বন্ধন-শৃঙ্খল।

তুই দাঁড়া। হাতে তুলে নে দেবতার দীপ। তার পরে যাত্রা কর, যাত্রা কর রুদ্রের নর্ত্তনে।

চোখ দুটো জ্বলে উঠল মুহূর্ত্তে। এলো বিবেকানন্দের চিত্তে তড়িৎ স্পন্দন।

কিন্তু একি!

আবার, আবার রক্তে কেন রিক্ত প্রবাহ। চোখে অশ্রুর নির্ঝর। মনে সন্ধ্যার আল্পনা। না, না, তুই বল্, বল্ মা পাষাণী! "মাগো! তোর কি ইচ্ছা বল্। তুই ত প্রকৃত কর্ত্রী। আমি তোর হাতে কলের পুতুল মাত্র। তোর মনে কি আছে খুলে বল্।" আমার হৃদয় বৃত্তির ঝড়ঝঞ্ঝায় তোর স্নেহের পরশ দে মা! শান্ত কর, তৃপ্ত কর, পথ দেখা আমায় তুই। আর ছলনার জালে আকীর্ণ করে রাখিস্ না! এবারে আমার সব দহন জ্বালায় শান্তি বারি সিঞ্চন কর। যদি তোর অভিপ্রায় আমাকে দুর-বিদেশে পাঠাতে, তবে কেন দ্বারে দ্বারে অর্থের জন্য কাঙ্গালপনা করতে হবে? কেন দয়ার

দানে তোর বোঝা বয়ে যাব? তুই তো রিক্তা নয়। তোর তো ঐশ্বর্য্যের অন্ত নেই। না, আর এক পা এগোব না। খুলে বলবি তো চলব।

শিষ্যদের ডেকে বললেন স্বামিজী,—"বৎসগণ! আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিবার পুর্ব্বে মার উদ্দেশ্য জানিতে চাহি। যদি আমার গমন তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন। তাঁর ইচ্ছা হইলে অর্থ আপনি আসিবে; চেষ্টা করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব তোমরা এই সব অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ কর।"

বিস্ময় লাগে, তাকায় তারা অবাক দৃষ্টিতে। গুরুর আজ্ঞা কেমন করে করবে অবহেলা। ওরা দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয় করল পাঁচ শত টাকা।

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন স্বামিজী। রইলেন তার আশীর্ব্বাণীর অপেক্ষায়! যেন ছোট্ট শিশুটি তাকিয়ে রইল—

তাকিয়ে রইল দুটি ডাগর চোখ মেলে মায়ের দিকে।

এমনি দিনে এক পত্র এলো—

পত্র এলো হায়দরাবাদ থেকে।

কে লিখেছে?

মন্মথবাবুর বন্ধু মধুসূদন চাটার্জ্জ।

কেন?

স্বামিজীকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে।

মাত্র অল্প কয়টি দিন থাকবেন। কিন্তু তবুও বলছি, যেমন করে হোক তাঁকে এখানে না এলেই নয়। সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে আছে। চাইছে সবাই স্বামিজীকে দেখতে। দেখো ভাই, আমরা যেন বঞ্চিত না হই।

মন্মথবাবু সম্মতি নিলেন স্বামিজীর।

আর?

শিষ্যদের।

পত্র লিখলেন মধুসূদনকে।

কি?

যাচ্ছেন স্বামিজী—

যাচ্ছেন ১০ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে।

যাত্রা করলেন।

হায়দরাবাদ। গাড়িখানা ঢুকল যেন হাওয়ার বেগে ঝড়ের মতন। সারিবদ্ধ জনতা। অবিচ্ছিন্ন লাইন। আছে তারা দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে আছে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। বিপুল জনসঙ্ঘ। ধনী থেকে সুরু করে দরিদ্রতম মানুষটিও আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে।

নামলেন স্বামিজী গাড়ি থেকে।

ওরা দেখে তো অবাক! দেবদুর্লভ রূপ। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল তনুশ্রী। দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে বীর বিদ্রোহী বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে।

ওরে তোরা জয় দে, জয় দে মুক্ত কণ্ঠে। পবিত্র অন্তরে।

জয়ধ্বনিতে মুখর হোল হায়দরাবাদ।

কিন্তু স্বামিজীর লাগে যেন কুণ্ঠা। লাজে রক্তিম হয়ে যায় মুখশ্রী। আড়ষ্ট হয়ে আসে কণ্ঠ।

মধুসুদন দিল সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে। ওরা দিল স্বামিজীকে পরিয়ে মালা।

নিয়ে গেল মধুসুদনের বাঙ্গলোয়।

১২ই ফেব্রুয়ারী।

আমন্ত্রণ এসেছে। আমন্ত্রণ এসেছে নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব খুরসিদজঙ্গ বাহাদুরের কাছ থেকে। হিন্দু ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন নবাব। অবিচল তার আস্থা হিন্দুদের পবিত্রতম ধর্ম্মমতে। হিমালয়ের উর্দ্ধলিঙ্গ থেকে কন্যাকুমারিকার পাদবিন্দু পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেছেন খুরসিদ। দেখেছেন হিন্দুদের তীর্থস্থানগুলো ঘুরে ঘুরে।

চললেন স্বামিজী নবাবের প্রাসাদে।

মুগ্ধ মনে স্বামিজীর পার্শ্বে বসলেন খুরসিদ। আলোচনা করলেন হিন্দু, মুসলিম ও খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে। সে প্রায় দু'-ঘণ্টা ধরে আলোচনা হোল। বুঝিয়ে দিলেন স্বামিজী ধর্ম্ম কি, এবং ধর্ম্মের মূল সূত্র কোথায়। এ এক মহা সমন্বয়ের লীলাভূমি। এখানে হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, নেই কোন ভেদাভেদ। লোকে এখনো বোঝে না। কিন্তু দিন আসবে, যেদিন আর ধর্ম্মে থাকবে না গোড়ামি। চলবে না ধর্ম্মের নামে সংস্কারের মিথ্যা ঝঞ্ঝা। মানুষ নির্ম্মল মন লয়ে, পবিত্র চিত্তে ধর্ম্মকে গ্রহণ করবে। ধর্ম্মের নামে একই পতাকাতলে আনত শিরে দাঁড়াবে লক্ষ কোটি মানুষ, যেখানে থাকবে না ভেদের ভাবনা, যেখানে থাকবে না শ্রেণী-বৈষম্য, যেখানে থাকবে না

ধনী দরিদ্র। সবাই এক মোহনায় এসে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াবে। যে যার চিত্তবৃত্তির ভাবানুযায়ী ঈশ্বরকে ডাকবার সুযোগ পাবে। দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে। নবাব তো স্বামিজীর মধুর-বাণী শুনে অবাক।

আরো বললেন স্বামিজী, বললেন—যাবেন তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশে। প্রচার করবেন ধর্ম্মের উদার সার্ব্বভৌম মত,—যে মত ও পথ দেবে মানুষের মন থেকে আবিল মুছে। সংকীর্ণতার পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে যে ধর্ম্ম মানুষকে এনে দেবে মহামুক্তির মহামন্ত্র, এমন স্নিগ্ধ, শাশ্বত সত্যের বাণী বয়ে তিনি যাবেন, যাবেন বিশ্বের দরবারে ভারতের চিরন্তন সত্যের ধ্বজা উড্ডীন করতে।

নবাব খুরসিদ দিতে চাইলেন এক হাজার টাকা। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেন স্বামিজী।

কেন?

বললেন,—"নবাব বাহাদুর, ইতিপূর্ব্বে আমার পরম বন্ধু মহীশুরের মহারাজ বাহাদুর এবং শিষ্য রামনাদের রাজা আমাকে পাশ্চাত্ত্য দেশে গমন করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি কখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে গমন করিবার জন্য ভগবানের আদেশ পাই, তাহা হইলে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিব।"

এক সহস্র শ্রোতার সম্মুখে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী,—বক্তৃতা দিলেন মহবুব কলেজে। নাম ছিল তার "পাশ্চাত্ত্য দেশে আমার বার্ত্তা।"

সভাপতির আসনে ছিলেন পণ্ডিত রত্নলাল। মুগ্ধ হোলেন তাবা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সমাগত জনতা মুখর হয়ে উঠল।

বিদায় নিলেন স্বামিজী নবাব খুরসিদের কাছ থেকে।

যাত্রা করলেন দর্শনার্থে মক্কা মসজিদ, মারমিনার, ফলকনামা, বসীরবাগ নিজামের প্রাসাদ সমূহ।

মাতৃভূমির লুপ্ত গৌরবকে আবার প্রাণবন্ত করতে হবে। জগতের বুকে ছড়াতে হবে আশা ও আশ্বাসের বাণী। মানুষের মনমরুকে উর্ব্বর ক'রে সোনার ফসল ফলাতে হবে। জড় চিত্তে জাগরণের মুক্ত-শুদ্ধ বীজমন্ত্র পৌঁছে দিতে হবে।

দিকে দিকে প্রচার হয়ে গেল স্বামিজীর প্রবাস যাত্রার কথা। বেগমবাজারের ধনী মহাজনেরা চাইল স্বামিজীর রিক্ত হাত পূর্ণ করে দিতে। বলল তারা, আমরা সব ভার বহন করছি। আপনি যান পাশ্চাত্ত্য দেশে।

এলো থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ও সংস্কৃত ধর্ম্মমণ্ডল সভার সভ্যেরা স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। কত আলাপ হোল। তারা তৃপ্ত মনে দিয়ে গেল স্বামিজীকে উৎসাহ।

১৫ই ফেব্রুয়ারী।

তার এসেছে, তার এসেছে পুণা থেকে।

কি লিখেছে?

হিন্দুসভার প্রতিনিধিদের একান্ত অনুরোধ, একবার তিনি পুণা যান।

কিন্তু এখন কি করে যাওয়া যাবে। উত্তর দিলেন তারের,—"এখন আমি যাইতে অক্ষম, তবে সুযোগ পাইলেই আনন্দের সহিত আপনাদের ওখানে যাইব।"

১৭ই ফেব্রুয়ারী ত্যাগ করলেন হায়দরাবাদ। অগণিত জনতার বেদন-বিধুর মন। তারা বিষাদঘন তনু নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ষ্টেশনে। সে কি একজন আর দু'জন লোক? প্রায় হাজার দেড়েক হবে।

যাত্রা করলেন যুগযাত্রী, যাত্রা করলেন আবার মাদ্রাজে।

মাদ্রাজ।

সমুদ্র সৈকতে নীল জলের মৃদু মন্থন। বনে বনে মর্ম্মরী। কুঞ্জে জাগে ভ্রমরা সঙ্গীত।

নিখিল চিত্ত যেন হরষে হারা।

জোয়ার এসেছে—

জোয়ার এসেছে প্রাণ-প্রবাহের।

বন্দরে বন্দরে গ্রামে জনপদে নতুন দিনের নব সঞ্চার।

ওরা নেমেছে পথে—

পথে নেমেছে স্বামিজীর প্রিয় মাদ্রাজি শিষ্যবৃন্দ।

কেন?

গভীর অধীর চিত্ত চলে—

চলে দৃঢ় প্রাণে। পবিত্র সংকল্প—যেমন করেই হোক পাঠাবে তার স্বামিজীকে পাশ্চাত্ত্যে।

এ যেন লহর চলে, লহর দোলে, সফেন ঢেউয়ের মত।

বনের মৃদুল সমীর চলে, আবিল নেইকো কিছু।

ডাকছে তারা জনে জনে—

ডাকছে মুক্ত মনে।

এসো, এসো, সবাই এসো, এসো মুক্ত হাতে। মুঠা মুঠা আশীষ ছড়াও—ছড়াও স্নিগ্ধ প্রাণে। বল দাও, ভরসা দাও, দাও অর্থ আঁজল ভরে।

এগিয়ে এলো ধনী-জ্ঞানী, এলো মহাজন।

চাইল দিতে অর্থ তারা—

চাইল আঁজল ভরে।

কিন্তু বিবেকানন্দ বললেন—না।

পেরুমলকে ডেকে বলেন—যেয়োনাকো দয়ার দান আনতে ধনীর দ্বারে। যেও না কৃপার পাত্র হয়ে করুণা ভিক্ষা করতে। আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি লক্ষ-কোটি মৌন, মূক, দলিত, লাঞ্ছিত মানুষদের ভারতবর্ষ থেকে। আমি যাচ্ছি দীনতম ভারতের অবহেলিত মানুষদের পবিত্রতম তীর্থ থেকে। ঐ ভাঙা ঘর। ঐ আর্ত্তদের প্রাণ ফাটান চীৎকার। ঐ ওদের জীবন-বেদ রচনা

করতে যাচ্ছি। তোমরাও তাদের মাঝে যাও। যাও সেই মুক্ত শুদ্ধ বিস্তৃত প্রাণের পরিধির মাঝে। যাও সেই সুন্দর স্নিগ্ধ অসীম মনের পরিবেশে। ওরে, ওদের অর্থ নেই—কিন্তু প্রাণ আছে। ওদের আহার নেই—কিন্তু দানে ওরা দাতাকর্ণ।

তাদের কাছে বল। দেখ তারা কি বলে। দেখ আমায় তারা তাদের যোগ্য প্রতিনিধি বলে মানতে চায় কিনা। ওদের দুঃখময় জীবনে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তির সন্ধান দিতে পারি, পারি যদি ঐ সব ব্যথিত ভগ্ন মানুষদের একবারটির জন্যও দাঁড় করিয়ে দিতে—তবেই সার্থক হবে আমার যাত্রা। তাই তো "আমি জনসাধারণ ও দীন দুঃখীর পক্ষ হইতেই যাইতেছি।"

ওরে, ওদের কথা বলতে পারলেই আমার তৃপ্তি।

ওদের গান গাইতে জানলেই আমি ধন্য।

গুরুবাক্য শিরোধার্য্য।

মাদ্রাজী ভক্তবৃন্দ দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে, জনসাধারণের ঘরে ঘরে গিয়ে করল অর্থ সংগ্রহ। যাত্রা করল রামনাদ, মহীশূর, হায়দরাবাদ সর্ব্বত্র। আনলো প্রচুর অর্থ। করতে লাগল স্বামিজীর যাত্রার প্রস্তুতি। কিন্তু কই গো, সাড়া তো এলো না!

পৌঁছাতে পারেনি এখনো স্বামিজী—

পৌঁছাতে পারেনি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে।

মা, তুই তো কিছু বললি না।

মন জ্বলে স্তিমিত তারার মত। জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু আবার যায় নিভে।

আশা আর নিরাশা।

ঝড় যেন আন্দোলিত করে যায় মনকে।

কি করবে, কোথায় পাবে পথ, কে দেবে আশ্বাস? কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না স্বামিজী।

ওরে পাষাণী! তুই সাড়া দে। কথা বল। একবার মরু মনে জোয়ারের কলতান এনে দে মা! এখনো বসে তুই স্তব্ধ আসনে প্রহর গুণে চলবি? আয়, আয় মা, আয় তুই শুচির সর্ব্বরী থেকে মুক্ত মন-লোকে। ঘুমন্ত অরুণকে জাগিয়ে দে। আমি তিমিরের তরঙ্গ সন্তরি দূর দিগন্তে মোহনার খোঁজে যাত্রা করি। উর্দ্ধে নভলোকে তারার আঁখিপাত। নিম্নে মরুবুকে মারী—মরণের ঢল। তাদের মিনতি, করুণ আকুতি,—যাত্রা কর যাত্রী তুমি, আর

দেরি নয়। এবারে তুই মা আদেশ দে। আমি যে দৈবের অধীন। তুই না বললে কেমন করে লগ্ন আসবে?

মন মানছে না। চায় যেন হাওয়া হয়ে উড়ে যেতে। কিন্তু সাড়া না পেয়ে বা কেমন করে যাবেন। তাই বসে ভাবছেন একদিন, ভাবছেন—শ্রীমার কাছে একখানা পত্র দিলেত হয়! মা আমার যা বলবেন, তাই করব। যেতে বললে যাব। আর যদি বলেন না, তবে যাব না। তাই ভালো। শুধু শুধু এত ভাবনা কেন? অস্থির চিত্তে একটু স্থিরতা এসেছে। শ্রীমার আদেশ বৈ কিছু করছেন না তিনি। পত্র দিবেন।

কিন্তু এমনি দিনে ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা।

ঝড় থেমে গেল। জ্বালা নিভে গেল। দ্বন্দ্বের হোল অবসান।

সে কি?

রাত্রি—ঘোর ঘন রাত্রি। কেউ নেই পথে। নিঝুম পুরী। শশাঙ্ক আঁকা, আঁকা দূর দিগন্তে আকাশের গায়। আর সমতলের বুকে এসে মূর্চ্ছিত হচ্ছে মাঝে মাঝে, মূর্চ্ছিত হচ্ছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ স্পন্দন। তন্দ্রালু চোখ ঘুম ঘুম ভাব স্বামিজীর। মাঝে মাঝে সমুদ্রের গর্জ্জন এসে ভেঙে দেয় তার অবচেতন ভাবকে। শিহরণ জাগে। চমকে তাকান। আবার নেমে আসে তন্দ্রা। বুজে যায় আঁখিতারা।

এমনি এক নিশি ঘন গভীর রাত্রে জাগে সূর্য্যের নবতনু।

সূর্য্য?

হ্যাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ অবয়ব।

কোথায়?

ফেন শুভ্র তরঙ্গ স্পন্দনে হেলে দুলে চলছেন উদ্দাম সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ-য়ের ওপর দিয়ে।

তার পর?

এগিয়ে চললেন সম্মুখের দিকে। আর ফিরে ফিরে চাইলেম পিছু পানে। ডাকছেন তার প্রিয় নরেনকে। যেমন ডাক দিয়েছিলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে, ঠিক তেমনটি—ওরে তুই আয়, আয় এগিয়ে আয়। ভয় নেই। শঙ্কা নেই। নেই, নেই কোন বন্ধন। তুই স্বচ্ছন্দে চলে আয়।

তন্দ্রা স্বামিজীর কাটল।

একটা স্বর্গীয় আনন্দের দোল দিয়ে গেল যেন কে অন্তর মনে। দিব্যভাবে মন গেল মুগ্ধ হয়ে। চোখ মেলে তাকালেন। কে যেন কানে কানে বলে গেল—"যাও।"

অশরীরী আত্মার আহ্বান। দৈবের ডাক।

আর কে বন্দী করে রাখতে পারে জাগ্রত সিংহকে।

কে পারে মহাসমুদ্রের শত লক্ষ তরঙ্গকে বন্দী কারায় আটক রাখতে?

নিরুদ্ধ শক্তির জাগরণে এলো মনে অমেয় শক্তি। পত্র দিলেন শ্রীমাকে। চাইলেন আশীর্ব্বাদ। লিখলেন—"মহাবীর যেমন রামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের উপর লাফ দিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ঠাকুরের নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম।"

চিঠি এলো।

কার চিঠি?

নরেন লিখেছে।

কি? আহা, বাছা আমার বিদেশ যাবে। আশীর্ব্বাদ চেয়েছে। ওরে, কত দিন দিন মাস মাস হয়ে গেল। ওকে আমি দেখি না। মনটা যেন কেমন করে। একবারটি না দেখে কেমন করে যেতে বলি।

ব্যাকুল শ্রীমার অন্তর। নরেনকে দেখবার জন্মে আকুল তাঁর চিত্ত। এমন কোন্ মা আছেন, যার অন্তর পুত্রের প্রবাস যাত্রার কথা শুনে কাঁদে না? ওরে, ও একা একা কেমন করে রইবে? ও তো কোনদিন সংসার করেনি। বীর বিদ্রোহী সন্ন্যাসী মার কাছে এখনো শিশুটি যেন। মা যেন ভাবছেন সেই ছোট্ট নরেন এখনো তার কোলের ছেলে।

ওমা, তুমি ভুল করছ; নরেন যে ঠাকুরের মহান সঙ্ঘের মহান নেতা।

নিশ্চয় পারবে। তুমি হুকুম দাও।

—না না, অমন কথা কইছ কেন। মার কাছে ছেলে কি কোনদিন বড় হয়? আমার নরেন সেই নরেনই আছে। তাকে আমি কোন্ প্রাণে অমন দূর দেশে যেতে বলি, বল্ দেখিনি তোরা?

মার সাথীরা আর কি বলবে।

আর কেই বা পারে এমন সমস্যার মীমাংসা করতে।

পারে।

কে ?

একজন। সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

আকুল চিত্তে এনে দিলেন ঠাকুর স্থিরতার সুস্থ সিদ্ধান্ত।

দেখলেন মা—স্বামিজী যা দেখেছিলেন, তেমনি এক অপুর্ব্ব স্বপ্ন।

তবে আর ভাবনা কি। যখন উনি ডেকেছেন। আর সঙ্গে করেই তো নিয়ে যাচ্ছেন।

তবুও প্রাণ কাঁদে। কিন্তু সংহত চিত্তে স্নেহ বিগলিতা জননী জগতের মঙ্গল সাধনায় স্বামিজীকে সম্মতি দিলেন যেতে।

জবাব এলো চিঠির।

মা যেতে লিখেছেন। আনন্দের কি আর সীমা আছে! আনন্দে আবেগে সুরু করে দিলেন নৃত্য। মাথায় তুলে নিলেন শ্রীমার আশীর্ব্বাণী।

কিন্তু এমন পাগলপারা ভাব দেখলে লোকে বলবে কি ?

আত্মভোলা ভোলার মনে আবার চেতন লোকের বাণী।

তাই তো ?

চলে গেলেন সমুদ্র তীরে। আনন্দে উদ্বেল হিয়া। মনে আনন্দের অমিয় লহর। যে দিকে তাকান কেবল দেখেন তিনি বিশ্ব আনন্দময়।

ওদিকে বসে আছেন ভক্তবৃন্দ মন্মথ বাবুর বাসায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। চললেন সেখানে। দিব্য রাগরঞ্জিত তনু। নির্ম্মল টলমল স্নিগ্ধ স্বামিজীর মুখচ্ছবি। যেন প্রভাতের প্রথম কুসুমটি শতদলে মুগ্ধ। আর কেন ? এবারে আয়োজন কর। "শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পাইয়াছি, সমস্ত সংশয়-ভাবনা দুর হইয়াছে, আমি আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত। করুণাময়ী জননী আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আর চিন্তা কি ?" উদ্দাম গতি।

শিষ্যেরা প্রচুর প্রাণ চেতনা নিয়ে সুরু করলে অর্থ যোগাতে।

যার পথ তিনিই মুক্ত করেন। মানুষ তো নিমিত্ত বৈ আর কিছু না।

অল্প দিনের মধ্যেই আয়োজন পুর্ণ। আর দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই যাত্রা করবেন যুগযাত্রী।

হঠাৎ এসে হাজির হোল খেতড়ি থেকে জগমোহন। সব আয়োজন দিল উল্‌টে।

কেন ?

খেতড়ির মহারাজ জগমোহনকে বলে পাঠিয়েছেন—"জগমোহন, এ উৎসবে স্বামিজীর আসা চাই। তিনি না থাকিলে এ উৎসব আনন্দ সবই বৃথা।" তুমি শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এসো।"

কোন্ উৎসব?

কেন, ঐ যে পুত্রকামনা করেছিলেন রাজা। স্বামিজী দিয়েছিলেন বর। সেই ছেলের মুখে ভাত। অন্নপ্রাশন উৎসব।

জগমোহন মন্মথ বাবুর দ্বারে এসে ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল, "ওহে স্বামিজী কোথায়?"

ভৃত্য বললে—"তিনি সমুদ্রে গিয়েছেন।"

আ! তবে কি—তবে কি! "তিনি তা হলে পশ্চিম দেশে যাত্রা করেছেন? কি বল হে?"

দূরে একটা ঘরে ঝুলান রয়েছে গেরুয়া আলখাল্লা। জগমোহনের দৃষ্টি গেল সেদিকে। "না, তিনি কখনই যান নাই।" আশ্বস্ত হোল জগমোহন।

এমনি সময় একখানা গাড়ি এসে থামল দুয়ারে। নামলেন স্বামিজী।

জগমোহন করল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

সব কথা শুনলেন স্বামিজী।

জগমোহন রইল তাকিয়ে। যেমন শাবক থাকে তাকিয়ে, তাকিয়ে থাকে তার মার দিকে, ঠিক তেমনটি যেন।

বললেন স্বামিজী—তা কেমন করে হয়?

আঁৎকে উঠল জগমোহন—না হোলেই নয়।

"দেখ জগমোহন, আমি ৩১শে মে আমেরিকা যাত্রা করব ঠিক হয়ে গিয়েছে, এখন তারই জন্য গোছগাছ করতে হচ্ছে—এ অবস্থায় মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার আর সময় কৈ?"

নাছোরবান্দা জগমোহন বললে—"গুরুজি! অন্ততঃ এক দিনের জন্যও আপনাকে খেতড়িতে যেতে হবে, অন্যথায় রাজাজী হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাবেন। আমেরিকা যাবার বন্দোবস্তের জন্য আপনার ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই। মহারাজ সমস্ত বন্দোবস্ত করবেন, আপনি আমার সঙ্গে খেতড়িতে চলুন।"

—বুঝি, তুমিও বলছ। মহারাজেরও একান্ত ইচ্ছা। খেদ রেখেও তো মন যেতে চায় না রে। কিন্তু কি করি বল দেখিনি?

—আপনাকে যেতেই হবে।

—আচ্ছা চল।

ঠিক হোল বোম্বে থেকে যাত্রা করবেন স্বামিজী আমেরিকার পথে।

আর মাদ্রাজে ফিরে আসবেন না।

পথের দু'ধারে অগণিত লোকের বিষণ্ন বদন। অশ্রুপূর্ণ লোচনে রয়েছে তারা দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রীগুরুর বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে। জ্ঞানী, গুণী, ধনী, মানী থেকে, ছাত্র শিক্ষক ও দরিদ্র মানুষটি অবধি সে এক অবিচ্ছিন্ন লাইন।

দেখছে তারা, দেখছে বিদায় বিধুর গুরুদেবের ব্যথাক্লিষ্ট বদন।

ওরা এক এক করে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে প্রণাম করল। চাইল আশীর্ব্বাদ।

ওরে, আয় আয় তোরা, এগিয়ে আয়—

দেখে যা ভারত-আত্মার মূর্ত বিগ্রহ চলেছে—

চলেছে তোদের একান্ত আপনার জন, তোদের একান্ত নিজস্ব মন, কোন্ দূর বিদেশে তোদেরই কথা কইতে। এ বড় মর্ম্মময় দৃশ্য! এ বড় বেদনাকরুণ যাত্রা।

প্রিয় শিষ্যদের ছেড়ে যেতে যে তাঁরও প্রাণ কাঁদে।

কাঁদবে না?

ওরে যার ঘর নেই, তার যে বিশ্বময় সংসার।

যার মোহ নেই, তার যে কোটি কোটি সন্তান। খণ্ড স্বার্থে যে বাঁধা পড়ে নেই, সে যে ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধনে আটকা পড়ে আছে।

কাঁদবে না প্রাণ? ঐ দাঁড়িয়ে আছে অগণিত সন্তান। এ যে তাঁরই মানস লোকের সব ছেলেরা। কেমন করে তাদের জন্যে দুফোটা চোখের জল না পড়ে পারে।

বহু কষ্টে সামলে নিলেন স্বামিজী—

সামলে নিলেন নিজেকে নিজে। কিন্তু গতি এলো মন্থর হয়ে। শ্লথ পদসঞ্চারে গাড়িতে উঠে বসলেন।

ধীরে ধীরে গাড়ি ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা রইল তাকিয়ে—

তাকিয়ে রইল চলমান গাড়িখানার দিকে। অস্তমিত সূর্য্যের মত দিগন্তের অন্তরালে মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল শ্যাম সবুজের গহন ঘোরে গাড়ি।

এ মহাযাত্রা ছিল একান্ত গোপন।

অনেকেই জানত না বিবেকানন্দের এ বিশ্ব পরিক্রমার সংবাদ। আর তিনিও চাননি জানাতে, খৃষ্টান দেশে প্রচারে যাবেন। সেখানে মানুষের দুঃখ দৈন্যকে প্রত্যক্ষ করবেন। তাদের ধ্যান জ্ঞান ও মোক্ষের সন্ধান জানবেন। এত সব কথা শুনলে হয়ত মনমুখী মানুষ তার গুরুভাইয়েরা উঠবে আঁত্কে। হয়ত তাদের আত্মচিন্তায়, মোক্ষলাভে বিঘ্ন ঘটবে। তাদের প্রশান্ত মন উঠবে চঞ্চল হয়ে।

কিন্তু আকাশে অরুণোদয় হলে কে পারে তাকে ঢেকে রাখতে?

খেতড়ি যাবার পথে হয়ে গেল দেখা—

দেখা হয়ে গেল আবু রোড ষ্টেশনে দুই সতীর্থের সঙ্গে।

ওরা নির্জ্জন পাহাড়ে করছিল কৃচ্ছ্র সাধনা।

কে কে?

ব্রহ্মানন্দ আর তুরীয়ানন্দ।

ভুলেও ভাবেনি দেখা হয়ে যাবে স্বামিজীর সঙ্গে।

স্বামিজী তাদের কাছে বললেন—

বললেন সব কথা খুলে।

ওরা ত অবাক। তুমি বিলেত যাচ্ছ?

স্বামিজী বললেন, "হরি ভাই! তোমাদের এই তথাকথিত ধর্ম্মটাকে আমি বুঝিতে পারিলাম না।" ভগবানের নাম করছ তোমরা। আত্মসত্য জানবার জন্য নির্জ্জন বনে, পর্ব্বতগুহায় ধ্যানী মনে তন্ময় হয়ে আছ। কিন্তু দেখছ না কি একবারটি, তোমার আশেপাশে কারা চিৎকার করছে? কেঁদে কেঁদে বলছে, আমাদের মুক্তি দাও। ওরে, নিজের মুক্তির জন্য লোকালয় ছেড়ে চলে গেলে নির্জ্জনে! কিন্তু ভাই, ওদের পাশে দাঁড়ায় কে? কে দেবে ঐ হৃত-সর্ব্বস্ব মানুষদের জলঝরা চোখ মুছিয়ে? দেহ-সর্ব্বস্ব প্রাণী হতে বলছি না। মনন ধর্ম্মী হও, তাতে বাধা কি! কিন্তু তাই বলে কি মনন-শীলতার তরী 'পরে ভর করে চলে যাবে দেহাতীতে? যাও সেই অরূপের সন্ধানে। সীমা থেকে অসীমের গভীরে, তাতে বাধা নেই। কিন্তু তাকে জেনে কেবল নিজেই অন্তহীন অভিসারে ডুবে রয়ো নাকো। সবাইকে নিয়ে যাত্রা কর। যাত্রা কর দুর্গম পথে দুঃসাহসিক যাত্রীর মত।

সমস্ত চেতনার মধ্যে যেন একটা প্রবল স্পন্দন জাগল স্বামিজীর। স্নায়ুগুলো উঠল চন্‌মন্‌ করে। তপ্ত রক্তের দ্রুত প্লাবনে শিরায় শিরায় মন্থন জাগল। রক্তাক্ত হয়ে গেল গৌরকান্তি তনুখানা।

ওরে তোমরা জান না,—"আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি.....কিন্তু ভাই, সর্ব্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দুর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া কোন লাভ হইবে না। এই কারণেই—জনসাধারণের মুক্তির অন্যতর উপায়ের সন্ধানেই—আমি এখন আমেরিকা চলিয়াছি।"

আবেগ আকুল কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। চোখ ফেটে এলো কান্না। বড় বেদনায় তাঁর গণ্ড বেয়ে অশ্রু নির্গত হোল। তুরীয়ানন্দও কেঁদে ফেলল।

উপনিষদে জিজ্ঞাস্য বিষয় কি?

ব্রহ্মবিদ্যা।

কিন্তু তাই বলে কি বলতে হবে কোন ঠাঁই নাই বস্তু বিদ্যার?

সে কি কথা! কে বলল তা! এ জাগতিক বিশ্বের বস্তু জগতে অন্নই হচ্ছে বস্তু, প্রধান বস্তু। তার প্রাধান্য কম কি! তাই বলে কি বস্তু জিজ্ঞাসাই শেষ জিজ্ঞাসা? এক রকম বলা চলে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে কি?

'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ।' নিন্দা করো না অন্নকে। 'অন্নং ন পরিচক্ষীত।' দেখবে যেন উপেক্ষা করো না অন্নকে।

অন্ন দিয়ে সেবা কর জীবের। সেবার শক্তি এনে দেবে অন্ন। অন্নই প্রাণ। অন্নই প্রেম। অন্নেই এনে দেবে ব্রহ্ম জানার তন্‌হা।

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীবের সেবা তো অন্ন দিয়েই হয়।

কিন্তু এখানে আরো কথা আছে!

কি?

যারা বস্তুবাদী তারা পাবে তাদের প্রাণের কথা এতে।

কিন্তু—উপনিষদ তো কেবল বস্তু সত্তার কথাই বলেনি! এতো খণ্ড জীবনের সাধনা। খণ্ড সত্তায় আটকা পড়ে রইলে চলবে কেন?

আরো গভীর, আরো নিবিড় একটা জগৎ আছে—

আছে মানুষের মনলোকে। সেখানে মানুষ বস্তু নিয়েই তুষ্ট নয়। সে চায় আরো অনেক কিছু জানতে।

বৃহদারণ্যকে—বিরোচন জানল দেহকেই সত্য বলে। তৃপ্ত হোল মন। আনন্দে আত্মহারা হোল বিরোচন দেহকেই ব্রহ্ম বলে। বস্তুকেই ব্রহ্ম জেনে। কিন্তু ইন্দ্র করল কি?

সে চাইল জানতে আত্মাকে। শান্ত হোল না তার চিত্ত, শান্ত হোল না আত্মাকে না জানা অবধি। তাই বলে বস্তু হেলা-খেলার নয়! কিন্তু বস্তু বৈ মানুষ বাঁচে কি করে? সবাই তো আর সাধুসন্ত আসে না! কিন্তু বস্তু যেন মানুষকে পেয়ে না বসে। বস্তুর দাস হয়ে যেন মানুষ বস্তু ভারে জর্জ্জরিত না হয়। তবেই কিন্তু বিষম কাণ্ড। বস্তু যখন ভার হয়ে আসে, তখন কিন্তু অমন কুৎসিত কদর্য আর কিছু নেই। এই বস্তুই বাঁধিয়ে দেয় তখন দ্বন্দ্ব। যাতে করে মানুষে মানুষে ঘটে তারতম্য। ছোট বড় ভেদের সৃষ্টি হয়। মানুষ বস্তু মোহে মত্ত পাগল হয়ে পশু পর্য্যায়ে পা বাড়ায়।

তবে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার উপায় কি?

সত্যের সাথে যুক্ত হতে চাইলে, চাই ভোগ বিরতি।

তবে কি ব্রহ্মলাভ সম্ভব নয় বস্তু সাধনায়?

কেন হবে না?

হয়?

নিশ্চয়। লাভ হবে বস্তু ব্রহ্ম।

এখানে থামলে যাবে সব তালগোল পাকিয়ে।

খণ্ডকে সর্ব্বস্ব মনে করে বিরাট অন্ধকারে পড়তে হবে।

তবে এর হাত থেকে আলো প্রজ্ঞার পথ কোথায়?

চেতন লোকে। নিত্য জিজ্ঞাসায়।

নিত্য জিজ্ঞাসা আবার কি?

যে ধন সবার চেয়ে সেরা। যা সব থেকে বড়। যিনি মহতোমহীয়ান তাঁকে জানার নামই নিত্য জিজ্ঞাসা। আর এই নিত্য জিজ্ঞাসার জবাবই হোল ব্রহ্ম উপলব্ধি। এই জানার মধ্যেই থাকে লুকানো বৈজ্ঞানিকের পুরুষকার।

এ পুরুষকার প্রকাশ লাভ করেছিল শ্রীভৃগুর সাধনায়।

শ্রীভৃগু কে?

মহর্ষি বরুণদেবের পুত্র।

শ্রীভৃগু এলো পিতার কাছে জ্ঞান ধ্যানের কথা শুনতে।

এলো শ্রীভৃগু ব্রহ্মবার্ত্তা শুনতে। বললেন ভৃগু, অধীহি ভগবো ব্রহ্ম। ভগবন ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করুন।

মহর্ষি বললেন কি?

বললেন, ওরে পৃথিবীর যা থেকে জন্ম হোল, মানুষ যা থেকে পেল প্রাণ, বর্দ্ধিত হোল, তার পরে আবার বিলীন হয়ে গেল যার কোলে—সেই সত্যকে জানার নামই হোল ব্রহ্মকে জানা। তুমি তাকে ধ্যান কর।

কি করলেন ভৃগু?

জানলেন—জন্ম, প্রকাশ, বিকাশ ও লয় যা থেকে হচ্ছে তা আর কি?

এর মূলে তো অন্ন! আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন ভৃগু। বললেন—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ'। অন্নই তবে সেই ব্রহ্ম।

চললেন পিতার কাছে জানতে, তার অনুমান সত্য কিনা।

মহর্ষি বললেন না কিছু। কেবল শুধু উপদেশ দিলেন—'তপো ব্রহ্ম'। তপস্যা দ্বারা এগিয়ে চল।

আবার বসলেন ভৃগু—

বসলেন ধ্যানে।

এবারে কি উপলব্ধি হোল তার?

বুঝলেন, প্রাণ থেকে অবির্ভাব হয়েছে জগতের। বলে উঠলেন—'প্রাণো ব্রহ্ম ব্যজনাৎ'।

—বল পিতা, আমার এবারে হয়েছে কি ব্রহ্মোপলব্ধি?

—তোমাকে কেমন করে বুঝাই বল। একে কথায় ধরা যায় না। আত্মার খোঁজ নাও। আত্মোদ্ধার কর। ব্রহ্মকে জানতে পারবে। আবার ধ্যানলোকে তন্ময় হয়ে যায় ভৃগু।

এবারে ভৃগুর উপলব্ধিতে আভাসিত হোল মন।

বললেন—'মনো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ'।

এবারে?

—আরো এগিয়ে চল।

তবে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।

বল পিতা, এবারে জেনেছি কি তাকে?

হয়নি এখনো। তপস্যা কর।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগু হারালেন না ধৈর্য। মগ্ন মনে সেই অনাদি অনন্তকে জানার জন্যে আবার বসলেন ধ্যানে।

এবারে দেখলেন কি?

কি যে দেখছেন তা নিজেই বলতে পারছেন না। সর্ব্বত্র একটা আনন্দ-ঘন পরিবেশ। যেদিকে দৃষ্টি যায় কেবল আনন্দময় দিব্যতা। সর্ব্বত্রই মুগ্ধ অপূর্ব্ব রূপ। কোথাও একটু অপূর্ণতা নেই। পূর্ণানন্দে ভৃগু তন্ময় হয়ে গেলেন।

বুঝলেন এই পূর্ণতা থেকেই বিশ্ব মুগ্ধ। এই আনন্দ থেকেই অমৃত। এই সত্য থেকেই মুক্তির প্রশান্তি।

পূর্ণ হোল সাধনা। লাভ করলেন ভৃগু ব্রহ্মকে। প্রত্যক্ষ করলেন ভূমাকে। পিতা করলেন আশীর্ব্বাদ।

প্রাণের যটুক পবিত্রতম প্রকাশ। মহৎভাবে অর্জ্জন কর অন্নকে; আনন্দকে ধারণ কর শ্রেয়ো ধর্ম্ম বলে। শ্রমের পবিত্রতম আশীর্ব্বাদে গ্রহণ কর অন্ন। অন্ন যেন বন্ধন না হয়ে ওঠে।

সত্য বলে মেনে নাও অন্নকে। কিন্তু আসক্ত হয়ে পড়ো না বস্তুর দাসত্বে। তবেই মুক্তি। তবেই বন্ধন মোচন।

প্রাণ যখন আপন মুক্তির মোহে অপচিত না হয়ে বিশ্ব-মানবের জয় গানে মুখর হয়ে ওঠে, ওঠে যখন ত্যাগতৎপর হয়ে, তখনই মানুষের মুক্তি। মানুষ তখনই তার মলিনা বাসনার কারাদুর্গ ভেঙ্গে হাজির হয় বিশুদ্ধ বিশ্ব-প্রাঙ্গণে।

মনের মানুষের, প্রাণের দরদীর খোঁজ মেলে—

খোঁজ মেলে এই বিশাল প্রাঙ্গণে। জগৎ এসে কোলাকুলি করে যায় অলক্ষ্যে। প্রেম জ্ঞান বৈ তখন আর কিছুতে থাকে না তার রুচি। আত্মা যায় আত্মহারা হয়ে বিজ্ঞানানন্দে। বেদান্ত তো একেই বলে ব্রহ্ম। তবে শ্রুতি এ থেকে এগিয়ে গেছে আর এক ধাপে।

কোথায়?

একেবারে পূর্ণানন্দে। সেখানে বিশ্বময় আনন্দ। অন্নে, প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে কেবল স্ফুরিত হচ্ছে দিব্য আনন্দের আলো ভাতি। যিনি এই সকল

ধাপগুলো মাড়িয়ে এসেছেন, তিনিই জীবন-মুক্ত মহাপুরুষ। তিনিই সর্ব্ব বস্তু, সর্ব্ব জীবে দয়াবান। তিনিই মনস্বিতার আলোকে উজ্জ্বল মহিমময়। শিব ও সুন্দর।

বিবেকানন্দ যে এই বেদান্তেরই বৈদান্তিক। এই শ্রুতিরই সার্থক সাধক।

তাই তো তাঁর প্রাণ কাঁদে দুঃখীর দরদে, আর্ত্তের কান্নায়, ব্যথিতের হাহাকারে।

তাই তো স্বামিজী তুরীয়ানন্দকে বললেন—"আমার মনটা কিন্তু আরো অনেক বড়ো হইয়াছে। আমি অপরের দুঃখ বেদনা অনুভব করিতে শিখিয়াছি। বিশ্বাস করো, বড়ো বেদনার সঙ্গেই আমি অনুভব করিয়াছি।"

রুদ্ধ আবেগে স্বামিজীর কণ্ঠ গেল নীরব হয়ে। কান্না এলো তাঁর চোখে।

কাঁদল তুরীয়ানন্দও।

যদিও এর ফলাফলের কোন মূল্য নেই—

মূল্য নেই ব্রহ্মাণ্ডের কাছে। কিন্তু সমাজের সাথে যে এর যোগসূত্র রয়েছে অনেক। সামাজিক ব্রহ্মাণ্ডের কাছে এর মূল্য ত কম নয়।

কথা সত্য এইটেই যে, ব্রহ্মজ্ঞ হলেই তাকে সমাজ সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে যেতে হবে না। মানুষের বেদনায় তার যে অনেক কিছু করবার রয়েছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদ তো এই শিক্ষা দিচ্ছে।

কথা উঠতে পারে—তবে, বস্তু আর ব্রহ্মে তফাৎ কোথায়?

তফাৎ হোল এই—বস্তুবাদীরা আত্মগত নয়। তারা চলে নিয়মে বাঁধা শাসনের অনুশাসন নিয়ে। ফলে হয় কি? তাদের বস্তুবাদের বনিয়াদ রচনা করতে গিয়ে তারা হয়ে পড়ে বস্তুর দাস। দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দুঃখ। ক্ষয় ও ক্ষতি। হিংসা, দ্বেষ, মৃত্যু ও মড়ক।

সে কি?

যেমন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এটমের হুমকি। হাইড্রোজেন বোমার বড়াই। এই দিয়ে কি আর বিশ্বশান্তি সম্ভব?

এ ত ক্ষমতার লড়াই। প্রভুত্বের ঝঞ্ঝা।

শান্তির স্থান মনে। সেই মনকে, সেই অনুভূতিকে সবার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারলেই মুক্তি। শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় কি আর এত সভা শোভা-যাত্রার দরকার হয়?

বস্তুবাদীরা বলবেন—এ হোল ভাববাদ। ভাবের কথা।

আর মনমুখোরা বলবেন কি ?

অত শত ঝামেলা দিয়ে কি হবে ? আত্মসত্যের সন্ধান পেয়ে আত্মানন্দে ভাসতে পেলেই হোল।

কিন্তু স্বামিজী বললেন কি ?

ভাববাদের সঙ্গে যুক্ত করে দে বস্তুবাদ। তার পরে উচ্চারণ কর আত্মগত মন্ত্র। প্রেরণা দে সবাইকে মনোদীক্ষার আনন্দে। তবেই তারা কর্ম্মের ভেতরেও প্রাণ পাবে, পাবে ব্রহ্ম বস্তুর মধ্যে। এখানেই প্রভেদ স্বামিজী ও সতীর্থদের মধ্যে।

ভাবে আর বস্তুতে সমন্বয় হোলে মানুষ কেবল রাষ্ট্রিক মুক্তিই পায় না। তার আত্মমুক্তিও ঘটে। মানুষ যায় তখন মহান হয়ে। হিংসা, দ্বেষ সব কিছুকে ভুলে তারা বিশ্বকে কোল দিতে যায় এগিয়ে।

এমন মুক্তির কাছে, এমন স্বাধীনতার কাছে রক্তক্ষরা সংগ্রামের কি ঠাঁই আছে ? ও তো পৈশাচিক বৃত্তির পাশব বিকাশ। অসভ্যতার চূড়ান্ত স্বাক্ষর।

কিন্তু এর হাত থেকে মুক্তি কেমন করে আসবে ?

মুক্তি আসবে ভোগ-বিরতিতে। আত্মিক চেতনায়। জীবন জিজ্ঞাসায়।

মানুষ যদি ভোগে আসক্ত হয়ে না পড়ে, না পড়ে যদি ঐহিক ঐশ্বর্য্যে নিমজ্জিত হয়ে, তবেই তার অন্তরে জাগে এক অনাদি অনন্ত জিজ্ঞাসা। আর সেই জিজ্ঞাসার প্রভাবে আসে তার আত্ম-চেতনা। এই আত্ম-চেতনাই চালিত করে তাকে ভোগ-বিরতির পথে।

কেউ বলবে এ ভীরুর কথা। কিন্তু না। এতে চাই শ্রেষ্ঠ সংযম। যে সংযম মানুষকে করে মহান্। দেয় প্রাণে অজেয় শক্তি। দেহে অমেয় বল। আর সেই বলে বলীয়ান মানুষ সংসারে, জগতে ও রাষ্ট্রে বাস করেও নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত নির্ম্মল, স্নিগ্ধ হয়ে থাকে। সন্ধান করে প্রেয় ও শ্রেয়কে।

ফলে হয় কি ?

মানুষে মানুষে ভেদ ঘুঁচে যায়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। যুক্ত হয়ে যায় জীবনে জীবন। বিশ্ব শান্তির কাঠামো হয়ে ওঠে মজবুত। এই তো ভারতীয় সাধনার ঐক্য। এই সত্যই প্রাচীন ভারতের হৃদপিণ্ডে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল।

এই সত্যই বীর বিদ্রোহী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো।

তুরীয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিলেন স্বামিজী।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আকাশে উঠেছে অসংখ্য তারা।

খেতড়ি।

দীপ জ্বলছে। শত শত দীপ। আলোয় আলোময় চতুর্দ্দিক। উৎসবের আনন্দে খেতড়ির রাজবাটি মুখর। কত রাজা, কত অমাত্য, কত প্রজার আনাগোনা।

নৃত্য-গীতে মাতোয়ারা চারিদিক।

স্বামিজীর শকট গিয়ে পেঁছিল। পেঁছিল রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে। দ্বার রক্ষীরা করল কুর্ণিশ। মহারাজ এসে স্বামিজীকে নিয়ে গেলেন অন্দরে। করলেন অবনত মস্তকে প্রণাম। সুরু হোল দিকে দিকে শান্তি-সঙ্গীত।

রাজকুমারকে নিয়ে এলো সভায়। স্বামিজী করলেন আশীর্ব্বাদ। উচ্চারণ করলেন কল্যাণ বাক্য। রাজসভা আনন্দে উঠল মুখর হয়ে। ভরে গেল তাদের অন্তর এক মহা দিব্যভাবে।

কিছু দিন স্বামিজী মাদ্রাজে রইলেন।

হোল যাত্রার সূচনা। কিন্তু ছাড়তে চান না মহারাজ স্বামিজীকে বললেন, "স্বামিজী মহারাজ, আপনাকে বিদায় দিতে আমার বুকটা যে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমি বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহি না তবে আমি জয়পুর পর্য্যন্ত আপনার অনুগমন করিব।"

স্বামিজী সম্মতি দিলেন না।

উত্তরে মহারাজ বললেন,—"অতিথিকে বিদায় দিতে হইলে অন্তত রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ত যাওয়া উচিত।"

এলেন জয়পুর অবধি মহারাজ।

সঙ্গে জগমোহনও আছে।

জগমোহনকে রেখে গেলেন স্বামিজীর সঙ্গে। মহারাজ বিদায় নিলেন।

বলে গেলেন যাবার সময় জগমোহনকে—দেখ, যেন স্বামিজীর কো অসুবিধা না হয়। আর প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র সব কি দিও। জয়পুর থেকে জগমোহন ও স্বামিজী প্রথম শ্রেণীর একখানা কামর চাপলেন।

গাড়ি এলো—

এলো আবুরোড ষ্টেশনে। রাত্রিটা বাস করলেন স্বামিজী, বাস করলেন এক রেল কর্ম্মচারীর বাসায়।

ভোর হোল। সময় হলো। এলেন স্বামিজী ষ্টেশনে।

ঘটল এক অপ্রীতিকর ঘটনা।

কি?

স্বামিজীর কামরায় বসে কথা কইতেছিলেন—

কথা কইতেছিলেন এক ভক্ত বাঙ্গালী।

এমনি সময় এলো—

এলো এক শ্বেতাঙ্গ রেল কর্ম্মচারী।

বাঁধিয়ে দিল বিষম গণ্ডগোল।

কেন?

বললে নেমে যেতে বাঙ্গালী ভদ্রলোককে।

কিন্তু ভদ্রলোক নামলেন না।

রেগে তো সাহেব আগুন। দিতে লাগল কত না আইনের দোহাই।

বাঁধল ভীষণ ঝগড়া। স্বামিজী ভক্তটিকে বারণ করলেন ঝগড়া করতে। কিন্তু কি হবে তাতে?

সাহেব স্বামিজীকে বলে উঠল—"তুম্ কাহে বাত করতে হো!"

সামলে কথা বল সাহেব। "তুম্ তুম্ কচ্ছ কাকে?.........আপ বলতে পার না?" ভড়কে গেল সাহেব। বললে—"অন্যায় হয়েছে, আমি ও ভাষাটা (হিন্দী) ভাল জানি না।........."

"তোমার নাম নম্বর বল, আমি তোমার ব্যবহার উপরে জানাব।"

লোকে লোকারণ্য। বচসা উঠেছে সপ্তমে। এবারে ভয় হোল সাহেবের মনে। যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু দুর্ব্বলের মত ক্ষমা করবার লোকত নয় স্বামিজী—

বললেন দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে—"এই শেষ বলছি, হয় তোমার নাম নম্বর দাও। নয় ত লোকে দেখুক তোমার মত কাপুরুষ আর দুনিয়ায় নেই।" এবারে সাহেব সত্যিই পেল ভয়। ঘাড় হেট করে বসে পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

ওরে জগমোহন, "ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি চাই দেখছো? এই আত্ম-সম্মান জ্ঞান। আমরা কে, কি দরের লোক না বুঝে ব্যবহার করাতেই লোকে আমাদের ঘাড়ে চড়তে যায়। অন্যদের

নিকট নিজেদের মর্য্যাদা বজায় রাখা দরকার। তা না হইলেই তারা আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছল্য ও অপমান করে—এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শিক্ষা ও সভ্যতায় হিন্দুরা জগতের কোন জাতের চেয়ে হীন নয়, কিন্তু তারা নিজেদের হীন মনে করে বলেই একটা সামান্য বিদেশীও আমাদের লাথি ঝাঁটা মারে—আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।"

ওরে, পরাধীনতা আমাদের ললাটে পরিয়ে দিয়েছে ক্লীবতার কাল তিলক। মেরুদণ্ড ফেলেছে ভেঙে। তাই তো মিথ্যার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের মুখোমুখি হয়ে অমরা লড়তে জানি না। অসত্যকে চলি প্রশ্রয় দিয়ে। নীরবে সয়ে যাই অপমানের গ্লানি, অসম্মানের অভিশাপ। কেনরে? আমরা সইব কেন? কেন আমাদের সত্য বলার অধিকার থাকবে না? এ জাতটা কি একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছে?

একবার দাঁড়া দেখেনি! দাঁড়া সোজা হয়ে দু' পায় ভর দিয়ে। প্রত্যক্ষ কর, প্রত্যক্ষ কর তোর স্বরূপ সত্য। চেয়ে দেখ তোর পুর্ব্বপুরুষদের মহিমময় কীর্ত্তি। কেবল পরের দেয়া বুলি, আর পরের দেশের শিক্ষাকেই আঁকড়ে ধরিস না। নিজেকে জান, নিজেকে বোঝ, তবেই জাগ্রত হবে সুপ্ত সত্ত্বা। প্রতিষ্ঠিত হবে জগতের বুকে তোর অধিকার। লোকেরা তবে কথা কইবে সমঝে। শিক্ষা নিতে আসবে তোর কাছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল কথাগুলো—

শুনল জগমোহন।

বোম্বে এসে পেঁ ছিল গাড়ি। নামলেন গাড়ি থেকে স্বামিজী, নামলেন ষ্টেশনে।

জগমোহন জানায় অনুরোধ—চলুন।

কেন?

কিছু পোষাক কিনে আনি।

পোষাক কিনছে জগমোহন। দামী দামী পোষাক। লাল রং রেশমি কাপড়। কিনছে আর ভাবছে জগমোহন,—বেশ মানাবে। কিন্তু স্বামিজী ভাবলেন, এত দামী পোষাকের দরকার কি?

—কি করছ জগমোহন? এত দামী পোষাক কেন? যেমন তেমন একটা গেরুয়া কাপড় কিনলেই তো চলবে। মিছামিছি······।

—সে কি? তুমি যাচ্ছ রাজর্ষি, যাচ্ছ মহাভারতের আত্মকেন্দ্র থেকে। যাচ্ছ থৈ-হীন অসীম সমুদ্রের বাণী বহন করে। অনাদি, অনন্ত সনাতন ধর্ম্মের মুখপাত্র হয়ে।

তাদের কাছে তুমি ছোট কিসে? "রাজগুরু—রাজগুরুর উপযুক্ত বেশে ভ্রমণ করবেন।"

যাত্রার দিন এল ঘনিয়ে। কালের বুকে একটা চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গেল। জগমোহন কিনল একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট। রিজার্ভ করল কেবিন। সাল ১৮৯৩।

তারিখ? ৩১শে মে।

জাহাজ নোঙ্গর করা ঘাটে—পেনিন্‌সুলার জাহাজ।

বোম্বের সমুদ্র উপকূল। অবারিত নীল জলের বিস্তার। থৈ নেই, সীমা নেই, নেই অন্ত। যেন কোন দূর অনন্তের আহ্বানে চলেছে—

চলেছে একটা বজ্রাহত ইঙ্গিত রেখে। যেন ডেকে বলছে—ওরে আয়, আয়, আয়! এগিয়ে আয় প্রমত্ত মন, আমার মত প্রবল তরঙ্গ স্পন্দনে এগিয়ে আয়। প্লাবিত করে দে উপকূলের যত সব দগ্ধ তাপিত মনজমিন। এনে দে মরুবুকে প্রাণ চেতনার উর্ব্বরতা। ডাকুক ফসলের বান। রাত্রির বুকে ফুটে উঠুক স্নিগ্ধ সকাল। চল্, চল্, অজানা দেশের অফুরান পথে চল।

ছাত্র জীবনে বুঝি দেখেছিলেন স্বামিজী, দেখেছিলেন আমেরিকার মানচিত্র। কে জানত সেদিন, এই অজানা দেশের অভিসারে পা বাড়াতে হবে, পা বাড়াতে হবে স্বামিজীকেই। দিতে হবে পারি শ্রান্তিহীন ফেনিল উচ্ছল জল-তরঙ্গে।

সময় হোল—

সময় হোল জাহাজ ছাড়বার।

আলসিঙ্গা, পেরুমল ও জগমোহন প্রণাম জানালো।

আলসিঙ্গা এসছিল মাদ্রাজ থেকে—

এসেছিল স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রণাম জানাতে।

একি!

শ্লথ হয়ে আসে যেন পদসঞ্চার! স্নিগ্ধ মুখে যেন সন্ধ্যার আল্‌পনা? বিদীর্ণ হয়ে যায় মন। কান্না আসে যেন চোখ ফেটে। একি! মন, তবে কি তুই মায়ার দাস? কায়ার অনুগামী!

গৈরিক রেশমী পোষাক, মাথায় গৈরিক পাগড়ী। ধীরে ধীরে উঠলেন স্বামিজী—জাহাজের ডেকে। কিন্তু দৃষ্টি স্থির। পলক বিহীন চোখ। তাকিয়ে আছেন পারের দিকে, তাকিয়ে আছেন ঐ ওদেরই দিকে।

ব্যথায় যেন বুক ভেঙ্গে যায়। অব্যক্ত বেদনায় গিয়েছে সারাটা তনু-মন বিষণ্ণ হয়ে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন থম্‌কে দাঁড়িয়েছে এখানে।

কি কথা কইবেন? সিঁড়ি থেকে ওরা বিদায় নিল, বিদায় নিল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ঢং ঢং করে বেজে উঠল ঘণ্টা। এতো ঘণ্টা নয়, যেন লক্ষ কোটি বছরের মিলন-গ্রন্থিকে ছিন্ন করে দিল কে নির্ম্মম হাতে।

একটা আর্ত্ত করুণ কান্না ডুকরে উঠল মনের ক্রান্তি বৃত্তে। আশা ও আশ্বাসের নির্ম্মল মনটা ভরে গেল মুহূর্ত্তে ঘন কালো বিষাদের মলিন অন্ধকারে। হৃদয়ের প্রতি ঘাটে মন্থন জাগল। বেরিয়ে এলো তা, জোয়ারের মত বেরিয়ে এলো দুটো কালো কাজল চোখের পাড়ে। যেন সমুদ্রের সমস্ত ফেনিল জলোচ্ছ্বাস এসে আছড়ে পড়ল চোখের তারায়। হৃদয় প্রবাহ আর সমুদ্র স্রোত মিলে এক হয়ে গেল। জাহাজ ছেড়ে দিল।

কিন্তু স্বামিজী দাঁড়িয়ে রইলেন ডেকে। তট প্রান্তের শেষ চিহ্নটুকু অবলুপ্তির অন্ধকারে মিলিয়ে না যাওয়া অবধি স্থির সন্ন্যাসী দুটো জলভরা চোখে রইলেন তাকিয়ে। কতবার করলেন ওদের উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ প্রেরণ।

এবারে ভেসে এলো অন্তরে আর একটা রাজ্যের মোহন ছবি। আহা কি রূপ! সেই শ্যাম সবুজ অরণ্য বিস্তার। দোয়েল-কোয়েলের মিষ্ট মধুর সঙ্গীত। গঙ্গার কলনাদ। দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মন্দির। বরাহনগর··· শ্রীমা···সতীর্থ···সব একে একে ছবির মত এসে স্তব্ধ হয়ে গেল মনের প্রান্ত সীমায়। আবার এলো চোখে জল।

তারপর?

দেশ···জাতি···সভ্যতা···দুঃখ···বেদনা···ও হাহাকার তাঁকে অস্থির করে তুলল। উদ্বেল অশান্ত মন আবার হিমেল রাত্রির মত নীরব মৌন হয়ে গেল মুহূর্ত্তে। জল এলো আবার চোখে।

কেউ জানলে না। কেউ খোঁজ নিলে না। একাকী সাগ্নিক সন্ন্যাসী যাত্রা করলেন—যাত্রা করলেন এক অজানা দেশের সন্ধানে। খেতড়ির মহারাজের একান্ত অনুরোধে বিবেকানন্দ নামই বজায় রইল।

পাড়ি উজিয়ে দিল জাহাজ—

পাড়ি উজিয়ে দিল নীল জলের নিঃসীম দিগন্তে।

৩৭

জাহাজ চলেছে—

চলেছে জাহাজ নীল জলের বুকে হংস বলাকার মত। চলেছে উজানে বাঁক কাটিয়ে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে। চলেছে অনিশ্চিত অজানা পৃথিবীর পথে।

দিন কাটে। আসে রাত। নতুন নতুন ভাব। নতুন নতুন শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন স্বামিজী। নবতরঙ্গ স্পন্দিত হয় অন্তরে। ভাব ভাবনায় ছোঁয়া-লাগে তারই। মনে পড়ে যায় শ্রীগুরুর অমৃতময় মধুর বাণী—"যত দিন বাঁচি তত দিন শিখি।"

কিন্তু বড় খারাপ লাগছে স্বামিজীর। দু'দণ্ড যে নতুন সাথীদের সঙ্গে কথা বলবেন, তারও অবকাশ পাচ্ছেন না। একে তো নিজেকে সামলান দায়, তার উপর আবার মালপত্র কত কিছু। বিরক্ত হয়ে বললেন তাই—"এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহা তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হইতেছে। বাস্তবিক এ এক ঝঞ্ঝাট।"

আবার মন স্থির হয়ে যায়। ভাবেন তিনি—ডাক দিয়েছেন যিনি, ব্যবস্থা করবেন তিনিই।

দিন যেতে না যেতে আলাপ হোল জাহাজের কাপ্টেনের সঙ্গে। এলো সব ভালো ভালো খাবার। ইয়োরোপীয় কায়দা-কানুন জেনে ফেললেন এক এক করে। জমে উঠল আলাপ কয়েক জন জার্ম্মানের সঙ্গে।

এক সপ্তাহ যায় যায় প্রায়। পৌঁছল এসে জাহাজ কলম্বো বন্দরে। সিংহলের রাজধানীতে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পীঠস্থান। এই সিংহলেই পাঠিয়েছিলেন রাজভিক্ষু অশোক, পাঠিয়েছিলেন পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে ভগবান বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে।

জাহাজ নোঙ্গর ফেলল। পারে উঠলেন স্বামিজী। সহর ঘুরে দেখে এলেন মহানির্ব্বাণ মূর্ত্তি। দেখলেন আরো কত মন্দির। কিন্তু আলাপ হলো না পুরুতদের সঙ্গে। তারা যে সিংহলের ভাষা বৈ আর জানে না কিছু। ফিরে এলেন ব্যর্থ মন নিয়ে স্বামিজী, ফিরে এলেন জাহাজে।

নোঙ্গর তুলল জাহাজ। বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রের বুকে ভেসে ভেসে উপনীত হোল পেনাংএ। ছোট্ট সহর। ছবির মত সুন্দর। বড় ভাল লাগল সহরটি স্বামিজীর মালয়ের রাজধানী পেনাং।

প্রাচীন কালের বিভীষিকা। মুসলমান মালয়বাসিগণ জলের বুকে দস্যু-বৃত্তি করে কত লোকের না প্রাণ নাশ করেছে। লুটপাট করে সর্ব্বস্বান্ত করে দিয়েছে যাত্রীদের। এই ছিল তাদের পেশা। ক্রমে লীন হয়ে গেল সে দিন-গুলো ইতিহাসের বিস্মৃত পাতায়। রণতরীর কামান দিল খর্ব্ব করে তাদের পশুবৃত্তিকে। শান্তির জীবন ফিরে এলো মালয় তথা পেনাংএর বুকে।

ছাড়ল জাহাজ পেনাং থেকে। এলো সিঙ্গাপুরে। এখান থেকে হংকং মাত্র তিন দিনের বিরতি। দেখে নিলেন স্বামিজী চীনের রাজধানী ক্যাণ্টন আর কি দেখলেন?

আর দেখলেন, প্রাচ্যের আর্ত্ত পীড়িত মানুষদের 'পর পাশ্চাত্ত্যের অবাধ শোষণের সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। মনে পড়ে গেল ভারতবর্ষের নিরন্ন ভাইদের মুখচ্ছবি। চীন ও ভারতবর্ষ। দুটি সভ্য দেশ। কিন্তু এরা একপাও এগুতে পারছে না। কেন? তার কারণ কি? "দারিদ্র্যই তার এক কারণ। সাধারণ হিন্দুর বা চীনার পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়কে এত দূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিতে অবসর দেয় না।"

এ হোল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের একটি মস্ত কৌশল। বুদ্ধিজীবী মানুষদের এই করেই তারা পঙ্গু করে রাখে। ভেঙ্গে দেয় মেরুদণ্ড। সুযোগ দেয় না কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে। অবকাশ দেয় না জীবনের চরমতম পরাজয়ের কথা ভাবতে। কেন? তা হ'লে তার সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ রক্তের তরঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে সময় লাগত না এক মুহূর্ত্ত। তাই তো এদের ঘাড়ে দারিদ্র্যের দুঃসহ ভার। অভাবের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার।

ছাড়ল জাহাজ ক্যাণ্টন থেকে। এলো জাপানের নাগাসাকি বন্দরে জাপান! কি সুন্দর। কোথায় চীন আর কোথায় জাপান! এ যেন পটে আঁকা একখানা ছবি। শ্যাম সবুজ প্রকৃতির কোলে তারই যেন শোভন লোভন একটি অঞ্জলির অর্ঘ্য। মনোময় উদ্যান। কৃত্রিম জলাশয়। মুগ্ধ হয়ে গেলেন স্বামিজী। দেখলেন নাগাসাকি, ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও সহরগুলো আর দেখলেন শতলক্ষ যুব জীবনের অপূর্ব্ব প্রাণ-চেতনা। উদ্দাম কর্ম্ম

চাঞ্চল্য। দৃষ্টি গেল খুলে। একটা অন্তহীন আনন্দের দোল দিয়ে গেল স্বামিজীর অন্তরে।

কিন্তু পাশাপাশি আর একটি দেশের কথা স্মরণ হোল। তাঁর মনের প্রসন্ন প্রভাতে ছায়া ফেলে গেল বিষণ্ণ সন্ধ্যা। ভেসে উঠল দূর দিগন্তের ভগ্ন জীর্ণ বার্দ্ধক্য গ্রস্ত একটি বিরাট দেশের কঙ্কাল রূপ। সে দেশ ভারতবর্ষ। ব্যথায় বিমর্ষ হোয়ে গেল স্বামিজীর মুখখানা। সেই অশিক্ষার অন্ধকার। নিরন্নের হাহাকার। লক্ষ কোটি মৌন মূক মানুষের মরণ মিছিল এসে যেন দাঁড়াল সম্মুখে। লজ্জায়, দুঃখে ও ব্যথায় বিদ্রোহী হোয়ে উঠল স্বামিজীর মন। স্বদেশের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন তার বজ্র দৃঢ় বাণী। কালের বুকে সে বাণী ধ্রুব তারার মত জ্বলছে, জ্বলছে যুগ ও জীবনের নতুন আকাশে। মানুষ তাই দেখে অর্জ্জন করছে তার পবিত্রতম দাবী জানাবার অধিকার মানুষেরই দরবারে।

পত্র লিখলেন স্বামিজী মাদ্রাজী বন্ধুদের—

পত্র লিখলেন ইয়োকোহামা থেকে—"এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস? দেশকে ভালোবাস? তা হলে এস, ভাল হবার জন্য, উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জন কাঁদে কাঁদুক, তবুও পেছনে চেয়ো না, কেবল সামনে এগিয়ে যাও।"

"বলি চান দেশ মাতৃকা......সহস্র নিঃস্বার্থ, তেজস্বী যুবকের জীবন বলি চান। হে বীর্য্য-হৃদয় যুবক বৃন্দ, ...এগিয়ে এস, বেরিয়ে এস.......।"

"চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—বিপুলা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ কর্ম্মশালার দিকে। বুঝে দেখ—শুদ্ধ মাত্র অপরিসীম উদ্যমে, সঙ্ঘ শক্তিতে আর বৈজ্ঞানিক কৌশলে ক্ষুদ্র জাপান, সদ্যজাগ্রত তরুণ জাপান.........কেমন জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিপুঞ্জের মধ্যে মর্য্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে।"

"এসে নিজ চক্ষে দেখে যাও এসব—আর ধিক্কার দাও, সহস্র ধিক্কার দাও নিজেদের চরম অক্ষমতাকে........ধিক্কার দাও নিজেদের কূপমণ্ডুকতাকে। আর সে সঙ্গে সঙ্গে, পার যদি—বেশ ভাল করে এ কথাটি উপলব্ধি ক'রে যাও যে—নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।"

ইয়োকোহামা থেকে ছাড়ল জাহাজ। প্রশান্ত মহাসাগরে ধরল পাড়ি।

এগিয়ে চলল জাহাজ, এগিয়ে চলল প্রাচীন গোলার্দ্ধের তটতীর্থ ছেড়ে নতুন এক অজানা গোলার্দ্ধে। চলল কানাডার ভ্যাঙ্কুবরের দিকে।

* * * *

দিন।

এক একটি দিন। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মেঘের মত দিন। একটি রক্ত রঙ্গিন অরুণোদয় থেকে আর একটি উদয় রাগের কক্ষ অবধি বিসারিত দিন। চব্বিশ ঘণ্টার অখণ্ড একটানা পথ। কত ভাব, কত ভাবনা, কত-না নতুন নতুন গ্রন্থিহীন পথের সঙ্গে পরিচয়। আবার ভাবনার সঙ্ঘাতে মনের মধ্যাহ্ন আকাশে বৃষ্টির মন্দ্রিত ঝঙ্কার। প্রতিটি পলে পলে পুরাতন পরিচিত পৃথিবীর শ্যামতট থেকে অজানার অভিসার। কখনও মন প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ের মত দিগন্ত বিসারী। আবার অবলুপ্ত হয়ে যায় সে ক্ষণ-তরঙ্গ মনেরই অতলান্তে। বড় ভাল লাগছে স্বামিজীর, ভালো লাগছে নীলাম্বুরাশি অতিক্রম করে সাম্‌নের দিকে এগুতে। সফেন তরঙ্গে হেলে দুলে চলেছে জাহাজ একটা নতুন গোলার্দ্ধের সন্ধানে। এক মাস অবিরাম চলল জাহাজ। পৌঁছল এসে ভ্যাঙ্কুবরে। নোঙ্গর ফেলল। ট্রেনে চাপলেন স্বামিজী। কানাডার মধ্য দিয়ে, রকি পাহাড়ের গা ছুঁয়ে চলল ট্রেন, চলল চিকাগোর পথে।

চিকাগো। আলোক সজ্জায় পরিশোভিত। সজীব। অপূর্ব্ব এখানের প্রাণ-প্রবাহ। পথের দু'ধারে অট্টালিকা। বিপণি। শ্যাম সমারোহ। তারই কোলে স্নিগ্ধ সুন্দর কুসুমরাজি। কি সুন্দর! কি মনোরম! প্রাণ চাঞ্চল্যের এ এক প্রকৃষ্টতম স্থান। বিস্ময় জাগে মনে। ভাবেন তিনি—এত ঐশ্বর্য্য! এত সম্পদ! দেখতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে পথ, ঘাট, মাঠ ও মানুষ।

কেউ তাঁকে চেনে না। তিনি যে অপরিচিত পৃথিবীর একজন পরিচয়হীন সন্ন্যাসী। ডেকে বসাল না কেউ। এগিয়ে এলো না জানতে নাম, ধাম ও পরিচয়। বরং করল তারা স্বামিজীকে বিদ্রূপ। পিছু পিছু ছুটল লোকেরা। হৈ হৈ করে তুলল উত্যক্ত করে। লাল কাপড়। মাথায় আবার পাগড়ি। বলি এ আবার কেমন সাধু!

এ কোন্ বেশ?

লোকের ভিড় পড়ল ভেঙ্গে। সুরু হোল হৈ হল্লোর।

বড় খারাপ লাগে স্বামিজীর। জীবন লাগে বিস্বাদ। আর যেন সহ্য হয় না। যে যেমন পারছে, যাচ্ছে ঠকিয়ে। প্রতারণা করছে। চার আনার

কুলি নির্ব্বিবাদে চার টাকা দাবী করে বসে আছে। এ যেন এক লুঠের বস্তু আর কি।

উপায়হীন হয়ে উঠলেন একটি সাধারণ হোটেলে। বলি, এও তো অপরিচিত স্থান। তা হোক। তবুও একটি নিশ্চিত আবাস। স্বস্তি একটু পেলেন এবার। রেহাই পেলেন সেদিনকার মত।

রাত পোহাল।

চললেন স্বামিজী বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখতে।

নব নব আবিষ্ক্রিয়ার শত সহস্র যন্ত্র। পণ্য সম্ভার। এই দিয়ে খোলা হয়েছে বিশ্ব-প্রদর্শনী। দেখলেন স্বামিজী। মুগ্ধ হোলেন। এত সব আয়োজন দেখে গেলেন বিস্মিত হয়ে।

কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য উপভোগেও একক মন পায়না তৃপ্তি। নিঃসঙ্গ জীবনের কাছে এ যেন একটা ক্ষণিকের বিদ্যুৎ ঝলক!

বড়ই অসহায় লাগে যেন। ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র প্রকাশ দেখে হাঁপিয়ে ওঠেন স্বামিজী। এ যে কেবল আত্ম-প্রচারের বহিরাবরণ। কলকাতার তুলনায় এখানকার খরচা অনেক বেশী। কেমন করে বা চলবে? মনের আকাশে জমা হয় দুর্ভাবনার মেঘ। তারপরে আবার শুনলেন—শুনলেন কিনা, ধর্ম্ম-সম্মেলন হচ্ছে না সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে। সবে তো এ জুলাই মাস। মাঝে পুরো দুটি মাস। বড় হতাশ হয়ে পড়লেন। বিষণ্ণতার অন্ধকারে তাঁর মনের আশার দীপগুলো সব গেল ম্লান হয়ে। সম্মুখে কেবল দিগন্ত বিসারী নিরাশার সাহারা।

তবে এখন উপায়?

চলে গিয়েছে প্রতিনিধি হিসেবে নাম লেখাবার তারিখটিও। সরকারের অনুমোদন পত্র না হোলে তদ্‌বির তদারকেও কিছু হবার নয়। ভেঙ্গে পড়লেন বিবেকানন্দ। সম্মুখে দেখলেন শুধু অন্তহীন অন্ধকার।

আর কেন? এবারে চল মন, ফিরে যাই ঘরে। জীবনের জোয়ারে এসেছে ভাটার মন্থরতা। আশার ক্ষীণতম রোশনাইটুকুও নেই আর। আলোর বৃন্তে ফুটেছে শত সহস্র রাত্রিরা। আর পড়ে থেকে কি হবে?

রিক্ত হস্ত। শূন্য মন। দূর দেশ। অপরিচিত সন্ন্যাসী। কে আসবে এগিয়ে দু'টো সান্ত্বনার কথা বলতে। কে দেবে বল, ভরসা, আশা ও আশ্বাস? সহায়হীন, সম্বলহীন সন্ন্যাসী। হাতে আছে মাত্র দু' পাঁচ দশ টাকা।

চিকাগোর রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে তা অতীব সামান্য বৈ কিছু নয়। তারপরে আবার প্রচণ্ড শীত। কিন্তু ফিরে গেলে যে মহৎ কাজ রয়ে যাবে অসমাপ্ত। কি করবেন ভাবতে ভাবতে ঘনিয়ে আসে চেতনায় ঘোর। দিন তো আর কম নেই। কি করে খরচা চলবে? হাক দিয়ে কাঁদলেও এ বিপদ থেকে মুক্তি মেলে না। স্মরণ করলেন শ্রীগুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে।

ওগো, আমার অন্ধকার অন্তরে জ্বালিয়ে দাও আশার প্রদীপ। নিরাশার বন্দরে ভিড়াও আমার উত্তরণের তরী।

ছল ছল নয়ন। আরক্তিম তনু। বুজলেন চোখ।

আবার বুঝি বলল মন—হে, শরণ্য, তুমি এসো আমার স্মরণে, মননে, জীবনে ও মরণে। এসো আমার কর্মে ধর্মে ও মর্মে। যে পতাকা তুলে দিয়ে গেছ হাতে, তাই নিয়ে বেরিয়েছি জগৎ মাঝে, বিশ্ব বুকে। তুমি একটু সহায় হও। বল দাও। আলো জ্বাল আমার পথের সম্মুখে। আমি চলে যাই বন্ধুর পথে জীবনের গান গেয়ে।

অবরুদ্ধ হৃদয় দুর্গের কবাটগুলো গেল ভেঙ্গে। গুরুকে ভরসা স্থলে রেখে যাত্রা করলেন স্বামিজী। পত্র দিলেন মাদ্রাজে। আর একটি আবেদন পত্র পেশ করলেন সরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে। চাইলেন সাহায্য। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠান প্রত্যাখ্যান কবল স্বামিজীর আবেদন। বলল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা "মরুক শয়তান, শীতে মরুক।"

'রাখে কৃষ্ণ মারে কে!' অদৃশ্য শক্তির হাতে অর্পণ করলেন স্বামিজী তাঁর আশা, ভরসা সব কিছু। শেষ সম্বল কয়েক ডলার নিয়ে চলে এলেন বোষ্টনে।

খরচা এখানে অনেক কম। আসতে আসতে আলাপ হোল পথে এক ভদ্র মহিলার সঙ্গে। মাসাচুসেট। ধনে, মানে প্রতাপে, প্রতিপত্তিতে মহিলা একজন নামী লোক। আমন্ত্রণ জানাল সে, আমন্ত্রণ জানাল স্বামিজীকে তার বাড়ীতে।

তবে কি ভাগ্যের দুয়ার গেল খুলে? বিঘ্ন, বিপদের ঝঞ্ঝা থেকে উত্তরণ হোল নির্ভাবনার বন্দরে? তবে এখানে এসে অনেকটা চিন্তা মুক্ত হোলেন স্বামিজী। লিখলেন, "এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ আমার যে এক পাউণ্ড খরচা হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে। আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন। এ সব যন্ত্রণা সহ্য

করিতেই হইবে। আমাকে এখন অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের জন্য রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে।"

তা হোক, তবুও মিলেছে একটা স্থির নিশ্চিত ঠাঁই। মন তো স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—আর এখানে নয়। এখান থেকে ইংলণ্ডে। সুযোগ সুবিধে না হোলে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। সে ভাবনা থেকে মুক্ত হোয়েছেন স্বামিজী। দেশে যাবার ভাবনা নেই আর মনে। এবারে একটু খোঁজ খবর করবার বাসনা জাগল মনে। পত্র লিখলেন এক অধ্যাপককে, "এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে সব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে—এক্ষণে অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি পাইয়াছি ভগবানের আদেশ, আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সবই দর্শন করিতেছে। মরি বাঁচি উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

বিঘ্নের সমুদ্রে পাড়ি না দিয়ে কে কবে পেয়েছিল সাফল্যের বন্দর? রাত্রি শেষে যেমন আলোর উদয়, তেমন দুঃখের তপস্যা করে পেতে হয় জীবনের মহৎ স্বীকৃতি।

পত্র লিখলেন স্বামিজী, পত্র লিখলেন শিষ্যদের কাছে, "কোমর বাধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কার্য্যের জন্য ডাকিয়াছেন। আমি সমস্ত জীবন নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছি, প্রাণপ্রিয় নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর ও বদ্‌মাস বলিয়াছে। আমি এ সমস্ত সহ্য করিয়াছি তাদের জন্য যারা আমাকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে। বৎস! জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ! লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হৃদয়ের বেদনা অনুভব কর, অকপট হইয়া ইহাদিগের জন্য ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে ও এই দুঃখভার হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। তথাকথিত ধনী ও বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি। অবশেষে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে অর্দ্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছি। ভগবান দয়াময়! তিনি অবশ্যই সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে শীতে ও অনাহারে মরিতে পারি। কিন্তু হে যুবকগণ! আমি তোমাদের নিকট দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতগণের জন্য এই প্রাণপণ

চেষ্টা দায় স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। তোমরা এই ত্রিশ কোটী নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন গভীরতম অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছে। প্রভুর নাম জয়যুক্ত হউক—আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। এই চেষ্টায় শত জন প্রাণত্যাগ করিতে পারে। আবার সহস্র জন এই কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইবে। বিশ্বাস-সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস—জ্বলন্ত সহানুভূতি অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।"

হৃদয় দিয়ে হৃদি। হৃদয়ের সুকুমার ভাব ভাবনা দিয়ে মানুষের মঙ্গল চিন্তা করতে হবে। হৃদয় দিয়েই অনুভব করতে হবে কোটী কোটী হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনা। মুক্ত হবে পথ। বল পাবে দেহে। আসবে জীবনে শুভ লগন। অভয় শঙ্খ বেজে উঠবে অন্তরে।

স্বামিজীর জীবনে এলো সে সুযোগ। ভদ্রমহিলা স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল হার্ভর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীস বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সঙ্গে। নাম জে, এইচ, রাইট। আলোচনা হোল বিবিধ বিষয় নিয়ে। মুগ্ধ হোল অধ্যাপক। ক্ষণিকের আলাপন রচনা করে দিল প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সেতু। বলল সাহেব, "আপনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ চিকাগো মহাসভায় গমন করুন, তাহা হইলে বেদান্ত প্রচার কার্য্যে অধিকতর সাফল্য লাভ করিবেন।"

পত্র লিখে দিলে সাহেব মহাসম্মেলনের এক বিশেষ ব্যক্তির কাছে। নাম তার বনি সাহেব। লিখলে, "দেখলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র করলে যা নয় তদপেক্ষা বেশী পণ্ডিত।"

আবর্ত্তিত হোল অন্ধকার। উদিত হোল সূর্য্য। আর ভাবনা নেই। জুটেছে সঙ্গী! একক জীবনে পেয়েছেন স্বামিজী ভাবনার দোসর। ফিরে এলেন চিকাগোতে। নিয়ে এলেন রাইট সাহেবের পত্র। ট্রেন এসে পোঁছল অনেক রাত্রে।

হঠাৎ গেল মুখখানা বিমর্ষ হোয়ে বিষণ্ণ আকাশের মত। চিন্তার ছোঁয়া লাগে চিত্তে। মন যায় খারাপ হোয়ে। কেন?

এতরাত। কোথায় যাবেন এখন স্বামিজী। কেমন করে পোঁছে যাবেন তিনি নির্দ্দিষ্ট আবাসে। হারিয়ে ফেলছেন ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানা। এত বড় শহর। তারপরে রাত। বড়ই বিপদ হোল তাঁর। পথে চলতে দু'একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী,—

ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানাটি বলতে পারেন স্যার ?

ফিরে তাকাল না কেউ। করল অবজ্ঞা। দিল না কথার জবাব। একটি হোটেলে উঠলেন। ঠাঁই হোল না সেখানেও। ফিরে এলেন ব্যর্থ মনে।

এখন কোথায় যাবেন ? মহা ভাবনায় পড়লেন। বাইরে হিম ঝরছে। শীতের প্রবলতায় স্তব্ধ হোয়ে গেছে শহর। দাঁতে দাঁতে শব্দ উঠে গেছে এতক্ষণে। আর কোথায় যাবেন ! ফিরে এলেন আবার ষ্টেশনে। এলেন প্ল্যাটফর্মে। পড়ে আছে একটি শূন্যবাক্স। উপায়হীন সন্ন্যাসী ঢুকলেন তার মধ্যে। বড় কষ্টে কেটে গেল রাত। ঘুম এলো না।

বেরিয়ে পড়লেন পথে। ক্ষুধা-ক্লিন্ন মুখ। স্নায়ুগুলি যেতে চায় নিস্পন্দ হয়ে। মাঝে মাঝে থেমে যেতে চায় হৃদ্স্পন্দন। আর চলছে না দেহ। শ্লথ হোয়ে আসে পায়ের ছন্দ। ভিক্ষার আশে তবুও দ্বারে দ্বারে হাজির হোতে লাগলেন ভিক্ষু।

ভাগ্য যখন বঞ্চিত করে, সময় তখন দাঁড়ায় এসে রুদ্ধ করে পথ, জীবনের সর্ব্বঘাটে বিপদের উত্তাল তরঙ্গ জেগে ওঠে। দুর্ব্বিষহ লাগে জীবন। সবাই করে অবহেলা। ঠেলে দিতে চায় দূরে !

স্বামিজীর ভাগ্যেও এর বেশী জুটলা না কিছু। ক্ষুধাতুর বিবেক। চাইলেন ভিক্ষা। পেলেন কি ? পেলেন মর্ম্ম দহন। তাড়িয়ে দিল লোকেরা। রুদ্ধ করে দিল দ্বার। ঘৃণা, অবহেলা, অবজ্ঞা নিয়ে ফিরে আসতে হোল তাঁকে। জীবনের 'পর ধিক্কার আসে। বিষাক্ত লাগে মন। প্রাণ যায় কোন অসীমে যেন ছুটে।

এবার মন স্থির। আর নয়। কারো দুয়ারে দয়ার দান চাইবেন না স্বামিজী। বসে পড়লেন রাজপথে। একমনে শুধু শরণ নিলেন শরণ্যের পদে।

ব্যথার দিনগুলিতে অতীতের স্মৃতিরা এসে আরো ভিড় জমিয়ে বসে। স্বামিজীর মনের ক্রান্তিবৃত্তে ছায়া পড়ে ফেলে আসা দিনগুলির। এক এক করে ভেসে ওঠে যেন চোখের সামনে—সেই নগ্ন পদ...—ছিন্ন বসন......... ছোট ছোট ভাই বোন ও মায়ের অনশন ক্লিষ্ট বিষণ্ন বদন........চাকুরীর খোঁজে অফিসে অফিসে কাতর প্রার্থনা।

আজকে দিনটার সঙ্গে যেন অদ্ভুত মিল ছিল সে দিনগুলির।

হে দয়াময়, আর নয়! এবারে মুক্ত কর পথ! শুদ্ধ কর মন! অপসৃত কর অন্ধকার। জীবনের মালিন্য মুছে জ্বালিয়ে দাও আশার দীপ শিখা!

ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যেতে চায়। কান্না আসে। ঘোর ঘনিয়ে আসে চেতনায়। আনমনা হোয়ে পড়লেন মুহূর্ত্তের জন্যে।

একটা শব্দ হোল। কিসের? দ্বার উন্মুক্তির। বেরিয়ে এলো এক অপূর্ব্ব রূপসী। দাঁড়াল স্বামিজীর পশ্চাতে। চম্‌কে গেলেন স্বামিজী। তাকালেন পিছু ফিরে। জিজ্ঞেস করল রমণী, "আপনি কি ধর্ম্ম মহাসভার একজন প্রতিনিধি?"

জড়িমা জড়িত মন। ভাবছেন স্বামিজী এ কি স্বপ্ন! বললেন স্বামিজী, "হ্যাঁ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি, পথও চিনি না।"

মহিলাটি নিয়ে এলো স্বামিজীকে অন্দরে। বলল বিশ্রাম করতে। এনে দিল খাবার। সুস্থ হোলেন স্বামিজী। মিসেস জি, ডাবলিউ হেল অন্তর দিয়ে বুঝল সন্ন্যাসীর দুঃখ। সহায় হলো স্বামিজীর। ব্যবস্থা করে দিল আহার ও বাসস্থানের। যুক্ত হোয়ে গেল বিবেকানন্দের নামটি প্রতিনিধিদের খাতায়। অবসান হোল ভাবনা চিন্তার। কালকের অজ্ঞাত, অখ্যাত, অবজ্ঞাত সন্ন্যাসী আজ পরিচিত পৃথিবীর একজন। কালকের ঘৃণিত, অবহেলিত কালো আদমি, পথের ভিক্ষুক আজ বিশ্বের জ্ঞানী গুণীদের আসরে জাগ্রত প্রতিভার দীপ্তিমান স্বাক্ষর। একেই বলে দৈব যোগ। বলে দয়ার দান ভগবানের। তাঁর খেলা বিচিত্র। ব্যথার পঙ্কে তিনি অঙ্ক ভাসিয়ে লীলা করেন। কাঁটার বৃন্তে ফুল হোয়ে তিনি ছড়ান স্নিগ্ধ লোভন গন্ধ। তাঁর দয়া পেতে হোলে, ঐ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হোয়ে পৌঁছে যেতে হবে বৃন্তে। ঐ পঙ্কে হাবুডুবু খেয়ে তার পরে অঙ্ক।

মন এবারে শান্ত। সংহত হোয়েছে চিত্ত। পৌঁছে গেছেন ভাবনার উপান্তে। এসেছেন নির্ভাবনার তীর্থে। স্মরণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্ম! কামনা করলেন আশীর্ব্বাদ। প্রতীক্ষায় রইলেন অনাগত দিনটির শুভ লগ্নের জন্যে।

সকাল।

শীতের সকাল। দিগ্‌বলয় আচ্ছন্ন কুয়াশায়।

কিন্তু তবুও তার মাঝে সূর্য্যের আভাস ঘটে—

আভাস ঘটে শুভ্র ধবল তুষার-জাল ভেদ করে।

রক্তরাঙ্গা প্রথম প্রভাতের বুকে লাগে কাঁচা সোনার আল্‌পনা। ছড়িয়ে পড়ে কনক কিরণের হাসির ছটা আদিগন্তে। মানুষের মন ভরে যায় খুশিতে। মুখর হ'য়ে ওঠে জল-জঙ্গল, পথ প্রান্তর। পাখীরা গায় গান মুগ্ধ ললিত সুরে। ওরে, জোয়ার এসেছে, জোয়ার এসেছে শতাব্দীর বুকে। নতুন প্রাণ-প্রবাহের তরঙ্গে উচ্ছল অবারিত জনস্রোত। চলেছে তারা এক পথে। চলেছে এক-মুখো অবিচ্ছিন্ন।

অন্য দিনের চেয়ে আজকে আকাশটা অনেক নির্ম্মল। বাতাসে বয়ে আনে শুভক্ষণের মাঙ্গলিক। প্রকৃতি ঋতুমতী শুচি শুদ্ধা। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই মুগ্ধ মধুর ভাব। চোখ চায় না আর ফিরতে। পলক পড়ে না যেন। শিশির-স্নাত ঘাসের বুকে ঝরা ফুলের লীলা, আর চিকাগোর কেন্দ্র-বিন্দুতে হাজারো হাজারো মানুষের নবপদ সঞ্চার। এ এক অপূর্ব্ব ক্ষণ। মুগ্ধ মধুর দিন! বিশ্ব এখানে স্তব্ধ। বাতাস এখানে শান্ত। স্থির এখানে জনতার দৃষ্টি। যুগ-জগৎ ও জীবন এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে, থম্‌কে দাঁড়িয়েছে রহস্য অবলোকনে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

সোমবার।

তারিখ?

১১ই সেপ্টেম্বর।

কালের বুকে কাহিনীর একটা আঁচড় পড়ল। সূচনা হোল নব-অধ্যায়ের।

বেলা হয়েছে। ঘড়িতে বেজেছে দশটা।

চিকাগো রূপান্তরিত হয়েছে মহামিলন তীর্থে। সে কত না লোকের জমায়েৎ! কেউ তার অজ্ঞ নয়। নয় কেউ অশিক্ষিত। সবাই দিক্‌পাল, দিগ্‌গজ। জ্ঞানী, গুণী, ধার্ম্মিক, দার্শনিক আরো কত! প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের সেরা সেরা সব লোকেরা এসেছেন। আছেন তাদের ভেতরে বৈজ্ঞানিক আর খ্যাতিমান সাহিত্যিকও। সবাই তারা বসে গেলারীতে।

শিল্প-প্রাসাদ। যেমন তার বাইরের রূপ, তেমন রূপ তার ভেতরের। নানা রংএ রঞ্জিত শিল্প-প্রাসাদ। দূর থেকে দেখলেও ভ্রম হয় না। অপূর্ব্ব সাজ-সজ্জায় সজ্জিত শিল্প-প্রাসাদ। ঐশ্বর্য্য গরবিণী চিকাগো আজকের দিনে যেন আরো সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। দিচ্ছে পলে পলে তার ধন-বিলাসের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। কেনই বা ঢেকে রাখবে তার স্বরূপকে ?

সে তো জগতের কাছে দীন বলে পরিচিত নয়। তাই তো সবার কাছে খুলে ধরেছে তার ঐশ্বর্য্যের রংঝিল। এ যে দেয়া-নেয়ার পালা।

ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম্মসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন—ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বম্বের নাগরকার।

বীরচাঁদ গান্ধী এসেছেন জৈনদের হয়ে।

থিওসোফিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে এসেছেন এনি বেসাণ্ট ও চক্রবর্ত্তী।

সিংহল থেকে এসেছেন বৌদ্ধ ধর্মপাল।

আর ?

এ ছাড়া রয়েছে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কত শত লোক। গম্‌গম করছে শিল্প-প্রাসাদ। ছ-সাত হাজার মানুষের সে এক শান্ত স্তব্ধ সম্মেলন। সর্ব্ব-ধর্ম্মের লোক এসেছেন। মিলেছেন তারা এক মোহনায়। মিলেছেন—হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও ইহুদি। মিলেছেন কন্‌ফ্যুসিও, শিন্তো, মহম্মদী ও পারসিক।

এ যেন নীল নির্ম্মল আকাশের কোল থেকে তারারা এসেছে--এসেছে মর্ত্ত্যের বুকে।

কেন ?

তন্দ্রাচ্ছন্ন বিশ্ব আত্মাকে জাগ্রত করতে। বিস্মৃত সত্তায় আনতে আবেগ মধুর মুখরতা।

যেমন নদীতে বান ডাকে। বান ডাকে সমুদ্রে।

তপ্ত ক্লিষ্ট পিপাসায় জল পায় রুক্ষ রিক্ত কুল। শীতল মধুর স্পর্শ-কাতরতায় তৃষাতুর মাটি পড়ে ঝাঁপিয়ে—

ঝাঁপিয়ে পড়ে বিরহ কাতর মন নিয়ে অনন্তের অভিসারে।

ফেনিল জলরাশি তার উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কেতে আহ্বান করে বারে-বারে, আহ্বান করে বন্ধ্যা মরু মাটিকে। নদী বেড়ে যায়।

সমুদ্র ধেয়ে চলে।

আরো একটি ঢেউ এসেছে—

এসেছে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পাড় থেকে।

আরো একটি তারা খসে পড়েছে। দীপ্তি তার কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত।

কিন্তু এমন ঢেউ—এমন তারা তো কেউ কোনদিন দেখেনি। এ যে অখ্যাত অজ্ঞাত।

তা হোক। কিন্তু সকলের দৃষ্টি কেন তাকে কেন্দ্র করে স্থির? যেন এই প্রথম—এই শেষ।

যেন এই আদি—এই অন্ত।

কে? কে তুমি?

এক তরুণ সন্ন্যাসী।

নাম?

স্বামী বিবেকানন্দ।

কেউ তাঁকে ডাকেনি। জানায়নি কেউ আমন্ত্রণ। অনাহুত এসেছেন অনাদিকালের বাণী বয়ে। কোন সম্প্রদায় থেকে নয়—সকল সম্প্রদায়ের, সকল পথের সকল মানুষের মঙ্গল গাইতে এসেছেন স্বামিজী। এসেছেন জগৎকে শোনাতে শাশ্বত সঙ্গীত। সমন্বয়ের বার্ত্তা। আর্য্য সভ্যতার পতাকা নিয়ে এসেছেন তরুণ যুবক, ত্রিশবছরের সন্ন্যাসী, এসেছেন হিন্দুভারতের উদার সার্ব্বভৌম মর্ম্মবাণী নিয়ে। জগতের বুকে জাগাবেন মন্থন। প্রতিষ্ঠা করবেন আত্মসত্যের মন্ত্র মধুর বাণীকে।

কিন্তু তা কেমন করে?

কেন?

সভাকে মুগ্ধ করবার কলা-কৌশল তো তাঁর জানা নেই। বক্তৃতা করেননি তো কোন দিন স্বামিজী। লিখেও আনেননি কিছু। তবে, তবে কেমন করে মুগ্ধ করবেন সভাকে? বিস্তার করবেন প্রভাবের যাদু?

চুপি চুপি স্মরণ করেন স্বামিজী তার ইষ্টদেবের নাম। আর?

আদ্যা আরাধ্যা সুরেশ্বরী শক্তির।

কিন্তু তবু করে দুরু দুরু বুক। শুকিয়ে আসে কণ্ঠ। বিস্ময় লাগে বিস্ফারিত চোখে, বিস্ময় লাগে অগণিত মুমুক্ষু জনতার জমায়েৎ দেখে। কৈ, এমন তো মনে হয়নি আগে। ডাগর চোখ দুটো ঘুর-পাক খায় বারে বারে। একবার দৃষ্টি যাচ্ছে সভার মধ্যমণি কার্ডিন্যাল গিবন্সের দিকে। আরবার

বিরাট বিপুল জনতার দিকে। যেন থৈ-হীন সমুদ্র। এর কুল পাওয়া দায়। সমস্ত শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিতের তড়িৎ প্রবাহ ছুটল মুহূর্ত্তে। বাত্যা বিধুনন বৈশাখী ঝড় খেলতে সুরু করল বদ্ধ বুকের তলায়। কে যেন ছুঁড়ে মারল একটি ঢিল বোবা জমাট জলে। প্রবল তরঙ্গ স্পন্দনে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে অন্তর মন। এমন সময় আহ্বান করলেন সভাপতি—

আহ্বান করলেন স্বামিজীকে।

যেন এক ঝলক খ্যাপা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বুকের মাঝে। মাথায় পড়ল বাজ। বললেন স্বামিজী,—"না, এখন নহে।"

ক্ষণিক বিরতি। একটা রূঢ় ধাক্কা দিয়ে স্তিমিত সত্তাকে জাগিয়ে দিতে চাইল মন। কিন্তু নিষ্প্রভ হয়ে আসছে অন্তরের পবিত্র দীপমালাগুলো বিষণ্ণ গোধূলির মত। ডুকরে কাঁদলেও এ অক্ষমতার গ্লানি থেকে মুক্তি মিলবে না। বিরাট মঞ্চের আলোকমালাগুলি যেন ব্যঙ্গ করছে। হাসছে যেন তারা নিঃশব্দে। প্রচণ্ড হিম রাত্রির সমস্ত তুহিন এসে যেন স্বামিজীকে আরো কাতর করে দিচ্ছে। অস্থির উন্মত্ত চিত্তটা বারে বারে ফিরিয়ে আনতে চাইছে তেজ শক্তি আপ্রাণ। ঠিক—ঠিক এমনি সময়ে আবার আহ্বান এলো—

আহ্বান এলো সভাপতির কাছ থেকে।

কিন্তু এবারেও ঐ একই প্রতীক্ষা ভিক্ষা। একই সময় সাধনা। আরো —আরো সময় চাই। সময় দিন্। না—না, "এখন নহে।"

এ কেমন ভাব! তবে কি কিছু বলবে না? ভাবছেন সভাপতি, —বুঝি সাহস পাচ্ছে না। তাই আড়ষ্ট কণ্ঠে বারে বারে বলছে, "এখন নহে।"

শেষ মুহূর্ত্ত। অপরাহ্ণ বেলা। আর সময় নেই।

কেন?

সবার বলা শেষ হয়েছে। যে যার ধর্ম্মকে বড় বলে শেষ করেছেন বক্তৃতা। সংকীর্ণ বাতায়নে বসে যে যার সম্প্রদায় বৈ আর কিছুকে বড় করে বলতে পারলেন না। দেখলেন না তারা ক্ষুদ্রের ভেতরে বৃহতের প্রতিচ্ছবি। খণ্ডের ভেতরে অখণ্ডের অন্তহীন লীলা। কেবল নিজের ঢেরা পিটিয়েই যে যার পাণ্ডিত্য জাহির করলেন।

কিন্তু প্রাণ কই? মন কই? কোথায় অনুভূতির অনুরণন? এ যে কেবল আমিত্বের ব্যাখ্যা। কই 'আমি-হীন' ভূমির কথা তো কেউ কইলে

না? কইলে না তো সেই অনাদি অনন্ত সত্যের কথাটি! বললে না তো কেউ এক বৈ আর দ্বিতীয় নেই।

ওদিকে স্বামিজীর প্রতীক্ষিত চিত্তে জেগেছে ঝড়ের সংক্ষুব্ধ গর্জ্জন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোতে ঝিম্ ধরে গিয়েছে এতক্ষণে। কর্ণরন্ধ্র যেন গিয়েছে নিরুদ্ধ হয়ে। একটা নিঃসীম রাত্রির স্তব্ধক্ষণের মত ঝির ঝির শব্দ বৈ আর কিছু ভেসে আসছে না কানে। বুঝি একে বলে স্নায়ুর আক্ষেপ। দুর্ব্বলতা। এখনই—এখনই পড়বে ডাক। দাঁড়াতে হবে গিয়ে বিবেকানন্দকে সাত হাজার মুখর জনতার সম্মুখে। কিন্তু সব যেন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে আসছে না কিছু। কেবল ভ্রম, ভ্রান্তি, অন্ধকার, ভীতি, এগুলোই থেকে থেকে হামলা করে যাচ্ছে।

আমেরিকা! চিকাগো! শিল্প-প্রাসাদ!

যেন বিভীষিকার মত মনে হচ্ছে স্বামিজীর কাছে।

আর মনে পড়ছে ভারতবর্ষ। তার সমাজ। তার সংস্কার ও মানুষের মনের ব্যাপক বিশ্বাসের কথা। ম্লেচ্ছদেশ আমেরিকা। ভারতীয় সমাজের চোখে গভীর রাতের দুঃস্বপ্নের মতই ঘোর ঘনিয়ে আনে। এদেশে এলে ভারতবাসীর জাত নাকি থাকে না। থাকে না ধর্ম্ম। লোকেরা করে নিন্দা। সমাজ দেয় তাড়িয়ে। আর ভারতবর্ষের পরিচয় কি শ্বেতকায় গর্ব্বিত জাতির কাছে? অতি হীন, অতি নীচ বলে। পরাধীন, পরপদলেহী ভারতবাসী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাদের দয়ার দানে খুড়ি কুড়িয়ে চল্‌ছে ভারতবর্ষ। বেঁচে আছে তাদের কৃপার ওপরে। তাদের শাসন শোষণের বেদীমূলে মাথা কুটে চাইছে দুদণ্ডের শান্তি, সুখ ও জীবনের নিরাপত্তা।

হায় হায়, এমন ঘন গভীর অমাদিনে পরাধীন দেশের নিঃসহায় তরুণ সন্ন্যাসী প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে আর একবার স্মরণ করলেন শ্রীগুরুর পুত-পবিত্র মূর্ত্তি।

তখন। ঠিক তখনই আবার এলো ডাক –

ডাক এলো সভাপতির কাছ থেকে।

এবারে আর না বললেন না স্বামিজী। উঠে দাঁড়ালেন। মনের মন্দিরে প্রত্যক্ষ করলেন বাগ্‌দেবীকে, আর্য্যভারতের ঋষিকুলকে। আরো আরো একজনকে দেখলেন তিনি মানস নেত্রে। করলেন অন্তরমন ঢেলে প্রণাম—

প্রণাম করলেন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে।

এগিয়ে চললেন তারপর—

এগিয়ে চললেন স্বামিজী মঞ্চের দিকে।

শ্যামল গায়ের রং। পড়েছে তাতে বিদায় বিধুর সূর্য্যের আরক্ত আভা। কালো ডাগর চোখ, যেন মায়া মাখা হরিণ চোখের মত। রক্ত রঙ্গিন ঠোঁট আরক্তিম মুখ—এ যেন প্রথম সূর্য্যের শুচি শুদ্ধ ভাব। গৈরিক বাস পরনে। মাথায় হলুদ পাগড়ি। আহা কি রূপ! কিনা মুগ্ধ ভাব!

দৃষ্টির যাদু ছড়িয়ে দিলেন জন-সমুদ্রের ওপর। সংহত করলেন চিত্ত। দাঁড়ালেন গিয়ে প্রশস্ত বক্ষ উঁচিয়ে—

দাঁড়ালেন বক্তৃতার বেদীতে।

স্থির সভার পলক। উন্মুখ মন। এমন তরুণ সন্ন্যাসী—আর কতটুকু বলবে!

শোন, শোন কি বলছেন তরুণ তাপস। প্রাণ ভরে মন দিয়ে শুনে যাও। এমন আর কেউ কোন দিন শোননি। অনেক অনেক নেয়ার আছে। অনেক গ্রহণ করার রয়েছে। দুর্লভকে সুলভে পেয়ে ভুল করো না। জীবনের সেরা ধন কুড়িয়ে নেও। শোন শোন ঐ প্রনাদ ঝঙ্কার—শোন যুগ যুগ তপস্যা লব্ধ ভারতীয় আত্মার শাশ্বত সাম্য-মৈত্রীর বাণী। বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের মধুর মুগ্ধ সম্বোধন।

—"আমার মার্কিন ভাই ও বোনেরা।"

সাত হাজার মুখর মানুষের মধ্যে যেন বজ্রপতন হোল। ওরা মুগ্ধ মনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অপলক নেত্রে তাকিয়ে করতালিতে ঝঙ্কৃত করে তুলল শিল্প-প্রাসাদ। ওরে এ যে সম্বোধনেই সম্মোহন। অগণিত জনতার আত্মায় জাগে অপূর্ব্ব প্রাণ স্পন্দন। নব তরঙ্গে শিহরিত হয়ে উঠে দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা।

অবিশ্রাম চলল করতালি একশত আশি সেকেণ্ড ধরে একটানা।

অবাক স্বামিজীও।

কেন?

ভাবছেন তিনি, তবে কি, তবে কি এরা সব ক্ষেপে গেল?

নিশ্চল স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে স্বামিজী। যেন শীত শীতল নদীর বুকে মৃদু হাওয়ার ক্ষণিক ঢেউয়ের মত বিবেকানন্দ মুহূর্ত্তে গেলেন বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে। ওরা কি তবে ব্যঙ্গ করছে? না না, তা নয় তো!

মনের ঘোর কাটল। ফিরে এলো আত্ম-বিশ্বাস। উপলব্ধি করলেন স্বামিজী—

উপলব্ধি করলেন মহাশক্তির প্রত্যক্ষ অনুভূতি। বুঝলেন তাঁর লীলা। চকিতে মন ভরে গেল আনন্দের অমিয় লহরে। গুরুর দয়া! মায়ের আশীর্ব্বাদ! আর শক্তির মিলন সহস্রারে। তা না হলে এমন হবার নয়। কিছুতেই নয়। হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার গেল খুলে। পরাণ উঠল দুলে। সুরু হোল বক্তৃতার ধারা বর্ষণ। অন্তর নিষিক্ত ধারা।

কান পেতে মন ঢেলে শুনতে লাগল সপ্ত সহস্র নরনারী—শুনতে লাগল ভারতীয় সাধনার ঐক্যতান—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব সে ক্ষণটি। কাহিনীর বুকে একটি অগ্নি আখর উঁকি দিল। আর একটি আঁচড় পড়ল কালের বুকে কাহিনীর।

সাগ্নিক সন্ন্যাসী জ্বালিয়ে দিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বুকে হোম বহ্নি। পদানত লাঞ্ছিত ভারতবর্ষ মর্য্যাদার সৌধ শিখরে উড়িয়ে দিল তার গৈরিক পতাকা। অর্দ্ধেক পৃথিবী পদানত হয়ে পড়ল স্বামিজীর মুহূর্ত্তে। দিকে দিকে জাগল শিহরণ। মন মুগ্ধ হয়ে গেল সবাকার। রুদ্ধ সভ্যতার বুকে এলো প্লাবন। স্বামিজীর প্রবল ভাব ও জ্ঞান তরঙ্গে বিধৌত করে দিল মানুষের, সমাজের, দেশের ও রাষ্ট্রের সব ক্লেদ, সব গ্লানি। আঁধার-আচ্ছন্ন লক্ষ কোটি চিত্তে রাজর্ষি জ্বেলে দিলেন জ্ঞান-প্রজ্ঞার দীপমালা।

ওরা সবাই তাকিয়ে রইল—

তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। বলে চললেন স্বামিজী। বলে চললেন—"সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ফল স্বরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা, এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা জগতে মহা উপদ্রব রাশি উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে পঙ্কিল করিয়াছে, সভ্যতার নিধন সাধন করিয়াছে······এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব সমাজ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর উন্নত হইত! কিন্তু ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে; এবং আমি সর্ব্বতোভাবে ইহাই আশা করি যে, এই ধর্ম্ম-সমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল, সেই ঘণ্টা নিনাদই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা কুতর্কাদি দ্বারা

উদ্‌ঘাটিত বহুবিধ নির্য্যাতন পরম্পরার এবং এই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্ববিধ অসদ্ভাবের সমূল নিধন সমাচার ঘোষণা করুক।"

ওরে এত হৈ-হল্লা কেন—কেনরে এত বাক-বিতণ্ডা ?

তিনি কি কারো একা ?

যে যেমন ডাকবে তার কাছে তেমন হয়ে তিনি আসবেন। তিনি যে মিলে আছেন বিশ্ব সত্বায়। ওরে, প্রেমে তার উজান খেলে। চাঁদ ঝরে করুণায়।

তার কাছে কি কোন ভেদ আছে ?

তিনি সবাকার। অণু থেকে অনীয়ান অবধি তার লীলার রেণু।

ডাক—কাঁদো, তবেই মিলবে তাঁর দেখা। ওরে, কাঁদতে জানলে কি আর কথা আছে ?

চোখের জলের আর এক নাম যে ভালোবাসা। আর সে ভালোবাসা যে পুত পবিত্র শুদ্ধ। ভেদ নেই, ভ্রান্তি নেই, নেই ক্ষেদ আর দ্বেষ।

নানা পথে হেঁটে নানামতের লড়াই করে কি হবে রে ?

একবারটি চোখ বুজে দেখতে চেষ্টা কর—

চেষ্টা কর দেখতে সেই জ্যোতিচ্ছটা। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে কর উপলব্ধি। প্রত্যক্ষ কর সেই রূপ রস ভরা-গৌরস্নিগ্ধ কান্তি। চাইবে না আর মানস চোখ বুজতে। বিশ্ব এসে দাঁড়াবে তোমার অন্তর দ্বারে। বাহ্য জগতের মত্ত মোহ—হিংসা-দ্বেষ মিলে যাবে অখণ্ড লীলায়। কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মধু মুগ্ধ-বাণী। আত্মরতির সুখ-সায়রে মগ্ন হয়ে যাবে মন। জানতে পারবে তখন—ঠিক তখনই মানব মনের মহা জিজ্ঞাসার জ্বলন্ত জবাব। বুঝবে তখন আঘাত নয়—আলিঙ্গন। হিংসা নয়—প্রেম।

অব্যক্ত আনন্দে অধীর হয়ে উঠল জনতা। মহা উল্লাসে জানাল তারা স্বামিজীকে বিপুল অভিনন্দন।

অজস্র জনতার প্রাণ-স্পন্দনে তখন কি প্রকাশ পেল ?

প্রকাশ পেল সত্যের আলো-ভাতির। অতিক্রান্ত হোল সংকীর্ণতার যুগ। ধর্ম্মে গোঁড়ামির ঠাঁই নেই। এ হোল অন্তরের একান্ত অনুভূতির বস্তু। এখানে সংশয়, সংন্দেহ আর দ্বন্দ্ব দুঃখের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বুঝল তাঁরা ধর্ম্মের অমরবাণী, শাশ্বত সত্যের অমৃতময় বাণী মানুষের চিত্ত গ্রন্থিতে গ্রথিত। সুকুমার চিত্তের সুস্থ সবল মৈত্রীর বাণীই ধর্ম্মের গুণ গান ও

কীর্ত্তন। তাই দিয়েই মাতিয়ে তুলতে হবে জগৎ। দিতে হবে সবাইকে কোল।

শেষ হোল প্রথম দিনের অধিবেশন। স্বীকার করে নিল জাগ্রত জনতা এক বাক্যে—

স্বীকার করে নিল স্বামিজীকে সে দিনকার অধিবেশনের বিজয়ী বীর বলে, শ্রেষ্ঠতম বক্তা ও আচার্য্য বলে।

'মূকং করোতি বাচালং'—হে প্রভু, তুমি বোবাকে ক'রে তোল মহা বক্তা। গিরি লঙ্ঘনের শক্তি দাও পঙ্গুকে। তোমার কৃপায় বধির নেয় তার শ্রবণ লোভন আকুতি জুড়িয়ে। ওগো কৃপাময়! তোমার কৃপা বৈ পথ চলি এমন সাধ্য কি? আর তোমার দয়া পেলে ভাবনাই বা কি?

শক্তি, মুক্তি, পরা প্রজ্ঞার দীপ জ্বালতে কি আর সময় লাগে? আমার মাঝে তোমার প্রকাশ হোলেই হোল। তবেই মধুময় হয়ে উঠবে অন্তর মন। জ্বলবে আলোর দীপমালা।

কেবল তোমায় আমায় মিলন হোক। কেবল আমার খেলার আঙ্গিনায় তোমার ঘটুক পদপাত। আর চাই না কিছু। শুধু অতটুকুন পেলেই আমি তৃপ্ত। আমি দৃপ্ত। আমার সকল চাওয়া পাওয়া হবে ধন্য।

দাও, দাও হে হৃদিময়, আমার হৃদয়-মন ভরে দাও তোমার সুরের ঝঙ্কারে। তোমার কথার কাব্যে। তোমার গানের গমকে।

আমি বিশ্ব সভায় গাইব তোমার গান। সৃজন পারে রেখে যাব তোমার কাব্য। আর মানুষের মনোলোকে জাগিয়ে দেব অপূর্ব্ব ছন্দ-সুরের গমক।

তুমি আছো, তাই তো আমি আছি। আমি তো যন্ত্র। তুমি যান্ত্রিক হয়ে না বাজালে কেমন করে বাজি? তুমি গতি নিয়ন্ত্রণ না করলে কেমন করে চলি?

দাও একবারটি তোমার দয়ার দান। দাও তোমার করুণারুণ দৃষ্টি।

১৫ই সেপ্টেম্বর।

মিলেছে ধর্ম্মসভা। জোর তর্ক চলছে প্রতিনিধিদের মধ্যে।

কেন?

যে যার ধর্ম্মের ধ্বজা উর্দ্ধে তোলবার অপচেষ্টায় মত্ত। আপন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দিতে উতলা তাদের চিত্ত। তাই তো তুমুল বিতণ্ডা। প্রলয় প্রভঞ্জন।

এক কোণে বসে আছেন স্বামিজী চুপটি করে। শুনছেন বসে। ভাবছেন কত কথা।

ওগো তুমি কণ্ঠে ভাষা দাও। আমি ওদের মুখরতাকে দেই নীরব করে।

সঞ্চারিত হোল দয়াল প্রভুর শান্ত মধুর ছন্দ—

সঞ্চারিত হোল বিবেকানন্দের চিত্তে।

এলেন এগিয়ে। বললেন বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে,—"হে ভ্রাতৃগণ,……আমি একজন হিন্দু। আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি ও ইহাকে সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী তার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছেন! মুসলমানও আপনার ক্ষুদ্র কূপে উপবিষ্ট আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ বোধ করিতেছেন।……"

ভেঙ্গে ফেল সংকীর্ণ অবরোধের গণ্ডি। বেরিয়ে যাও এ সীমানা থেকে। কি হবে নিজেকে এক কোণে রেখে বিভ্রম সৃষ্টি করে? প্রসারিত করে দাও দৃষ্টি। এমন অবারিত বিশ্ব। অন্তহীন অনন্ত। আহা! এমন মুক্ত মধুর জগৎটাকে দেখবে না? চল, এগিয়ে চল জ্ঞানের দীনতা লয়ে। তবেই বুঝবে, জানবে, দেখবে এ ক্ষুদ্র, ক্ষীণ দৃষ্টির বাইরেও একটা জগৎ আছে। আছে একটা অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড। সেখানে কেউ কাউকে করে না হিংসা। কেউ কাউকে জাহির করার মোহে ওঠে না মত্ত হয়ে। সেখানে সবাই বাধা পড়ে আছে প্রেমের বাঁধনে। প্রীতির গ্রন্থি সূত্রে।

আর তাদের ওপরে আছেন একজন। সেই অনাদি অনন্ত পুরুষকে জান। তিনিই হোলেন জগৎ নিয়ন্তা। বিশ্ব কর্ত্তা। মালিক ও পিতা। এগিয়ে যাও। জ্বালাও প্রাণের দীপ। হেটে চল দুর্গম পথের নিঃসীম অন্ধকারে। ভাসিয়ে দাও প্রেমের পারাবারে প্রীতির তরণী। ডাক তাঁকে মুক্ত শুদ্ধ কণ্ঠে। ডাক সেই মানুষের ভগবানকে। তিনি আসবেন। হাত ধরে তুলে নেবেন বুকে।

মিছে তর্ক থাক। বাক্‌যুদ্ধে পাবে না তাঁকে। তিনি তো দ্বন্দ্ব দুঃখে নেই। তিনি আসেন প্রেমের অশ্রুঝরা পথ পেরিয়ে। একবার কাঁদো। দু' ফোটা চোখের জল ঝরুক।

সকলের মুখে গেল চুন হয়ে। মাথা করল হেট। আরক্তিম হয়ে গেল লজ্জায়। শেষ হোল পঞ্চম দিনের অধিবেশন।

বিরতি।

মাত্র দু' দিনের বিরতি।

ডাক এলো আবার। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে এবারে

১৯শে সেপ্টেম্বর।

প্রতীক্ষিত জনতার ভিড় পথের দুধারে।

পাকাপাকি ভাবে পোত নির্ম্মাণ করে ফেলেছেন স্বামিজী—

পোত নির্ম্মাণ করে ফেলেছেন মানুষের অন্তর লোকে। তাই তো এত ভিড়। এতো তিতিক্ষা।

সুরু হোল সভা। একটি বিরাট বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী।

বললেন—"......মনুষ্যের আত্মা অনাদি, অমর ও পুর্ণ এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু।....ইহা ভাবিলে হৃদয় বিহ্বল হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম এই। তবে ইহার কি কোন উপায় নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে এইরূপ করুণ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণা নিধান বিশ্ব পিতার সিংহাসন সমীপে উহা পৌঁছিল এবং আশা ও সান্ত্বনাবাণীরূপে তিনি এক বেদবিৎ ঋষির হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। মহর্ষি.....জগতে এই আনন্দের সমাচার ঘোষণা করিলেন,—'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিবালোক নিবাসী ত্রিদশ মণ্ডলী, তোমরা সকলে আসিয়া শুন—আমি সেই অনাদি, পুরাতন, মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।.....তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। আর অন্য পথ নাই।'

'অমৃতের অধিকারী' এই নামটি কেমন মধুর..। হে ভ্রাতৃগণ...তোমরা অমৃতের অধিকারী! হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলিতে অস্বীকার করেন।

তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী পবিত্র পুর্ণ। তোমরা এই মর্ত্ত্য-ভুমির দেবতা। তোমরা পাপী? ইহা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। বিশুদ্ধ মানবাত্মায় ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ মাত্র।... তোমরা জরামরণ রহিত মুক্ত ও নিত্যানন্দময় আত্মা।......"

অশ্রান্ত গতিতে বলে চললেন স্বামিজী। যেন শ্রাবণধারা। একটানা অনর্গল বর্ষণ হোতে লাগল।

বললেন মূর্ত্তি-পুজা সম্বন্ধে—"কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু সংকীর্ণতা তদপেক্ষা ঘোরতর শত্রু। আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তবে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি-গণ ধর্ম্মালয় বলিয়া এক স্বতন্ত্র স্থলে কেন তাঁহার আরাধনা করিতে যান? কেন তাঁহারা ক্রুশকে এত পবিত্র বলেন? প্রার্থনার সময় কেন তাঁহারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন?

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্তদিগের ধর্ম্ম মন্দিরে এত মূর্ত্তি কেন? প্রার্থনা কালে প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ীদের হৃদয়ে এত ভাবময়ী মূর্ত্তির বিকাশ হয় কেন? হে ভ্রাতৃগণ, নিশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবন ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, চিন্তাকালে মূর্ত্তি বিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব।......মানবকে ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং দেব বিগ্রহই হউক, দেবালয়ই হউক বা ধর্ম্মশাস্ত্রই হউক, এই সমুদয় তাহার ধর্ম্মজীবনের বাল্যাবস্থার সহকারী মাত্র; এ সকল তাহার চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহে। ....হিন্দু নরনারীর মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মোন্মাদ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে স্বীয় দেহপাত করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও বিধর্ম্মী বিনাশের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন না; এবং যদিও ইহাকে তাঁহাদের দুর্ব্বলতা বল, সে দোষ হিন্দু ধর্ম্মের নয়। খ্রীষ্টিয়ানগণ ডাকিনী বলিয়া যে কত শত স্ত্রীলোককে পুড়াইয়া মারিয়াছে, তাহা কি খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ, না তাহাদের নিজেদের দোষ?

সুতরাং—

হিন্দুর পক্ষে সমস্ত ধর্ম্মজগৎটা নানা রুচি বিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সেই একমাত্র ঈশ্বর উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মই জড় ভাবাপন্ন মনুষ্যকে ব্রহ্মে পরিণত করিতে নিযুক্ত এবং সেই এক ঈশ্বরই সকল ধর্ম্মপথ প্রকাশ করিয়াছেন; তবে ধর্ম্মগুলি পরস্পর এত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কেন?

হিন্দু বলেন—ভিন্নাবস্থাপন্ন বিভিন্ন প্রকৃতি লোকের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্য দিয়া আসিতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেখাইতেছে। প্রত্যেক স্বভাবের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সকল বিভিন্নতা আবশ্যক।

কিন্তু সকলেরই অন্তস্তলে প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে সেই এক সত্য রাজত্ব করিতেছেন।.........যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করিবে, সে তদ্রূপ অনন্ত হইবে; সেই ধর্ম্মসূর্য্য কৃষ্ণভক্ত বা খ্রীষ্টভক্ত, সাধু বা অসাধু সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম হইবে না। পরন্তু সকলের সমষ্টি স্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির অনন্ত পথ মুক্ত থাকিবে; সেই ধর্ম্ম এতদূর

সর্ব্বভৌমিক হইবে যে, তাহা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে ; ····· ···।"

কিন্তু প্রতিনিধিবর্গের মন বিষিয়ে দিল স্বামিজীর অগ্নিদৃপ্ত কণ্ঠ।

জাগল ঝড়। ঈর্ষার ঝড়। তারা চাইল নবীন সন্ন্যাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে। কেন? আপন স্ত্রীর কাছে কোন্ স্বামী পরপুরুষের স্তুতি বন্দনা শুনতে চায়রে?

ওরে, জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে—তারা মানুষের ভালো দেখলে চোখ টাটিয়ে ওঠে। নিজের চাইতে বড় কাউকে দেখলে তাকে ছোট করবার অপচেষ্টায় মত্ত হয়ে যায়। তাদের যুক্তি বুদ্ধির সড়ক পেরিয়ে আর কেউ এসে যদি তাদের আজন্মের ভ্রান্ত মতকে খণ্ডন করে জ্বালাতে চায় আলোর দীপমালা, তবে প্রলয় বাধিয়ে তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও কসুর করে না। বিরুদ্ধবাদীরা লেগে গেল জোর প্রচারে। প্রচার করে দিল জনে জনে কত মিথ্যা। কত না ভ্রান্তিকে সত্য বলে। উত্তেজিত করে তুললে জনমনকে।

কি বলে?

বলল তারা—তরুণ সন্ন্যাসী কতকগুলো ভ্রান্তকথার বাহার বিন্যাস করে চলেছে, চলেছে কতগুলো মুগ্ধ মধুর যাদুজাল বিস্তার করে। হিন্দুধর্ম্মের কোথাও অমন কথা নেই। এগুলো সব কল্পনার রঙ্গিন মেঘ। সাবধান, কেউ যেন ভুল করে বসো না। কতকগুলো সূক্ষ্মতর্কের যুক্তিজালে তোমাদের দৃষ্টিকে ফেলছে ঝাপসা করে। আচ্ছন্ন হয়েছে তোমাদের মন। এ কেবল পাশ্চাত্ত্য জগতের চোখে ধুলি দেওয়ার এক নব কৌশল! কেবল কি পাশ্চাত্ত্যের লোকেরাই তাঁর পিছু লাগল?

না।

তবে আর কারা?

ওরে, জাতির ললাটে কলঙ্কের কালো আখর লিখে দিতে কুণ্ঠিত হোলনা জনৈক স্বদেশবাসী রেভারেণ্ড প্রচারক। অতি কুৎসিত মনের পরিচয় দিয়ে বললে কিনা কর্ত্তৃপক্ষকে—বললে, বের করে দিতে অশান্ত, অজ্ঞ, চরিত্রহীন বালককে সভা থেকে।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ শুনল না তাদের কথা। পেল না খুঁজে কোন অসংগতি। কোন দোষ ত্রুটি। তারা গেল মুগ্ধ হয়ে। মুগ্ধ হোল তারা হিন্দুধর্ম্মের উদার

সার্ব্বভৌম মতবাদ শুনে। এমন আত্মসত্যের বাণী আর তো কেউ শুনায়নি। এযে গহন মনের মেঘমল্লার। এ সুরে গান গাইতে পারলে জগৎপিতার চোখে আসবে কান্না। নেমে আসবেন তিনি তাঁর ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ আসন ছেড়ে ধূলির ধরায়।

তবে দ্বন্দ্ব কেন?

সকল সম্প্রদায়ের যুক্তি তর্ককে যে উপচে গেছে—

উপচে গেছে স্বামিজীর খরতরঙ্গ।

উদার, উন্মুক্ত, অবারিত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার সেতুবন্ধনের সংবাদ এনে দিয়েছেন—সংবাদ এনে দিয়েছেন স্বামিজী। এযে তাঁর বিবেকের প্রেরণা। অনুভূতির অনুরণন। এর কাছে কি যুক্তি আর আইনের ঠাঁই আছে?

ধর্ম্ম—সে তো আইনের নিগড়ে বাধা পড়ে নেই। এযে প্রেমের পয়োধি মন্থন। সবার অধিকার আছে ঈশ্বরকে ডাকবার। অধিকার আছে ধর্ম্মকে জানবার। "………ধর্ম্ম এইরূপ হইবে যে উহাতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবে এবং উহার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্যজাতিকে স্ব স্ব দেবত্ব ভাবোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।

এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম দান কর, সমস্ত জাতিই তোমার অনুবর্ত্তী হইবে। অশোকের ধর্ম্মসভা কেবল মাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্ম্ম-সভায় যদিও সকল ধর্ম্মের স্থান ছিল, কিন্তু উহা একটি ক্ষুদ্র গৃহেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'প্রত্যেক ধর্ম্মেই ঈশ্বর আছেন'—সমস্ত জগতে ইহা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই ছিল।

যিনি হিন্দুদিগের ব্রহ্ম, পারসীকদিগের অহুর মজদা, বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, মুসলমানদিগের আল্লা, ইহুদীদিগের জিহোবা, খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গস্থ পিতা, তিনিই সেই ভগবান যিনি আমাদের শক্তি দেন।"

শেষ হোল নবম দিবসের অধিবেশন। জেনে গেল ওরা শাশ্বত সত্যের বাণীটি। কিন্তু এতেই শেষ হোল না। কর্ত্তৃপক্ষ জানালে স্বামিজীকে—

জানালে প্রতিপক্ষের প্রতিবাদগুলো।

ফলে হোল কি?

স্বামিজী প্রস্তুত হোলেন।

কিসের জন্যে?

তাদের প্রতিবাদকে খণ্ডন করার জন্যে।

মাঝে ২০শে সেপ্টেম্বর আর একটি বক্তৃতা দিলেন।

কি তার বিষয়-বস্তু ?

"হে খ্রীষ্টানগণ, তোমরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতে ব্যস্ত, কিন্তু বল দেখি, অনাহারের হস্ত হইতে তাহাদের দেহ উদ্ধারের জন্য কোনরূপ যত্ন কর না কেন ? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু হে খ্রীষ্টানগণ, তোমরা সে বিষয়ে কোনই মনোযোগ কর না ! তোমরা সারা ভারতবর্ষে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু ভারতবাসীদের ধর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে আছে।........."

বিদ্রোহীর আত্মায় যায় আগুন ধরে। সিংহ বিক্রমে গর্জ্জন করে ওঠেন স্বামিজী। নিরন্ন স্বদেশ, বুভুক্ষা পীড়িত জনতার প্রাণ ফাটান চিৎকার যেন এসে আছড়ে পড়ে তাঁর বুকে। তারা অন্ন চায়। তারা কেবল দুমুঠো ভাত চায়। ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের সেখানে যেতে হবে না। যদি পার শিথিল কর শাসনের লৌহ শৃংখল। মুমূর্ষু ভাইদের মুখে দুটো অন্ন দেয়ার ব্যবস্থা কর। "......ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগকে ধর্ম্মের কথা বলা বা তাহাদিগকে দর্শন শাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।......"

এর পরেই আবার এলো ডাক—

ডাক এলো কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

কেন ?

১৯শে সেপ্টেম্বরের প্রতিবাদকে খণ্ডন করবার জন্যে।

বসেছিলেন স্বামিজীও এই সুযোগটির অপেক্ষায়। আনন্দ পেলেন মনে। চললেন সভা মঞ্চে।

২২শে সেপ্টেম্বর।

একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় মুগ্ধ করলেন সভাকে। বললেন, বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধটি খুলে।

তার পরে ২৫শে আর একটি বক্তৃতা দিতে হোল বিবেকানন্দকে।

বিষয় ?

'হিন্দুধর্ম্মের সার কথা।'

ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

কি ?

বক্তৃতা করছেন স্বামিজী—

বক্তৃতা করছেন একটানা অবিশ্রান্ত। কিন্তু একি ! হঠাৎ গেলেন থেমে। তাকালেন বহ্নি প্রজ্জলিত নয়নে সভার দিকে। নীরব, মৌন। কাটল সময় কিছুটা। তার পর ?

তার পরে জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী—

জিজ্ঞেস করলেন—কারা এ সভামধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ? হাত তুলুন।

সপ্ত সহস্র নরনারীর মধ্য থেকে হাত জাগল মাত্র তিন কি চারখানা।

বিদ্যুৎ বহ্নির চকিত তরঙ্গে স্পন্দিত হয়ে উঠল বিবেকানন্দের অন্তর।

ধুমেল আকাশের বুকে যেন উল্কাপাত হোল। বীর বিদ্রোহী শির উত্তোলন করে চিৎকার করে উঠলেন—

চিৎকার করে উঠলেন দৃপ্ত সতেজ কণ্ঠে—"তবু তোমরা আমাদিগের ধর্ম্ম সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখ !"

স্তব্ধ হয়ে গেল সভা। বিমূঢ় বিস্ময়ে ভীতি-বিহ্বল মনে রইল সবাই তাকিয়ে—তাকিয়ে রইল দৃঢ়বদ্ধ বাহুযুক্ত যোদ্ধা সন্ন্যাসীর দিকে।

ক্ষণেক বিরতি।

একটু হাসলেন শুধু—

হাসলেন স্বামিজী। তার পরে আবার সুরু হোল বক্তৃতা।

ওরে, সে যেন অনল বন্যা। অগ্নিবৃষ্টি।

ঝঞ্ঝা ব্যাকুল অন্তরের দুরন্ত প্রতিভা যেন ঠিক্‌রে বের হোতে লাগল—

ঠিক্‌রে বের হোতে লাগল বিবেকানন্দের তনু মন থেকে।

বিমুগ্ধ জনতা স্বীকার করল নতি। জানাল অভিনন্দন। ভাঙল সভা। আর একটি, মাত্র একটি বক্তৃতা—

শেষ দিনের অধিবেশন।

২৭শে সেপ্টেম্বর।

জনতার অপূর্ব্ব সম্মেলন। প্রাণ-প্রবাহের সে এক স্বত উৎসারিত ধারা।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পথের দুধারে হাজারো হাজারো জনতার প্রতীক্ষিত জমায়েৎ। ঐ—ঐ আসছেন—

নেমে আসছেন যেন স্বর্গ থেকে শুদ্ধ মুক্ত মানুষটি।

আহা কি রূপ। ওরে, চোখ তো আর চায় না যেন পলক ফেলতে।

মুহূর্ত্তে ভরে গেল শিল্প-প্রাসাদ। যেন সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। সাগরের প্লাবন।

সুরু হোল ধারা বর্ষণ,—"খৃষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খৃষ্টান হইতে হইবে না। প্রত্যেকে অপরের অধ্যাত্ম আলোক অধিগত করিবেন, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইবেন না, বিকাশের নিজস্ব মূলনীতি অনুসারে সকলে বিকাশলাভ করিবেন।......ধর্ম্ম সম্মিলন...... প্রমাণ করিয়াছে...... যে, পবিত্রতা, শুদ্ধি ও মহানুভবতা কোনো বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একার সম্পত্তি নহে; প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মরীতিই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারীর জন্ম দিয়াছে, এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ স্বপ্নেও ভাবেন যে সকল ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবে, শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বিবেচনা করি ও এই কথা বলি যে. শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্ম্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে, 'সমর নহে—সহায়তা!' 'বিনাশ নহে—বরণ!!' 'দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি' !!!"

অনাগত দিনের বুকে এঁকে দিলেন মিলিত মিছিলের পদচিহ্ন। নীল নির্ম্মল আকাশ ভালে ছুঁড়ে মারলেন একমুঠা লাল তারা। জনতার স্তিমিত, সংকীর্ণ, আচ্ছন্ন মনে এনে দিলেন মরুর পিপাসা।

পাশ্চাত্ত্যের ধূলিকণা, নদী-মেখলা ও শ্যামবিটপীকুঞ্জ থেকে উত্তুঙ্গ শিখর তীর্থ অবধি বিঘোষিত হোল ভাবীযুগের বার্ত্তা।

ভোগদৃপ্ত জাতটা দাঁড়িয়ে গেল থমকে। বুঝল তারা, জানল তারা, দেখল তারা অবজ্ঞাত পদদলিত ভারতবর্ষ এক মুঠা অন্নের কাঙ্গাল হোলেও মহাসম্পদের একচ্ছত্র সম্রাট। পেয়েছে সে অমৃতের সন্ধান। প্রত্যক্ষ করেছে মানুষের ভগবান। তাঁর কাছে যুগ জগৎ ও জীবন অতি দীন ভাবে ভিক্ষা করছে প্রেম মৈত্রী ও মোক্ষ। সেখানে বিজয়ের বাসনা নেই—আছে প্রজ্ঞার প্রশান্তি! সেখানে দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই—আছে মৈত্রীর মোহন ছবি! সেখানে ভোগের পিপাসা নেই—আছে ত্যাগের আনন্দ! সেখানে ঈর্ষার কুটিলতা নেই—আছে প্রেমের কান্না!

আকাশে, বাতাসে, গ্রাম জনপদে ঝঙ্কৃত হোতে লাগল ঋষির বেদমন্ত্র। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের অমৃত মধুর সুর! প্রদীপ্ত হয়ে উঠল অনির্ব্বাণ প্রাণ-বহ্নি, অমলিন পাবক শিখা।

দিগন্ত ভালে হয়েছে অরুণোদয়।

মেঘান্ধকার আকাশের গায় লেগেছে আলোর আল্পনা।

মসীলিপ্ত মনগুলো থেকে খসে পড়ছে কুৎসিত স্বত্তিগুলো অসহায় ক্রন্দন করে। নবপল্লবিত মঞ্জুল মাধুরী মনকে মুগ্ধ করছে থেকে থেকে।

কিন্তু কে চায় ঘুম মাখা চোখ দুটোকে টেনে তুলতে? কে চায় জাগ্রত সত্বার পরাজয়ের গ্লানি সইতে?

কিন্তু তবুও সইতে হয়। বইতে হয় আত্মগ্লানির বোঝা।

কখন?

যখন হিংসায় ফেনায়িত হয়ে ওঠে কপট মন। ঈর্ষার শিহরণ জাগে দেহের তন্ত্রীতে। আর ঘৃণায় ধিক্কার আসে আপন অন্তরে—তখনই। এর জ্বালা বড় ভীষণ। এর পীড়ন থেকে মুক্তি পায় না কেউ। অবশেষে মূঢ় মন ভগ্ন শুষ্ক কণ্ঠে শ্রেয়কে শ্রেয় বলতে শেখে। বলে ওঠে তুমিই আমার প্রেয়।

পাশ্চাত্ত্য জগতের ভ্রুকুটি-কুটিল মানুষগুলোর দশা হোল তাই। স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে ওদের ভোগী মন ফিরে তাকাল একবার অন্তরের দিকে।

কি দেখল সেখানে?

ব্যবধান। অনেক—অনেক ব্যবধান।

তাইতো সেদিন তারা তাদের অজ্ঞাতেই মুখর হয়ে উঠল স্বামিজীর স্তুতি-বন্দনায়। গোঁড়া কাগজ 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' করল ঘোষণা,—"চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বিবেকানন্দই শ্রেষ্ঠতম বিগ্রহ। তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হয়, এমন ধর্ম্মমার্গে সমুন্নত জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা।"

যে ব্রহ্মজ্ঞানী তাকে কে পারে আড়াল করে দাঁড়াতে?

তমসার পারে দাঁড়িয়ে যে দেখল আলোর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহানকে, সে যে নিজেও ব্রহ্ম হয়ে যায়রে। তার কাছে সূর্য্যের তেজ যায় নিষ্প্রভ হয়ে। চন্দ্র করে তার স্তুতি বন্দনা। তারপর তো মানুষ?

বড় হতাশ মনে তারা বলতেলাগল—"পাদ্রী ফাদ্রী পাঠান আর চলবে না।"

'দি বষ্টন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' লিখল—তাঁর প্রচারিত ভাবসমূহের মহত্বের জন্য এবং চেহারার গুণে তিনি ধর্ম্মসভার একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। যদি

তিনি শুধু মঞ্চের ওপর দিয়ে চলে যান, তবে করতালিধ্বনি হতে থাকে।"

তা হবে না কেন?

মেঘলা দিন। আকাশ ভালে মেঘের কত ঘটা। আলো আর পেরে উঠছে না যেন তার তরী ভাসিয়ে এপারে এসে উঠতে। এই মাটি মায়ের কোলে। কেবল ঝড়, আর জল। দিকে দিকে হায় হায় রব। যায় বুঝি রসাতলে সৃষ্টি। মানুষের চোখে জল। বুকভরা আকুল আর্ত্তি।

এমনি দিনে পুব গগনে উঁকি দিল রবি। মেঘ মলিন কালো কায়ায় পড়ল আলোর লেখা। বল তো কেমন তখন হয়?

উঠবে না কি মুখর হয়ে ত্রস্ত ভীত মানুষ? দিবে না কি করতালি মুগ্ধ মধুর ছন্দে?

স্বামিজী সেই সূর্য্য। আঁধার দিনের আলো। তাই তো এত ঘটা!

'দি ইন্টিরিয়র চিকাগো' লিখল—"ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে মহাসভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে যাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সভা মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।"

হাঁ হাঁ, ইনিই সেই পুরুষ, যিনি দেখেছেন আদির অন্তকে। মানুষের দেবতাকে। তাইতো এমন আকুলতা। এতো ব্যাকুল কান্না। তুমি এসো, তোমাকে আবার দেখি। জুড়িয়ে নেই তৃষাতুর চিত্ত।

'দি নিউইয়র্ক ক্রিটিক' লিখল,—"বক্তৃতাশক্তি তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা।... শুনিলেই বুঝা যায় অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিতেছে।"

এ তো চিরন্তনের সত্য বাক্য। মন যখন যোগযুক্ত হয়ে যায় প্রেমময়ের সঙ্গে, তখনই কথা হয় কাব্য। সুর হয় সঙ্গীত। আর শ্বাস প্রশ্বাসে শোনা যায় অপূর্ব্ব মধুর ধ্বনি। যে শোনে সে যায় মুগ্ধ হয়ে। যে দেখে সে আর চায় না চোখের পলক ফেলতে। তন্ময় হয়ে তারা তখন ভাবে একি মধু-ক্ষরণ হচ্ছে?

'দি প্রেস অব এমেরিকা' বলল,—"হিন্দুদর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, সমবেত সভাসদবর্গের অগ্রগণ্য প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি তাঁহার অভিভাষণ দ্বারা বিরাট সভাকে যেন সম্মোহিনী শক্তি বলে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রত্যেক খৃষ্টান চার্চ্চের অন্তর্গত ধর্ম্মযাজক এবং প্রচারকগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বামিজীর বাগ্মিতার বাত্যাতরঙ্গে তাহাদের বক্তব্য বিষয় সমূহ ভাসিয়া গিয়াছিল।......"

শান্ত-ছন্দ সঞ্চারিত হয়েছে ঈশ্বরের। অনুভূতির অনুরণন। প্রাণ-প্রবাহের উচ্ছল খরধারা। কে পারে তাকে রুখতে। কে পারে তার কণ্ঠ-সঙ্গীতকে ছাপিয়ে সুর তুলতে? মহাসমুদ্রে জোয়ার এলো। ভাসিয়ে নিয়ে গেল খাল, বিল, নদ-নদীর সব আবিল, আর বদ্ধ জল। দিয়ে গেল নতুন সুর। নতুন তরঙ্গ। তাই তো সবাই অবাক। অধীর মন। নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অগণিত ভাববিহ্বল মানুষ।

'মিঃ মারউইন মেরি স্নেল' লিখলেন—"আর কোন ধর্ম্মই ধর্ম্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে নাই, এবং এই ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ।"

যা সত্য, শাশ্বত, চিরন্তন তার প্রভাব চিরদিনই বিস্তৃত হয়ে চলে। সে থমকে দাঁড়ায় না। পিছু চায় না। জনে জনে—লোকে লোকে তার আমন্ত্রণ।

তাই তো জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভারেণ্ড ব্যারোজ বললেন—"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।" মহাবোধি সোসাইটীর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ধর্ম্মপাল 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজে লিখলেন—"স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি সমূহ চিকাগোর পথে পথে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে, তার নিচে লেখা 'সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ', সহস্র সহস্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পথিক এই প্রতিকৃতিগুলির প্রতি ভক্তিভরে সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছে।" মানুষ-বিবেকানন্দে আরোপ করেছে তারা দেবত্ব। তাই তো নত করে শির। জানায় প্রণতি। কামনা করে আশীষ।

এ যেন এক আনন্দমেলা মিলেছে। তাই চিকাগোর পথে পথিকের নৃত্য। কাগজের পাতায় পাতায়, মানুষের মনোলোকে যেন আলোর অপূর্ব্ব সমারোহ। নবতরঙ্গের কলধ্বনি। এমন আর হয় না। যেমন হয় না ব্রহ্ম দুই। ঠিক তেমনই বিবেক এক। মুখর জনতার অন্তর লোকে নিয়ন্তার নিত্য সঙ্গীত। আনন্দের সফেন ঢেউ। ঐ—ঐ একজনকেই কেন্দ্র করে। দেখলেও আনন্দ। আনন্দ তাঁর মধুমুগ্ধ বাণীতে। আনন্দ তাঁর চলার ছন্দে। আনন্দ তাঁর চোখের তারায়। আনন্দ তাঁর অঙ্গ কান্তিতে।

নে, নে একবারটি দেখে নে। চোখ জুড়িয়ে মন ভ'রে দেখে নে। এমন আর দেখবি না। এমন আর আসবে না।

৪৬

খ্যাতির তরণীতে পাল তুলে দিলেন বিবেকানন্দ।

সম্রাটের সম্মানে ভূষিত করে দিলে তাঁকে। আর ভাবনা কেন? পশ্চিমের মলয় হাওয়ায় একত্বের মন্ত্র গুঞ্জরণ। অজ্ঞাত সন্ন্যাসী আজ যেন বহু জন্মের পরিচিত বন্ধু। অর্থের অভাব ঘুচেছে। আদরের ক্ষুদ্র বেষ্টনী বিস্তৃত হয়েছে দিগন্তে। কেবল অনুরাগের বংশীধ্বনি। আকুল আমন্ত্রণ। ডাকে। পেতে চায় একান্ত করে। কাছে। মনে। দেহে। কিন্তু মৃণাল পত্রে তো জল লাগে না! সিক্ত করতে পারে না কেউ। তা সাগরই বল, আর বল কিনা নদী। তার সত্তা স্বতন্ত্র। পঙ্কে ফেল, সেখানেও একই ভাব। কিছুতেই যেন তার শুচিকে পারে না ক্লিন্ন করতে। ঈশ্বরের গান গাইতে গাইতে বিবেকানন্দ যে ঈশ্বরময় হয়ে গেছেন। জীব-জগতে শিব হয়ে আছেন তিনি। ভেদ কোথায় জীবে শিবে? আবরণ উন্মোচন করলেই শিব। কিন্তু মায়ার আবরণে আবৃত হয়ে আছে। ঐটুকু সরিয়ে দাও। তবেই দিন দিন মাস মাস বছর বছর তাকে সম্ভোগ করতে পারবে। ক্ষণে ক্ষণে তার প্রভায় প্রভাবিত হবে চিত্ত। কাঁদলে যদি—তবে মহামায়ার মহারাত্রিকে একটু সরিয়ে দাও।

কাঁদছে এক নারী।

কেন?

পেতে চায় স্বামিজীকে। বরণ কয়তে চায় স্বামিত্বে।

তা, কি ভাব নিয়ে এলে? ঐশ্বর্য্য? রূপ? না যৌবন?

সব-কিছু তোমাকে নিবেদন করছি। আমার যৌবন চাও? নাও। যেমন খুশী তেমন করে উপভোগ কর। কাঞ্চন? অভাব কি! যত চাও। উজাড় করে নাও আমার ভাণ্ডার। কেবল তোমাকে চাই। চাই তোমার প্রীতি-মুখরিত বাণী।

তাতেও নয়?

তবে নেও, নেও আমার রূপমদিরা। পান কর আকণ্ঠ। আমি ফুল হয়ে ফুটি। তুমি ভ্রমর হয়ে এসো। এসো আমার পাপড়ি 'পরে। কর পান মধু।

না।

কেন ?

"ভদ্রে, আমি যে সন্ন্যাসী, নিখিলের সমস্ত নারী যে আমার মা।" এসো। তুমিও এসো। মায়ের মত স্নেহ দাও। আশীষ দাও। দীক্ষিত কর আমায় মাতৃমন্ত্রে। আমি তোমাকে মা বলে ডাকি। তোমার চরণ ধূলি মেখে নেই আমার অঙ্গে।

যেন ভেঙ্গে পড়ল আকাশ খানা। নিভে গেল আশার রোসনাই। রক্ত-রাঙ্গা হয়ে উঠল মুখ।

এলো চোখে জল। তাকিয়ে রইল দুটা মায়ামাখা আয়ত আঁখি মেলে।

কিন্তু কি হবে তাতে ?

ওরে, লালায়িত করতে পারে না ওকে কাঞ্চন। কামের অলকায় ঢেউ আনতে পারে না রূপসী কামিনী। ত্যাগী চিত্তে ভোগের ছন্দ তুলতে গিয়ে হোল সুরহারা। ওরে, ওর নয়ন-বহ্নিতে যে মদন গেছে ভস্ম হয়ে। ত্যাগের তপে ভোগের সাগর গেছে শুকিয়ে। আর কেন ? এবারে ফিরে যাও, যাও ফিরে রূপ যৌবন আর অর্থের সাম্রাজ্ঞী !

* * * * * *

কাগজের প্রথম পাতায় বড় হরফে লেখা কার নাম ?

স্বামী বিবেকানন্দের।

হকারদের আর শ্বাস ফেলবার সময় নেই। তারা ছুটছে উদ্ধশ্বাসে। পাঠকের তো আর সইছে না যেন সবুর।

কত গুণকীর্ত্তন। কত প্রশংসা। যেন নন্দন কাননে থরে থরে ফুলের মত আখরগুলো হাসছে। কত গন্ধ ! কত বর্ণ ! দলে রূপে সমান। যেমন ভারতীয় সন্ন্যাসী দেখতে, তেমন বলতে। যেমন আত্ম উপলব্ধি, তেমনি তার মনোময় বিন্যাস। পড়ে আর মুগ্ধ হয়ে যায় সবাই। প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে তাকে দেখবার জন্ম। পাঠ করলেন স্বামিজীও।

পাঠ করলেন আত্মস্তুতি। কিন্তু উঠলেন আর্ত্তনাদ করে। বললেন— "আজ হতে আমি নির্জ্জনচারী সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা হারালাম।"

ওগো, এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে ? চাইনি তো আমি, চাইনি তো এমন গরিমার সৌধ শিখরে উঠতে। কেবল তোমার নাম প্রচার করতে বেরিয়েছি। বেরিয়েছি তোমার শেখান গান গাইতে। না না, আমায় তুমি এমন করে মায়ার আবরণে ঢেকো না। আমার মুক্ত বুদ্ধ মনে তুমি বিস্তার করে দাও পৃথিবী।

অবাধে ধেয়ে চলি। অবারিত দিগন্তশায়ী প্রশান্ত মলয় হওয়ার মতো আমি ছুটে যাই দেশে দেশে।

* * *

শেষ হয়ে গিয়েছে সভা। ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে ভারতীয় সন্ন্যাসীর গুণমুগ্ধ বাণী।

আমন্ত্রণ করলেন চিকাগোর এক ধনী সুধী।

খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়েছেন বিবেকানন্দ। শুয়েছেন এক সুরম্য প্রকোষ্ঠে। আহা! যেন ঐশর্য্যের নন্দন কানন! বিলাসের মোহন শয্যা। দেখে যেন চোখে ধাঁধা লাগে। চোখ যায় ঝলসে।

কিন্তু ঘুমতো আসে না!

এপাশ ওপাশ করছেন। হাই তুলছেন বারে বারে।

না, না, না—ঘুম তো আসে না!

উঠে বসলেন। তাকালেন বাইরের পৃথিবীটার দিকে একবার গহন ঘন রাত্রিকে ভেদ করে। আবার এলিয়ে দিলেন দেহখানা শয্যায়।

কই! তবু ঘুম নেই!

কেন? ঘুম কেন আসে না?

ইন্দ্রপুরীর মত অট্টালিকা। কাশ আর শনফুলের স্তবকের মত আলোর দীপালি। বিকীর্ণ হচ্ছে রজতদ্যুতি। ফেননিভ ননীকোমল শয্যা!

কিন্তু কি হবে তাতে?

মন বিষিয়ে উঠছে থেকে থেকে। ঐশর্য্যের মোহন শ্রী যেন বিভীষিকার মত করছে আত্মপ্রকাশ। সুখশয্যা কাঁটা হয়ে বিঁধছে সারা অঙ্গে। বড় ব্যথা! বড় যন্ত্রণা! ধীরে ধীরে আলোর প্রভা নিস্প্রভ হয়ে যায়। মনের আকাশে কতকগুলো বাদুড়ের পক্ষ ঝাপটের মত শব্দ হয় মুহূর্ত্তে।

তারপর? তারপর?

তারপর কতগুলো কঙ্কালের মিলিত মিছিল এসে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। চলে এসো, এসো, আমাদের মুক্ত কর!

এই সেই ভারতবাসী। ভারতবর্ষের দরিদ্র পীড়িত মানুষ। শীতে তারা কাঁপছে। ক্ষুধায় কাঁদছে ডুকরে। দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিহরণ জাগছে বুঝি। হায় হায়, ওদের চোখ ভেসে যাচ্ছে কান্নায়। ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে দেহ। পথের ধুলি আর কঙ্করের শয্যায় রক্তমুখো হয়ে গেছে এতক্ষণে সারাটা অঙ্গ।

তারা এক বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। একখানা আস্ত বসনে পারে না ঢাকতে লজ্জা। হাহাকার হতাশায় দিন কাটে। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অসহায় ক্রন্দন করেও পারছে না দু-মুঠো আহার জোগাতে।

আর এ দেশে এতো ঐশ্বর্য্য। এতো সুখভোগ—বিলাস, আড়ম্বর।

ঝিম ধরে যায় মাথায়। মন পুড়ে যায় খাক হয়ে। বেগবতী বন্যা যেন এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বক্ষ পঞ্জরের কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে। সে নদীতে উত্তাল ঢেউ। কিন্তু পথ পাচ্ছে না বেরিয়ে আসার। কি যন্ত্রণা! কি পীড়াদায়ক।

শয্যা ছেড়ে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ।

নামলেন মেজেতে।

হাঁ হাঁ, এই—এই আমার শয্যা! আমিও সেই আর্ত্ত পীড়িত মানুষের একজন। গড়াগড়ি দিতে লাগলেন ধূলিতে। বিশ্বভোলার চোখ গড়িয়ে নামল জলের ধারা। একি তবে প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ? এক একটা নিষ্ঠুর ভয়াল তরঙ্গ এসে খান খান হয়ে যাচ্ছে স্বামিজীর হৃদয় পুলিনে।

হঠাৎ সে নিরুদ্ধ শক্তি পেল পথ। কল কল্লোলে বেরিয়ে আসতে লাগল মহাসাগরের উর্ম্মি-মুখর তরঙ্গ। বললেন বিবেকানন্দ,—"হা, আমার দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার অত দুর্দ্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এত সুখভোগ! আমি এ সুখ সৌভাগ্য ও নাম যশঃ লইয়া কি করিব!"

করুণ আর্ত্তি। রাতের চোখেও যেন জল। ভিজে গেছে শ্যামলিম সবুজ প্রান্তর। ঘুম আর হোল না সে রাতে। রইল আঁখি জেগে ঠায়।

* * * *

দিন যায়। ঘুরে আসে রাত।

চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে স্বামিজীর মন্ত্র বন্দনায়।

এমনি দিনে বক্তৃতা-পরিষদ আহ্বান করল স্বামিজীকে। অনুরোধ করল যুক্তরাজ্যের নগরে নগরে তাঁর সুমহান বাণী প্রচারের জন্যে।

এ তো মন্দ সুযোগ নয়।

সাড়া দিলেন বিবেকানন্দ। ঘুরতে লাগলেন যুক্তরাষ্ট্রের নগরে, বন্দরে গ্রামে। প্রচার করতে লাগলেন মানবধর্ম্মের চিরন্তন বাণী। আগ্রহ ব্যাকুল চিত্তে এলো এগিয়ে, এগিয়ে এলো অগণিত জনতা। শুনতে লাগল আচার্য্যের মধুরবার্ত্তা। সাড়া দিল তারা বিপুল উদ্দীপনা লয়ে। অভ্যর্থনা জানাল সবাই। নিবেদন করল অন্তরের অর্ঘ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে চিকাগো, ইওয়া, দেমোয়ান, সেণ্টলুইস, মিনিয়াপলিস, বোষ্টন, কেমব্রিজ, বালটিমোর, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও আরো কত স্থানে ঘুরতে লাগলেন।

ভাবলেন—যদি ধনিক গোষ্ঠীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। কিন্তু সে আশার আলো গেল নিভে। নির্ম্মল চিত্তের আকাশে এলো ভেসে একখানা কালো মেঘ।

মন বসল বেঁকে।

কেন?

যশ আর অর্থ?

এই পেতে যাচ্ছেন বিবেকানন্দ!

এই জন্যেই আত্মগর্ব্বী জাতির কাছে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দেবেন?

ঝড় জাগল চিত্তে। দ্বন্দ্বের আলোড়নে উঠল অমৃত। স্থির মনে এলো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

কি?

মিথ্যাকে মিথ্যা বলে স্বীকার নয়—তাকে নগ্ন করে ছেড়ে দিতে হবে পথে। যাদের সঙ্গে জীবনের কোথাও মিল মেলে না, মানুষের পবিত্র অধিকারকে যারা দম্ভে পিষে আত্মগর্ব্বে শির উঁচু করে চলে পথে, যারা অবিশ্বাসের দৃঢ় কুঠার হেনে সুকুমার প্রবৃত্তির পবিত্র মনগুলোকে তুলল বিষিয়ে—তাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের বনল না। কিন্তু বক্তৃতার দল ছেড়ে তিনি এলেন না সরে। তিনি দুর্জ্জয় শক্তি নিয়ে প্রতিবাদ করলেন—প্রতিবাদ করলেন মানুষের অমানুষিকতার। তুলে ধরলেন জাগ্রত জনতার চোখে তাদেরই হিংসা-লোলুপ মনকে। মারী মড়ক ও ধ্বংসের কলঙ্ককে।

আর তুলে ধরলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রূর কুটিল হিংস্র মনোভাবকে। সেদিন ছিল বোষ্টনে বক্তৃতা।

বিষয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ।

সভা। কিন্তু কি দেখছেন স্বামিজী তাকিয়ে?

বিপ্লব-স্পন্দিত অন্তরে যেন আগুন ধরে গেল। দুলে উঠল মন। রইলেন না চুপটি করে। বিদ্রোহী বিবেকানন্দ। উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর রোষ-বহ্নির প্রতিটি স্ফুলিঙ্গ সংকীর্ণ সাম্প্রয়িকতার কারা দুর্গে ফেটে পড়ল উল্কার তেজে।

ওরে, কার কাছে লুকোচুরি ?

অন্তর দ্রষ্টার কাছে ফাঁকির হাসি ? ভক্তির ভাণ ?

একদৃষ্টিতে বুঝে নিলেন সব।

পাল্‌টে ফেললেন বক্তৃতার বিষয়-বস্তু মুহূর্ত্তে। প্রচণ্ড হয়ে আত্ম প্রকাশ করলেন বিবেকানন্দ।

কেন ?

দেখলেন তিনি অগণিত জনতার মন আচ্ছন্ন অর্থের লোলুপতায়। ভাব-বিহ্বল চোখের অন্তরালে শিকারের শ্যেন দৃষ্টি। ভণ্ডতার মন নিয়ে বসে আছে সব সৌখীন ধর্ম্মের শুচি বাস পরে।

একটা হৈ চৈ পড়ে গেল সভায়। তারা বেরিয়ে যেতে লাগল দল বেঁধে। ভণ্ডদের গলা টিপে ধরলেন স্বামিজী। ধর্ম্মের ভাণকারী খৃষ্টানদের আক্রমণ করলেন তীব্রভাবে।

ফেটে পড়ল তারাও। সৃষ্টি হোল একটা অপ্রীতির। কিন্তু কে দমে। বলতে লাগলেন স্বামিজী,—"তোমরা যতোই আস্ফালন কর, কোথায় তোমাদের খৃষ্টান ধর্ম্ম তরবারির বিনা সাহায্যে সফল হইয়াছে? তোমাদের ধর্ম্ম এমন যে, তাহা বিলাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে। আমি এখানে আসিয়া যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহা সমস্তই ভণ্ডামি মাত্র। তোমাদের এই ঐশ্বর্য্য খৃষ্ট হইতেই আসিয়াছে বটে! যাহারা খৃষ্টের নাম লয়, তাহারা অর্থ সঞ্চয় করা ছাড়া আর কিছুই করে না। তোমাদের এখানে মাথা রাখিবার মতো একখানা পাথরও খৃষ্টের কপালে জুটিবে না!······তোমরা খৃষ্টান নও! তোমরা খৃষ্টান হও।"

এই ঘৃণিত অবহেলিত করুণার উপদেশ তাঁদের মনে দিল তুফান তুলে। আক্রোশের তুষানল বহ্নিমান হয়ে উঠল মুহূর্ত্তে।

পাদ্রীরা পিছু লইল স্বামী বিবেকানন্দের।

মস্ত হল্লা।

এ যেন সাত মহলার রাজকন্যা রাজপুত্রকে সন্ধান দিয়েছে রাক্ষসদের প্রাণ-পিঞ্জরের। বিক্ষিপ্ত পাদ্রীর দল। যায় বুঝি সব প্রভাবের মঠ মিনারগুলো ভেঙ্গে। হয়ে পড়ে বুঝি প্রকাশ সৌখীন ধর্ম্মের নকল বেশ।

এখন উপায়?

যেমন করে হোক এ সন্ন্যাসীটাকে তাড়াতে হবে। দিতে হবে তার নামে রটিয়ে কুৎসা। তবে যদি তেজ পড়ে।

তাই করল ওরা। দিকে দিকে জনে জনে রটিয়ে দিল—বিবেকানন্দ ভ্রষ্ট। মিচিগানের গভর্ণরের কর্ম্মচ্যুত পরিচারিকার জাত মেরেছে। অবমাননা করেছে তার নারীত্বের—সতীত্বের।

কিন্তু যাঁর আজন্মের স্বপ্ন শিব-সুন্দরের, যাঁর সাধন বেদী রচিত হয়েছে নিকাষিত হেমদীপ্ত সত্যে, তিনি কি আর মিথ্যার অপপ্রচারে কান দেন? তাঁর পথ মুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র। তিনি জানেন কেবল সামনের ঠিকানা। তাই সমুখ পানে চলেন তিনি এগিয়ে। পিছু ফিরে কখনো তাকান না। আর ঈশ্বরই সে পথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকেন—

দাঁড়িয়ে থাকেন প্রভাতের অরুণোদয়ের মত। সব গ্লানি—সব কালিমাকে ধুয়ে মুছে স্বর্ণ প্রপাতে তাকে নিত্য সতেজ, নিত্য শুদ্ধ করে রাখেন।

সত্যাই তাই হোল।

পত্র লিখলেন গভর্ণর পত্নী। সেই মিচিগানের গভর্ণরের স্ত্রী।

কেন?

ধর্ম্মের ধ্বজাধারী ভ্রষ্ট পাদ্রীদের পশু-রটনার প্রতিবাদ করে।

কিন্তু ক্ষতি কিছু হোল বটে সমূহ।

দেখতে দেখতে একটা জোটের মহল দাঁড়িয়ে গেল। মিলল তাতে প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারি, থিওসফিষ্ট আর ব্রাহ্ম সমাজের কিছু লোক। কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কাছে নিন্দা আর স্তুতি সমান হয়েই আসে। কথাগুলো তাঁর কানে এলো বটে। বিচলিত হলেন না স্বামিজী। চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর প্রচার। আবার দেখা দিল হিন্দু প্রতিনিধিরাও তাদের ঈর্ষাতুর মন নিয়ে। শক্তি পেল, পেল সাহস খৃষ্টান মিশনারীরা। তারা ধরল অন্য পথ।

পূর্ণযৌবনা রূপবতী যুবতীকে পাঠাল স্বামিজীর কাছে—পাঠাল তাঁর সংযমের বাধন ভাঙতে। পাঠালো তাঁর দৃঢ় চরিত্রের ভিত নড়িয়ে দিতে। কিন্তু ফল হোল বিপরীত। সুন্দরী শত চেষ্টা সত্বেও ব্যর্থতার গ্লানি বই পেল না কিছু। অবশেষে ত্যাগী তাপসের চরণধূলিতে মাথা ঠুকে এলো চলে।

তবে এখন কি করা ?

ভাবছে স্বামিজীর প্রতিপক্ষ।

ছাড়ল না তারা তাদের চেষ্টা। পড়ল না ভেঙে। এবারে সুরু করল ধমকাতে। দেখাতে লাগল ভয়। যদি নিরস্ত হয়।

কিন্তু কাকে নিয়ে এত হৈ-হল্লা করছ ? দেখছ না কি তার মগ্ন মনের দুয়ারে কে দাঁড়িয়ে ? শুনছ নাকি কার বন্দনা গাইতে দু-চোখে নেমে আসে অশ্রুর ধারা ? বাঁধন যত আটবে, তোমাদের বাঁধন কিন্তু শৈথিল্যের ও অবজ্ঞার পঙ্কে ততই দিন দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসবে। হৃদয়কে পবিত্র কর। মনকে সংহত কর। সত্যকে জেনে নেও। মিছে প্রভাবের দণ্ড ধরে চললেই সম্রাটের সম্মান মেলে না। চাই অন্তর্দ্দৃষ্টি। অনুভূতি। আর ক্ষমা প্রজ্ঞা। জুড়ে দাও সাথে সাধনটুকু। আর ভাবনা নেই। তোমার বিবেক তোমাকে চালাবে। আত্মসত্যের জ্যোতিতে আলোময় হয়ে যাবে জগৎ। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

তারা তাদের অভিযান থেকে এক চুলও সরল না। যেন আরো দিন দিন বেড়ে চলল তারা।

আর কেন ? এবারে অটল নির্ভীক স্বামী বিবেকানন্দও দাঁড়ালেন জোড় পায়। না না না, জীবনের ভয় ? তা শেষ হয়ে যাই যাব। মুখে তো তারই নাম করছি। তারই গুণ গাইছি। প্রভুর যা খুশী তাই করুক। আমি থামছি না। আমি আত্মরক্ষার ভয়ে দমছি না। বললেন বিবেকানন্দ, —"………আমার অন্তর লোকের সত্যের বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব ? এই নির্ব্বোধ জগৎ আমাকে যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে গেলে আমাকে এক নিম্নস্তরের জীব বিশেষে পরিণত হইতে হইবে, তদপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়। আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা আমি নিজের ভাবেই বলব।

আমি আমার বাক্যগুলি হিন্দু ছাঁচেও ঢালিব না, খৃষ্টানী ছাঁচেও ঢালিব না

বা অন্য কোন ছাঁচেও ঢালিব না। উহাদিগকে শুধু নিজের ছাঁচে ঢালিব এই মাত্র!"

মাথাঝাড়া দিয়ে উঠতে লাগল ষড়যন্ত্রের ধূমেল বহ্নি। ভয় ও ভীতির সঞ্চার হোল স্বামিজীর অনুরাগীদের অন্তরে। তারা অনুরোধ জানাল, দিল পরামর্শ একটু সামলে চলার জন্যে। কিন্তু কাকে সামলে চলতে বলছে?

তাঁর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠে বিষণ্ণ গোধূলির মত। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়া, জীবনের ভয়ে মিথ্যার কাছে নতি, এ যে তার সুকুমার চিত্তে ব্যথার গান গেয়ে যায়।

তাই তো রণোন্মত্ত যোদ্ধার কণ্ঠে ধ্বনিত হোল—"* * * কি? সংসারের ক্রীতদাসসমূহ কি বলিতেছে, তাহা দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিব? ছিঃ! ভগ্নী, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন 'সন্ন্যাসী দেবশীর্ষ, কারণ তিনি গীর্জ্জা, ধর্ম্মমত, ঋষি, শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের কোন ধার ধারেন না। মিশনারী কিম্বা অন্য যে কেহ হউক, তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না।" পত্রখানা লিখলেন স্বামিজী এক সহৃদয় মহিলাকে।

দেবরক্ষিত জীবন, দেবপ্রিয় সন্তান, কাকে ভয় করবে? সত্যের ধ্বজা সে উড়াবে নীল আকাশে। আসুক বাঁধা, আসুক বিপদ, কিবা যায় আসে?

ভারতবর্ষেও তখন গোঁড়া হিন্দুদের প্রচার চলছিল—

প্রচার চলছিল বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে।

ওরা যা খুশী বলে বলুক। ভ্রূক্ষেপহীন অবজ্ঞার স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন স্বামিজী তাদের নিন্দাগাথা। স্তব্ধ করলেন মিথ্যাচারীদের কঠিন প্রতিঘাতে। বললেন—

'হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার
সাধুলোক্‌কো দুর্ভাব নেহি যব নিন্দে সংসার।'

দুর্জ্জয় শক্তি নিয়ে দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের মত দাঁড়ালেন স্বামিজী। বয়ে গেল ঝড়। বয়ে গেল ঝঞ্ঝা। হোল বজ্রপাত। কিন্তু সিংহবীর্য্য পুরুষ একপা টললেন না। সত্যের আলোকে উদ্‌ভাসিত অন্তর থেকে ক্ষরিত হোল প্রেমের মন্দাকিনী। এগিয়ে চললেন যুগধর্ম্মের বার্ত্তা বয়ে যুগযাত্রী।

কেউ তাঁকে গালি দিলে বিনিময়ে রক্তনেত্র সম্পাত না করে স্মরণ করেন স্বামিজী বিশ্বভোলার রূপ। বলেন কেবল—"শিব" "শিব"।

যদি কেউ রোষ ভরে ক্ষুদ্ধ হয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে, তবে একটু মিষ্টি হেসে বলেন স্বামিজী,—"ইহা তো শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী।" ওরা অবুঝ। তাই বলে কি আমাকেও ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। আমার কথা আমি বলে যাই। এক দিন ওদের ঘুম ভাঙ্গবে। তিমির রাত্রির অবসানে দেখবে সূর্য্যের স্বর্ণ প্রপাত। তখন ওরা আত্মগ্লানির মর্ম্মপীড়ায় শোধ করবে আজিকার সমস্ত দেনার দাদন।

ওরে আমার আত্মা শুদ্ধ। আমার আত্মাই সত্য। আর আত্মার প্রেরণাই তো ঈশ্বরের ঘোষণা। ভাবনা কি। প্রভু যা বলান তাইতো বলে যাই।

এদিকে হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা অবধি ভক্তি শ্রদ্ধায় বিগলিত সবাই। তারা আনন্দে আত্মহারা। তাদের গুরুজীর জয় ঘোষিত হয়েছে বিশ্বধর্ম্ম সভায়। একি কম গৌরবের।

রামনাদাধিপ রাজা ভাস্করবর্ম্মা সেতুপতি আর খেতড়ির রাজাবাহাদুর আমন্ত্রণ করলেন সভা। ডাকলেন প্রজা পাইক। কি আনন্দ! মহা আড়ম্বরে শ্রীগুরুর বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করলেন প্রকাশ্য সভায়। লিখলেন ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি। লিখলেন স্বামিজীকে।

বিবেকানন্দের জন্মভূমি কলকাতায়ও এক সভা হোল—

সভা হোল ১৮৯৪ এর ৫ই সেপ্টেম্বর। মিলল সব শিক্ষিত সমাজের লোকেরা। টাউনহল ভরে গেল লোকে। তারা আনন্দে উৎফুল্ল হোল। জানাল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে স্বামিজীকে ধন্যবাদ।

আর ভাবনা কি? স্বদেশের মুগ্ধ বাণী, দেশী ভাইদের অকুণ্ঠ সমর্থন, ওরে এর চাইতে আর মূল্যবান বস্তু কি আছে? এমন ধন পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা। আজন্ম সাধনার ফলে এ বস্তু মেলে।

১৮ই নবেম্বর নিউইয়র্ক থেকে পত্র দিলেন—

পত্র দিলেন স্বামিজী রাজাবাহাদুরের কাছে। জানালেন তার অভিনন্দনের উত্তর।

লিখলেন,—"কলিকাতা টাউনহলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব আমি পাইয়াছি। আমার জন্মভূমির অধিবাসীদের সদয় বাক্য এবং আমার সামান্য কার্য্যের সহৃদয় অনুমোদনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

"আমি ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি, কোন ব্যক্তি বা জাতি, অন্যান্য সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না।.........যে অপরকে ঘৃণা করিবে,

তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহা অলঙ্ঘনীয় বিধি।........" "আদান প্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যদি আবার উঠিতে চায়, তাহা হইলে তাহার শুভভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং বিনিময়ে অন্যে যাহা দিবে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু ; প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। আমরা সেই দিন হইতেই মরিয়াছি, যে দিন আমরা অন্যান্য জাতিকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের এই মৃত্যু কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে জগতের সকল জাতির সহিত মিলামিশা করিতে হইবে।......"

"যে অপরকে স্বাধীনতা দেবার জন্য প্রস্তুত নহে, সে কি স্বাধীনতা লাভের যোগ্য ? অনাবশ্যক হা-হুতাশ এবং বিলাপ না করিয়া আসুন আমরা দৃঢ় চিত্তে মানুষের মত কাজে লাগিয়া যাই। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে বস্তু যাহার সত্যকার প্রাপ্য, তাহা হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের অতীত মহৎ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্তর হইবে সন্দেহ নাই।"

সুদূর পাশ্চাত্ত্যে বসে তৈরী করছেন স্বামিজী স্বদেশের মরুভূমিকে। সিঞ্চন করছেন জল। পেলব দিচ্ছেন পলির। এসে তিনি বীজ বুনবেন। ফলাবেন সোনার ফসল তাই। একি কেবল চিঠি ? না।

তবে ? সুপ্ত ভারতের কানে দিচ্ছেন তিনি উত্থানের মন্ত্র। বন্ধ্যা মরুতে ছড়াচ্ছেন উর্ব্বরতার খইল। আর ভগ্ন স্তিমিত মনে জ্বালাচ্ছেন দুঃখ ভস্মের অগ্নি।

বাক্‌পতির অন্তরে নীরবতার সন্ধানী পাখনা।

এ কোন্ খেলা খেলছি। নাম যশের তোরণ দ্বারে প্রতিষ্ঠার বোঝা আগলে কি হবে?

আত্ম প্রচার?

না না না, আমায় তুমি খ্যাতির আসনে বসিয়ে দিও না।

অর্থ?

স্মরণ হোল গুরুর বাক্য। আমায় প্রলোভনে ফেলে মোহ পাশে বেঁধো না। আত্ম প্রতিষ্ঠা চাই। চাই সত্বার জাগরণ। তাই বলে তুমি আমায় অর্থের লোভে আত্মবিক্রয় করে দিতে বল? অবশেষে বক্তৃতা কোম্পানীর দাসত্ব? দাসত্ব মোচনের দুর্জয় তপ করে নিজেই দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে রইব? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

প্রভু, আমার পথ মুক্ত কর। ভেঙ্গে দাও ক্ষীণ ক্ষুদ্র মোহ মিনার। আমায় সত্যের স্তুতি পাঠ করতে দাও, দাও আমায় মানুষের মুক্তি-মন্ত্র ঘোষণা করতে। তুমি আমার সহায় হও।

আমেরিকার বক্তৃতা কোম্পানীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইলেন স্বামিজী।

ধীরে ধীরে সে বাঁধনকে দিলেন শিথিল করে। একটু মুক্তির অবারিত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মন চাইল আকাশের চিরজীবী আলোর আশ্বাস।

স্থির হয়ে গিয়েছে সিদ্ধান্ত। আর ভাবনা নেই, এবারে বন্ধন মুক্তির পালা।

১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

ডেট্রইটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে কতগুলো বক্তৃতা দিলেন, ধারবাহিক বক্তৃতা।

তার পরে চিকাগো, নিউইয়র্ক ও বোষ্টন। বলছেন ঈশ্বর প্রসঙ্গ। মানুষের ধর্ম্ম। আর হিন্দুদর্শনের কথা। কোন বাঁধা বিপত্তি নেই। অনর্গল বর্ষণ। যেন এই চরাচরের চরম ও পরম কথা।

কেটে যায় মার্চ্চ, এপ্রিল, মে ও জুন।

আমন্ত্রণ এলো গ্রীনএকর থেকে জুন থাকতে থাকতে। সাড়া দিলেন স্বামিজী। চললেন সেখানে। পথে পথে লোকের ভীড়। ওরে দেখবি চল, ভারতবর্ষের সেই সন্ন্যাসী এসেছেন। বিদেশে এসেও যেন স্বদেশবাসী। একটু

অহংকার নেই। একটু সঙ্কোচ নেই। যেমন ভাবছেন তেমন বলছেন। দেখবি? চল। পথে পথে বলাবলি করছে লোকেরা।

অপুর্ব্ব! অপুর্ব্ব বক্তৃতা, শেষ হলো গ্রীনএকর কনফারেন্সের ভাষণ। কত লোকের ভীড়। এমন মানুষকে দেখলেও পুণ্য হয় রে! ওরে আয় আয়, ভালো করে দেখ! উৎসাহী ছাত্রের দল এলো বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করতে। জানাল প্রস্তাব।

সম্মত হোলেন স্বামিজী।

সারাটা শরৎ কেটে গেল ভ্রমণে। তারপর ফিরে এলেন বাল্টীমোর ও ওয়াশিংটনে বক্তৃতা করতে। সেখান থেকে নিউইয়র্কে ফিরে এলেন স্বামিজী।

এখানে একটি পারিবারিক সভার আয়োজন হোল। ব্রুকলীন নৈতিক সভার সভাপতি পণ্ডিত লুইস, জি, জেমস্ মুগ্ধ হলেন স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে। ডাকলেন আর একটি সভা। অনুরোধ করলেন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বলতে।

তাতে আর আপত্তি কি!

'পউচ ম্যানসন' ভবনে বক্তৃতা দিলেন বিবেকানন্দ। ভেঙ্গে পড়ল সহস্র সহস্র জনতার অবিচ্ছিন্ন জমায়েৎ। বাক্‌পটুর বাক্‌ব্রহ্মে তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গেল যেন।

বেদান্ত প্রচারের ভিত গাড়লেন এখানেই প্রথম বলা চলে। এখান থেকে আর তিনি ভ্রাম্যমাণ বক্তা হয়ে দেশে বিদেশে যাননি। বেদান্ত ও যোগ শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপন করলেন স্বামিজী নিউইয়র্কে। বক্তৃতা কোম্পানী ত্যাগ করে ক্ষতি কিছু হোল বটে। অর্থের ক্ষতি। কিন্তু তবু মন চাইলে না আর সেদিকে চলতে। তাদের প্রভাব থেকে মুক্তির নিশ্বাস ছাড়লেন বিবেকানন্দ। এ যেন এক সঙ্কট সমুদ্র থেকে উত্তরণ। আজ যেন তিনি একটি নিশ্চিত পরিধির সুস্থ মানুষ। ঘোষণা করে দিলেন স্বামিজী।

ঘোষণা করে দিলেন নিউইয়র্কের আকাশে বাতাসে। কি? বিনামূল্যেই তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করা যায়। মন চাইলে বেদান্ত কেন্দ্রে আসুন।

ব্রুকলিন থেকে চলে এলো স্বামিজীর গুণমুগ্ধ ভক্তরা। এলো গ্রীনএকর থেকেও।

তারা যোগ দিল বেদান্ত আলোচনায়। নতুন প্রতিষ্ঠানটি ভরে যেতে লাগল দিন দিন। ১৮৯৫ এর ফেব্রুয়ারী থেকে কাজ সুরু হোল। নির্ব্বাচিত

ছাত্র। শিক্ষা দিতে লাগলেন রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের রীতিপদ্ধতি। এ হোল অন্তরসংযমের অমোঘ যোগ। মানসিক ও দৈহিক সংযম।

কি হয় এ যোগ শিখলে?

মনের শক্তি যায় বেড়ে। দেহ হয়ে পড়ে মনের দাস, জীবনে আসে সংহত-ভাব। মন মুগ্ধ হয়ে যায় আত্মানন্দে। কেবল এক বাণী এক ধ্বনি ধ্বনিত হোতে থাকে তখন। আত্মার ধ্বনি, কানে আসে আত্মার আকুতি। আত্মার প্রেরণা।

আর জ্ঞানযোগ?

বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও পরিশুদ্ধ। বিশ্বনিয়ম আর আত্মার মাঝে রচনা করে দেয় সেতু। বাস্তবে আর আত্মায় ঘটে কোলাকুলি। ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় নিত্যকার কর্ম্ম প্রবাহের সঙ্গে অমর আত্মার বিশুদ্ধতা। মানুষ স্খলন থেকে বেঁচে যায়। পতনের আবর্ত্তে পড়েও দেখে মুক্তির শুদ্ধ মুক্ত পথ। এ জানা থাকলে আর ভয় কি সংসারে? চিত্ত বাস্তবেও মধুর স্বাদ করে আস্বাদন। আর যোগযুক্ত আত্মার সঙ্গেও করতে পারে লীলা খেলা। এতো মহাসম্পদ বৈ আর কিছু নয়!

যেমন শীতের সকালের অরুণিত সূর্য্য। আচ্ছন্ন কুহেলি গর্ভে প্রথমে নিমজ্জিত, অদৃশ্য। ধীরে ধীরে ক্ষীণ প্রকাশ, তার পর বিন্দু বিন্দু কিরণ পাত। একি! কোথায় গেল কুজ্ঝটিকার আবরণ?

এই আবরণ ভেদ করে আলোর রাজ্যে নিয়ে যায় জ্ঞান যোগের সিদ্ধি। শত শত প্রলোভনের মোহপাশ থেকে মুক্তি এনে দেয় জ্ঞান-যোগের সাধনা। কঠিন তপ আবার জপে কোমল। জ্ঞানযোগেই মনোযোগ। আর জ্ঞানযোগেই মেলে সত্যের সঙ্গে যোগাযোগ। নাও, শিখে নাও তোমরা।

ভক্তরা এলো। অনুরাগী ভক্ত। বসল স্বামিজীর পদপ্রচ্ছায়। শুনতে লাগল মধুর উপদেশ। ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন স্বামিজী। বিষয় হোল জ্ঞানযোগ আর রাজযোগ। ক্ষুদ্র কক্ষ। কি হবে তাতে? লোকের ভীড় কি আর কমে? এ যেন আষাঢ়ের আকাশে দাদুরির সঘন সম্মেলন। ডাকে, ডাকে, শুধু ডাকে। ডাকে তারা স্বামিজীকে ভক্তি-বিনম্র অন্তরে। হাঁটু ভেঙ্গে বসিয়ে রাখে স্বামিজীকে সভার কেন্দ্রবিন্দুতে।

ধীর মন। আকুল ব্যাকুল চিত্ত। যোগশিক্ষায় মগ্ন তারা। পালন করছে ব্রহ্মচর্য্য। নিচ্ছে সাত্বিক আহার, দিন কাটছে সংযম ও তিতিক্ষার তপে।

স্বামিজীর কি তাই বলে বিশ্রাম মিলেছে? ওদের সঙ্গে তিনিও যে ছাত্রের মত যোগ ধ্যান করছেন। ফাঁকি দিয়ে জীবনে তো মহৎ কাজ হয় না। মুখে এক মনে আর বলে তো আদর্শ স্থাপন চলে না!

তাই জীবনকে প্রকাশ করলেন জন-সমক্ষে স্বামিজী।

প্রকাশ করলেন জীবন্ত বাণীর মতো। জীবনই বাণী আর জীবনই ব্রহ্ম; তাই জীবন দিয়ে শিখিয়ে দিতে হবে মানুষের কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও আদর্শ।

লোকে লোকারণ্য। ক্ষুদ্র স্থানটি রূপান্তরিত হোল মঠে। আত্মিক অনুভূতি লাভের অভীপ্সায় লোক আসতে লাগল স্রোতের মত। রাজযোগ বক্তৃতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। এ যেন কস্তুরীর সুরভিত গন্ধে পাগল হয়ে গিয়েছে সবাই। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক আর অধ্যাপক ছুটে আসে, ছুটে আসে স্বামিজীর যোগ ব্যাখ্যা শুনতে।

এমন সময় প্রকাশিত হলো স্বামিজীর 'রাজযোগ'। অল্পদিনে নিঃশেষ হয়ে গেল প্রথম সংস্করণ। একখানা পুস্তক স্বামিজীকে পরিয়ে দিল যশের রাজমুকুট। পরিয়ে দিল খ্যাতির জয়মাল্য, জগদ্বিখ্যাত মনস্তাত্তিক জেমস মুগ্ধ মনে দেখা করতে এলেন স্বামিজীর আবাসে। সে কত কথা। কত আলাপন কয়েকটা সপ্তাহে বইখানির সংস্করণ হোল তিনবার।

এলো কত প্রতিষ্ঠাবান লোক। গ্রহণ করল স্বামিজীর শিষ্যত্ব। তাঁর প্রচারের কঙ্করময় পথ হোল মুক্ত। সহায় হোল তাঁর কর্ম্ম বহুল পথে ডাঃ স্ট্যাণ্ডস-বার্গ (স্বামী কৃপানন্দ), এলো মিসেস্ অলিবুল, ডাঃ এলেন ডি, মিস্ ওয়াল্ডো, প্রফেসার ওয়েম্যান ও রাইট। আরো কত খৃষ্টান মিশনারী আকৃষ্ট হয়ে পড়ল স্বামিজীর জ্ঞান জ্যোতি দেখে। ম্যাডাম ক্যালভে, নামী গায়িকা গ্রহণ করল স্বামিজীর শিষ্যত্ব। 'ডিক্সন সোসাইটীর' সভ্যগণও গেল মুগ্ধ হোয়ে।

তারা সশ্রদ্ধ মন নিয়ে এলো হিন্দু আদর্শে জীবন রচনা করতে। সুরু হোল বেদান্তের কাজ।

কত শ্রম! কত কষ্ট! দিন দিন মাস মাস কেটে গেল বেদান্ত প্রচারে।

জীবন না হয় একটা যাবে। যাবে প্রভুর নামে কেটে। ভয় কি? তুমি তো আছো।

শিষ্য ও অনুরাগীদের বললেন এগিয়ে যেতে নির্ভীক মনে। বললেন, মহাব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করতে স্বামিজী।

আর্য সভ্যতার পতাকাবাহী আজন্ম বৈরাগী তাপস আত্মার শাশ্বত বাণী শুনিয়ে মুগ্ধ করলেন মুখর মানুষের চিত্ত। তাদের তৃষা শুষ্ক মরুমনে সিঞ্চন করলেন মন্দাকিনী ধারা। বললেন ডেকে ডেকে, ওরে, মানুষই দেবতা। মানুষই ভগবান। তার সেবা কর। তাকে লাঞ্ছনার ক্লেদপঙ্ক থেকে তুলে নাও কোলে। পীড়িত নিরন্ন জনকে জাগরণের মন্ত্র দাও। তাদের দুঃখ মোচনে জীবনকে বিলিয়ে দাও। তবেই জানতে পারবে ঈশ্বরকে। আত্মিক অনুভূতি লাভ হবে। দেবতা আসবেন হাসি মুখে। মানুষের সেবা কর। নর-নারায়ণের সেবা।

কেটে গেল দুটো বছর—

কেটে গেল নানা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনগুলোর অশ্রান্ত স্পন্দমান তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

গ্রীষ্মকাল।

ঘটল এমনি দিনে একটি ঘটনা এখানে।

'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক।' অবস্থান করছেন বিবেকানন্দ কয়েক জন প্রিয় শিষ্য নিয়ে।

অনাগত দিনের কর্ম্মপন্থার নিশ্চিত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি এখনো তিনি। মন চলছে ঝড়ের তালে তাল দিয়ে। একটা আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে যেন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে নিরুদ্ধ অন্তরের সমস্ত গ্রন্থিগুলো। সেণ্ট লরেন্স নদীর বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলো যেন এসে খান খান হয়ে যাচ্ছে স্বামিজীর চিত্ত বৃত্তে। ক্ষণে ক্ষণে মন তন্ময় হয়ে যায়, তন্ময় হয়ে যায় স্বগত ভাবাবেগে। শুনতে পান যেন দৈববাণী, আত্মার আশ্বাস।

যেমন মন ভাবে তেমন কাজ করে যাও। পবিত্র শুদ্ধ মনে তো ভ্রান্তির ছায়াপাত হয় না। ওখানটা নির্ম্মল। সুন্দর। ঠিক যেন নীল আকাশের চাঁদ ধোয়া জ্যোছনার রংএ উদ্ভাসিত।

তাই হোল। স্মরণ করলেন স্বামিজী বিবেকপতি শ্রীরামকৃষ্ণকে।

ভবিষ্যতের দিনগুলো উঠলো স্বাতীর মত উজ্জ্বল হয়ে চিত্তাকাশে।

যিশুর জীবন বাণীর মন্ত্র গুঞ্জরণ যেন ধ্বনিত হোল কোকিল কণ্ঠে। আহা, কি মিষ্টি মধুর সে কণ্ঠ। কাটল সাতটা সপ্তাহ। সাধন, তপ, জপ। আর ধ্যান, জ্ঞান, সত্য। এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় দিনগুলো মুগ্ধ মধুর হয়ে উঠল। ভারতীয় শাস্ত্র আর যিশুর জীবন সঙ্গীতে সেণ্ট লরেন্স নদী তীর পবিত্র তীর্থে হোল পরিণত। স্বাধীনতা, সংযম ও সাহস এই দিয়ে তার অনুগত শিষ্যদের জীবন কঠোর কঠিন ও কোমল মধুর করে তুললেন। দিলেন তাদের কানে মানব

বন্দনার মন্ত্র। শক্তি মুক্তির দুর্জ্জয় সাধনায় শিক্ষিত করে তুললেন তাদের। অভী মন্ত্রের প্রণাদ ঝঙ্কারে সহস্র দ্বীপোদ্যানে অঙ্কিত হোল যুগধর্ম্মের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। লেখা হয়ে রইল্ আগুন আখর।

লিখলেন স্বামিজী অভয়ানন্দকে,—"ব্যক্তিত্বই আমার লক্ষ্য। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।"

"আমি যদি আমার জীবনে একটি মাত্র ব্যক্তিকেও স্বাধীনতা লাভ করিতে সাহায্য করিতে পারি, তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।"

এলো গ্রীষ্মঋতু।

১৮৯৫ সাল।

আকুল মনে বেজে উঠল অনুরাগের বাঁশী। ডাক দিলেন স্বামিজী তাঁর প্রিয় পশ্চিমদেশীয় শিষ্যবৃন্দকে।

তোরা আয়। তোদের জন্যে প্রাণ যেন কেমন করছে! তোদের না দেখলে যে মন আর ভালো লাগছে না। কত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গেল। তোরা আমার কাছে নেই। আয়, আয়, আয়।

আর কি রইতে পারে? নীরব মনের তন্ত্রীতে বাজে ব্যাকুল সুরের আকুল কান্না।

ওরা সাড়া দিল। এলো ছুটে শ্রীগুরুর পদ-প্রচ্ছায়। প্রিয় হতে প্রিয়তম হয়ে উঠল তরুণ জে, জে, গুডুইন। উৎসর্গ করল জীবন। গুরু বই আর রইল না তার কিছু ধ্যান জ্ঞান।

ক্রমে গতি এলো মন্দ হয়ে। ছেদ এলো স্বামিজীর ভ্রমণে।

কিছু দিনের বিরতি।

এমনি সময় ডাক এলো—

ডাক এলো ইংলণ্ড থেকে। পত্র লিখেছে বেদান্তানুরাগিণী মিস্ হেনরিএটা।

কেবল কি সে একা?

বারে বারে আমন্ত্রণ আসছে মিঃ ই, টি, ষ্টার্ডির কাছ থেকেও। ঐ এক কথাই—স্বামিজী একবার ইংলণ্ডে আসুন।

মন চায় যেতে।

তা চাইবে না কেন। ভালোবাসার স্নিগ্ধ সুরভিতে মাখা মায়ার রেণু। পাগল হয়ে গিয়েছে মন। প্রস্তুত হতে লাগলেন স্বামিজী।

এমনি দিনে নিউইয়র্কের ধনকুবের এক প্রস্তাব পেশ করলেন।

চাইলেন তিনি স্বামিজীকে নিয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যেতে। আনন্দে আত্ম-হারা স্বামিজী। তা আর কথা কি! চল যাই।

বাধা দিল না প্রিয়তম শিষ্যরা। ভাবল তারা, একটু ঘুরে আসুক। সমুদ্রের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে তো ভালই।

স্থির হয়ে গেল যাত্রার দিন।

প্রচারের ভার ন্যস্ত করলেন স্বামী অভয়ানন্দ, কৃপানন্দ আর সিষ্টার হরি-দাসীর 'পর। বেদান্তের সার্ব্বভৌম উদার বাণী রেখে গেলেন তিনি আমেরিকার শিক্ষিত ও বিশুদ্ধ জনদের জন্যে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের তপস্যালব্ধ সাধন সত্য প্রতিষ্ঠা পেল—

প্রতিষ্ঠা পেল ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণপুরী—আমেরিকায়।

যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন নিউইয়র্ক থেকে ফ্রান্সের পথে।

ফ্রান্স থেকে এলেন প্যারীতে।

প্যারী। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রণী প্যারী। কি সুন্দর! মুগ্ধ হোলেন স্বামিজী। দেখলেন অধীর আগ্রহ নিয়ে তার ঐতিহাসিক স্থান-গুলো।

তার পর হোল আবার যাত্রা সুরু—

যাত্রা সুরু হোল ইংলণ্ডের পথে।

পথ। সফেন সমুদ্রের তরঙ্গ বন্দনা করে জাহাজ চলছে এগিয়ে। এগিয়ে চলেছে এক নতুন দেশে, যেখানে স্বামিজী এই প্রথম যাচ্ছেন। কেমন সে দেশ। কেমন তাদের আচার পদ্ধতি, ভাবছেন একমনে। ভাবছেন রক্ষণ-শীল ইংলণ্ড, বিশ্বসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ইংলণ্ড, আত্মগরিমায় মুখর ইংলণ্ড তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে? নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ভাইদের গোত্র ভুক্ত সন্ন্যাসীকে কি চোখে তারা দেখবে? ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি ইংলণ্ড তাকে কি তবে বিজেতার আরক্ত আঁখি সম্পাতে প্রত্যক্ষ করবে?

সমুদ্রের ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো মনের প্রান্তসীমা অবধি একটা প্রবল তরঙ্গ স্পন্দন থেকে থেকে গর্জ্জে উঠতে লাগল। ঘৃণায়, দুঃখে ও ব্যথায় মন বিষাক্ত হয়ে গেল মুহূর্ত্তে। মনের কেন্দ্র বিন্দুতে অসহায় ভারতবর্ষ ক্রমে যেন ছায়ার মত আভাসিত হোল। সেই দেশ? যারা লক্ষ কোটি সন্তানের পবিত্র অধিকার নিয়েছে ছিনিয়ে, জ্বালিয়ে দিয়েছে যারা আর্য্যভারতের বুকে ধ্বংসের

বহ্নি বন্যা, ভেঙ্গে দিয়েছে মানুষের সুখ শান্তির প্রশান্ত পরিধিকে। সেই ইংলণ্ড! সেই ঘৃণিত সাম্রাজ্য লোলুপ দেশে যাচ্ছি?

নানা চিন্তার ঝড় বয়ে গেল অবিশ্রাম গতিতে।

জাহাজ এসে পৌঁছল ইংলণ্ডে।

দ্বিধান্বিত বক্ষ। ঘৃণা-সঙ্কুচিত চিত্ত। স্বদেশাভিমানী ব্যথিত বিবেকানন্দ পদার্পণ করলেন ইংলণ্ডের মাটিতে।

সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তিনি ইংলণ্ডের ধনী থেকে দরিদ্রের সঙ্গে মিশলেন। প্রত্যক্ষীভূত হলেন শিক্ষিত থেকে অভিজাতদের চলা বলা সঙ্গে।

কি দেখলেন তিনি?

দেখলেন তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা। সংযমের কাঠিন্য। উদ্যমশীল জীবনের অধ্যবসায় ও কর্ম্মপ্রবাহ। ভাবের আবেগে তারা অন্ধ হয়ে চলে না। গুণীর জয় গান গাইতে বেসুরা হয়ে যায় না কণ্ঠ। আর নিয়মের শৃংখলকে উশৃংখলতার চাঞ্চল্যে বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। স্বামিজীর মন থেকে ভ্রান্তির অপচ্ছায়া ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে লাগল। আমেরিকার চাইতে ইংলণ্ড তাঁকে অধিক আকৃষ্ট করল।

মন আনন্দ পেল, পেল উৎসাহ।

বাত্যা ঘূর্ণীর মত ইংলণ্ডে আত্ম প্রকাশ করলেন স্বামিজী। পাশ্চাত্য তাঁকে নাম দিল 'সাইক্লোনিক হিন্দু'। জনতা ভেঙ্গে পড়ল। স্বামিজী বেদান্তের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। 'পিকাডেলী প্রিন্সেস্ হলে' হাজারো হাজারো জনতাকে মুগ্ধ করলেন স্বামিজী আত্মজ্ঞানের তত্ত্বপূর্ণ বার্ত্তা শুনিয়ে। এলো নরনারীর দল এগিয়ে—

এগিয়ে এলো স্বামিজীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে। সংবাদপত্র-গুলো প্রশংসায় উঠল মুখর হয়ে।

'দি ষ্টণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখল,—"রামমোহনের পর, একমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে বাদ দিলে, প্রিন্সেস হলে হিন্দু বক্তার মত আর কোন শক্তিশালী ভারতীয় ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই।.........বক্তৃতার মুখে তিনি আমাদের কারখানা, ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া এবং পুঁথি পুস্তকের দ্বারা মনুষ্যজাতির কতটুকু হিত হইয়াছে, বুদ্ধ এবং যীশুর বাণীর সহিত তাহার তুলনা করিয়া অতি নির্ভীক, তীব্র, তাচ্ছিল্যপূর্ণ সমালোচনা করেন। বক্তৃতাকালে

তিনি কোন স্মারকলিপি ব্যবহার করেন নাই,—তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আড়ষ্টতাহীন দ্বিধাহীন।"

লিখল 'দি লণ্ডন ডেইলি ক্রনিকাল,'—"জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অবয়বে বুদ্ধদেবের চিরপরিচিত মুখের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। আমাদের বণিক সমৃদ্ধি, আমাদের শোণিত লোলুপ যুদ্ধ, আমাদের ধর্ম্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন,—'এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের শূণ্যগর্ভ আস্ফালনপুর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হইবে না।" ………বেদান্তের ত্যাগ, বৈরাগ্যের ভিত্তির উপর দ্রুত উন্নতিশীল, আপাত মনোরম, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত না করিলে উহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, ………সাবধান আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহা যে কোন মুহূর্ত্তেই অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। এখনও যদি তোমরা সাবধান না হও, তাহা হইলে আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

বিদ্রোহীর সে বজ্রঘোষণা আজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পশ্চিমের আকাশে। বিপদের সংকেত লয়ে উদিত হয়েছে লালতারা। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ হোল না। আজ তাদের অন্তর সমুদ্রে এসেছে মন্থনের বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গ। হয়ত প্রভাবের ঝাড় লণ্ঠন গুলো ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাবে। প্রভুত্বের গর্ব্বিত উন্মাদনায় আসবে পরাজয়ের বিষণ্ণ বারতা। এতদিনের দলিত লাঞ্ছিত দেশগুলো মুক্তির পবিত্র সংকল্পে ভৈরবনাদ তুলবে। জাগবে ঝড়। প্লাবন বইবে রক্তের। আর সেই তরঙ্গ শোণিতের উষ্ণ প্রস্রবণে ভেসে ভেসে এক কালে জমাট বেঁধে যাবে তোমাদের আজন্মের স্বাধিকার।

কালের চাকাটাও আর একবার ঘুরে আসবে তার কক্ষ বৃত্তে।

মাত্র এক মাসের স্থিতি।

তা হোক। প্রভাবের যাদু জাল ছড়িয়ে পড়ল আদিগন্তে। প্রতিষ্ঠা, নাম, যশ সারাটা ইংলণ্ড জুড়ে স্বামিজীর। খুলে গেল রক্ষণশীল জাতটার দুর্গদ্বার। সম্ভ্রমের আসন হোল প্রতিষ্ঠিত—

প্রতিষ্ঠিত হোল ইংলণ্ডের প্রতিটি মানুষের চিত্তলোকে, হৃদয় মন্দিরে। বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইল, তাকিয়ে রইল তারা তাদের 'সাইক্লোনিক হিন্দুর' দিকে।

সে দৃষ্টি আরো একজনার পড়েছিল, জাগর প্রহরীর মত স্বামিজীর 'পর।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। নবেম্বর মাস। সপ্তাহের শেষ দিন। রবিবার। শীতের বিকেল। বসে আছেন বিবেকানন্দ।

কোথায়?

ওয়েষ্ট-এণ্ডের বৈঠকখানায়।

তাঁকে ঘিরে অনেক লোক। অন্তরে তাদের ভক্তির ঢেউ। যেন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের বাণী শুনবার জন্যে উদ্গ্রীব তারা সকলে। গম্ভীর মৌন বিবেকানন্দ। জ্বলছে পেছনে একটি আগুনের কুণ্ড। সন্ধ্যার অন্ধকার এলো ক্রমে গাঢ় ঘন হয়ে। নেমে এলো রাত্রি। মাঝে মাঝে বলছেন স্বামিজী, "শিব!" "শিব!"

কাটল কিছু সময়। ধরলেন স্বামিজী একটি গান।

কি গান?

একটি সংস্কৃত শ্লোকে জুড়ে দিয়েছেন সুর। অপূর্ব্ব সে সঙ্গীতের ঝংকার ওরা শুনছে বিমোহিত চিত্তে। শুনছেন মিস মার্গারেট নোবেলও।

চরিত্রের দৃঢ়তা, মননশীলতা ও সত্য-পরায়ণতায় নোবেল ইংলণ্ডের একজন নামী মহিলা। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছেন মার্গারেট। আছেন তিনিও তন্ময় হয়ে সেখানে।

এই তো প্রথম দর্শন। কিন্তু মুগ্ধ মন যেন বলছে, তুমি আমার কত-কালের পরিচিত। কত কাছের।

কিন্তু মন বললে কি হবে?

সহজে গ্রহণ করবার লোক নয় মার্গারেট।

এ যেন ঠিক ঠাকুর আর নরেন! যেমন নরেন অনেক পরীক্ষা করে তবে গুরু বলে প্রণাম করলেন রামকৃষ্ণের চরণ তলে।

মার্গারেটও তেমনি প্রথম দর্শনেই আত্মসমর্পণ না করে আত্মানুসন্ধান করে চললেন দিন দিন।

নিত্য আসেন, আসেন স্বামিজীর বক্তৃতা সভায়। শোনেন মন-প্রাণ অর্পণ করে। তাকিয়ে থাকেন এক দৃষ্টে। আবার মাঝে মাঝে ক'রে বসেন প্রতিবাদ। কিন্তু যতবার দৃঢ় মন লয়ে গিয়েছেন নোবেল প্রতিরোধের জোড়াল পাঁচিল দাঁড় করাতে, নির্ম্মম পরাজয় হয়েছে তাঁর ততবার।

অবশেষে?

অবশেষে কৃপা ভিক্ষা, প্রণাম। অনুধ্যান ও অনুসরণ।

কিন্তু কে? কে এই নোবেল মার্গারেট?

আমাদের চির পরিচিত বোন নিবেদিতা।

বলছিল একদিন ম্যাকলিয়ড,—"স্বামিজী মূর্ত্তিমান শক্তি।"

কিন্তু নোবেল বললেন কি,—নারে না। "স্বামিজী মূর্ত্তিমান স্নেহ।"

"আমি তা কখনো অনুভব করি নাই।"

"কারণ, সেরূপ তোমাকে দেখেন নাই.........।"

পুকুর ভরা জল। কেউ বলে তাকে জল। আবার কেউ বলে পানি। আবার কেউ বলে ফেল্‌লে ওয়াটার। একদল চেঁচিয়ে উঠল—না না, এর নাম জীবন।

যে যেমন ডেকে খুশী। যে যেমন দেখে খুশী তাই বলে তৃপ্তি পাচ্ছে। কেউ স্বামিজীর মধ্যে দেখল আগুন, কেউ দেখল সূর্য্য। তাই সে বলল—স্বামিজী শক্তি। আবার কেউ তাঁর মাঝে দেখল চন্দ্রের স্নেহশুভ্র কোমলতা, পলির পেলবতা। তাই সে বলল—ওগো, তুমি মূর্ত্তিমান স্নেহ।

এ যে মহাপুরুষদের লক্ষণ। আকাশের রামধনুর মতো তাঁদের বিচিত্র রং। তাই তো বহুরূপে বিরাজিত ভগবান মানুষের মনমন্দিরে।

* * * * * *

ইংলণ্ডে এসেছিলেন স্বামিজী বড় অবজ্ঞা বড় অশ্রদ্ধা নিয়ে।

কিন্তু ইংলণ্ড তাকে দিল কি?

রত্ন। দিল জীবনের ধন। মনের মত মন।

সে কি?

হ্যাঁ! ইংলণ্ডে এসে পেলেন স্বামিজী জে, জে, গুডউইনের মতো অনুরক্ত ভক্ত। পেলেন মিসেস সেভিয়ারের তুল্য অনুগামিনী।

আর?

আর পেলেম নিবেদিতার মতো অঞ্জলি।

এ যে অর্থে মেলে না রে। এ ধন বহু কষ্ট করে তবে পেতে হয়। তাই তো আমেরিকার এক শিষ্যকে লিখলেন স্বামিজী—"ইংরেজদের সম্পর্কে আমার ধারণা যা ছিল, তা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।" লিখলেন মাদ্রাজের এক শিষ্যকে,—"ইংলণ্ডে আমার কাজ সত্যই সুন্দর হইয়াছে।"

যাবার দিন এলো এগিয়ে। কিন্তু যেতে দিতে চাইছে না ইংলণ্ডের ভক্তবৃন্দ। কেমন করে তারা রইবে? গুরু বিরহে অন্তর যে পুড়ে যাবে ছাই হয়ে। কিন্তু তবু দিতে হোল যেতে।

মন করলেন বিবেকানন্দ যাত্রা করবেন আমেরিকার দিকে। আশ্বাস দিলেন ইংলণ্ডবাসীকে, আশ্বাস দিলেন স্বামিজী, আবার ফিরে আসবেন বলে।

এমনি দিনে বার বার পত্র আসতে লাগল আমেরিকা থেকে।

লিখল বোষ্টনের এক ধনাঢ্যা মহিলা, লিখল স্বামিজীকে চলে আসতে। কেবল তাই নয়। আরো লিখল। কি?

প্রচারের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে মহিলা।

প্রস্তুত হোলেন স্বামিজী!

যাত্রা করলেন আমেরিকার পথে।

কি রেখে এলেন বিবেকানন্দ?

রেখে এলেন প্রেম। ভক্তি। আর ভক্ত। বলে এলেন তাদেরে,—গঠন কর একটি সমিতি। শ্রীশ্রীভগবদ্‌গীতা আর হিন্দুশাস্ত্র আলোচনায় মন দাও। আমি আবার আসছি ফিরে।

* * * * *

এবারে আমেরিকার প্রসিদ্ধ বক্তা মিঃ রবার্ট ইংগারসোলের সঙ্গে পরিচয় হোল স্বামিজীর। দর্শন সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু তার নীতি ছিল ভোগবাদ আর সন্দেহবাদে আচ্ছন্ন। মানতেন না তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বরের কথা শুনলে করেন উপহাস।

একদিন বললেন ইংগারসোল স্বামিজীকে,—"এ জগৎটা একটা কমলা-লেবুর মত, যতদুর পারা যায় নিংড়াইয়া ইহার রস পান করা উচিত।

পরলোক বলিয়া কিছু আছে, তাহার যখন কোন নিশ্চিত প্রমাণ মেলে না, তখন ইহজীবনটাকেও একটা মিথ্যা আশায় বঞ্চনা করিয়া কোন লাভ নাই। কে জানে কবে মৃত্যু হইবে,—কাজেই যথাসাধ্য তৎপরতার সহিত জগৎকে উপভোগ করা উচিত।"

একটু একটু হাসছেন বিবেকানন্দ। শুনছেন ভোগবাদীর যুক্তি। কিন্তু রইলেন না নীরব স্বামিজী। উত্তর দিলেন তখনই। বললেন,—"কিন্তু জগৎরূপ কমলালেবুর রস বাহির করিবার প্রণালী আমি তোমার চেয়ে ভাল রকমই জানি, কাজেই তোমার চেয়ে অধিক রস পাইয়া থাকি। আমি জানি আমার মৃত্যু নাই, অতএব তোমার মত আমার ত্রাস নাই। আমার জগৎ হইতে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই; স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সম্পত্তি ইত্যাদি কোন বন্ধন নাই,—আমার নিকট জগতের সকল নরনারীই সমান ভালবাসার পাত্র, সকলেই আমার নিকট ঈশ্বর স্বরূপ। ভাব দেখি, মানুষকে ভগবান দেখিয়া আমি কত আনন্দ পাই! আমি নিরুদ্বেগে রস পান করিতেছি। তুমিও আমার প্রণালী অনুসারে এই জগৎরূপ কমলালেবুটি নিংড়াইতে আরম্ভ কর—দেখিবে, সহস্র গুণে অধিক রস পাইবে। একটি ফোটাও বাদ যাইবে না।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইংগারসোল শুনল কথাগুলো। ধীরে ধীরে তার শুষ্ক মনে সিঞ্চন হোল ভাব সমুদ্রের শীতল বারি। স্বামিজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো নাস্তিক। হৃদয় দিয়ে বুঝলো ঈশ্বর মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় এই সন্ন্যাসীর বাণী। ইংগারসোল হার মানলো।

এমন ঘটনা ঘটেছে ইংলণ্ডেও।

বললেন একদিন এক ইংরেজ পণ্ডিত,—"ভারতবর্ষে হিন্দুরা কি করিয়াছে? তাহারা এ পর্য্যন্ত একটী জাতিকে জয় করিতে পারে নাই।" গর্ব্বোন্নত শিরে বললেন বিবেকানন্দ—"পারে নাই নয়, তাহারা করে নাই! আর ইহাই হিন্দু জাতির গৌরব যে, তাহারা কখনও ভিন্ন জাতির রক্তে ধরিত্রী রঞ্জিত করে নাই।"

লালসা লোলুপ মন লয়ে তারা যায়নি পরের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে!

দেয়নি জ্বালিয়ে মানুষের সুখের ঘরে আগুন। নৃত্য করেনি তারা মানুষের রক্তে রঞ্জিত ভুমিতে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ অট্টহাস্যে।

ওরে, এ তার পরাজয় নয়। চির জয়। চিরজীবী সে।

প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে তাঁরা দেশ দেশ। ত্যাগের সাধনায় কাটিয়ে

দিয়েছে যুগ-জীবন। তোমরা বলছ হিন্দুরা কিছু করেনি ? স্তব্ধ হয়ে গেলেন পণ্ডিত। আপন অক্ষম প্রয়াসকে ধিক্কার দিতে লাগলেন বারে বারে।

এদিকে স্বামিজীর কাজ চালাচ্ছিলেন স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ আর মিস্ ওয়াল্ডো (হরিদাসী)। শত শত শ্রোতার ভক্তি ব্যাকুল মনে ওরা দিচ্ছিল প্রেমের প্লাবন এনে। কেবল নিউইয়র্কে নয়, স্থাপিত করল স্বামিজীর শিষ্যগণ দুটি প্রচার কেন্দ্র বাফোল ও ডিট্রিয়টে। এমনি দিনে এলেন বিবেকানন্দ, এলেন ৬ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কের আকুল ব্যাকুল ভক্তবৃন্দের মধ্যে। সুরু হোল আবার জোড়াল প্রচার।

এখানে দুটি কক্ষ ভাড়া করলেন স্বামিজী। সেখানে কৃপানন্দ তাঁর গুরুদেবকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

কর্ম্মযোগের সুফল ফলল। ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে চললেন স্বামিজী কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে। কর্ম্মের মধ্যে আত্মমগন আত্মা। ঈশ্বর লাভ করতে পারে কর্ম্ম দিয়েই। তাই কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিয়ে চললেন অগণিত ভক্ত ভাইদের স্বামিজী। সেই প্রশস্ত কক্ষে মিলিয়ে বসলেন স্বামিজী অধ্যয়ন কেন্দ্র। শত শত ছাত্র এসে যোগ দিল তাতে। শুনতে লাগল ভক্তি বিনম্র চিত্তে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা।

এ বক্তৃতা গুলো নিয়েই কর্ম্মযোগ পুস্তকখানা সঙ্কলিত হলো।

এর পরে রাজযোগ।

গুডউইনের অক্লান্ত শ্রম ও ঐকান্তিকতায় স্বামিজীর এ বক্তৃতা গুলো আজ জনমানসের গোচরে। সাংকেতিক লেখক গুডউইন বক্তৃতা গুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে ধরেছেন পুস্তকাকারে।

তাই তো ধন্য লোক এমন অমূল্য সম্পদ পেয়ে।

এলো খৃষ্টমাস। আমন্ত্রণলিপি পাঠাল মিসেস ওলিবুল। লিখল, অবশ্য যেতে স্বামিজীকে।

চললেন বিবেকানন্দ, চললেন বোষ্টনে। সেখান থেকে কেমব্রিজের মহিলাদের ডাকে দিলেন সাড়া। বক্তৃতা দিলেন 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ' সম্বন্ধে। ওরা বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে গেল। এমন তথ্য পুর্ণ বক্তৃতা তাঁদের জীবনে এই প্রথম। ভাবাবেগে, আনন্দের আত্মনর্ত্তনে ওরা মুগ্ধমনে পত্র লিখল, পত্র লিখল বিবেকানন্দের মাতৃদেবীর কাছে।

কেবল কি চিঠিই ?

তবে—

ভার্জিন মেরীর ক্রোড়ে শুয়ে আছেন বালক যীশু, এমন একখানা মনোরম চিত্র তার সঙ্গে দিল পাঠিয়ে, পাঠিয়ে দিল স্বামিজীর মার কাছে। বলল না কিছু স্বামিজীকে।

নীরবে গোপনে লিখল তারা। লিখল,—"জগতের কল্যাণে জননী মেরীর অবদানস্বরূপ খৃষ্টদেবের আবির্ভাবের দিন আমরা উৎসবানন্দে অতিবাহিত করিতেছি।........ আমাদের মধ্যে আপনার পুত্রকে পাইয়া আজ আপনাকে শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাইতেছি। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সেদিন 'ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তিনি আমাদের নর নারী ও শিশুদের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃপুজা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শক্তি সমুন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিবে।

আপনার এই সন্তানের মধ্যে আপনার জীবন ও কার্য্যের যে প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিয়া আপনার নিকটেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের যে নিয়ন্তা, সে দেবতার প্রকৃত আশীর্ব্বাদ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ুক; হৃদয়ে এই বাস্তব স্মৃতি লইয়া আপনার জীবন্ত আদর্শ যেন তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে, এই কথা স্মরণপুর্ব্বক আমাদের এই সামান্য নিদর্শন স্বরূপ কৃতজ্ঞতা আপনার নিকট যেন গৃহীত হয়।"

ফিরে এলেন বিবেকানন্দ বোষ্টন থেকে নিউইয়র্কে। সুরু করলেন বক্তৃতা। এক পয়সাও লাগে না। কেবল মন দিয়ে শুনে যাও। বিনামূল্যে জ্ঞান দিচ্ছেন বিবেকানন্দ।

ব্রুকলিন মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি, নিউইয়র্ক পিপলস্ চার্চ্চে অবিশ্রাম ধারায় বর্ষণ করছেন স্বামিজী। কত ভীড়। কত নর নারী, তারা তাদের তৃষিত মনের কত জিজ্ঞাসার কত প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল স্বামিজীর বক্তৃতা-গুলোর মধ্যে। সুরু হয়ে গেল সংগঠনের কাজ। যে আত্মসত্যের বাণী, যে তত্ত্ব ছিল এত দিন উপলব্ধির বস্তু, তা আজ বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে নিউইয়র্কের ভক্তবৃন্দ। বহু নরনারী তাদের নিত্যকার জীবন প্রবাহের মধ্যে কর্ম্মের রূঢ় বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করতে চাইল ঈশ্বরের বিভূতি। শিক্ষা দিলেন স্বামিজী, শিক্ষা দিলেন জ্ঞানমার্গে যোগসিদ্ধ হয়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার কৌশল।

তার পর এলো ফেব্রুয়ারী মাস।

ম্যাডিসন স্কোয়ার গর্ডেন। মস্ত একটি হল ঘর।

এখানে এলেন তিনি ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বলতে।

কি হয় এ যোগ শিখলে?

ভগবানের আসন ওঠে টলে। নেমে আসেন তিনি, নেমে আসেন প্রেমের পারাবারে পারি উজিয়ে ভক্তের প্রেম যমুনার ঘাটে। ভক্তি, কেবল ভক্তি, মুক্তি আসবে তো তবেই। ভক্তির আর একটি নাম কি জান? ভালোবাসা। স্বধু ঐটুকুইতো তিনি চান। আর কি! ওরে, তিনি তো তহশিল করতে আসেন না—আসেন না তো খাজনা আদায় করতে! প্রেমের কাঙ্গাল চায় কেবল প্রেম।

তাই তো তাঁর আর এক নাম প্রেম-ভিখারী। তাকে প্রেম দাও, ভালোবাসা দাও। দাও প্রাণ উজার করে ভক্তি। সংগে মিলিয়ে দাও বিশ্বাস। আর ভাবনা নেই। তবেই প্রেমময় খুশীর হাসি হাসবেন। আসবেন তোমার কান্না করুণ আঁখি দুটো মোছাতে। লীলা খেলা খেলতে। ওরে, জ্ঞানে জানবি তার তত্ত্ব। আর ভক্তি দিয়ে উপলব্ধি করবি তার সত্য। অনুভূতির উপলব্ধি।

সবাই তোমরা ভক্তিযোগের যোগী হয়ে ওঠো। ধ্যান মানসে সেই সত্য সুন্দরকে প্রত্যক্ষ কর।

হাজারো হাজারো লোক দাঁড়িয়ে বাইরে। শুনছে তারা যোগীর মুখে যোগের কথা। শুনছে জীবনের চরম ও পরম সত্যের বাণী।

এমনি দিনেই আবার তাঁর ডাক এলো মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি থেকে। বললেন স্বামিজী—

বললেন 'আত্মা ও ঈশ্বর' সম্বন্ধে এখানে।

ওরে, এ যেন মহা প্লাবন। পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে যে মহাশক্তির জাগরণ হয়েছে, জগৎকে শান্তিবারি সিঞ্চন করে তবে তার ক্ষান্তি। ব্রুকলিনের এথিক্যাল সোসাইটিতে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের আসরে স্বামিজী শোনালেন ভক্তি ও জ্ঞানযোগের বার্ত্তা। মুগ্ধ মনে ওরা শুনল। চাইল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দর্শনের অধ্যাপক পদে বরণ করতে।

কেবল কি তারাই?

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও পেতে চাইল বিবেকানন্দকে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পদে।

'ব্রহ্মবাদিন' কাগজে লিখলেন ব্রুকলিনের এক পণ্ডিত—"স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহা সম্প্রদায় ও মতবাদের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, উন্নতি ও পবিত্রতা বিধায়ক, দিব্যানন্দপ্রদ এবং সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক, যাহা ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেম ও অনন্ত দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।" বহু লোক পড়ল আকৃষ্ট হয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যে।

ডাক্তার ষ্ট্রীট সংসার ত্যাগের সংকল্প করে গ্রহণ করল স্বামীজির শিষ্যত্ব। স্বামিজী দিলেন তাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা। তার নাম রাখলেন যোগানন্দ।

দলে দলে লোক এলো বেদান্তের মর্ম্মবাণী শুনতে।

গ্রহণ করল শিষ্যত্ব। প্রচার করতে লাগল তারা নিজেদের "বৈদান্তিক' বলে। প্রতিষ্ঠিত হোল নিউইয়র্কে স্থায়ী বেদান্ত-কেন্দ্র। আত্মনিয়োগ করল বেদান্ত প্রচারে স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ ও যোগানন্দ।

স্বামিজীর অন্যতমা শিষ্যা সেদিনের আমেরিকার সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখিকা মিসেস্ এগ্না হুইলার উইলকক্স লিখলেন প্রসিদ্ধ কাগজ নিউইয়র্ক আমেরিকানে,'—"বার বৎসর পুর্ব্বে......একদিন সন্ধ্যা বেলায় শুনিলাম, ভারতবর্ষ হইতে বিবেকানন্দ নামে জনৈক দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক নিউইয়র্কে আসিয়াছেন।...আমি ও আমার স্বামী কৌতূহল বশতঃ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গিয়াছিলাম এবং দশ মিনিট যাইতে না যাইতেই অনুভব করিলাম, আমার সূক্ষ্ম, জীবনপ্রদ, রহস্যময় এক ভাবরাজ্যে নীত হইয়াছি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ রুদ্ধশ্বাসে বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম।"

"বক্তৃতান্তে আমরা নূতন সাহস, নূতন আশা, নবীন শক্তি ও অভিনব বিশ্বাস লইয়া জীবনের দৈনন্দিন বৈচিত্র্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

আমার স্বামী বলিলেন,—"ইহাই দর্শন শাস্ত্র, ইহাই ঈশ্বর ধারণা, আমি বহু দিন হইতে যাহা অন্বেষণ করিতেছি, ইহা সেই ধর্ম্ম।"

প্রচার চলতে লাগল জোর, বেদান্ত প্রচার।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। এপ্রিলের পনেরো দিন কেটেছে। ইংলণ্ড থেকে আবার এলো ডাক। যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে।

৪৮

পশ্চিমের মলয় সমীরে মন্ত্র গুঞ্জরণ।

সুরে তার কত আমেজ। কত না বাহার। নতুন ছন্দে নতুন সুরে গান ধরেছে তারা। হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার জেগেছে। আঁখিতে এসেছে কান্না। চলার ছন্দ হয়েছে ক্ষিপ্র।

কেন?

কে দিল রে ছড়িয়ে এই শান্তি পাঠ? কে শুনাল এমন মধুর কণ্ঠ? কোথায়? কোথায় সে সুররাজ? কোথায় সে ছন্দের যাদুকর? আহা, তাকে দেখব না! তার স্পর্শ, গন্ধ, গানকে উপলব্ধিতে ধরতে পারব না! এই তো তাদের আকুল আত্মার আকুতি।

চিঠি এলো—

এলো চিঠি স্বামিজীর কাছে।

কে লিখল রে? কার চিঠি? ভাবছেন বিবেকানন্দ।

খুলছেন চিঠিখানা ধীরে ধীরে।

ও! সেই!

সে কি?

বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত জন। বহু বারের স্মরণ ধ্যানের জন মোক্ষমূলার পত্র লিখেছেন। লিখেছেন অক্সফোর্ড থেকে ২৮শে মে। দুটি আত্মা যদি অধীর হয়ে ওঠে সুখকর মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, যদি ক্ষণেকের জন্যেও চিত্ত বিত্তহারা হয়ে ভাবে তার কথা, তবে মিলন না হয়ে যায় কোথায় রে? সে আজই হোক আর দুদিন বাদেই হোক মিলতে তার হবেই হবে।

স্বামিজীর এবারে হোল তাই।

মোক্ষমূলার তার স্মরণ ধ্যানে সজাগ হয়েছিলেন একদিন।

সে তো আজকের কথা নয়।

বহু দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মনের খাতায় সে নামটি রয়েছে এখনো লেখা। সময় এসেছে। তাই তো সুযোগ মিলেছে।

পড়েছিলেন স্বামিজী একটি প্রবন্ধ মোক্ষমূলারের—

পড়েছিলেন 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায়। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'প্রকৃত মহাত্মা'। লিখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে।

বাসনা-ব্যাকুল মন সে দিন আকুল আগ্রহে দর্শন চেয়েছিল মোক্ষমূলারের। স্মরণ হয়েছিল বারে বারে তাঁর কথা। মন করেছিলেন সে দিন স্বামিজী—দেখা একদিন হবে। দেখা করতে হবে। কথা কইতে হবে।

আজ সেদিন এসে ডাকছে—

ডাকছে স্বামিজীর দ্বারে দাঁড়িয়ে।

এসো। তোমাকে দেখতে চায়। তুমিও দেখবে। সেও তোমার জ্ঞান-সাগরে অবগাহন করবে। এসো তাপস, তোমার তপঃসিদ্ধ তনু দেখে সে মুগ্ধ মনে প্রণাম জানাবে। তোমার কাছ থেকে আহরণ করবে জীবনের সত্য। ব্রহ্মের সন্ধান জেনে নেবে তোমার দীপোজ্জ্বল দেহদীপ্তি থেকে। জেনে নেবে কর্ম্মের, মুক্তির আর ধ্যান-জ্ঞানের সার সত্যটি। এসো। এসো।

এলেন বিবেকানন্দ।

দুজনে বসেছেন মুখোমুখি। কথা কইছেন। কত কথা। বলতে বলতে বললেন স্বামিজী—বললেন কিনা কেশব সেনের কথা। ব্রাহ্ম সমাজের অমন নেতা, তার বোল গেল বদলে? আমি অবাক হয়ে রইলুম চেয়ে। আর সেই বোল বাহারের নতুন সুরের পিছু পিছু ছুটলুম। যেখানে যা পেয়েছি, যেখানে যা দেখেছি তাই পড়েছি মন দিয়ে। জ্ঞান দিয়ে। ধ্যান দিয়ে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলার নিবিষ্ট চিত্তে শুনছেন, শুনছেন স্বামিজীর কথা-গুলো। আর ভাবছেন, যদি উপাদান পাই তো উদ্যান রচনা করতে পারি। কিন্তু তা কেমন করে? কোথায় পাব? বললেন স্বামিজীকে—আমাকে উপাদান দিন্। আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্তুতি পাঠ করি। তাঁর জীবন-কাব্য রচি।

সম্মত হোলেন বিবেকানন্দ।

এ যে মহা আনন্দের সংবাদ।

রচনা করলেন মোক্ষমূলার 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'।

বিখ্যাত পুস্তক। সারা পড়ে যায়। পাশ্চাত্ত্য জগতে সৃষ্টি করে দেয় আলোড়ন। স্বামিজীর কর্ম্ম-প্রবাহ যায় আরো বেগবান হয়ে।

দুজনে কথা কইছেন—

কথা কইছেন বিবেকানন্দ আর মোক্ষমূলার।

বললেন স্বামিজী,—"শ্রীরামকৃষ্ণ আজকাল সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক উপাসিত হইতেছেন।"

"যদি এইরূপ মহা পুরুষ উপাসিত না হন, তাহা হইলে কাহার উপাসনা হইবে?" বললেন মোক্ষমূলার। আবার বললেন,—"তাঁহাকে জগতের নিকট পরিচিত করিবার জন্য আপনারা কি করিতেছেন?"

ওরে, সূর্য্যের পরিচয় দান করে সে নিজে। সাগরের সফেন তরঙ্গ ফেনায়িত হিল্লোলে চলে যায়। আমরা বলি কি? বিরাট সাগর। মলয় অনিল নিস্বনঘন তরঙ্গে আন্দোলিত করে বনানী। দোলা জাগায় জলে। আমরা বলি কিনা বায়ুর বেগ।

তাঁর পরিচয় তিনি নিজে। ঢাক পিটিয়ে কে কবে পেড়েছিল তাঁর স্বরূপ বোঝাতে?

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকাঃ
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥'

সূর্য্যের দীপ্তি তাকে প্রকাশ করতে পারে না। চন্দ্র তারাও না। ম্লান হয়ে যায় সেখানে বিদ্যুৎভাতি। অগ্নিও সেখানে প্রভাহীন।

তিনি স্বপ্রকাশানন্দ। তিনি যে নিজেই প্রকাশমান। তাই তো তাঁর আলোতে সব বিভাসিত।

তারপর মানুষ?

মানুষ তাঁকে কেমন করে প্রকাশ করবে? ওরে, তার রূপের সীমা নাই। কোন্‌টা বলি। কোন্ দিক বোঝাই। তাই তো চুপ হয়ে যেতে হয়। নির্ব্বাক মনে শুধু ভক্তি আর বিশ্বাসের অঞ্জলি নিয়ে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রকাশ তাঁর বাইরে নয়। প্রকাশ তাঁর মনে। তাই তো বুনে যাচ্ছি কর্ম্মের চষা ক্ষেতে জ্ঞানের বীজ। মেখে দিচ্ছি তাতে ভক্তির রেণু।

জ্ঞানের বীজ যখন অঙ্কুরিত হবে, পল্লবে পাতায় কলিতে কুসুমে হাসবে যখন মালীর বাগান, আসবেন তখন ভক্তির সাঁকো বেয়ে ভক্তের

ভগবান। পরিচয় হবে তখন। প্রকাশ, আভাস, আভাতি, জ্যোতি ও দ্যুতিতে তন্ময় হয়ে যাবে মালী। বুঝবে তাঁকে। বুঝবে ভগবানকে। জানবে আমার ঠাকুরকে। শ্রীরামকৃষ্ণকে। এসেছেন তিনি কার লিপি নিয়ে। কার শব্দ চয়নে হয়েছেন কবি। বুঝবে, বুঝবে, সেদিন বুঝবে। সবাই বুঝবে। বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ,—'বুঝবি বুঝবি কালে বুঝবি।' সত্যি। কালে বুঝবে আমার ঠাকুরকে।

মুগ্ধ হয়ে যান মোক্ষমূলার। তাকিয়ে থাকেন বিবেকানন্দের দিকে প্রজ্ঞাস্নিগ্ধ আঁখি মেলে।

বললেন বিবেকানন্দ তার প্রচারের কথা। জানালেন সহানুভূতি অধ্যাপক মোক্ষমূলার। কেবল সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত নন—নিজেকে প্রত্যক্ষীভূত করে নিলেন কর্ম্মের সংগে।

আবার সুধালেন স্বামিজী,—"আপনি কবে ভারতে যাইবেন? যিনি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের চিন্তাসমূহ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলেই আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইবে সন্দেহ নাই।"

পথের দুধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে লোক। শুচি শঙ্খের ধ্বনিতে বরণ করবে অতিথিকে। পরিয়ে দেবে গলায় মালা। শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম ও ভালোবাসার রেণু রঞ্জিত মালা।

বলুন "আপনি কবে ভারতে যাইবেন?"

যতক্ষণ সংগ্রাম ততক্ষণ হৈ চৈ হট্টগোল। কামানের শব্দ! বোমার কাঁপুনি। বিমানের সমারোহ। সৈনিকের চিৎকার।

কিন্তু যেই যুদ্ধ গেল থেমে?

তখন নির্ব্বাচন। লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচন। মন্ত্রী। সেনাপতি। অমাত্য। সভাসদ কত কিছু। আমন্ত্রণ। অভ্যর্থনা। পুরস্কার। সেলামী। জয়ী হয়েছেন স্বামিজী। বসেছেন একটা খ্যাতির আসনে সম্ভ্রমের সম্রাট হয়ে। এবারে চলছে তার নির্ব্বাচনী পর্ব্ব।

কিন্তু এ কেমন নির্ব্বাচন?

যেমন কর্ম্ম বিভাগ। তুমি করবে গান। আর তুমি তুলবে ফুল। ওহে, তোমার কাজ কি জান? চন্দন ঘসে দেবে। আর তুমি, হ্যাঁ তুমি তাঁর শ্রীচরণ সাজিয়ে দেবে পুষ্পে, পল্লবে, চুয়া ও চন্দনে।

মন্ত্রী না হোলে রাজা অচল। ছন্দ না হোলে কাব্য বেসুর। আবার ভক্ত না হলে ভগবান পঙ্গু।

তাই তাঁকে প্রকাশ করতে হোলে যে তোমাকে আগে প্রকাশক হতে হবে। তোমার বিকাশ হলেই তার প্রকাশ। তোমার আভাসে তাঁর আভাতি। যেমন মন্দির নির্ম্মাণ হোলে তার পরেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

এও ঠিক তাই।

ভক্তের অন্তর মন্দির। ভগবান সেই মন্দিরের অধিপতি।

ভক্তের হৃদয়টি হোল বটগাছের ছায়া বেষ্টনী।

আর সেই ছায়া বেষ্টনীই হোল ভগবানের বিশ্রামাগার।

এমনি করে বিজয়ী বীর বাড়িয়ে যাচ্ছেন তাঁর সৈন্য সংখ্যা। ডাকছেন আকুল হয়ে নব মন্ত্রে দীক্ষা নিতে। কর্ম্ম পথে শির তুলে চলতে। তাইতো মোক্ষমূলারকে অমন করে শুধালেন বিবেকানন্দ,—"আপনি কবে ভারতে যাইবেন?" এতো আর কিছু নয়? কবির শব্দ চয়ন। সৈন্যাধ্যক্ষের সৈন্য সংগ্রহ। সভাপতির সদস্য নির্ব্বাচন।

ঝড়।

বর্ষণ মন্দ্রিত দিন।

চলেছে মেঘের একচ্ছত্র আধিপত্য।

আজ যাত্রা করবেন স্বামিজী, যাত্রা করবেন ইংলণ্ড থেকে।

এ যাত্রার সূত্র ধরে ঝড় জেগেছে আরো একজনার অন্তর আকাশে।

বিষণ্ণ মন। অশ্রুসজল নয়ন। দিনটি তারও কাটছে প্রচণ্ড ঝড় ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু তাঁকে আর একবার দেখতে হবে। সেই শরণ স্বজনের তনুশ্রী দেখে এ মনমরুর উত্তাপে সিঞ্চন করতে হবে শান্তির শীতল বারি-ধারা। এ ব্যথার নির্দ্দয় রুক্ষতায় তার করুণার পাত্র থেকে চেয়ে নিতে হবে একবিন্দু শান্তির বারি। এ বিষণ্ণ গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে জ্বালিয়ে নিতে হবে ফের নিবন্ত সলতেটি। হে শরণ্য! তোমার শরণ লয়েই বের হোলেম পথে। তুমি আমায় আড়াল করে পালিয়ে যেও না কো। আমি আসছি। এই এলাম বলে।

ত্রস্ত পদক্ষেপে ছুটছেন বৃদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলার—

ছুটছেন স্বামিজীর দর্শনপ্রার্থী মোক্ষমূলার অধীর ব্যাকুল চিত্তে।

এসে পৌঁছলেন ষ্টেশনে। বর্ষণ কিন্তু যায়নি একেবারে থেমে। বায়ুর বেগ পড়েনি এখনো। মুছে যায়নি আকাশের ভাল থেকে কালো মলিন মেঘপুঞ্জ।

অবাক বিবেকানন্দ!

একি! এমন করে আসতে হয়? ঝড়ো দিন। বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। আর তার মধ্যে চলে এলেন ভিজে ভিজে?

বললেন স্বামিজী,—"আমাকে বিদায় দেয়ার জন্যে আপনি এত কষ্ট করে না এলেও পারতেন।"

দৈহিক কষ্ট? তা আর নেই। হার মেনে গেছে সে তোমার কথা ভাবতে ভাবতে। অন্তরে আমি এক সুখতীর্থের তীর্থপতি এখন। তা কেবল তোমার দর্শনে। তোমার কান্ত কোমল রূপজ্যোতির ছোঁয়া পেয়ে।

বললেন অধ্যাপক মোক্ষমূলার,—"শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য প্রত্যহ উপস্থিত হয় না।"

তাই তো এলাম ছুটে, ছুটে এলাম তোমাকে আর একবার দেখে নিতে। হোল বন্ধুত্বের সৃষ্টি। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

যাত্রা করলেন স্বামিজী।

দাঁড়িয়ে রইলেন ছলছল নয়ন মেলে মোক্ষমূলার।

মিসেস্ মূলার ও সেভিয়ার দম্পতি মনে করলেন স্বামিজীকে নিয়ে যাবেন সুইজারল্যাণ্ডে।

সম্মত হোলেন বিবেকানন্দ। যাত্রা করলেন জুলাই মাসের শেষ ভাগে। এলেন জেনেভা নগরীতে। সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ড।

হ্রদে ঘেরা পার্ব্বত্য প্রদেশ। বড় সুন্দর। বড় মনোরম! মুগ্ধ হয়ে যায় যোগিচিত্ত। ভাবলোকে জাগে সুখ স্পন্দন। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে সজাগ হয়ে ওঠে সেই গিরিগুরু হিমতীর্থ—হিমালয়। বিধুর মন প্রেমের অন্তহীনে যায় অবলুপ্ত হয়ে। হিমস্নাত শ্যাম সবুজ অঙ্গ। তার ধ্যান গম্ভীর মূরতি। আর তার রূপ রঙ্গিন ঐশ্বর্য্য। আহা কি মনোরম! কি মধুময়!

বলতে থাকেন স্বামিজী,—"আমার ইচ্ছা হয় হিমালয়ে একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশিষ্ট জীবন ধ্যান ও তপস্যায় কাটাইয়া দেই।........."

আবার বলতে লাগলেন—"সেখানে আমার ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ অবস্থান করিবে, আমি তাহাদিগকে 'কর্ম্মী'রূপে গঠন করিয়া তুলিব।...... তারা কাজ করবে। দেশে দেশে, জনে জনে অমৃতের সন্ধান এনে দেবে মিথ্যার সমাধি রচনা করে সত্যের চির উজ্জ্বল দীপ শিখায় জগৎ আলোময় করে তুলবে।

সে দিন কবে আসবে? কবে আমি একটু সমাহিত হয়ে সেই নির্জ্জন ক্রোড়ে বসব?

একি কেবল মুহূর্ত্তের স্বপ্ন-বিলাস?

না।

এ যে একাগ্র চিত্তের প্রশান্ত প্রকাশ।

বললেন শিষ্যরা,—"নিশ্চয়ই স্বামিজী! ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য এইরূপ একটি মঠ আমাদের একান্ত আবশ্যক।"

ভাবী 'মায়াবতী' মঠের বীজ বোনা হয়ে গেল। সত্যি একদিন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করল এই স্বপ্নসৌধ। কত শিষ্যের সমাগম হোল। আজো সে মঠ অমলিন আলমোড়ায়!

তার পরে আল্পস্ পর্ব্বত। এর শৃংগমালা বেষ্টন করে রেখেছে একখানা ক্ষুদ্র শ্যাম সবুজ গ্রাম। গড়ে উঠেছে সেখানে জনপদ। বাস করছেন স্বামিজী, বাস করছেন সেই নির্জ্জন গ্রামে। চারি দিকে শুভ্র ধবল তুষার শৈলী। স্তব্ধ। শান্ত। সমাহিত গ্রাম।

এমন পরিবেশ ভুলিয়ে দেয় জগৎকে। নিয়ে আসে মনকে কর্ম্ম-কোলাহল থেকে একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তি তীর্থে। সব কাজ ফেলে রেখে, সব ব্যথা ভুলে গিয়ে এখানে মন মগ্ন হয়ে যেতে একটুও অরাজী নয়। ধীরে ধীরে অন্তর্ম্মুখী হয়ে উঠলেন স্বামিজী। যেন বিস্মৃতির অতলান্তে তলিয়ে যেতে লাগল তাঁর সমস্ত বাহ্যিক রূপ। জ্ঞান, অভীপ্সা ও কর্ম্ম উদ্যম।

সংহত চিত্ত একবারে নীরব মৌন হয়ে ধ্যানাসনে বসল।

কাটল এমনি চৌদ্দটি দিন।

শ্রম ক্লান্তির কিছুটা অবসান হোল। ক্লান্ত কর্ম্মী দেহ দীপ্তি, মুখচ্ছবি এক অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এমনি দিনে আবার ডাক এলো বাইরের পৃথিবী থেকে।

চিঠি এলো। লিখেছে জার্ম্মানি থেকে। কে? কীলনগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সংস্কৃতের পণ্ডিত, পল্‌ডয়সন।

তুমি তো অন্তর্ম্মুখী হলে চলবে না! বাহির বিশ্ব তোমার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে পথ চেয়ে আছে উন্মুখ হয়ে। তুমি নীরব হলে যে জগৎ যাবে চুপ হয়ে। তুমি থেমে গেলে যে কর্ম্মমুখর বিশ্ব যাবে তমসার নিশ্চুপ নিথরে। তুমি বল, বল বীর—আমি থামব না। চলব, কেবল চলার গতিচ্ছন্দে জগতে আনব স্বাচ্ছন্দ্যের কল কল্লোল। জ্ঞান প্রজ্ঞার পাবক শিখা। শিব সত্যের মঙ্গল স্পর্শ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বলো। এখনো হয়নি তোমার বিশ্রামের ফরাস পাতা। তোমার শয়নের সুখশয্যা। তুমি যদি নিথর রাত্রি, তবে জগৎ যে অন্তহীন গহন ঘোর। তুমি যদি নীরব সান্দ্র, তবে আমরা যে নিঝুম অমানিশা। ওগো, না না এখনো নয়—হয়নি সময়। আরো এগিয়ে চল।

'ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।'

ঘুম ভাঙ্গল। সজাগ হলেন তপতীর্থের তাপস। নেমে এলেন বাস্তবতার রূঢ় ময়দানে। সাড়া দিলেন ডয়সনের ডাকে।

এখানে এসে ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা।

বসে বসে কথা কইছেন দুজনে। নানা কথা। বেদ, বেদান্ত, দর্শন ইত্যাদি। বেশ সুক্ষ্মালোচনা চলেছে। হঠাৎ ডয়সন উঠে গেলেন যেন কি কাজে। একাকী স্বামিজী বসে। অল্প বিরতি।

এলেন ফিরে খানিক বাদে অধ্যাপক। দেখছেন স্বামিজীকে পড়তে একখানা কবিতার বই। কোন দিকে খেয়াল নেই। মগ্ন মনে পড়ছেন বিবেকানন্দ। ডাকলেন ডয়সন।

সাড়া এলো না কিছু।

একটু বিস্মিত হোলেন অধ্যাপক। শেষ হয়ে গেল পড়া। তাকালেন বিবেকানন্দ। বুঝলেন তিনি, বসে আছেন ডয়সন বহু সময়। লজ্জা পেলেন স্বামিজী। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন,—"পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলাম। আপনি হয় তো অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। ক্ষমা করবেন।" কথাগুলো ভাল লাগল না ডয়সনের। ভাবলেন—এমন কি মগ্নতা, যাতে করে এত কাছের ডাক যায় না কানে? কেমন যেন একটা সন্দেহের ছায়াপাত হোল অধ্যাপকের মনে।

বুঝলেন স্বামিজী, বুঝলেন অন্তর-দ্রষ্টা অন্তরের খবর। বলতে লাগলেন কথার মধ্যে সদ্য পঠিত কবিতার ভাব, ছন্দ, ছত্র। ডয়সনের মনের মেঘ কাটল না তবুও। ভাবলেন নিশ্চয়ই এর আগে পড়া হয়ে গেছে এ বই বিবেকানন্দের।

কিন্তু না, পড়া তো এই প্রথম।

তা কেমন করে সম্ভব? বললেন ডয়সন—......"চারশত পাতার বই অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করা কেবল দুঃসাধ্য নয়—অসাধ্য।"

কিন্তু যিনি বলতে পারেন শিশির বিন্দু দেখে সমুদ্রের সংবাদ, যিনি তৃণশষ্প দেখে অবাধে বলে যান অরণ্যের আর্ত্তনাদ, তিনি কি পারবেন না মুখ দেখে মরমের সংবাদ বলতে?

নিশ্চয় পারবেন। আর পারবেন বলেই তো অমন করে মুচকি হাসি হাসছেন বিবেকানন্দ। বলতে লাগলেন হেসে হেসে,—"সংযত মন যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আমার মত ক্ষমতা সকলেই লাভ করিতে পারে।

আপনি জানেন আমি কাম কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের ফলস্বরূপ এই ক্ষমতা স্বতঃই আমাতে উপস্থিত হইয়াছে।..... ভারতে ব্রহ্মচর্য্য বলে এ প্রকার স্মৃতি শক্তির অধিকারী বিরল হইলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই।"

ডয়সনের হৃদয়ের দুর্গদ্বার গেল খুলে। যেন বলতে চাইল তার মন,—তুমি আমার হৃদয়ের রাজা। এসো আমার মনো মন্দিরে।

হয়ে গেল নিবিড় গভীর যোগ।

যোগ! যোগ! যোগ!

যোগ করতে করতেই যোগী হওয়া যায়। সংযম, ত্যাগ আর তিতিক্ষা। উপকরণ মাত্র তিনটি। তবেই মহৎ কাজ করবার শক্তি আসে আয়ত্তে। অন্তরে হয় সত্য শক্তির শুভ উদ্বোধন। মহা শক্তি অধিষ্ঠিতা হন সহস্রারে।

মায়াকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে কিন্তু! ঠেকাতে ঠেকাতে অবশেষে নিরস্ত হবে সে আপনি। তখনই মায়ামুক্ত শক্তি অধিষ্ঠান হবেন মনো মন্দিরে। কাজ করিয়ে নেবেন জগতের জন্য। আমি তো নিমিত্ত। তুমি আছ। তাই পথে চলি। কথা বলি। আমিও আছি।

বড় বেদনা নিয়ে পত্র লিখলেন বিবেকানন্দ,—"লণ্ডনে কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।......ভ্রাতৃসংখ্যা যে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে তাহাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই।.........আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশ জন প্রচারকের স্থান হইতে পারে, কিন্তু কোথা হইতেই বা প্রচারক পাওয়া যাইবে?......যদি কয়েক জন দৃঢ়চেতা খাঁটী লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্দ্ধেক জয় করিয়া ফেলা যাইতে পারে। কোথায় এরূপ লোক?"

এ জয় কিসের?

সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায়? না। তবে রক্তক্ষরা সংগ্রামের? তাও না।

তবে?

এ জয় হোল হৃদয়ের। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে জয় করবার পবিত্রতম সংগ্রাম। এ বিজয়ে ঘুণ ধরে না কোন দিন। ভাঙ্গে না ঐক্যের দৃঢ় বন্ধন। একবার এ বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হোলে যুগ যুগ ধরে তার স্থিতি, স্থাপকতার পরিধি বিস্তৃত হয়ে চলে। সাম্রাজ্য, দেশ, মহাদেশ এসে স্বেচ্ছায় বরণ করে

পরাধীনতা। সে পরাধীনতার কোন গ্লানি নেই। নেই কোন উৎপীড়নের ভয়। সেখানে নেই অশ্রুর বন্যা আর মৃত্যুর বিভীষিকা। এ জয় মানুষকে দেয় মুক্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ। স্বর্গীয় সুখ। কাম কামনা, ভোগ লালসার বিশীর্ণ বাসনা থেকে নিত্যানন্দের সুখধামে নিয়ে যায় নিয়ত।

ফলে হয় কি?

মানুষ মানুষকে শেখে ভালোবাসতে। হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, দুঃখের হয় অবসান। বিশ্বভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে যায় বিশ্বমানবের বিচ্ছিন্ন শক্তি। স্বজনের পারে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কিন্তু তেমন লোক কোথায় মেলে? চাই সাচ্চা লোক। চরিত্রে, সংযমে, তপে, তিতিক্ষায় দৃঢ় প্রাণ চাই। চাই সত্যের অভিসারে এক মন এক ধ্যান নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মত লোক। প্রভু কি আমাকে সেই স্বজনের সন্ধান দিবেন না?

চিন্তার ঝড় জাগে অন্তরাকাশে। চোখ ওঠে মুহূর্তে বহ্নিমান হয়ে। চঞ্চল হয়ে যান বিদ্রোহী বিবেক। হায়, হায়! ওদের দিকে তাকালে যে অন্তর যায় মরুময় হয়ে। আশার ক্ষীণ দীপশিখাটিও নিষ্প্রভ হয়ে যায় কেঁদে কেঁদে। কি আছে? আমরা যে স্বার্থান্ধ মন নিয়ে কেবল খুঁজছি নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, বিরাম। "আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ! মুখে স্বদেশহিতৈষণার কতগুলি বাজে বুলি আওড়াইতেছি, আর আমরা মহাধার্ম্মিক এই অভিমানে ফুলিয়া রহিয়াছি।.........বিবাহ! বিবাহ!! বিবাহ!!! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটা কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া জন্মিয়াছে—যোনিকীট—এদিকে আবার নিজেদের ধার্ম্মিক ও সনাতনপথাবলম্বী বলিয়া পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা, কিন্তু এখন উহার ততটা প্রয়োজন নাই, চাই এখন অবিবাহিত জীবন! যাক্ বালাই! বেশ্যালয়ে গমন করিলে লোকের মনে ইন্দ্রিয়াসক্তির যতটা বন্ধন উপস্থিত হয়, আজকালকার বিবাহ প্রথায় ছেলেদের ঐ বিষয়ে প্রায় তদ্রূপ বন্ধন উপস্থিত হয়।.........কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাহাদের পেশীসমূহ—লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্ম্মিত হইবে; আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ।.........হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর।"

জাগো, ওঠো। কান পেতে শোন তোমরা, শোন হে ভগ্ন জীর্ণ ঘুমন্ত দেশ, শোন জাগরণের বজ্রদৃঢ় আহ্বান।

সাড়া দাও, কথা বল ঝড়ের বেগে। তুফান হয়ে এসো। এসো বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গ স্পন্দনের মত তড়িৎ গতিতে। অবহেলা, লাঞ্ছনা আর দুঃখজর্জ্জর দিনের বুকে পদাঘাত করো। দীপ্তিমান হয়ে ওঠো একবারটি সূর্য্যের মত। আত্ম প্রকাশ কর ধূমকেতুর মত। জ্বলে ওঠো উল্কার অগ্নি হয়ে। সাড়া দাও সাগ্নিক সন্ন্যাসীর সানন্দ আহ্বানে। হে তরুণ, ঐ দেখ লক্ষ কোটি আর্ত্ত পীড়িত ভাই কাঁদছে ডুকরে। চাইছে একমুঠা অন্ন। একটু জীবনের সুস্থির আয়োজন। পারবে না তা দিতে? পারবে না তোমরা তোমাদের দেহ মন ও প্রাণ তাদের সেবায় উৎসর্গ করতে। এত দীন এত হীন বেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে দ্বারে দ্বারে ভিখ্-মাগবে আজনম? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, যারা মায়ের মুখে একটু হাসির স্নিগ্ধতা ফোটাতে পারে না, যারা নিরন্ন ভাই বোনদের মুখে দিতে পারে না দুটি অন্ন খুঁটে, যারা দহন দুঃখের জ্বলন্ত হুতাশনে এক বিন্দু জল দেয়ার শক্তি থেকে বঞ্চিত তারা কেন, কেন এই মাটির বুকে বাঁচার অধিকারটুকু রাখে? কেবল সৌখীন জীবন যাপনের হাল্‌কা আয়োজন। ধূর্ত্ত সুখের মোহে ব্যক্তিত্বের বলিদান দিয়ে এবং স্বার্থের সন্ধানে কপট কামনার কারাদুর্গ রচনা করেই মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্মে ছেঁদ টানতে চাও?

না, না, তা নয়। তোমরা ক্ষত্রিয়ের জাত। জন্ম তোমাদের ক্ষাত্রবীর্য্যে। না হয় বুকের রক্ত দিয়ে লিখে যাবে আগামী দিনের ইতিহাস। আগ্নেয়গিরির মত বজ্র সংকেত রেখে যাবে নয়া মানুষের জন্য। তবুও প্রাণময় হয়ে ওঠো। ছিঁড়ে ফেল মায়া মোহের বন্ধন শৃঙ্খল। ছিঁড়ে ফেল প্রিয়ার বাহুডোর। ভুলে যাও মায়ের আঁখিজল। মহৎ কাজ করতে হলে যে ত্যাগের তপে সিদ্ধ হতে হয়। আগে বিশ্বের বুকে সুস্থ সুন্দর পরিবেশ কায়েম কর। তারপর আরামের আয়োজন। বিশ্রামের বট বেষ্টনী। শক্ত হয়ে কোমর বেঁধে নামো। যাত্রায় জয় নিশ্চিত।"... ভারতের বাহিরে এক ঘা দিতে পারিলে উহার ভিতরের অযুত ঘায়ের তুল্য হয়।"

নেমে এসো দুর্গম পথ যাত্রী। এসো তোমরা আরামের শয্যাতল ছেড়ে জয় যাত্রার দুশ্চর তপস্যায়।

বললেন বিবেকানন্দ—

বললেন অধ্যাপকের কাছে—শীঘ্রই তিনি যাত্রা করবেন লণ্ডনের দিকে, সেখান থেকে ভারতবর্ষে।

অনুরোধ জানালেন অধ্যাপক আরো কিছু দিন থাকবার জন্যে। কিন্তু সম্ভব হোল না তা। প্রস্তুত হলেন অধ্যাপকও। তিনি চাইলেন স্বামিজীর সঙ্গে লণ্ডন আসতে।

কাল যে ছিল অপরিচিত নতুন, সে যেন আজ কত কালের কত যুগের আপন হয়ে গেল।

মুগ্ধ অধ্যাপক স্বামিজীর বেদান্ত ভাষ্য শুনে। তাইতো চাইছেন দুদিন এক সঙ্গে দিন কাটাতে।

এলেন স্বামিজী ডয়সনকে নিয়ে লণ্ডনে।

জুন মাসে প্রেরণ করলেন স্বামিজী সারদানন্দকে আমেরিকায়। আর অভেদানন্দকে বললেন প্রচারের সমস্ত ভার বহন করতে। দিতে লাগলেন তাকে শিক্ষা ও উপদেশ। অভেদানন্দই স্বামিজীর অনুপস্থিত কালের প্রধান প্রচারক হয়ে উঠলেন।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাস।

নানা বক্তৃতার মধ্য দিয়ে কাটতে লাগল দিন। অদ্বৈতবাদের সার সত্যগুলি বিশ্লেষণ করলেন স্বামিজী। এসময়কার বক্তৃতা ও উপদেশগুলোর মর্ম্ম বহন করছে স্বামিজীর 'জ্ঞানযোগ'।

ক্রমে দিন যেতে লাগল। স্বামিজীর মন ও দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়, ইচ্ছে হয় হাওয়া হয়ে ছুটে আসতে।

ওদিকে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন স্বামিজী প্রচার সম্বন্ধে।

সারদানন্দ আমেরিকায় বেশ জাঁকাল প্রচারই সুরু করে দিয়েছে এত দিনে। অনেক ছাত্র আসে। ইংলণ্ডেও তেমনই হোল। স্বামী অভেদানন্দের কর্ম্ম প্রবাহ ও প্রচারের প্রবল ঢেউয়ে ইংলণ্ডেও সাড়া পড়ে গেছে।

মন স্বামিজীর এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করে উঠল।

আর ভাবনা কি! ওরা পারবে, ওরা পারবে। পারবে আমার শূন্য স্থানে অঙ্ক বসিয়ে যেতে। মুঠা মুঠা ছড়িয়ে দিতে পারবে আলোর রোসনাই। আর ভাবনা নেই।

প্রস্তুত হতে লাগলেন স্বামিজী ভারতে ফিরবার জন্য।

এমনি দিনে লিখল মিসেস্ অলিবুল এক পত্র।

কি লিখল ?

লিখল, আপনার স্বপ্ন সাধনা, আপনার ভক্ত ভাইদের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠায়

আমার সহানুভূতি রইল। অর্থ লাগে তো এই দীনা সেবিকাকে জানাবেন।

এই শুধু দাবী, আর্ত্তি ও আকুলতা। মহৎ কাজে যদি নিজেকে এক বিন্দু ক্ষয় করবার সামর্থ্য অর্জ্জন করা যায়, তবেই বুঝব জীবন আমার বৃথায় যায়নি।

মনুষ্য জন্মের সার্থকতা যে ওখানেই। ওগো হৃদয়পতি, তুমি সে সুযোগ থেকে করো না বঞ্চিত। দিও না নির্ব্বাসন বঞ্চনার অরণ্যে। নিমজ্জিত করো না অন্ধকারের অতলান্তে। শুধু একবার, একবারটি দাও আমাকে তোমার স্বপ্ন সাধনার সৌধ নির্ম্মাণে অংশ গ্রহণ করতে। তোমার সেবা করতে।

দিকে দিকে মেঘ পুঞ্জিত অঞ্জন। কত ব্যাকুলতা। মন খুলে বলতে পেলে যেন খুশী, তুমি কি আসবে না, আসবে না কি ফের ফিরে আমাদের মাঝে? আমাদের ঝঞ্ঝা মন্থনে তোমার কৃপাবারি বর্ষণ করবে না? প্রগাঢ় মনকে তোমার সুধা ক্ষরণে করবে নাকি বিগলিত? দুঃখ দিনের ম্লান সন্ধ্যায় পাব না কি তোমার অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা? শান্তির স্নিগ্ধ ললিত ছন্দ? যাও। যাও তোমার ছায়া সুনিবিড় স্বদেশের সুখ-নিকেতনে। বাঁধা দেব না। কেবল কাঁদব। তুমি তো কাঁদতে শিখিয়ে দিয়েছ। তাই দিয়ে মনের মলিন মেঘে আনব বৃষ্টির মন্দ্রিত ঝঙ্কার। রইব চেয়ে সেই মেঘাকীর্ণ পথ পানে। তোমার আগমন প্রতীক্ষায়। তুমি ধরা না দিলে কি সাধ্য ছিল তোমাকে স্পর্শ করি? তুমি যে স্পর্শাতীত। কিন্তু এলে তুমি দুঃখ পীড়িত মানুষের মধ্যে। এলে তাদের কান্নাকরুণ আকুলতায়। এলে তাদের বেদন দিনের ছায়া সন্ধ্যায়।

কেন এলে তা জানি বলেই তো তোমাকে যেতে দিতে চায় না মন। তোমার বিদায় বিরহে কান্না আসে দু চোখ ফেটে। বুকের পাঁজর যেতে চায় ভেঙ্গে।

ভক্ত শিষ্য ও গুণমুগ্ধ অগণিত নর নারীর আকুল আর্ত্তি। ১৩ই ডিসেম্বর। পিকাডেলী হলঘর। কত লোক। বিদায়াভিনন্দন দিতে এসেছে তারা যুগাচার্য্যকে। একটু শব্দ নেই। কেবল নীরবঘন গম্ভীর পরিবেশ। এ যেন বিধুর বিরহে মায়ালগ্নের ধীর সঞ্চার। সাগরের বুকে ভাটার মন্থর প্রবাহ। তুহিন রাত্রির গভীর হিমযান। কেবল চোখের পারে অশ্রুর উজান। মুখে বেদনার বিশীর্ণ জিজ্ঞাসা। অন্তরে কান্নার লয়লীন আর্ত্তি।

রইতে পারলেন না বিবেকানন্দও। এ করুণ-ঘন দৃশ্য তার মনের সমস্ত অতীত স্মৃতির গ্রন্থখানাকে ওলট পালট করে দিয়ে যায়। এক এক করে বিস্মৃত দিনগুলো তাঁর হৃদয়কে ফেলে আচ্ছন্ন করে। চোখে আসে তাঁরও জল। বলতে থাকেন বিচলিত বিবেক,—"হয়ত আমি শ্রেয়ঃ মনে করিয়া এই দেহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি, ইহাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু যে পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেকেই উচ্চতম সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিতেছে, ততদিনে আমি মানব-জাতির কামনায় ধর্ম্মপ্রচারে বিরত হইব না।"

ওগো, মানুষের দুঃখে, মানুষের দৈন্যে, হাহাকারে তোমার অভয় মন্ত্র যে একান্ত প্রয়োজন। তুমি এসো যুগে যুগে মানুষকে শোনাতে সত্যের জয়গান।

মুক্তির অভিনন্দ্র। এ পাপক্ষত দুনিয়ায়, এ অন্ধকারের নিশি রাত্তিরে তুমি জ্বালিয়ে দিও সত্যের দীপশিখা। বন্ধন মুক্তির উজ্জ্বল আলো।

বিষাদ ঘন মনে জানাল সবাই স্বামিজীকে বিদায়াভিন্দন। সভা ভাঙ্গল।

আত্মগর্ব্বী বস্তুতান্ত্রিক জাতির সামনে কি রেখে এলেন স্বামিজী? রেখে এলেন ভারত-আত্মার অমর বাণী।

আর?

সাম্য, শান্তি, প্রীতি ও মুক্তির জাগ্রত ইঙ্গিত।

শুধু কি তাই?

না। তবে?

উদ্বুদ্ধ করলেন কর্ম্মে। দীক্ষা দিলেন বৈদান্তিক ধর্ম্মে।

১৬ই ডিসেম্বর। বিদায় গ্রহণ করলেন বিবেকানন্দ, বিদায় গ্রহণ করলেন সবার কাছ থেকে।

এবারে চল মন, ফিরে চল ঘরে। দুঃখিনী জন্মভূমি মা আমার কাঁদছেন। তাঁর চোখের জল যে দিয়েছে আমার পথ সিক্ত করে। আর কেন? এবারে চল মন, ফিরে চল।

ভারতবর্ষের শ্যাম সবুজ বনকান্তার, নদ ও নদীর লহরীমালা, আর জল-তরঙ্গের উদ্বেল আহ্বান যেন থেকে থেকে চঞ্চল করে দিচ্ছে যোগির চিত্ত। কান্না আসে। বুকে জাগে সঘন দোলা। আরক্তিম হয়ে উঠে মুখ। উঃ! কি দুঃসহ এই দহন জ্বালা। আর নয় প্রবাসে। এবারে যাত্রার আয়োজন কর।

একি! ত্যাগীর মনে কেন মায়ার ছায়া?

বললে এক ইংরেজ বন্ধু,—"স্বামিজী! চার বৎসর বিলাসের লীলা ভুমি, গৌরবমুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃ-ভূমি কেমন লাগবে?"

লাগবে?

লাগবে শীতের সকালের প্রথম সূর্য্যটির মত। মায়ের অঙ্কে শিশুর নিশ্চিন্ত নিদ্রার সুখশয্যার মত। আর লাগবে চাঁদঝরা স্নিগ্ধ রাতের অমলিন পবিত্র শুদ্ধ তীর্থের মত।

বললেন বিবেকানন্দ আবেগ মুগ্ধ মনে,—"পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে আসিবার পুর্ব্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম; এক্ষণে ভারতের ধুলিকণা পর্য্যন্ত আমার নিকট

পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা। ভারত এখন আমার নিকট তীর্থ স্বরূপ।"

দুঃখিনী জননীর অশ্রুই করেছিল ঘরছাড়া বিবেকানন্দকে। দিয়েছিল পরিয়ে কণ্টক মুকুট আর রণশয্যা। আজ তাঁর সন্তান জয়ী হয়েছে সংগ্রামে। জগৎ তাঁকে পরিয়ে দিয়েছে গৌরবের রাজমুকুট। সাজিয়ে দিয়েছে সম্ভ্রমের আসন। মন কি আর থাকতে চায় বাইরে? জন্মভূমি আজ যে স্নেহশীলা জননীর মত দুটি বাহু বারিয়ে দিয়েছেন। যেন ডেকে বলছেন—আয়, আয় রে আমার শূন্য অঙ্কে। আয় রে তোর কর্ম্মক্লান্ত দেহ নিয়ে বিশ্রামের ছায়ানীড়ে। শান্তির সুখ ধামে। তোর স্বদেশে।

তাই তো বিবেকানন্দ ব্যাকুল। চঞ্চল। আকুল।

হোল যাত্রা সুরু।

ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে, আল্পস পাহাড়কে পিছু ফেলে চললেন স্বামিজী, চললেন সেভিয়ার-দম্পতিকে নিয়ে। এলেন মিলান ও পিশা নগরীতে। সেখান থেকে ফ্লোরেন্সনগরী। ইতালীর চারুকলার কেন্দ্র-পীঠ ফ্লোরেন্স। মুগ্ধ করল স্বামিজীকে। দেখলেন সব ঘুরে ফিরে। তার পর একটু মনের খুশীতে ঘুরে বেরাচ্ছেন একটি পার্কে।

দেখা হয়ে গেল সেখানে মিসেস্ হেইলের সঙ্গে। মাতৃস্বরূপিণী হেইল। চিকাগোর পথে ক্লান্ত সন্ন্যাসীকে যিনি দিয়েছিলেন প্রথম আশ্রয়। দিয়েছিলেন পথের নিশানা। সেই অভয়দায়িনী মঙ্গলময়ী হেইল স্বামিজীকে দেখে আনন্দ পেলেন মনে।

যাত্রা করলেন আবার। রোম। প্রাচীন রোমকের শ্মশান সৌধ মহানগরী রোমকে প্রত্যক্ষ করলেন স্বামিজী।

রোম থেকে এলেন নেপ্‌লসে। কিন্তু জাহাজ এখনো এসে পৌঁছায়নি বন্দরে। সময় পেলেন কিছুটা। দেখতে গেলেন স্বামিজী ভিসুবিয়স্। দর্শন করলেন পম্পাই নগরী।

জাহাজ এসে পৌঁছল। সাউদাম্পটন থেকে এসে পড়ল জাহাজ। সে জাহাজে করে এসেছে স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য গুডউইন। মন বড় খুশী হোল স্বামিজীর গুডউইনকে পেয়ে।

৩০শে ডিসেম্বর ছাড়ল জাহাজ নেপলস্ বন্দর থেকে ভারত অভিমুখে।

৪৮

বিরামহীন গতি।

চলেছে জাহাজ একটানা অবিরাম। তরঙ্গ বন্দনা করে চলেছে। অভ্রস্পর্শী দিগন্ত রেখা। শুভ্র সফেন ঢেউ। নেই কোন বাঁধা। অবারিত। উন্মুক্ত। দিগন্তশায়ী। চলেছে জাহাজ সীমায়িত ভোগের জমক থেকে। অসীমে। এগিয়ে যাচ্ছে ত্যাগের তপঃতীর্থে। ভারতবর্ষে। এ যেন এক মহামগ্নতার অভিসার। চলেছে জাহাজ কৃত্রিমতার ক্ষণ সুখ থেকে কৃত যুগের পণ্য কুড়াতে। কুজ্ঝটিকার নিশি নির্ঝর থেকে আলোর দ্যুতি বিচ্ছুরণে। সেই কোকিলের কুহুরব। সমুচ্ছ্বসিত কুহুরণ। বৃন্দাবন। তার বনরাজি নীলা।

তার পর ?

হিমগিরি। হিমালয়। তার ধ্যান গম্ভীর মূর্ত্তি।

সমুদ্র সৈকত। দিগন্তবিসারী সর্ব্বঢালা করুণার প্রশান্ত ভালোবাসা। নীল আকাশ। তার কোল জুড়ে কপোত কূজন। পূর্ব্বরাগের মধুময় আর্ত্তি। বিরহ ব্যাকুল আকুলি বিকুলি। সেই ভারতবর্ষের তটতীর্থে চলেছে জাহাজ উজান ঠেলে বায়ুর বাঁক কাটিয়ে।

বসে ভাবছেন স্বামিজী। জাহাজে বসে ভাবছেন—

কি পেলাম ? দিয়ে বা এলাম কি ? তার হিসাব মেলাতে মন মগন বিবেকের।

এমন অবারিত মুক্ত প্রসারিত আকাশ, যার নীল নির্ম্মল পবিত্রস্পর্শে মাটি হয়েছে কোমল, জল জানায় মিতালী, তার ছোঁয়া না লাগে কার চিত্তাকাশে ?

ভাবো ভাল করে ভেবে দেখ যে জন্যে হয়েছিল যাত্রার সূচনা তা কি মিলেছে ?

পেয়েছ কি তোমার আরব্ধ কর্ম্মের পুরস্কার ?

চলেছ তো তোমার শৈশবের ক্রীড়াকুঞ্জে। চলেছ যৌবনের স্বপ্ন উপবনে। জীবনের উপান্ত দিনের বারাণসী ভারতবর্ষে।

কিন্তু কি নিয়ে যাচ্ছ তার জন্যে ?

সহসা ডুবে যান বিবেকানন্দ চিন্তার গভীরে। এক এক করে এসে পাশ্চাত্ত্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর আত্মার আকাশে।

কি দেখলেন?

দেখলেন,—"সংসার সমুদ্রের সর্ব্বজয়ী বৈশ্য শক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।..."

আর?

"ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণী বলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। যে ইংলণ্ডের ধ্বজা কলের চিম্‌নী, বাহিনী পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্য-বীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"

দেখলেন তিনি আরো। এই বণিক শাসনের বনিয়াদের ভিতকে আন্দোলিত করে এগিয়ে আসছে লক্ষ কোটি শ্রমিক। আসছে তাদের অধিকার জানাতে। পেষণের শোষণ দুর্গ ভেঙ্গে চুরমার করতে। আকাশে ওড়াতে তাদের শোণিত-সিক্ত রক্তাক্ত পতাকা। "প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেক দিন ধূলি দেওয়া চলে না।......... সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সেই উদ্বোধনের বীর্য্যে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতা রাশি ধৌত হইয়া যায়।"

সে দিন আগত। "য়ুরোপ এক আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে রহিয়াছে। যদি এক আধ্যাত্মিক প্রবাহে এই আগুন না নিভে, তাহা হইলে ইহা ফাটিয়া পড়িবে।"

চাই ধর্ম্মের প্রবল প্রবাহ। মানুষের মন নির্ম্মল পবিত্র ও শুদ্ধ না হোলে তো শুভ শক্তির উদ্বোধন হবে না! হবে না তার লালসা লোলুপ মন ত্যাগের তপে মগ্ন। আর যদি তা না হয়, তবে সংগ্রাম নিশ্চিত। রক্তক্ষরা সংগ্রাম। অগণিত মানুষের প্রাণ বলি হবে। সেই রুধির সমুদ্রে অত্যাচারীর স্বদম্ভ আস্ফালন কালের কক্ষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেদিন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই থেকে জগতের বুকে কায়েম হবে সুস্থ সুন্দর মানুষের রাজত্ব। ভেদ ভুলে যাবে আত্মগর্ব্বী দাম্ভিকের দল। মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করবে নারায়ণ। আর মানুষের সেবায়, মানুষের চাহিদা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্মে নিয়োজিত হবে রাজশক্তি।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ছুনিয়ায় তো সে নীতিবোধের জাগরণ হবে না। সেখানে সংগ্রামী জনতার মিলিত মিছিল অবশ্যম্ভাবী। আর "……তাহা রাশিয়া হইতে, অথবা চীন হইতে আসিবে……"

"জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বণিক) তৃতীয় যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে শূদ্রাধিকার (প্রলেটারিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

ক্ষত্রিয়ের স্বেচ্ছাচারী শাসন লুপ্ত হয়ে দেখা দেবে বৈশ্য-শাসন। কিন্তু তাদের লোলুপ রসনার নিঃশব্দ পেষণে সর্ব্বহারা জনতার মনে জেগে উঠবে একটা প্রবল ঝড়। সেই ঝড়ের ক্ষুব্ধ সমুদ্রে জগতের সমস্ত মেহনতি জনতা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছুনিয়ার মজছুর এসে দাঁড়াবে এক পতাকা তলে। এক সংকেতে তারা বলে উঠবে, ছুনিয়ার মজছুর এক হো! এক হো!

শ্রমিকের অধিকার হবে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বহারা জনতার অপূর্ব্ব সাফল্যে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ন্যায় নীতি ও ধর্ম্ম। বৈশ্য শাসনের বনিয়াদ উঠবে টলমল করে। লুপ্ত হয়ে যাবে মৃত্তিকা গর্ভে তাদের স্বর্ণ সিংহাসন। যুগ যুগ অন্তে হয়ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক করবে তা আবিষ্কার।

রাখবে কোন যাছুঘরে। ঘনায়মান ছুর্যোগের দিনে শূদ্র তার বুকের পাঁজর জ্বেলে এগিয়ে আসবে ছুঃখ নিশার শেষ উষায় শান্তির স্তুতি পাঠ করতে। জগৎ হবে ফুলের মত বিকশিত। ফুটবে সকলের মুখে হাসি। আনন্দে আবেগে নয়া মানুষের অন্তর উঠবে সৃষ্টির সাধনে জাগ্রত হয়ে। কর্ম্ম-যোগের প্রসার হবে। "ইহার সুবিধা এই, বাহ্য সম্পদ ও দৈহিক সুখ সুবিধা সমাজের সর্ব্বস্তরে বিতরিত হইবে, ইহার অসুবিধা (সম্ভবতঃ) সংস্কৃতির অবনতি ঘটিবে। সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটিবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা বিরল হইবে।"

সত্যদ্রষ্টা ঋষির অন্তরে আভাসিত হোল আগামী পৃথিবীর ছবি।

তন্ময় হয়ে গেলেন বিবেকানন্দ। আবার বললেন—"যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর হয়, যেখানে পৌরোহিত্য যুগের জ্ঞান, সামন্ত যুগের সংস্কৃতি, বণিক যুগের বণ্টনের আদর্শ এবং শ্রমিক যুগের সাম্যের আদর্শ অব্যাহত থাকিবে, অথচ তাহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহাই হইবে আদর্শ রাষ্ট্র। কিন্তু ইহা কি সম্ভব ?"

"যাহা হউক, প্রথম তিনটি যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সর্ব্বশেষ-

যুগের সময় উপস্থিত। তাহারা (শ্রমিকেরা) নিশ্চয়ই ইহা পারিবে, কেহ প্রতি-রোধ করিতে পারিবে না।........... আমি নিজে একজন সোশ্যালিষ্ট,—এই ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্দ্ধেক রুটি ভাল।"

এই অর্দ্ধেক রুটির শক্তিতে তারা জগতে আনবে বিস্ময়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবে। মানুষের দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত মানুষের অধিকার। দানবদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল থেকে তারা বাঁচাবে এই অসহায় মুমূর্ষু পৃথিবীকে।

কিন্তু আর কি নিয়ে এলে? আর কি জেনে এলে?

নিশ্চুপ গম্ভীর হয়ে আবার ভাবছেন স্বামিজী। ভাবছেন সত্যি কি নিয়ে যাচ্ছি?

চলছে যোগ-বিয়োগ। গুণ ভাগ। ছেড়া গড়ার হিসেব নিকেস। ফল দাঁড়াল কি?

ফল দাঁড়াল, একদিকে প্রাপ্তি। আর একদিকে ব্যর্থতা। ভারতবর্ষের আর্ত্ত পীড়িত নিরন্ন ভাইদের জন্য গিয়েছিলেন স্বামিজী দু-মুঠা দয়ার দান চাইতে। দাসানুদাসের মন নিয়ে স্বামিজী পা বাড়িয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যের মাটিতে। একটু কৃপা! একটু করুণা। এই ছিল প্রত্যাশা। শুধু এইটুকুই ছিল তার ভিক্ষা।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কি তা দিয়েছে?

না। সেদিক থেকে তাঁর যাত্রা হয়েছে ব্যর্থ। দেয়নি তারা স্বামিজীর শূন্য ঝোলা ভরে মণি মাণিক্যে আর অর্থ সম্পদে। রিক্ত সন্ন্যাসী রিক্তের বেদনা নিয়েই ফিরছেন আবার।

তবে পেলেন কি?

পেলেন ক্ষমতার প্রভুত্ব, পেলেন কর্ত্তৃত্বাধিকার।

এ তো কম সম্পদ নয়! ভারতবর্ষের লাঞ্ছিত জনতাকে দাঁড়াতে হবে তার নিজের পায়। আহরণ করতে হবে জীবনের উপচার। বাঁচার অধিকার।

ওরে, পরের দেয়া ধনে আর কদিনের আহার জোটে? পরের কৃপা করুণায় কি আর জীবনের গতিচ্ছন্দে থাকে স্বাচ্ছন্দ্য? যেমন ভাঁটার টানে নদী মন্থর, তেমনি দয়ার দানে জীবন শ্লথ। কেমন করে পাবে মন মুক্ত-দিগন্তের প্রশান্ত পরিধি! আর যদি তাই না পেলো তবে আনন্দের অভিব্যক্তি নেই, নেই যে জীবনের প্রস্ফুটন। বিকাশ, আর প্রকাশ। বললেন স্বামিজী, "আমি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই যাহাতে মানুষ তৈরী হয়।"

ইনিয়ে বিনিয়ে ঢাক ঢাক করে নয়। সত্যের পথে হাঁটতে হবে বুক ফুলিয়ে। মাথা উঁচিয়ে। কেন আমরা প্রত্যাশীর বেশে ভিক্ষা পাত্র লয়ে দাঁড়িয়ে থাকব? মেরুদণ্ডটা একবার টান করে দাঁড়া। চেয়ে দেখ তোর ঐশ্বর্য্যশালী দেশটাকে। দেখ ঐ তোর অধ্যাত্ম সম্পদ। তাই বলে এখন কেবল ধ্যান ধ্যান করে নীরব হয়ে গেলে চলবে না। একবার মার কোল ছেড়ে বেরিয়ে আয়। আয় দেখি ফেলে দিয়ে তোর আরামের শয্যাতল। ধূর্ত্ত সুখের আবরণ? ভারত দাঁড়াবে তার নিজের শক্তিতে। বহিঃশক্তির দয়া নয়। চাই আদান প্রদান, চাই আত্ম-জাগরণ। তবেই আসবে মুক্তি। যাত্রা কর, যাত্রা কর কঙ্করময় পথে।

আর সেই যাত্রার মহালগ্নে তুমি এসো। এসো মিছিলের প্রথম যাত্রী, তোমার মৃত্যুলাঞ্ছিত জীবনের দুর্জ্জয় সত্য ঘোষণা কর আকাশে, বাতাসে, মানুষের মর্ম্ম-দুয়ারে। তারাও চলবে অবিরাম। ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হবে তাদের গতি। দুঃখের তপস্যায় আসবে প্রভাতের প্রসন্নতা। বললেন স্বামিজী, "বিশ্রাম চাহি না। কাজ করিতেকরিতে মরিব, জীবন একটা যুদ্ধ। আমাকে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিতে ও মরিতে দাও।"

হে মহাশক্তি, তুমি জাগ্রত হও আমার আত্মার আকাশে। আমার চলার পথে তুমি সূর্য্যের মত কর কিরণ সম্পাত।

অন্তরে ফুটে উঠল অজস্র কর্ম্মের কলিকা। তরঙ্গ স্পন্দনের মত মনের সমুদ্রে জাগল প্রবল আশার তুফান। মন ভরে গেল মুহূর্ত্তে। ভরে গেল খুশীর হাসিতে। সেবা, শ্রদ্ধা ও প্রেমের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন বিবেকানন্দ। জাহাজের গতিও যেন ক্ষিপ্র হোল চকিতে। এগিয়ে চলল জাহাজ।

কেটে গেল ষোল সতের দিন।

এসে পৌঁছল জাহাজ ভারতবর্ষের প্রান্ত সীমায়।

১৫ই জানুয়ারী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

অপগত হয়েছে রাত্রির অন্ধকার। আকাশের পূর্ব্ব ভালে জেগেছে শুচি শুদ্ধ দ্যুলোক দুহিতা উষা। দু-একটি পাখীর কণ্ঠে বন্দনা সঙ্গীত। শ্রান্ত সমুদ্রে বিশ্রামের ক্ষীণ তান। কলম্বো বন্দর, দূরে ঐ, ঐ বিথারিত মায়ের স্নেহাঞ্চল। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ। তাকালেন একটি বার দূর দিগন্তের দিকে, সহসা মুদিত হয়ে গেল চোখ।

শ্রদ্ধা সন্নত চিত্তে প্রণাম জানালেন তাঁর জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সীকে। বললেন মগ্ন মনে, হে আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ, বেদ-প্রসবিনী গরীয়সী মা,

গ্রহণ কর দীন সন্তানের প্রণতি। আবদ্ধ কর আমাকে বাহুপাশে। তোমার প্রগাঢ় স্পর্শে ধন্য কর আমার মৃত্যু লাঞ্ছিত জীবন। তুমি আমাকে ভোলোনি, তাই আবার ডাক দিয়েছ আকুল সুরে ব্যাকুল হয়ে। আমি এসেছি, এসেছি তোমার সৌরভ স্নিগ্ধ কাশ কমল যুঁই মল্লিকার উদ্যানে। তুমি কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা। আমায় আশীর্ব্বাদ কর। বল দাও, শক্তি দাও, দাও দুর্জয় তপস্যার মন্ত্র শিখিয়ে। আমি দূর করব সকল বাধা। উল্লঙ্ঘন করব তোমার শৃঙ্খল। আসুক বন্যা। হোক আকাশ মেঘাকীর্ণ ঘন ঘোর; বিদ্যুৎ ঝলুক। পড়ুক বাজ। মহা প্লাবনে উঠুক আকাশে উল্কা। বাধা মানব না। চলব এগিয়ে। এগিয়ে যাব তোমার চোখের জল মুছিয়ে স্নিগ্ধ হাসির শুভ্রতা ফোটাতে। যাব তোমার কান্নায় আনতে বিজয়ের অট্টহাসি। তুমি যাকে স্থান দিয়েছ কোলে তার কি আর ভয় আছে। ভীতি তোমার অভী। বাধাই তোমার আশীর্ব্বাদ। তা নাহলে তো আসবে না উদ্যম। আসবে না প্রেরণা। তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার পথে প্রবল প্রতিরোধ হয়ে। আমি তাই ভেঙ্গে যাই, যাই তোমার যোগ্য সন্তানের মত মুক্তির স্থির নিশ্চিত সীমানায় মত্ত ভোলার মত। ওগো আমার শক্তিস্বরূপিণী মা, তুমি চন্দ্র, আর আমি সমুদ্র। তুমি পূর্ণ হলে তবেতো আমি হবো উত্তাল উত্তরঙ্গ!

হে দেবলীলাস্থল, দেবভোগ্যা জন্মভূমি, গ্রহণ কর আমার অকুণ্ঠ প্রণাম।

রাত ভোর হোল। জাহাজ এগিয়ে এলো কূলের দিকে।

তুমি সাগর, সমুদ্র ও নদীতে উজান বেয়ে এসেছ। এসেছ অন্তহীন, অসীম, উদ্বেল পথে। কিন্তু এলে কোথায়?

এলে মায়াঘেরা ছায়ানীড়ে। মানুষের রাজ্যে। অখণ্ড সংসারে।

এই সংসারেই হোক তোমার নিশ্চিত উত্তরণ। এই সংসারই হোক তোমার সাধনার বেদী। আমরা তোমাকে আমাদের মাঝে পাই। তোমার স্থির সিদ্ধান্তে জীবনের পথে চলি। তোমার মুক্তিতে হোক আমাদের মুক্তি। তোমার কর্ম্ম-প্রেরণায় আসুক আমাদের পথ চলার নির্দেশ। আমাদের বুক থেকে আমরা সরিয়ে ফেলি দুঃখের উপল। সরিয়ে ফেলি চলার পথের কণ্টক। চোখের তারার বিভ্রম। তুমি এসো। এসো আমাদের রোদন দিনের বেদন ক্ষণে।

সকাল। শীতের সকাল। ঢাকা ছিল এতক্ষণ দিগ্‌বলয়। ঢাকা ছিল কুয়াশার অবগুণ্ঠনে। সহসা ঝলক জাগল আলোর। হোল কিরণ সম্পাত। সদ্যোজাত শিশুটির মত আভাসিত হোল—

আভাসিত হোল কলম্বো বন্দর কুয়াশার গর্ভ থেকে।

উদয় শিখরে নবারুণ। কনক উজ্জ্বল দ্যুতি। আবার তার মাঝেই স্নিগ্ধ মধুর মাধুরী। যেন একহাতে তার রুদ্রবীণা। আর হাতে মঙ্গল শঙ্খ।

পাখীরা ধরেছে গান। সমুদ্রের বুকে উন্মুক্তির আকুলতা। মানুষের মনে বসন্তের মন্ত্র উচ্চারণ। গতিতে বিদ্যুতের চঞ্চলতা। তারা কেবল ছুটছে।

এরা কোথায় যাচ্ছে?

যাচ্ছে নবযুগের উদ্বোধনী শুনতে। অভ্যর্থনা জানাতে যুগাচার্য্যকে। নির্ম্মেঘ আকাশ। সমুদ্রের মৃদু তরঙ্গে পুলকের শিহরণ। তরুবনবীথী আর জল মন মাটি যেন এক ভাব এক রাগে তন্ময়। কে ধনী কে গুণী আর কে বা ঐশ্বর্য্যের সম্রাট?

এক পথে হাঁটছে সবাই। এক মনে। এক ভাবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সে কি একজন আর দু-জন?

হাজারো হাজারো মানুষ। আছে তার মধ্যে পথের মানুষ। কুড়ে ঘরের মালিক। আবার সাতমহলার বিবি। রাজ্যের সম্রাট। সে এক বিরাট বিপুল মিলিত মিছিল যেন।

কোথায় যাচ্ছে ?

কলম্বোর বেলাভূমে। সমুদ্রের তটতীর্থে।

জাহাজ আসছে ধীরে ধীরে এগিয়ে—

এগিয়ে আসছে সিংহলের শ্যামতটে। ঋষিদের তপঃতীর্থে। সাধকের বাঞ্ছিত ভূমিতে। ভারতবর্ষে।

অপূর্ব্ব শোভা সমারোহ নারকেল বৃক্ষের। বেলাভূমে লক্ষ কোটি দীপ জ্বালাবার আয়োজন বালুকণার। সমতলে অজস্র জনতার কণ্ঠে বন্দনা ধ্বনি। যেন ডাকছে তারা তাদের মুক্তিযজ্ঞের পুরোহিতকে।

চমকে উঠলেন স্বামিজী। তাকালেন।

আনন্দে নৃত্য করে উঠল মন। আবেগে জল এলো চোখে। ব্যাকুল মনে আকুল বালকের মত অধীর হয়ে উঠলেন বিবেকানন্দ।

ধীরে ধীরে এলো জাহাজ জেটির দিকে।

নোংগর ফেলল।

এখন কটা বাজে ?

তা বেলা প্রায় যায় যায়। কিন্তু নামেনি এখনো সন্ধ্যার ধূসরিমা। যায়নি ফিরে পাখীরা নীড়ে। ওঠেনি এখনো চাঁদ। বাজেনি মন্দিরে ঘণ্টা। সবে ম্লানিমার ছায়া পড়েছে অস্তগামী সূর্য্যে। আর তার প্রগাঢ় উজ্জ্বল দ্যুতি এসে যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে স্বামিজীর মাঝে। ওরা তা প্রত্যক্ষ করল। দেখল যেন ঘনায়মান আঁধারে এ এক জ্বলন্ত দিবাকর। দুঃখ দৈন্যের হুতাশনে সান্ত্বনার সমুদ্র। উৎপীড়নের ব্যাভিচারে মৃত্তিকা বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরি। অত্যাচারীর অভিযানে প্রতিরোধের উল্কা।

দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ। ডেকের ওপর দাঁড়ালেন।

এগিয়ে গেল মিছিল। জানাল অভ্যর্থনা।

তুমি এসো। নেমে এসো নয়নলোচন। আমাদের দুঃখকে রূপান্তরিত কর সুখে। বারিয়ে ধরো আনন্দের মঞ্জুষা। বন্ধন কর উন্মোচন। তুলে ধরো মুক্তির অবারিত প্রান্তর। আমাদের সঙ্কোচকে সঙ্কুচিত করো। এনে দাও প্রকাশের প্রস্ফুটন। অন্তরকে করো ভাষার প্রকাশনী। খণ্ডসুখে এনে দাও অখণ্ডের অমিত প্রভা। আমাদের দৃষ্টি হোক মহান। মাটিকে করো সোনা। আমরা রচনা করি তার বুকে স্বর্গ।

এসো বীর, নেমে এসো তোমার ঐশ্বর্য্যের সিংহাসন থেকে আমাদের পর্ণকুটিরে। আমরা তোমাকে মন প্রাণ ভরে গ্রহণ করি। ভয় নেই। হবে না তোমার অনাদর অবহেলা। রচিত হয়েছে বিজয় তোরণ। পথে পথে ছড়ান হয়েছে পুষ্প। সজ্জিত হয়েছে তোমার সম্ভ্রমের আসন। ঘরে ঘরে শুচি সন্ধ্যার আয়োজন। পরেছে পুরনারী পবিত্র পট্টবাস। হাতে নিয়েছে মঙ্গল শঙ্খ। দাঁড়িয়ে আছে পথের বাঁকে। নদীর তটে। হাতে তাদের অর্ঘ্যডালা। আর ফুলমালা। তোমার চরণ পদ্ম করবে সজ্জিত। পরাবে গলায় মালা। আর নিবে তোমার পদরেণু। তোমার চরণধুলি। এসো। নেমে এসো!

ধীরে ধীরে নামছেন স্বামিজী জাহাজ থেকে।

পুরনারীগণ উলু দিল ঝাঁকে ঝাঁকে। মুখর হয়ে উঠল কলম্বোর বন্দর। হোল পুষ্পবৃষ্টি। রচনা করল তারা ফুল পথ। লুটিয়ে পড়ল কত লোক চরণে। নিল চরণপদ্মের মাধুরী।

চলল শোভাযাত্রা।

এগিয়ে চলল সম্মুখের দিকে। গোলাপ জলের নির্যাস আর গঙ্গা-জলের শান্তি বারি বর্ষিত হতে লাগল থেকে থেকে। উঠল জ্বলে ঘরে ঘরে ধুপ ধুনা। সে স্নিগ্ধ মুগ্ধ সুবাসকে বাতাস নিল লুফে। ছড়িয়ে দিলো দিকে দিকে দূরে দূরে। মানুষেরা মত্ত পাগলের মত ছুটল। এ যেন চাতকের বহু আকাঙ্ক্ষিত বারি সন্ধান। মরুর অভিসারে সাগরের অভিযান। চকোরের বিরহী মনে চাঁদের মুগ্ধ স্বপ্ন।

আসল শোভাযাত্রা।

কোথায়?

দারুচিনি উদ্যানের কাছে।

বিরাট মণ্ডপ। অগণিত জনতা। এলো তার মাঝ থেকে কুমারস্বামী বেরিয়ে। পরিয়ে দিল মালা। পাঠ করল অভিনন্দন। গ্রহণ করল স্বামিজীর পদধুলি।

বিবেকানন্দের মনে আনন্দের নৃত্য দোলা।

কুমারস্বামী যেন বলতে পেলে খুশী—তুমি যা দিয়েছ তাই তো অনেক। তাই আমার অন্তহীন। আসিনি তোমার কাছে শুধু লেনদেনের প্রার্থনা নিয়ে।

কিন্তু যদি আরো কিছু নিতে হয়, আরো যদি কিছু মন চায়, তা শুধু তোমাকে। তোমার দয়ার দানের ছিটাফোঁটা নিয়ে আমার কাজ নেই। সমগ্রকে চাই। আমার ক্ষুধা অনেক। আকাঙ্ক্ষা অনেক। ক্ষুদ্র ঘরে সুখের পণ্য সাজিয়ে কি হবে? ও ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চাই তোমার ঘরে ঠাঁই নিতে। তোমার সঙ্গে দুলতে ভাসতে। আরো নিবিড় করে যদি তোমাকে চাই, তবে তা নিঃসীম অন্ধকারে একলা ঘরে নয়, চাই, বিশ্ব ঘরের উজ্জ্বল আলোতে। তামাম দুনিয়ার সর্ব্ব জীবের মধ্যে। আমাকে তুমি এই সঙ্গটুকু দাও। দাও শুধু এই অনুভূতির কনক প্রভাটি। এসো তুমি, নেমে এসো জীবের জনতায়।

অবাক হয়ে যান বিবেকানন্দ।

কেন?

তিনি তো এমনটি দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। এ যেন তাঁর কাছে বিস্ময়ের স্বপ্ন। ভরে যায় খুশীতে মন। আনন্দে ওঠে নৃত্য করে হৃদয়। আসে চোখে জল। জল আসে আবেগে, অনুরাগে।

উত্তর দিলেন অভ্যর্থনার,—"আমি কোন মহারাজ বা ধনকুবের বা প্রসিদ্ধ রাজনীতিক নহি, কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক······"

কে বললে? তুমি যদি ভিক্ষুক, তবে আমরা তোমার ভিক্ষার ঝোলা। নিয়ে চল আমাদের। নিয়ে চল তোমার সাথে করে। ঐ ঝোলার মত কাঁধে বয়ে। আছি পড়ে পঙ্গু হয়ে। পথ মোদের উপল বন্ধুর। তুমি যদি না পার কর, তবে দিন দিন মাস মাস বছর বছর এমনি বুঝি ভুগতে হবে গ্লানির গুহা ঘোরে। অন্ধকারের কারাগারে। পঙ্কিলতার আবর্ত্তে। জানি না তুমি কে। তা জেনে বা কি প্রয়োজন। তোমাকে বরণ করেছি। তোমাকে স্মরণ করে আনন্দ পাই। তোমাকে দেখলে প্রাণ ভরে যায় আনন্দের কল কল্লোলে। আমরা তোমার সেবক। তুমি আমাদের গুরু। এর চাইতে আর কি আছে বড় পরিচয়?

যেমন খুশী ভেঙ্গে ছেঁচে গড়িয়ে নাও। ঐ কুম্ভকারের মত মাটির গড়ন দিয়ে। তার পরে কর প্রাণ সঞ্চার। আবেগ দাও। দাও অনুরাগ। আর সর্ব্বঢালা ঐক্যের ভালোবাসা। তবেই ক্ষুদ্রকে অখণ্ডের অসীম আয়তনে মিলিয়ে নিতে পারব। পারব সবার সুখে হাসতে। আবার সবার দুঃখে ব্যথায় কাঁদতে।

'গুরুই স্বরু। আবার গুরুই সমুদ্র।

যেমন বন্ধ ঘরের ছোট্ট ফোঁকরটি। আলো আসে। আসে হাওয়া। কিন্তু সীমায়িত। গণ্ডিবদ্ধ। একটা পরিমিত আধ ফোটা প্রসূনের মতো। কিন্তু ঐ ফোকরটিকে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় বড় করে নাও। এক চোখ বুজে প্রথম এগিয়ে যাও। দেখ কত তারা আকাশে। চন্দ্রের কি সুন্দর প্রভা। সমুদ্রের জলে কত সফেন শুভ্রতা। আকাঙ্ক্ষার, অধীরতার পরিধি কিন্তু বেড়ে গেল। এবারে মন শুধু স্বরুতেই রইতে চাইল না। ঐ ফোঁকরকে কেন্দ্র করে শেষে একবারটি চোখ বুজে যাও তন্ময় হয়ে। দেখবে ছোটটি যেন হয়ে গেছে কত বড়। তোমার ভাবের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে অনেক, অনেক দুরে। যাকে একটি আঙ্গুলে ঢাকা যেত, তার মধ্যে এখন লয় হয়েও থৈ পাওয়া যাচ্ছে না। এই হোল খণ্ডের ভেতরে অখণ্ডের দর্শন। গুরুর ভেতরে ব্রহ্ম দর্শন। ভূমানন্দের আনন্দ অনুভূতি। অণীয়ানের ভেতরে অণুর প্রকাশ।

মানে ক্ষুদ্রের ভেতরে বৃহৎএর ভাগবতী তনু। বললেন আবার বিবেকানন্দ,—……"হিন্দু জাতি এখনও তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ হারায় নাই !………হে হিন্দুগণ, তোমরা জাতীয় জীবনের এই বিশেষত্ব হারাইও না। নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ধর্ম্মাদর্শকে দৃঢ় বলে ধরিয়া রাখ।"

যে তোমাকে আছে ধারণ করে, তার দিকে ফিরে তাকাবে না একবারটিও? একবার তাকে আঁকড়ে ধর। আর ভাবনা নেই। গ্লানির অন্ধকারে প্রভাময় হয়ে উঠবে চন্দ্র। বন্ধ্যা মনে ফুটবে প্রশান্তির শতদল।

দুঃখ-দৈন্যে আসবে আলোর আনন্দ। আসবে সাফল্যের বিজয়া। হবে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মই হোল মর্ম্ম। আর মর্ম্ম যার আছে তার কোলে জগৎ থাকে সুখ-সুপ্ত হয়ে। ভেদ কিসের? সব এক। সবাই সমান। বিন্দু বারি আর ঝলক ঝলক সমুদ্রের ঢেউতে তফাত কি! কোন বৈষম্য নেই। যেখান থেকে জন্ম আবার সেখানেই বিন্দু হয়ে ছিটকে পড়া। এই তো খেলা। এই তো লীলা।

এমন সত্য মনে আভাসিত হোলে কি আর দ্বন্দ্ব দুঃখ থাকে? সাম্য। কেবল সাম্যের শান্ত সঙ্গীত। আর প্রেমের প্রেমাঞ্জন। এতেই যেন ভরপুর বলে মনে হবে জগৎ।

চুপ। মৌন।

কথাটি নেই স্বামিজীর মুখে। বসে আছেন শুধু। বসে আছেন একটু বিশ্রামের আবরণ দিয়ে।

কিন্তু নীরব রইবেন এমন তাঁর সাধ্য কি?

অপেক্ষমাণ জনতার উন্মুখর আগ্রহ। যেন তারা চীৎকার করে বলতে পেলে খুশী—তুমি তোমার নিস্তব্ধতার সীমানা থেকে একবারটি নেমে এসো মুখরতায়। কথা কও। চোখে চোখ রাখ। তাকাও একবারটি মুখ তুলে। ভীতির ভয়াল কারা থেকে নিয়ে চল নির্ব্বিঘ্নের সীমানায়। নির্ভয়ের রাজ্যে। জ্বেলে দাও নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখাটি। ক্লিন্ন জীবনের কালী ধুয়ে সম্পাত কর উদ্দীপনের দীধিতি। আনো আলোর বন্যা। গতিশীলতার চলোর্ম্মি। আমরা তোমার সাথে চলি।

একটি প্রাণে যদি বাজে মেঘমল্লার, তবে আর একটি প্রাণের না কেঁদে উপায় কি? আর প্রাণটিও যায় তখন সিক্ত হয়ে করুণার বারি-ধারায়। কান্নার মৌসুম হাওয়ায়।

তন্ময় মনে কে যেন হঠাৎ দিল একটা মর্ম্মরি জাগিয়ে। একটা তুফান খেলে গেল যেন তাঁর মন পুলিনে।

তাকালেন বাহির পানে। দাঁড়ালেন। নেমে এলেন তাঁর আত্ম জগতের সিংহাসন থেকে ক্ষুদ্র জীর্ণ বাতায়নে। একেবারে বারান্দায়। সকলের দর্শনের সীমানায়।

অগণিত জনতা। তাকালেন বিবেকানন্দ। মুগ্ধ হয়ে গেল মন।

বললেন—তোমরা 'নারায়ণ'।

তোমরাই আমার ধ্যান জ্ঞান। আমার গভীর গহন। তোমাদের সেবা করতে পেলেই তাঁর দেখা পাব। দেখা পাব সেই পরম জনের।

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেম পত্রের জবাব দেওয়ার শক্তি দাও। দাও পেশ করতে ওদের আনন্দ লিপিকা তোমার দরবারে। হে অবধারিত, তোমার সঙ্গ লাভের অধিকার থেকে ওদের করো না বঞ্চিত। ওদের সামর্থ্য দাও। দাও শক্তি। মেলে ধরতে দাও নিশীথ নির্জ্জনের অন্ধকারে বাণী দীপ। হে প্রশান্তি,

প্রসূনের মত প্রসৃত হোক তোমার স্নিগ্ধ সুরভি। সূর্য্যের মত বিস্তার লাভ করুক ওদের প্রাখর্য্য। স্নিগ্ধ মধুর হয়ে উঠুক ওদের অন্তর। তুমি এসে ঠাই নিও তার পরে। দিও তোমার করুণার শীতল স্পর্শ।

মানুষের অন্তরই হোল দেবতার মন্দির। শ্রান্ত ক্লান্ত প্রভুর বিশ্রামাগার হোল মানুষের মরম। তাকে যদি ঠিক ঠিক ভক্তির ফালে চাষ দিতে পার, পার যদি নিষ্কাম কাস্তের তীক্ষ্ণ ধারে কামের গুচ্ছকে কেটে কেটে আবাদ করতে, তবে তিনি আসবেন। হাসবেন। ফুটবেন প্রসূনের মত। জীবন তখন বিশ্বের বুকে একটি শতদল হয়ে বিকশিত হবে।

১৬ই জানুয়ারী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী—বক্তৃতা দিলেন ফ্লোরা হলে।

কর্ম্মযোগী ছড়িয়ে যাচ্ছেন মুঠা মুঠা কর্ম্মের বীজ। আবার আবাদ করবার কায়দাও জানিয়ে যাচ্ছেন।

রামপ্রসাদ গাইতেন—"এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা
মন তুই কৃষি কাজ জাননা।"

কাজ জানিয়ে যাচ্ছেন বিবেকানন্দ। এ যেন ঈশ্বরের দরবারের একজন। এসেছেন মর্ত্তের মায়ায় ছায়া সঞ্চার করতে। এসেছেন মানব জীবনের কর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম জানাতে।

যেমন এসেছিলেন নদের নিমাই। ভক্তির সমুদ্রে এনে দিলেন খরস্রোত। হরিনামের ঢেউ। কেবল হরি বললেই মুক্তি। আর হরি গাইলেই শান্তি। দলে দলে ভক্তের দল গেল ছুটে। ছুটে গেল অধীর চিত্তে। আর স্বামিজী এলেন কর্ম্মের কাণ্ডারী হয়ে—

জানিয়ে যাচ্ছেন দেশে দেশে জনে জনে কর্ম্মযোগের যোগ-ধ্যান।

১৯শে যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ কাণ্ডিতে। সেখান থেকে অনুরাধাপুর। তারপর ?

জাফ্‌না। কত লোক। পথের দু-ধারে যেন জনতার অরণ্য।

কেবল একটু দর্শন। একটু নীরব নমস্কার নিবেদন। এই শুধু। তুমি দাঁড়াও। তোমাকে ক্ষণেক দেখি। কেবল এই আকুতি। বিস্ময় লাগে। অবাক নেত্রপাতে প্রত্যক্ষ করেন স্বামিজী মাঠের চাষা আর হাটের শ্রমিকদল। পুলকে মন উঠে নেচে।

ওরে, তোরাও এসেছিস ! আয় আয়। আমায় দেখবার জন্যে তোদের এত ব্যাকুল বাসনা। নে, দেখে নে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। তোদের দুফোটা চোখের জল আমার চলার পথ দেয় সিক্ত করে। আমি পথ চলতে পারি না। তোদের কান্না, আমার বুকে বিধে যায় শেল হয়ে। আমি স্থির থাকতে পারি না। তোদের হাহাকার আমাকে করে পাগল। আমি মত্ত হয়ে ছুটি তোদের একটু হাসি দেখতে। তোদের ডাকে নয় তো কার ডাকে সাড়া দেব ?

দাঁড়িয়ে যান স্বামিজী।

অগণিত জনতা মন ভরে চোখ জুড়িয়ে দেখে নেয় বিবেকানন্দকে। এযেন মৌসুম চলেছে—

চলেছে একটা প্রান্তর থেকে আর একটা প্রান্তরে। সিঞ্চন করছে মরু। দিচ্ছে তৃষা শুষ্ক রিক্ত মাটির তেষ্টায় জল।

এগিয়ে চললেন আরো। এলেন মাদ্রাজে। পাম্বান। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। ২৬শে জানুয়ারী।

স্মরণীয় ২৬শে জানুয়ারী।

কে জানত সেদিন উত্তর কালে ইতিহাসের পাতায় রক্তের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে রইবে ২৬শে জানুয়ারী। উজ্জ্বল হয়ে রইবে ভারতের শৃঙ্খল মুক্তির পবিত্র দিনটির বিজয় বার্ত্তা ধারণ করে।

২৬শে জানুয়ারী। এযেন বেদমন্ত্রের মত সমুচ্ছ্বসিত। প্রভাতের প্রথম সূর্য্যের মত রক্তস্নাত।

কেউ নয়। জানত না কেউ সেদিন। এই ২৬শে জানুয়ারী বয়ে আনবে শতলক্ষ সহীদের আত্মদানের সংবাদ। বয়ে আনবে লক্ষ কোটি নর-নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ! বয়ে আনবে লাঞ্ছিত ভারতের স্বাধীন মুক্ত পতাকা। হয়ত জেনেছিলেন বিবেকানন্দ।

কেনই বা জানবেন না ? অন্তরদ্রষ্টার কাছে তো কিছু গোপন থাকে না !

তাই বুঝি ভারতের কেন্দ্র বিন্দুতে উড্ডীন করলেন গৈরিক পতাকা। ঘোষণা করলেন বৈদান্তিক সাম্যবাদের জাগর মন্ত্র। লিখে দিলেন ইতিহাসের পাতায় অগ্নি আখরে ২৬শে জানুয়ারীর নাম। এঁকে দিলেন কালের বুকে এক মহিমময় স্মরণ সুত্র।

রামনাদাধিপ রচনা করলেন স্মৃতিস্তম্ভ। চল্লিশ ফুট উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ।

লিখে দিলেন তাতে,—"সত্যমেব জয়তে—যে স্থানে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ, পাশ্চাত্ত্য জগতে বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়া, অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ের পর তাঁহার ইংরাজ শিষ্যাগণ সমভিব্যাহারে ভারতের মৃত্তিকায় প্রথম পবিত্র-পদপঙ্কজ স্থাপন করেন, সেই পুণ্যস্থান চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিস্তম্ভ রামনাদাধিপ রাজা ভাস্কর সেতুপতি কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে নির্ম্মিত হইল।"

নির্ম্মিত হলো আর একটি তোরণ অব্যক্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। যা সে দিন ছিল দূরের মিছিল। অনাগত সম্ভাবনার অগ্নি উজ্জ্বল শিলা লিপি।

পরবর্ত্তীকালে তা গ্রথিত হোল ২৬ শে জানুয়ারীর বিজয়স্তম্ভে।

রামেশ্বর থেকে যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন রামনাদাভিমুখে।

রামনাদ। আয়োজন করছেন রাজাবাহাদুর—

আয়োজন করছেন রাজকীয় অভ্যর্থনার।

কেনই বা করবেন না?

কে এসেছেন? এসেছেন রাজাধিরাজ। নরের রাজা নরেন্দ্র।

তোপধ্বনিতে বিঘোষিত হোল স্বামিজীর আগমন বার্ত্তা। সুসজ্জিত রাজ পথ। চলেছে রাজকীয় শকট। স্বামিজী তার মধ্যে। এগিয়ে যাচ্ছেন, যাচ্ছেন ধীর মন্থর গতিতে। বাজছে চতুর্দ্দিকে আনন্দের ঐকতান। জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে রামনাদ।

শকট এসে থামল।

কোথায়?

অভ্যর্থনা মণ্ডপে। তারা অভিনন্দিত করল বিবেকানন্দকে।

আবার চলা হোল সুরু।

পরমকুড়ি, মনমদুরা, মদুরা, ত্রিচিনোপল্লী ও তাঞ্জোর থেকে জানাল স্বামিজীকে সাদর অভ্যর্থনা।

এলেন বিবেকানন্দ কুম্ভকোণম্।

এ যেন কর্ম্মযোগীর আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ। কেউ নয়, কেউ বঞ্চিত হবে না যোগীর যোগ-জ্ঞান থেকে। সবাই সমান ভাবে গ্রহণ করবে। জীবনের শূন্য মন্দিরে জ্বলবে প্রাচুর্য্যের প্রদীপমালা। সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠবে আলোর ঝলক। মন মরুর দহন থেকে যাবে প্রশান্তির প্রচ্ছায়। শান্তির সরোবরে।

৬ই ফেব্রুয়ারী।

এলেন বিবেকানন্দ মাদ্রাজে।

শত শত লোকের অবিচ্ছিন্ন মিছিল।

দাঁড়িয়ে আছে তাঁরা প্লাটফর্ম্মে।

মাদ্রাজ!

নামহীন গোত্রহীন সন্ন্যাসীকে ভারতের আত্মসত্যের ধারক হিসেবে, ভারতীয় সাধনার ঐক্যের প্রতিভূরূপে যারা প্রেরণ করেছিল সুদূর দিগন্তে, সমুদ্রের ওপারে, সেই মাদ্রাজ আজ আবার বরণডালা আর শুভ্রমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের বীর বীরেন্দ্রকে বরণ করবার জন্য অধীর আগ্রহে।

বিজয়ী বীর আজ তার সাধের মাদ্রাজে এসে দাঁড়িয়েছেন—

দাঁড়িয়েছেন তার সমুন্নত শির তুলে। তার বহু সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্মরণ দলিল নিয়ে।

কি লেখা তাতে?

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা।

আর?

দয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সেবা, ত্যাগ ও তপ।

আর নেই কিছু?

জ্ঞান, ধ্যান ও জয়।

জয়, জয় করে এসেছেন বিজয়ী বীর। জয় করে এসেছেন পাশ্চাত্ত্যের ভোগ মুগ্ধ মন ত্যাগের তপ তিতিক্ষায়। দিয়ে এসেছেন জ্ঞান, কর্ম্ম, সত্য ও মুক্তির বাণী।

৮৬

সংসারে তো অনেক কান্না। কিন্তু সে কান্নার পেছনে কি নেই হাসির উৎসটি লুকানো? আছে। সে উৎসটিকে উদ্ধার করাই হোল ঈশ্বরানুসন্ধান।

সংসারে তো অনেক দুঃখ। অনেক অত্যাচার। কিন্তু তাই বলে কি স'য়ে যেতে হবে তা নীরবে? না। এর পেছনে যে শান্তির সুখ স্বীকৃতিটি রয়েছে তাকেই বের করতে হবে খুঁজে খুঁজে।

সংসারে তো অনেক মৃত্যু। অনেক অশান্তি। তাই বলে কি নীরবে কেঁদে কেঁদে ফেলতে হবে চোখের জল? কেবল কি মৃত্যুর বিকৃত ভান আর কান্নার সকরুণ তানই হবে মানুষের আজীবনের সঙ্গি?

না। এর পেছনে যে বিভ্রমের আবরণ রয়েছে তাকে উন্মোচন করতে হবে। হবে মায়ার ছলনাকে ছিন্ন করতে। তার পরে জীবনের সংবাদ। শাশ্বত আত্মার আত্মীয়তা। একেই বলে অমরত্ব প্রাপ্তি। জীবন জিজ্ঞাসার জবাব। ঈশ্বরের সঙ্গ লাভ।

কিন্তু তা কেমন করে? কোন পথে?

সত্যের পথে।

যেখানে অক্ষমা। যেখানে অত্যাচার। যেতে হবে সেখানে এগিয়ে, এগিয়ে যেতে হবে মানুষের মত মানুষের দাবী নিয়ে। ওরে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়াই হোল ঈশ্বরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। আত্মগর্ব্বী যারা। যারা অত্যাচারী তাদেরকে দুর্ব্বলের মত ক্ষমা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করবার নাম ভীরুতা। এই ভীরুর দল শুধু কেবল দুঃখই পায়, আঘাতই সয়। এই ভুবনে তাদের ঠাঁই হয় না।

যারা মানুষের রক্তে মানুষের মজ্জায় রসনা তৃপ্ত করে, তাদেরকে চরমতম আঘাত হেনে তাদের স্ব-দম্ভ আস্ফালনকে খর্ব্ব করাই হোল সত্যপ্রীতি। আর সত্যপ্রীতি মানেই হোল ঈশ্বরকে ভালোবাসা। লোভীর লালসার খোরাক না হয়ে তার লোভকে ত্যাগের তলোয়ারে টুকরো টুকরো করে দেয়ার নামই মহত্বের প্রতিষ্ঠা।

মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া হলে দাঁড়িয়ে পাঁচ হাজার জনতার সম্মুখে ঘোষণা করলেম বিবেকানন্দ, ঘোষণা করলেন তাঁর উপস্থিত কর্ম্মপন্থা।—মানুষ চাই।

খাটি শক্ত লোহার মত দৃঢ় সতেজ মানুষ। যারা সত্যের ধ্বজা ধরে মৃত্যুকে হেলায় খেলায় বরণ করতে পারবে এমন মানুষ। যারা অশিবের আলয়ে শিব সুন্দরের মঙ্গল মন্ত্র উচ্চরণ করতে পারবে, পারবে যারা মিথ্যা ছলনার টুঁটি চেপে ধরতে, এমন মানুষ। "ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই।" আমি চাই—"লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানের দৃঢ়-বিশ্বাস-রূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।" কিন্তু স্মরণ রেখো ভাই, তোমাদের বন্ধু তোমরাই। তোমাদের আত্মসত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে হতে হবে উদ্বুদ্ধ। সমৃদ্ধ করতে হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন। "গণ্যমান্য উচ্চ পদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর ; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর।......আমি তথাকথিত অনেক ধনী বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। তাহারা আমাকে জুয়াচোর ভাবিয়াছে।"

ওরা আমাদের কথা ভাবে না। ভাবতে পারে না। নিরন্ন অসহায় মানুষের কান্না শুনে ওরা করে আনন্দে নৃত্য। ব্যথার গান শুনলে ওরা পায় পরম তৃপ্তি। ওদের মন আচ্ছন্ন রাতের তিমিরে। তমোগুণে আবৃত হয়ে দিন দিন শুধু মানুষের রক্ত শোষণ করতেই হয়েছে ওরা অভ্যস্ত। দরিদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ওরা চালায় ওদের প্রতাপের চাকা। গরীবের চোখের জলে অবগাহন ক'রে পায় আনন্দের স্বাদ। বুভুক্ষার হাহাকারে ওদের বুকে জাগে না একটুও করুণার ক্ষীণ অনুভূতি। মানুষের মৃত্যুই ওদের উৎসবের আনন্দ। মানুষের হাহাকারেই ওদের প্রসন্ন দিনের উদ্বোধন। আর মানুষের ব্যথা-বেদনায়ই বিশ্বশোষিদের সাধনার সিদ্ধি। তাই সামলে চলতে হবে। করুণার পাত্র নিয়ে অসহায় ক্রন্দন করে ধনীর দুয়ার থেকে কুড়িয়ে এনোনা অপমানের গ্লানি। অক্ষমতার অমর্য্যাদা। আর দরিদ্রতার অবমাননা। "......দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থানে বিচরণ করিয়া দেখিলাম সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পরিপুর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।"

তাদের সুখ দুঃখের ভাবনায় নেই কেউ মগ্ন হয়ে। নেই ঐ জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল প্রায় সমাজের কুড়ে কুটিরের দিকে তাকিয়ে।

সংস্কারকেরা তো বহু চেষ্টাই করলেন। কিন্তু তারা হয়েছেন ব্যর্থ।

কেন?

ওরে, আগে তো নিজেকে জানতে হবে। পরিচয় নিতে হবে আমি কে তার। তবে তো অন্যের ভাবনা। অন্যের জন্যে চিন্তা। তার পরিচয়। তার স্বভাব অভাবের খবর।

কিন্তু "সংস্কারকেরা বিফল মনোরথ হইয়াছেন।........কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাঁহাদের একজনও সকল ধর্ম্মের প্রসূতিকে বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই; ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি!"

সমাজে ধরেছে প্রবল ফাটল। ঘুণ ধরেছে সমাজে। হালকা বুলির বাহারে সংস্কার হয় না। চাই মনে-প্রাণে খাঁটী সংস্কারক হওয়া। কোথায় তেমন আদর্শ পুরুষ? মূল ব্যাধির শিকড়টিকে আগে করতে হবে উৎপাটিত। তবে তো বিষ বৃক্ষের পতন। কেউ কারু শত্রু হতে পারে না। বাইরের কন্‌কনে হাওয়া এসে ঢুকতে পারে না ঘরে। যদি আঁটা থাকে দরজা। এই ব্যথার কান্না, এই দুর্গতি দুর্দ্দশার জন্যে দায়ী আমরাই।

বললেন বিবেকানন্দ,—"আমরাই" আমাদের সর্ব্বপ্রথম দুর্দ্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—আমরাই একমাত্র দায়ী। আমাদের অভিজাত পূর্ব্ব পুরুষগণ ভারতীয় জনসাধারণকে পদদলিত করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাহারা অসহায় হইয়া পড়িল। এই অবিরত অত্যাচারে দরিদ্র ব্যক্তিরা, তাহারা যে মানুষ, তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া (ক্রীতদাসের মত) কেবল জল তুলিয়াছে ও কাঠ কাটিয়াছে। তাহাদিগকে এই বিশ্বাস করিতে শিখাইয়াছে যে গোলামী করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, তাহাদের জন্ম জল তুলিবার, কাঠ কাটিবার জন্য।"

ওরে ও মূঢ়, আপন মুখে কালির আলিম্পন দিয়ে সং দেখার আনন্দ পাচ্ছ? আপনারই বুকের মাঝে বপন করছ যক্ষার জ্যান্ত জীবাণু?

একদিন ঐ ক্ষুদ্র ক্ষত সারাটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিঃশেষ করবে মুহূর্ত্তে। সঞ্চিত রক্তের লালিত্যদীপ্ত তনুশ্রী দু'দিনে যাবে ম্লান হয়ে। সুখ

শুপ্তি ভেঙ্গে যাবে। নয়ন নিয়ত হাবু-ডুবু খাবে নীর-তরঙ্গে। বেদনার বিলাপে গুমরে গুমরে অসহায় ভাবে শুয়ে পড়তে হবে মৃত্যুর কোলে। হাসি খেলা নয়। নয় ছলা কলা। কাকে ঠকাচ্ছ? বঞ্চিত করছ প্রভাতকে তার কিরণ দীপ্তি থেকে? বঞ্চিত করছ মানুষকে তার চিরন্তনের দাবী থেকে? তার আজন্মের অধিকার থেকে? এ আবরণ দু'দিনের।

ঐ দেখ, নেমে আসছে তোমাদের প্রসন্ন প্রভাতের বুকে তমসার ছায়া সন্ধ্যা। আনন্দের আসরে ভেসে আসছে কান্নার কাকলি। উৎসবের অঙ্গনে হাহাকারের হা-হুতাস। বংশ মর্য্যাদা, কৌলীন্য আর জাত্যভিমান। এই নিয়ে চলতে চাও মানুষের বুকের ওপর দিয়ে প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করে? না-না-না। সে দিন আর এক পা এগোতে রাজি নয়। যে যেমন তাকে তেমন ছাঁচে ঢাল। তবে যদি মুক্তি মেলে। রাজার ছেলে রাজা হবে, আর চাষার ছেলে এক মুঠা ভাত পাবে না? তার অধিকার নেই মানুষের রাজ্যে বাস করবার? এমন বর্ব্বর ও পাশবিক মতবাদের ঠাঁই নেই আজিকার পৃথিবীতে। সুযোগ দাও, দাও প্রতিটি মানুষকে অধিকার। দেখবে চাষার ছেলে রাজার আসনে বসতে সক্ষম হবে। হবে দীন দরিদ্রের অবহেলিত লাঞ্ছিত সন্তান মানুষের মত মানুষ। তাকে কোন অধিকারে পদদলিত করে রাখছ? "যদি বংশানুক্রমিক ভাব সংক্রমণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়,তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্ব্বলকে অগ্রে সাহায্য কর। ব্রাহ্মণ যদি বুদ্ধিমান হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অপরের বিনা সাহায্যেই শিক্ষালাভ করিবে। অতএব এই দরিদ্রদিগকে, ভারতের পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইতে হইবে।

জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সবলতা-দুর্ব্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক বালিকাকে শুনাও ও শিক্ষা দাও যে, সবলদুর্ব্বল উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলের ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন—সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে।"

ভ্রান্ত মিথ্যা বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে লাভ হয় না সত্য বস্তু। মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে আবরণের গুঠনে চোখ ঢেকে কত দিন আর রাজত্ব করা চলে?

যাহা সত্য। যাহা শাশ্বত, চিরন্তন, তার বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করবে আকাশ, মাটি, আর জল। তার বন্দনা গান গাইবে বন, পাখী, পবন আর সমুদ্র।

কি দিয়ে তাকে ঢেকে রাখবি রে?

বজ্রমন্দ্রিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন স্বামিজী—

ঘোষণা করলেন বৈদান্তিক সাম্যবাদের অমর মন্ত্র। আর ধিক্কার দিচ্ছেন আত্মগর্ব্বী উচ্চবর্ণদের। তোমাদের এ গর্ব্বিত শির ধুলায় হোক ধূষরিত। হীন দীন বলে যারা আজও অবজ্ঞাত, অবহেলিত, আসুক তারা এগিয়ে, এগিয়ে আসুক রক্তঝরা দুর্গমের দিগন্ত থেকে। তারা খেটে খাওয়া মানুষ। দেহের শোণিতে রচনা করবে তারা পৃথিবীর বুকে সুখের স্বর্গ। চাইনা ধনীর ধনের ঝনৎকার। তার দয়ার দাস হয়ে পলে-পলে, তিলে-তিলে, বিন্দু বিন্দু রক্ত নিঃশেষ করতে। ভারতের উত্থানকে কেউ পারবে না রাখতে বিঘ্নের বাঁধ দিয়ে আটকে। সে জাগবে, উঠবে, প্রতিষ্ঠা করবে জগতের বুকে তার শ্রেষ্ঠ আসন।

কিন্তু "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক মুদীর দোকান থেকে; ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা জগতে নেই, এত শান্তি, এত প্রীতি, ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!!"

বেরিয়ে এসো। এসো তোমরা অন্ধগলির নিরন্ধ্র থেকে। বস্তির আলো মলিন কুক্ষি থেকে। "হে আমার ভারত! জাগ্রত হও! কোথায় তোমার জীবনী-শক্তি? সে শক্তি তোমার অমর আত্মায়।........."

আত্মাই সত্য। আত্মাই শাশ্বত, তাকে বঞ্চিত ক'রে মহৎকাজ হবার নয়। তাকে জাগ্রত করলে তবে সকলের জাগরণ, সবাকার মুক্তি, হে আমার শ্রমিক ভাই, আমার মেহনতি জনতা, তোমরা এসে দুনিয়ার দুয়ারে প্রতাপের পদ পাত কর। কর যাত্রার সূচনা, জয় যাত্রার। বিলাসীর জাত, আত্ম সুপ্তির জাত সোনার পালঙ্কে শুয়ে তোমাদের শোণিত সুরা পান করছে নিয়ত। তোমরা তা করতে দিও না। দিও না আপন বুকের লাল সুধা পান করতে অবাধে নির্ব্বিবাদে।

ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের জন্যে আহ্বান করছেন গণদেবতা—আহ্বান করছেন জনগণকে। আর বলছেন ডেকে ডেকে,—বলছেন নয়া ভারতের উদ্বোধনী মন্ত্র,—"অন্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা—তোমার স্বজাতি; সর্ব্বত্রই তাঁহার জাগ্রত হস্ত, সর্ব্বত্রই তাঁহার জাগ্রত কর্ণ, সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না……এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য।"

মরা নদীতে এলো ঝটিকার তরঙ্গ। প্রান্তে প্রান্তে আন্দোলিত হোল বজ্র ঘোষের বীর বলিষ্ঠ বাণী। যেন আহত ব্যাঘ্র মত্ত মধ্যাহ্নের মত উঠল ক্ষুব্ধ গর্জ্জন করে।

দিল সুপ্তি ভেঙ্গে সুষুপ্ত জাতির। এলো প্লাবন। প্লাবন এলো আলো বন্যার মহা তরঙ্গের। সে তরঙ্গ স্পন্দনে কম্পন জাগল সমাজে—দেশে ও জগতে। মিথ্যার বেসাতি নিয়ে যাদের কারবার তাদের বন্ধ ঘরের দুয়ার গেল খুলে। অবহেলিত, লাঞ্ছিত পতিতের দল জানল, তারাও মানুষ। বাঁচার প্রচুর অধিকার রয়েছে তাদেরও। ভারতের মাটি, ভারতের জল, জঙ্গল, আকাশ ও মাটিতে বিচরণ করতে তাদের কেউ রাখে না বাঁধা দেয়ার অধিকার। যারা তা দিয়ে দিয়ে এতদিন পঙ্গু করে রেখেছে, তাদের চিনে নিতে একটুও বিলম্ব হোল না। তাই তো দেশের জনসাধারণ হোল নব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। প্রচারের পবিত্র সঙ্কল্প নিল বৈদান্তিক সাম্যবাদের। আর কর্ম্মের কুঠার নিয়ে যাত্রা করল মরুময় দুর্গমের দিগন্তে। প্রতিষ্ঠিত হোল মাদ্রাজে একটি স্থায়ী কেন্দ্র।

যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন মাদ্রাজ থেকে কলকাতার পথে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী। সোমবার। আরোহণ করলেন জাহাজে স্বামিজী।

বাংলা দেশ!

নাড়ির টান রয়েছে যার সঙ্গে, রয়েছে রক্তের যোগ। প্রাণের মিল। এই সেই শ্যাম সবুজ বাঞ্ছিত দেশ। জন্মভূমি বাংলা।

মা, অনেক দূরে গিয়েছিলেম তোমার কোল ছেড়ে। সে তো আজকের কথা নয়। দীর্ঘ দ্বাদশ বছর পেরিয়ে গেছে। পেরিয়ে গেছে কত ঝঞ্ঝা ব্যাকুল দিনগুলো এক দুই করে। কিন্তু তোমায় আমি ভুলিনি। ভুলতে পারিনি। কেমন করে ভুলব? তোমার শ্যামল আচল বিছানো আঙ্গিনায় খেলেছি আমি শৈশবের খেলা। তোমার লীলা কোমল নীর-সমীরে আমি দিনের কোঠা পেরিয়ে এসেছি মাসের কোঠায়। তার পরে বছরের সীমানায়। তোমার শীর্ণ জীর্ণ কঙ্কাল বুকের স্তনাঞ্চল সরিয়ে আমি পান করেছি সঞ্জীবনী সুধা।

দেখেছি দুচোখ ভরে তোমার সজল আঁখিদুটো। কত অভাব। কিন্তু তবুও তোমাকে দেখেছি স্নেহের আবরণে ঢাকা। তুমি সদা হাস্যময়ী। কিন্তু কোন সন্তান পারে নীরব রইতে মায়ের চোখে জল দেখে? তাই তো গিয়েছিলেম মা। গিয়েছিলেম বড় দুঃখ বড় ব্যথা বুকে লয়ে অজানার অভিযানে। ফিরে এসেছি। জানি না কি নিয়ে এলাম। আর তুমি বা কি দেবে তোমার প্রবাস থেকে ফিরে আসা সন্তানকে। তবে শুধু এইটুকুই জানি—

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে—
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।'

তুমি কারুণ্যপুর্ণেক্ষণা। তুমি মরুতপ্ত দগ্ধ প্রান্তরে বিসর্পিত শান্তি।

আহা কি না মধুমুগ্ধ রূপ! চোখ যেন আর ফেরে না! ফিরতে চায় না। জুড়িয়ে গিয়েছে আমার সব ক্লান্তি। সব ভ্রান্তি। সব গ্লানির মাঝে পেয়েছি যেন এক অনির্ব্বচনীয়ের আনন্দ। অভয়ের মুগ্ধ সঙ্গীত। অন্ধকারের ঐশ্বর্য্যে আলোর অনির্ব্বাণ দীপশিখা। আয় মা এমন মূর্ত্তিতেই আয়!

খুলে গেছে পুঞ্জিত মেঘের আগল আটা দরজা। আর ভয় নেই। আমরা এসেছি। এসেছি তোমার শৃঙ্খল মুক্তির মন্ত্র নিয়ে। তোমার চরণ বন্দনা করতে।

তুমি একবার দাঁড়াও—

দাঁড়াও মাগো, এক হাতে দানব হন্তা খড়্গ, আর হাতে অভয়ের আকাশ নিয়ে। ঝরুক তোমার এক চোখে স্নেহশান্ত সমুদ্র। আর এক নেত্রে অগ্নিবর্ণ অশনি।

জাহাজে দাঁড়িয়ে জন্মভূমি বাংলাকে প্রণাম জানালেন বিবেকানন্দ।

নোঙর ফেলল। লাগল জাহাজ খিদিরপুরের জেটিতে।

জনতার জোয়ার। অধীর তারা। উদ্বেল হয়ে ছিল এতক্ষণ দর্শনের প্রতীক্ষায়। জয়ধ্বনিতে মন্দ্রিত হয়ে উঠল আকাশ। নামলেন স্বামিজী। দাঁড়িয়ে আছে স্পেশ্যাল ট্রেন। আরোহণ করলেন স্বামিজী। আকাশের অরুণিমার প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ত্যেও আভাশিত হোল আর একটি দীপ্তিময় তপন। ঢুকল শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ৭টা ৩০ মিনিটে।

যেমন বোশেখের আকাশে বৃষ্টি আসে মন্দ্রিত ঝঙ্কারে, ঠিক তেমনি যেন জনতার ঝড় ফেটে পড়ল শিয়ালদায়। ওরা জয় দিল। 'জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়'। জয় স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়' বলে।

স্বামিজীর মনে তখন সমুদ্রের সংক্ষুব্ধ গর্জ্জন। আকাশের উন্মুক্ত দিগন্তের ইশারা।

'একজাতি একপ্রাণ একতার' স্বপ্নে বিভোর বিবেকানন্দ। জনতীর্থের দিকে তাকিয়ে যুক্ত করে জানালেন প্রণাম। নামলেন। অভ্যর্থনার আয়োজনে কোথাও নেই বিন্দু ত্রুটী। পল্লবে, কুসুমে। সঙ্কেতে, শকটে একটুও অবহেলার স্পর্শ নেই। রচিত হয়েছে তোরণদ্বার। থেকে থেকে বাজছে বাদ্য। সম্মুখে তরুণ সমাজ। পেছনে প্রৌঢ়। মাঝে বৃদ্ধ নর নারীদের অপূর্ব্ব শোভা সমারোহে মিছিল চলল এগিয়ে। ছেলেরা টানছে শকট। টানছে ঘোড়া খুলে দিয়ে।

ওরে, এযে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা। স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা।

আহুত হোল সংবর্দ্ধন সভা।

২৮শে ফেব্রুয়ারী। শোভাবাজার রাজপ্রাসাদ। বিশিষ্ট নাগরীক। পণ্ডিত। কতলোক। এলো তারা এগিয়ে—দিল মানপত্র—অভিনন্দন লিপিকা।

উত্তরে বললেন সাগ্নিক সন্ন্যাসী—

বললেন—ওঠো। জাগো। আঁখিপাত কর ঐ দীন—দরিদ্র, পতিত-পীড়িতদের দিকে। শীতরাত্রির অন্ধকার থেকে ওদের নিয়ে এসো আলোর সীমানায়।

"আমি তোমাদের ওপর এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও……… সেই দীন, দরিদ্র, পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ-কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর,—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।" যাদের কথা কেউ ভাবে না। যাদের সজল দুটি আঁখি মুছিয়ে দুটো শান্তির অভয়ের কথা কেউ উচ্চারণ করে না। সেই আজন্ম লাঞ্ছিত ভাইদের পাশে গিয়ে তোমরা দাঁড়াও। তাদের ডেকে বল—

'ভয় নাই ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

তাদের সেবা কর, তাদের দুঃখ দিনের ম্লান সন্ধ্যায়, তাদের বন্ধ্যা মনের মরু-দিগন্তে ছড়িয়ে দাও মুঠা মুঠা আলোর আশ্বাস। জীবনের সংবাদ। বিঘ্নের বেদীকে চুরমার করে দাও তোমার চলার ছন্দে। ভয়কে জয় কর অগ্নিদীপ্ত সূর্য্যের স্বাক্ষরে। "হে বাঙ্গালী যুবকগণ, তোমরা গ্রহণ কর আমার এই কার্য্যভার"

গ্রহণ কর সেবাধর্ম্মের ব্রত।

ওঠো। একবার স্বপ্নের কবর থেকে বেরিয়ে এসো মুক্ত দিগন্তে। মৃত্যুর গুহা গহ্বর থেকে জীবনের পরিধিতে। সম্মুখে তোমার কর্ম্মের উত্তাল সমুদ্র। পাড়ি ধরতে হবে। পথ দুর্গম, দুস্তর সে পারাবার, হোক। তোমাকেই সে তুফান দোলায় দোলতে হবে। যেতে হবে মুক্তির পারে যাত্রীদের নিয়ে। যেতে হবে শান্তি তীর্থে রাত্রির রাজত্ব থেকে।

আর শোন হে বাঙ্গালী সন্তান,—"কোন মহান আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না।…………রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক ধর্ম্মবীর, এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি।" এসো মহান প্রভুর মহান পতাকাতলে। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে একবার দৃঢ় মনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর। বল 'সত্যমেবজয়তে'। সত্যের ধ্বজা ধরে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ঐক্যের বিশুদ্ধ সূত্রে হব আমরা আবদ্ধ। স্বপ্নিল গোধূলির বুকে আনব জীবনের প্রচণ্ড প্রতাপে নতুন দিনের বাণী। আমাদের কলকণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিতে জাগ্রত করব সুপ্তির কোল থেকে অবজ্ঞাত জাতিকে। জাগ্রত করব, দরিদ্র, লাঞ্ছিত শ্রমজীবী জনগণকে। তারাই হবে আমাদের মিছিলের প্রথম পদক্ষেপ। তারাই হবে আমাদের কুঞ্জের পারিজাত।

হে প্রভু, তমিস্র রজনীর বুকে সম্পাত কর তোমার আলো-কান্তি। অপসৃত কর ধূম-ধূলির আবরণ। অম্বরে যেমন ছড়িয়ে দিয়েছ নক্ষত্রদ্যুতি, তেমনি ওদের অন্তরেও ছড়িয়ে দাও আলো-কান্তি। হে অনন্ত, একবার, শুধু একবার তুমি সহায় হও আমার নির্দ্ধারিত কর্ম্মপ্রবাহে। এসো তুমি, নেমে এসো মানুষের মনে। ওগো এমন বড় আর কি আছে জগতে। এমন যে আকাশ, পৃথিবী তার চাইতে কম নয় তো মানুষের অন্তরাকাশ। আর তুমি তো আকাশ, পৃথিবীর চাইতেও বড়। আবার তোমার ঠাঁই তো মানুষেরই অন্তরে। ওগো, তুমি অতলস্পর্শি সমুদ্রের শেষের খবরটি দাও। দাও সেই উত্তাল গম্ভীর মৌনের ভাষা জানিয়ে জনে জনে।

ওরা তোমাকে জানুক। অনুভব করুক অনুভূতির মন্দিরে, তবেই আমার হবে। তবেই ওরা জাগবে, মৃত্যুর দিনেও পাবে প্রাণের আশ্বাস। ভঙ্গুর হয়েও পাবে চলার ছন্দ। দাও, দাও প্রভু, তোমার নিবিড় গভীর সত্ত্ব। সমুদ্র সত্ত্ব।

মর্ম্মভেদী আহ্বান। আর মর্ম্মদীর্ণ আবেদন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনল সবাই। শুনল স্বামিজীর বজ্রনির্ঘোষ, যেন পেল ওরা নতুন প্রাণ, নতুন আকাশ, নতুন সূর্য্য।

জীবধাত্রী বসুধার আকাশে, বাতাসে, বনে, কান্তারে, সমুদ্রে, সৈকতে শুনতে পেল যেন অমিত বীর্য্যের বাণী। শুনতে পেল যেন আত্ম প্রতিষ্ঠার আহ্বান, দেখল যেন আত্মার আকাশে লেখা হয়ে গেছে নিশ্চিত দৃঢ়তার বলিষ্ঠ সঙ্কল্প। এ শুধু সঙ্কল্প নয়। বজ্রদৃঢ় শপথ, মানুষের মত বাঁচতে হবে। দেশের জন্ম উৎসর্গ করতে হবে জীবন। সত্য শুদ্ধ পবিত্রের পতাকা নিয়ে চলতে হবে, চলতে হবে বিঘ্ন মঙ্গল পথে। কঙ্কর কণ্টকিত পথে। মুক্তির অবারিত উন্মুক্ত দিগন্তে। আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল দেশটা।

জেগে উঠল সুপ্তিমগ্ন জনতা

হে শ্যাম সবুজ অরণ্য, তোমার আবেদনের সুরটি মর্ম্মরিয়ে উঠুক আমার চিত্তাকাশে।

সমুদ্র, তোমার উর্ম্মিমুখর তরঙ্গ উদ্বেলতায় ভরে দাও আমার প্রাণ-পুলিন। হে আকাশ, তোমার মত শুদ্ধ, পবিত্র অবারিত হোক আমার অনুভূতির প্রাঙ্গণ। আমি মুক্ত দিগন্তে সমীরণ হয়ে বয়ে যাই। প্রভু, স্মরণ লোকে তোমার দয়ার দাসকে ধরে রেখ। ধরে রেখ চির-জাগ্রত করে। তোমার শেখান গান গাইবার সামর্থ্য দাও। দাও তোমার সুর-ছন্দে ঝঙ্কার দেবার শক্তি। আমি জোয়ার আনি মরা-নদীতে। মরুর বুকে রচনা করি কুসুমের উদ্যান। আর অন্ধকারের নিশিঘোরে জ্বেলে দেই উদ্দীপনের দীপ-শিখা।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী—

বক্তৃতা দিলেন 'সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত' সম্বন্ধে। ওরে, বেদান্ত একটি দুর্ব্বোধ্য দর্শন নয়। নিহিত রয়েছে বেদান্তের অন্তরে সনাতন ধর্ম্মের সুর ও সঙ্কেত। ভিত ও বনিয়াদ। বেদান্তের ধুয়ো ধরে যারা ধর্ম্মকে আটকে রেখেছেন ভাতের হাঁড়িতে, ধর্ম্মের নামে যারা সংস্কারের সাধনায় মত্ত হয়ে আঘাত হানছেন মানুষে মর্ম্মমূলে, তাদের মিথ্যা পাগলামোতে ধর্ম্ম রক্ষা পাবে না।

বর্ণাশ্রম অবলুপ্ত। দেখা দিয়েছে জাতি ভেদ। বাংলার সনাতনীরা তো ব্রাহ্মণ আর শূদ্র বৈ বর্ণই দেখছেন না। কিন্তু এ মিথ্যা প্রতারণায় জাতির জয়যাত্রা ব্যাহত হবে। ধর্ম্মের সুন্দর শাশ্বত পবিত্রতার মাঝে দেখা দেবে মিথ্যা আর ছলনা। তুলে দাও অবান্তর ভেদজ্ঞান। বর্ণ বিভাগ। সবাইকে অধিকার দাও। কেন তারা বঞ্চিত হবে? বেদ পাঠে অধিকার রয়েছে প্রতিটি মানুষের।

অন্তরায় কিসের?

প্রচার করে চললেন বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। কুসংস্কার আর গোঁড়ামির ঠাঁই নেই এখানে।

আপোষকামী মন লয়ে তাদের সঙ্গে মিতালি নয়। অদ্বৈত বেদান্তের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে খান খান করে ফেলতে হবে, ফেলতে হবে ভেদ বৈষম্যের বিষ বৃক্ষকে। এই হোক আজিকার তরুণ বাংলার ব্রত। এই হোক আজিকার জাগ্রত বাংলার সাধনা।

দিকে দিকে পড়ে গেল সাড়া। অবলুপ্তির অন্ধকার থেকে জেগে উঠল সুপ্তিমগ্ন জাতি। তাকাল বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। এলো কত পণ্ডিত। এলো তর্কের মন নিয়ে। কিন্তু চলে গেল তারা পরাজয়ের গ্লানি স'য়ে তাদের সংস্কারের সঙ্কীর্ণ বাতায়নে।

তোমরাও এসো। ছুড়ে ফেলে দাও অন্তরায়ের আবরণ অন্ধকারের অন্তরালে। ঐ দীন-হীন পতিতদের জন্যে দু'ফোটা অশ্রু ঝরুক। তাদের ব্যথা তাদের অভাব, বঞ্চনা ও হাহাকার তোমাকে আঘাত করুক থেকে থেকে। তাদের জীবন বেদ রচনা কর। রচনা কর তোমার বুকের দরদ আর বেদনার অশ্রু দিয়ে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে আত্ম মুক্তির সাধনায় মত্ত হোলে চলবে না। তুমি ধার্ম্মিক এই দাবী যদি করতে চাও, তবে আগে ক্ষেত্র তৈরী কর। তৈরী কর সাধন বেদী। সকলের মুক্তির মাঝেই ঈশ্বরের অনুকম্পা। তার দয়া চাও তো নররূপী নারায়ণের সেবা কর। দীনের দীন হ'য়ে তার কথা শোন। তাকে বাঁচার সামর্থ্য দাও। আত্মার পরিচয় জানো।

"দূরে—অতি দূরে, যথায় লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি, কিং বদন্তীর ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্য্যন্ত প্রবেশে অসমর্থ—অনন্তকাল ধরিয়া স্থির ভাবে সেই আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃ প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যে কখন কিছু নিষ্প্রভ, কখন অত্যুজ্জ্বল কিন্তু চিরকাল অনির্ব্বাণ ও স্থিরভাবে থাকিয়া শুধু সমগ্র ভারতে নয়, সমগ্র চিন্তা জগতে উহার পবিত্র রশ্মি, নীরব অননুভাব্য শান্ত অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি বিকিরণ করিতেছে ; ঊষাকালীন শিশির সম্পাতের ন্যায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপ কলিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে—এই সেই উপনিষদের তত্ত্বরশ্মি ; এই সেই বেদান্ত দর্শন।......তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অথবা যে কোন প্রকারের অদ্বৈত বাদী বা দ্বৈতবাদী হও, অথবা তুমি যে নামেই আপনাকে অভিহিত কর না কেন, তোমাকে তোমার শাস্ত্র উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে।"

আর যদি তাই কর, তবে আর থাকবে না ভেদ জ্ঞান। আচার সংস্কারের ক্ষুত ক্ষুতে ভাব।

ওরে, যখন ঈশ্বর উপলব্ধি ঘটে তখন আর মন পড়ে থাকে না বিভুতির বিভায়। চন্দ্র আকাশে প্রভাময় হোলে কি আর থাকে অন্ধকারের বিধুমন ? মন কি আর বিধুর বিনতি জানায় মোমবাতির ক্ষণ প্রভার ? তখন সে আপন আলোকে আলোময়। সুচী-ভেদ্য অন্ধকারও পারে না তার প্রভাকে নিষ্প্রভ করতে।

'তমেবৈকাং জানথ আত্মানম্ অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ।'

আত্মাকে জানো। আর সব হেয় বাক্য ত্যাগ কর। আত্মাকে জানলেই হবে আত্মায় আত্মায় মিতালি। তখন আত্মাধার নরকে মনে হবে নারায়ণ। আর বাধা কি তখন তার সেবায়? এই আত্মার সোপান বেয়ে বেয়েই যেতে হবে পরমাত্মার অভিসারে।

নিছক কতগুলো মিথ্যা আবরণের গুণ্ঠনে ঢেকে রেখোনা নিজেকে। তুমি হয়োনাকো শম্পা। তুমি হও চন্দ্রপ্রভ। কেবল দিয়েই যাও। জাতি বর্ণ দেখে দেখে নয়। সবাইকে সমানভাবে আলো দান কর। কানে কানে বলে দাও জাগরণের মন্ত্র। 'বহু জন সুখায়, বহুজন হিতায়' নিজেকে অর্পণ করে তুমি হও অর্পণা। অর্পণানন্দে জীবের জনতায় নিজেকে একীভূত কর। ঝাপিয়ে পড় কর্ম্ম প্রবাহে।

অবাক লাগে। বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে গুরু ভাইরা। বলে তুমি এ কি ভাব নিয়ে এলে? সন্ন্যাস জীবন চলবে নির্দ্ধারিত পথে। কেবল তপ, ধ্যান আর মুক্তি। এই তিনটি পথ বৈ আর কোথায় যাবে সে? জাগতিক দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুখ তার স্নিগ্ধ শয্যা তলে হাতছানি দিয়ে আনতে পাড়বে না সন্ন্যাসীকে। পতন উত্থানের কোন দিকেই থাকবে না তার আঁখিপাত। সে হবে নির্জ্জনচারী। নিঃসঙ্গ। একাকী। শুধু মুক্তি আর মিলন। সেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা। তুমি একি কথা বলছ নরেন?

আলমবাজার মঠের গুরু ভাইরা নরেনকে সম্মান দেখাল। বরণ করল। কিন্তু মানতে চাইল না তাঁর মতবাদ। এখানেই কুজ্ঝটিকা। এখানেই ঝড়। আর বিদ্রোহীর মনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শের নবরূপায়ণও ঘটেছে এখানেই।

ওরে মন্দিরকে নিয়ে আয় বিরাটের বিশ্বে। ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে সম্প্রসারিত কর তাঁকে বাহির জগতে। তোর কি সাধ্য তাকে আটকে রাখবি অমন ছোট্ট একখানা প্রাচীর ঘেরা ঘরে?

তিনি কারুর একা নয় রে! সবার ডাকে তিনি সাড়া দেন। তুই সেই সবার হয়ে তার পুজায় এগিয়ে যা। এড়িয়ে যাসনে। মাড়িয়ে যা। মনে প্রাণে তুই ত্যাগী হ। কিন্তু দীন হীনের তুই সেবায়েৎ সাজ। "যত্র জীব, তত্র শিব।"

আয়, নেমে আয় তোর তপের আসন থেকে কর্ম্মের কোলাহলে। কোটি

মৌন ভারতবাসীকে দেখিয়ে দে তাদের কল্যাণের পথ। বুঝিয়ে দে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। রেখে দে তোর ফুলের অর্ঘ্য। শান্তি স্বর্গ রচনা কর এই মর্ত্ত্যের মাটিতে। তিনি তোর ঐ ক্ষুদ্র ঘরে ফুলের অর্ঘ্য নেয়ার জন্যে বসে নেই। কবির কথায়,—

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।'

এসো এসো তোমরা নেমে এসো। নেমে এসো ধূলি মলিন বিশ্বে। ওরে মুক্তি খুজছিস্?

'মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন' প'রে
বাঁধা সবার কাছে।'

* * * *

কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম 'পড়ুক ঝরে'।

বাউল বিদ্রোহী ঘোষণা করলেন—

ঘোষণা করলেন মানবাত্মার জয়। ঘোষণা করলেন কর্ম্মের পথে ঈশ্বর উপলব্ধির সুনির্দ্দিষ্ট পথ।

হে কর্ম্ম বীর,—

'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণ-সজ্জা।'

বুঝল তারা, বুঝল গুরু ভাইরা। মুক্তির মহামন্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে জনারণ্যের বিপুল বিস্তারে। মানুষের সেবাই ঈশ্বরোপাসনা। গ্রহণ করল তারা সেবা ধর্ম্ম। রামকৃষ্ণানন্দ যাত্রা করল দাক্ষিণাত্যে। যাত্রা করল বেদান্ত প্রচার করতে। অভেদানন্দ আর সারদানন্দ রইল পাশ্চাত্যে। আর অখণ্ডানন্দজী গেল দুর্ভিক্ষ পীড়িত আর্ত্ত জনের সেবায় মুর্শিদাবাদে।

ঘুমন্ত বায়ুর মত শ্রান্তি এলো নেমে—

নেমে এলো একখানা অবসাদের আবরণ নিয়ে শ্রম শ্রান্ত স্বামিজীর দেহে। আর যেন চলতে চায় না পা। বাকপটু একটু নীরবতার প্রশান্ত প্রচ্ছায় দাঁড়াতে পাড়লে যেন কত না শান্তি পান! এমনি শরীরের অবস্থা।

কিন্তু তাই বলে এলিয়ে দেননি দেহখানা বিশ্রামের ফেন শয্যায়। বলে চলছেন সমানে। ব্যাখ্যা করছেন গীতাতত্ত্ব। সে কতনা আবেগ, কতনা ভক্তি। তৈরী করছেন আগামী দিনের জন্যে তাঁর নবদীক্ষিত শিষ্যদের।

তোমরা যদি বলতে পার, পার যদি বলতে—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে, "তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এসকল রোগ, শোক, পাপ, তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে।........তুমি সর্ব্বশক্তিমান—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাঁহার বাহির দিক দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি পাত কর—সমগ্র জগৎকে বল্, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।" তোমার মাঝে জগৎ সুপ্ত। শক্তি ঘুমন্ত। তাকে জাগ্রত কর। শক্তিকে ডেকে তোল। নিয়ে যাও সহস্রারে। সেখানে কত আনন্দ। দেখবে তোমার মাঝে ঘটেছে নবসূর্য্যের উদয়। নতুন পৃথিবী সৃজনের আনন্দে মগ্ন মন হয়ে যাবে আত্মভোলা। চিত্ত নিবিষ্ট হয়ে পড়ে থাকবে ঐ এক ধ্যান এক জ্ঞান এক চিন্তায়।

শুনছে ভক্তবৃন্দ। শুনছে মন প্রাণ সঁপে গুরুজীর গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা। কিন্তু ডাক্তার এসে বললে, অমন করে কথা বলবেন না স্বামিজী—অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন কিন্তু। আর আপনার এখন বিশ্রাম নেয়া একান্ত প্রয়োজন। ওদিকে প্রবাস যাত্রার জন্যে অনুরাগী ভক্তবৃন্দ অনুরোধ করছে অনেক দিন ধরে—চলুন স্বামিজী, একটু হাওয়া বদল করে আসি। এমন করে চললে কি শরীর টিকবে আর?

অনুরোধ এড়ান কঠিন। বাধ্য হয়ে দিতে হোল সম্মতি।

কিন্তু এ কি শুধু বিশ্রামের আয়োজন?

না। তবে?

কক্ষচ্যুতি। একটা সীমানা থেকে আর একটা সীমানায় যাত্রা। একটা

কক্ষ থেকে আর একটা কক্ষ পরিক্রমণ। সেখানেও কর্ম্মের আহ্বান। প্রচারের হাতছানি। উত্তর ভারতে প্রচারের প্রচ্ছন্ন বাসনা মনকে বসল যেন পেয়ে। যাত্রা করলেন স্বামিজী দার্জ্জিলিং।

সঙ্গে গেল মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, গিরিশচন্দ্র, মিঃ গুড্-উইন, ডাক্তার টার্ণবুল আরো কত। সেই মাদ্রাজী শিষ্য আলসিঙ্গা পেরুমল, জি, জি, নর সিংহাচার্য্য ও সিঙ্গারা ভেলু মুধালিয়র। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্থান করে দিলেন তার 'রোজ-ব্যাঙ্ক' নামক ভবনে। আমন্ত্রণ জানালেন দার্জ্জিলিংয়ের মিঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জী। মাত্র মাস দু'য়েকের বিরতি।

কর্ম্মমুখর বিবেকানন্দ ফিরে এলেন—

ফিরে এলেন আবার কলকাতায়।

* * * * *

আলমবাজারের মঠ!

সন্ন্যাস গ্রহণের জন্যে আকুল আকুতি জানাচ্ছে—

আকুতি জানালে কয়েক জন যুবক—ওগো, তুমি তোমার দয়ার দানে ধন্য কর আমাদের জীবন। শিখিয়ে দাও বহু বাসনার সঙ্কট উত্তরণের মন্ত্রটি। হে কৃপাকঠোর, তোমার করুণার কটাক্ষে মলিন মেঘ-পুঞ্জকে কর নির্গলিত সুধা। নির্ব্বাপিত হোক যত মায়া-মোহের দীপমালা। আমরা তোমার প্রদর্শিত পথে চলতে শিখি। বাসনার মুমূর্ষু মূর্চ্ছনা থেকে নিয়ে এস, নিয়ে এস প্রশান্তির হিম মৃত্তিকায়। ওগো, তুমি আমাদের অন্তরের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর। রেখ না আর ফেলে, ফেলে রেখ না রিক্ত পিপাসুর চুম্বনের চিতায়। ক্ষুধার সাহারায়। বিদীর্ণ বিলাপের মধ্যে ফেলে রেখে আর দিও না বিস্বাদের মালা।

ওরা বহু দিন ধরে আছে আলমবাজারের মঠে। ছিলেন না তখন বিবেকানন্দ দেশে। চলছিল তখন পাশ্চাত্ত্যে তাঁর বিজয় অভিযান।

বলছেন স্বামিজী,—এমন আকুল হয়েছিস তোরা। তা বেশত।

বড় আনন্দ পেলেন স্বামিজী। বললেন হবে।

কিন্তু গুরু-ভাইরা জানাল অমত। সবার বেলা নয়। কেবল একজনের বেলায়। কেন?

তার পূর্ব্বজন্ম নাকি পাপ পঙ্কিল। ক্লেদ পৃক্ত। কিছুতে চলবে না তাকে নাম দেয়া। স্বামিজী তো শুনে অবাক। যেন একখানা বিস্ময়ের মলিন মেঘ এলো ভেসে, ভেসে এলো তার জাগর চোখের সামনে। অবাক দৃষ্টিতে রইলেন
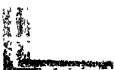
তাকিয়ে। বললেন—তা হোক না। তা বলে কি ওরা পারবে না এজন্মেও মুক্তির মহাতীর্থে মুমুক্ষু যাত্রীর বেশ ধারণ করতে? ছিঃ ছিঃ এমন কথা কি বলতে আছে? ওরে "আমরা যদি পাপীকে আশ্রয় প্রদান না করি, তবে ওরা আর কোথায় যাইবে। কোথায় আশ্রয় পাইবে? এ যখন উচ্চতর পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য মহান সঙ্কল্পে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তখন ইহাকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা যদি উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎচরিত্র ব্যক্তিগণের চরিত্র সংশোধনে অক্ষম হও, তাহা হইলে গৈরিক পরিধান করিয়া আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ কেন?" মনে রেখো, ও-বস্ত্র সৌখীনতার আবরণ নয়। সত্যের ও ত্যাগের উন্মীলিত শায়ক সঙ্কেত।

মূক হয়ে যায় তারা। কথা বলবার অধিকারটুকু যেন মুহূর্ত্তে গেল মিলিয়ে। জানাল সম্মতি।

হয়ে গেল দীক্ষা। গ্রহণ করল সন্ন্যাস, গ্রহণ করল যুবকগণ নবযুগ ধর্ম্মের আদর্শ। এলো এগিয়ে। এলো স্বামিজীর চরণ বন্দনা করতে।

বলল—গ্রহণ কর আমাদের দীন প্রণতি। দাও অভীমন্ত্র। যেন তোমার আশিস্ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারি জগতে তোমারই মহান আদর্শ। আশীর্ব্বাদ করলেন বিবেকানন্দ। বললেন—তোমাদের আর ভাবনা কি? "মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ তোমরা, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

মনে রাখবি 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। প্রাণটা রাখবি হাতের মুঠায়। জীবের ক্রন্দনে যদি দরকার হয় ঐ মুঠা খুলে অকাতরে দান করবি প্রাণ। ওরে, দুঃখীর দুঃখ দূর করে, আর্ত্তের ক্রন্দন নিবারণ করে, বঞ্চিতের বুকে আশার বাণী জাগিয়ে দিতে পারলেই বুঝবি তোর সাধনা হয়েছে সার্থক। সবাইকে ডেকে বলতে হবে। সকলের মাঝে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে দিতে হবে। তবেই তো সন্ন্যাস ধর্ম্মের দুশ্চর ব্রত মহিমান্বিত হয়ে উঠবে। ফিরে তাকালেন বিবেকানন্দ তাঁর গুরু-ভাইদের দিকে।

বলতে লাগলেন আবেগ-দীপ্ত ভাষায়—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' —আমাদের জন্ম। কি কচ্ছিস্ সব বসে? ওঠ্—জাগ নিজে। নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।"

কিসের জন্যে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিস ? যদি এলি তো আমার মত আয়। দাগ রেখে যা এই পৃথিবীর বুকে। তোর দ্বারা উপকৃত হোক জগৎ। জীবনে জীবনে গেয়ে যা আশার গান। কেবল নির্জ্জন বনচারী হয়ে ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন হলেই ঈশ্বর মেলে না। ঐ বঞ্চিত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত মানুষদের সেবা কর। তবে যদি তাঁর দেখা মেলে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কর। মানব সঙ্ঘ। সেবাশ্রম। তোরা সবাই সেখানে থাকবি। মোহমুগ্ধ মানুষকে শোনাবি ত্যাগ, তপ ও কর্ম্মের মন্ত্র। শোনাবি মানুষকে মানব ধর্ম্মের বাণী, সুন্দর ও সুখী করে তুলবি এই জগৎটাকে। জনে জনে বিলিয়ে যাবি প্রাণ প্রবাহের খরতরঙ্গ। মানুষ পাবে বল। পাবে বীর্য্য। পাবে বাঁচার শক্তি।

প্রকাশ করলেন বিবেকানন্দ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা।

ডাকা হোল সভা—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে। আবেদন জানালেন বিবেকানন্দ। আবেদন জানালেন--শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত ও শিষ্যদের। সাড়া দিল তারা। এলো বাগবাজারের বলরাম ভবনে। বললেন স্বামিজী,— "নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।······আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ কোরে সংসারাশ্রমে কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা এ কার্য্যে সহায় হোন।" সম্মতি জানালো ওরা। সম্মতি জানালো সবাই এক বাক্যে।

নাম রাখা হোল সঙ্ঘের, রামকৃষ্ণ-প্রচার বা রামকৃষ্ণ-মিশন।

ঘোষণা করলেন মিশনের উদ্দেশ্য—

"মানবের হিতার্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্য্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'মিশনের' উদ্দেশ্য।"

"ব্রত—জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমতকে এক অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তরমাত্র জ্ঞানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনই এই মিশনের ব্রত।"

সাধারণ সভাপতির পদে বরণ করল সবাই বিবেকানন্দকে।

ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ যথাক্রমে কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে হোলেন নিযুক্ত। সঙ্ঘের সম্পাদক হোলেন এটর্ণী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সহকারী পদে নিযুক্ত হোলেন ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ ও শরচ্চন্দ্র। সমিতির অধিবেশনের স্থান ও সময় নির্ব্বাচিত হোল—বলরামের বাড়ী, প্রতি র'ববার বেলা ৪টার পরে।

চলতে লাগল কাজ।

কিন্তু দিন যেতে না যেতেই একখানা কালো মেঘের সঞ্চার হোল—

সঞ্চার হোল কয়েকজন গুরুভ্রাতার মনে।

সেকি ?

ভাবল তারা, এ বুঝি পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারা। স্বামিজী বুঝি প্রচার করে চলছেন তাই।

কেন এমন ভাবনা এলো ?

সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, সে তো ত্যাগের পথে মুক্তির অভিসার। কি ছাই সেবা, সেবা করে চিৎকার করছে। সেবা করবে কার ? মায়া মোহের বাঁধন ছিঁড়ে সন্ন্যাসী থাকবে অনাসক্তির পথে। আর বিবেকানন্দ বলছে কিনা আর্ত্তজনের সেবা কর। দরিদ্রের মুখে অন্ন দাও। অবলাকে সাহায্য কর। কর্ম্ম-মার্গে আরূঢ় হয়ে মানবের সেবায় আত্মাহুতি দাও।

এমন সব কত ভাবনা কত চিন্তা এক এক করে এসে বিভ্রমের ছায়া ফেলে যাচ্ছে গুরু-ভাইদের মনে।

আবার ভাবছে—ঠাকুর তো বলতেন ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ।

তবে কেন আবার বলছে নরেন, স্বদেশ-প্রেমের মহা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে। বলছে কেন মানব-সেবা ব্রত গ্রহণ করতে ? এ তো সন্ন্যাস ধর্ম্মের অঙ্গ নয়।

মন যেন ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠতে চায়। চায় প্রতিবাদ জানাতে এহেন কাজগুলোর।

অবশেষে একদিন বলল তারা স্বামিজীকে। হারে নরেন! এ তোমার কেমন ধারা ? কোথায় ত্যাগী হয়ে মায়া মোহের বাঁধনকে করব ছিন্ন। তা নয়, তুমি বলছ আবার সেই ফাঁদেই পা দিতে ?

রাগ করলেন না স্বামিজী। পেলেন না মনে ব্যথা।

ডেকে আনলেন সেই ভ্রান্তির গুহা থেকে প্রীতির পরিধিতে। বললেন ধীরে-ধীরে,—"তুমি কি বলতে চাও যে, লেখাপড়া, সাধারণে ধর্ম্মপ্রচার, আর্ত্ত, রোগী, অনাথা এদের সেবা করা ও দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করলেই

অমনি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে? 'ঈশ্বর অন্বেষণ কর, জগতের উপকার করতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা করা মাত্র,' এ রকম কথা ঠাকুর ব্যক্তিবিশেষকে বলছেন বলেই যদি ঐ সমস্ত কাজ মন্দ বলে মনে কর, তাহ'লে তুমি ঠাকুরের উদ্দেশ্য একবিন্দুও বোঝ নাই।"

বলতে বলতে শান্ত দীপ শিখাটি যেন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। বলতে লাগলেন ঘনগম্ভীর কণ্ঠে,—"তুমি কি মনে কর যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছো?………… তুমি যে ভক্তিকে লক্ষ্য করছো, তা' আহাম্মকের ভাবুকতা মাত্র, যা' মানুষকে ক'রে তোলে কর্ম্মবিমুখ ও কাপুরুষ। আর বলছো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারের কথা? তাঁর অনন্তভাবের কতটুকু হদিস করতে পেরেছি আমি আর তুমি যে, জগৎকে বলতে যাব? স'রে দাঁড়াও। কে তোমার শ্রীরামকৃষ্ণকে চায়, কে তোমার 'ভক্তি' 'মুক্তি' নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ত্র কি বলছে না বলছে কে শোনে? স্বদেশবাসীকে কর্ম্মযোগে অনুপ্রাণিত ক'রে যদি পারি নিমজ্জমান তমোহ্রদ থেকে তুলে নিতে, পারি যদি মানুষের মত নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে তা হলে নরকে যাব আমি লাখ আনন্দের সঙ্গে। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই, যারা নিজেদের ভক্তি-মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্র নারায়ণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে; আমি তাদের চেলা-ভৃত্য-ক্রীতদাস।"

নিস্তব্ধ তমসার গ্লানি সহসা দীপ্তিময় হয়ে উঠল বজ্রের আলোয়। যেন জ্বলন্ত জোনাকির লাখ লাখ কণা বিচ্ছুরণ হোল। পরাধীন ভারতবাসীর নির্ম্মম বেদনা জগদ্দল পাথরের মতো ভারি করে দিল বিবেকানন্দের বক্ষ পঞ্জরটা। কেন্দ্রিভূত শক্তির প্রাবল্যে বিদীর্ণ করে দিতে চাইলেন স্বামিজী অন্ধকারের দুর্ব্বিসহ গ্লানি। যেন বুকটা ফেটে খান্ খান্ হয়ে যেতে চাইল। ফলে হোল কি?

দু'বাহু দিয়ে চেপে ধরলেন বক্ষ সজোরে। দ্রুত পদসঞ্চারণে ত্যাগ করলেন সে স্থান। ঢুকলেন গিয়ে বিশ্রাম কক্ষে। বসে পড়লেন মাটিতে। মুদিত নয়ন। জ্ঞানহীন ভাব। যেন তন্ময়তার কোলে মহামগ্ন তাপস। হোলেন সমাধিস্থ। ওরা সবাই তো অবাক।

যেন একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছে এমন প্রসঙ্গ তুলে। ভীত ত্রস্ত অন্তরে এক-পা দু'পা করে এগিয়ে এলো পিছু পিছু। কি আর আছে বলবার।

এতক্ষণে অন্য জগতের আকাশ-চারী হয়ে গেছেন বিবেকানন্দ।

এসো। এসো নরেন, নেমে এসো তুমি সহজে।

ভেঙেছে ভ্রম ভ্রান্তির কারা-কক্ষ। পেয়েছি অনন্ত আকাশের ঠিকানা। উন্মুক্ত দিগন্তের পথ। তুমিই সত্য। তুমিই স্বচ্ছ। নিস্তব্ধ তমসার সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে তুমিই আমাদের আলোর দিশারী। তোমাকে কেন্দ্র করে যে ভুলের মিনার রচনা করেছিলাম, ভেঙে তা চূরমার হয়ে গেছে। নেই তার কণাটিও আর, পড়ে নেই নরেন। এসো তুমি নীরব রাত্রির স্তব্ধতা থেকে মুখর দিনের আলোয়। তুমি যদি আত্মমগন হয়ে থাকো তো আমরা কাকে ভর করে চলব? কে আনবে সাহারার তপ্ত বুবুক্ষায় শীতলতার বারি বসন্ত? এসো ভাই।

সাড়া দাও। কথা কও।

আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে গুরু-ভাইরা। নীরব প্রার্থনা। আকুতি জানাচ্ছে। পেয়েছে খুজে সমাধান। বুঝল তারা বিবেকানন্দের ভাব-ভাবনার মর্ম্মটি। বুঝল আজ নতুন করে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের সুধা স্বাদ।

ধীরে ধীরে ফিরে এলো জ্ঞান। স্বামিজী চাইলেন চোখ মেলে। এলেন আবার ওদের মাঝে। ফিরে এলেন প্রিয় সতীর্থের ডাকে। বললেন—"………হায়, মুক্তি নাই! এখনও আমাকে অনেক কর্ম্ম কর্‌তে হবে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রীতদাস, তিনি যে তাঁর কর্ম্মভার আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করে গেছেন; যে পর্য্যন্ত না সমাপ্ত করতে পারি, সে পর্য্যন্ত তিনি তো বিশ্রাম করতে দেবেন না!"

মনের ক্রান্তিবৃত্তে ছায়ার মত সঞ্চারিত হয় ঠাকুরের কথা—"নরেন সকলের নেতা।" পরিচালিত করবে নরেন সবাইকে। সঞ্চার করবে শীতল স্নিগ্ধ ছায়া। বেদনায় আনবে প্রশান্তি। কান্নায় দিবে সান্ত্বনা। প্রখর উত্তাপে আনবে বনছায়া। এতো শীঘ্র নির্ব্বিকল্প সমাধি নয় রে নরেন। তোর অনেক কিছু করবার আছে। অনেক অনেক কাজ বাকী। স্বার্থপরের মতো তুই কেবল নিজের মুক্তি চাস্? ঐ যে পড়ে আছে যারা, বেদনায় বিশীর্ণ হয়ে, পড়ে আছে অভাব অনটনের শশ্মান শিয়রে। লাঞ্ছনা, অবহেলার

মরুদিগন্তে, দিবি না তুই তাদের মুক্তির সংবাদটি বলে? দিবি না তাদের ব্যথিত চিত্তে সান্ত্বনার শান্তিবারি ছড়িয়ে? আয় নরেন, নীরবতার আসন থেকে জনারণ্যের মাঝখানে। জনতীর্থের সাধন-বেদীতে। নেমে আয়, আয় রে নরেন!

হে প্রভু, তোমাকে গোচরে আনি এমন সাধ্য কি? একবারটি তোমাকে জানতে দাও। বুঝতে দাও তোমার ভাব। তোমার করুণারুণ কিরণ সম্পাতে ধৌত করে দাও আমার অন্তরের অন্ধকার। নিয়ে এসো আমাকে বিঘ্নের চূড়া থেকে নির্ব্বিঘ্নের সমতলে। বিভ্রাটের বিভ্রম থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে। আকাশের আঁচলে যেমন নক্ষত্রের দ্যুতি, ঠিক তেমনি শ্যামলীর আঁচলেও বেঁধে দাও মুঠো মুঠো। চিরন্তনের আলো-দীপ্ত তনু আভাসিত হোক। আভাসিত হোক আমার কর্ম্ম পথে প্রথম প্রভাতের মতো। তোমার সম্মতি জেনে নেই আমি তাই দেখে।

সাধু নাগ মশাইকে জিজ্ঞেস করেন বিবেকানন্দ,—আচ্ছা নাগ মশাই, "দেখুন এই সব মঠ, সেবাশ্রম ইত্যাদি করছি একি ঠিক ঠাকুরের উপদেশ মত হচ্ছে?"

—নিশ্চয়।

—আমার খেয়াল খুশীর অনুরূপ হচ্ছে না তো?

—কে বললে? ঠাকুর তো এই কথাই বলে গেছেন বারে বারে।

ওরে "জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা।" জীবে সেবা করতে পারলেই ঈশ্বরের সেবা করা হবে। জীবকে ভালো বাসতে পারলেই ঈশ্বর লাভ হবে। তুমি তো তাই করছ। ঠিক ঠাকুরের আজন্মের ইচ্ছাটি তোমার মাঝে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

একটু আশ্বস্ত হলেন বিবেকানন্দ। যেন গ্রীষ্মের নিদাঘদহনে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল মন্দ্রিত ঝঙ্কারে।

শরৎচন্দ্র, স্বামিজীর শিষ্য শরৎ আসে ঋগ্বেদ পড়তে বিবেকানন্দের কাছে। বেশ অধ্যয়ন চলছে। এমনি সময় এলো নাট্য-সম্রাট গিরিশ। বললেন স্বামিজী—বসো।

বসে আছে গিরিশচন্দ্র। স্বামিজী একটু একটু হাসছেন আর বলছেন,—"জি, সি, তুমি বোধ হয় এসব জিনিষ পড়ার কোন দরকার বোধ কর না, চিরকাল কৃষ্ণ বিষ্ণু নিয়েই কাটিয়ে দিলে!"

বললে গিরিশ—"কি হবে ভাই আমার আর বেদ পড়ে? বেদ বুঝবার মত আমার বুদ্ধিও নেই, অবসরও নেই। ও সমস্ত জিনিষকে দূরে রেখে প্রণাম করে আমি ভগবান রামকৃষ্ণের কৃপায় ভব-সমুদ্র পার হ'য়ে চলে যাব। তিনি তোমাকে দিয়ে লোক শিক্ষা দেবেন, ধর্ম্ম প্রচার করাবেন, তাই ও সমস্ত তোমাকে পড়িয়েছেন।"

গিরিশ ঘোষের কথা শুনে মনে জোর পেলেন দ্বিগুন স্বামিজী।

আবার বলল নাট্য-সম্রাট,—"আচ্ছা নরেন। বেদ-বেদান্ত তো অনেক পড়েছো। ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ, লাম্পট্যাদি বীভৎস পাপ, আরও কত রকম অন্যায়, অবিচার ও দুঃখ, যাহা আমরা সচরাচর দেখতে পাই, তার কোন প্রতিবিধান তোমার বেদ-বেদান্ত লেখে কি?..............নরেন, বেদ-বেদান্তের মধ্যে এর কোন প্রতিকার পেয়েছো কি?"

চকিতে চঞ্চল হয়ে উঠল স্বামিজীর চিত্ত। এলো চোখে জল। আরক্তিম হয়ে গেল তনু। যেন আর দাঁড়াতে পারছেন না। ভাবাবেগে সমস্ত দেহ কাপছে থর্ থর্ করে। এক-পা দু'-পা করে ওখান থেকে চলে গেলেন স্বামিজী।

এলেন ক্ষাণিক বাদে ফিরে।

যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে।

বললেন গিরিশ ঘোষকে,—"দেখ জি, সি, জগতের দুঃখ কষ্ট দূর করবার জন্য, এমন কি একজনের বেদনা লাঘব করবার জন্য আমি সহস্রবার জন্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। নিজের মুক্তি চাই না। আমি প্রত্যেককে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য করতে চাই।" তোরা আমাকে বল দে। সাহস দে। আমি যেন ঠাকুরের আরব্ধ কর্ম্মের বাস্তবরূপ ফুটিয়ে তুলতে পারি ব্যষ্টির জীবনে। সমাজ-দেশ ও কালের বক্ষে।

এমনি দিনে তাঁর মনে আরো একটি স্বপ্নের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।

স্থাপন করতে হবে একটি নারী মঠও। যেখানে থাকবে ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীরা। প্রচার করবে নারী-জাতির আদর্শ। তাদের উন্নতির সোপান রচনা করে দেবে। অবলা জাতিকে তার নিজের পায় দাঁড় করিয়ে দেয়ার শিক্ষা দেবে। দেবে বল ও শক্তি। কেন তারা পড়ে রইবে আজন্মের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে? কেন সে পুরুষের কাঁধের বোঝা হয়ে জীবনের প্রথম দিনটি থেকে উপান্ত বেলায় হাজির হবে?

তাকে শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে ভালোর ভালো করে তুলতে হবে। তারপর নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করবে নিজেরাই। পুরুষকে রইতে হবে না পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে রইতে হবে না নারীর বোঝা টানার জন্যে। পুরুষের দাসী বৃত্তির জন্যেই কি নারীর জন্ম? তার কি নিজস্ব কোন সত্তা নেই? আছে, আছে। শক্তি যে সুপ্ত নারীরই অন্তরে। তাকে জাগ্রত করবার ইন্ধন দিলেই সে শক্তি জাগ্রত হবে। ঘরের কোণে কুললক্ষ্মী করেই কেবল তাকে আটকে রাখা চলবে না। তাকে জীবনের দাঁড়াবার অধিকার দিতে হবে। দিতে হবে এ দুনিয়ায় স্বাধীন সত্তা নিয়ে বাঁচতে। ওরে নারীর মুক্তি বই নরের মুক্তি নেই। নারী উৎস, নর স্রোতধারা। নারী স্নেহ-মায়া-মমতা; আর নর তারই রূপকার। তাই আগে মুক্তি দিতে হবে মমতাময়ী নারীকে। আটকে রেখ না তাকে চিরাগত সংস্কারের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে।

উঠে পড়ে লেগে গেলেন স্বামিজী মঠ-সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু দেহ আর কতইবা সইবে। দেখলে যেন শঙ্কা জাগে মনে। দিন দিনই যেন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে শরীর। গুরু ভাইরা ভয় পেল মনে। ইংলণ্ড থেকে এসে গেল মিস মূলার।

সবাই মিলে বলল—

বলল কিনা—চলুন স্বামিজী, একটু হাওয়া বদলে আসি। শরীর তো এত শ্রমে চলতে আর চাইবে না তা না হলে।

মন চায় না যেতে। কিন্তু তবুও তাদের একান্ত অনুরোধের মর্য্যাদা রাখতে হোল স্বামিজীকে।

৬ই মে শিষ্য ও গুরু-ভাইদের নিয়ে যাত্রা করলেন—যাত্রা করলেন কলকাতা ছেড়ে আলমোড়ার পথে স্বামিজী।

আলমোড়া।

অভিনন্দন জানাল আলমোড়াবাসী অকুণ্ঠভাবে। লোদিয়ায় জানান হোল স্বামিজীকে অভ্যর্থনা। কত লোক। যেন জন-সমুদ্রে ডেকেছে বান। বিরাট শোভা যাত্রা। স্বামিজী অশ্ব পৃষ্ঠে আরূঢ়। মিছিল চলল এগিয়ে। মুঠামুঠা চাল আর ফুল বৃষ্টি করতে লাগল পুরনারীগণ।

উৎসুক জনতার তন্‌হাতুর মন। তারা আছে উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনবার জন্যে। পাঁচ হাজার জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন স্বামিজী—বললেন তাঁদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে,—"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ শয়নে-স্বপনে যে ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারত জননী পার্ব্বতী দেবীর জন্ম ভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্য পিপাসু ব্যক্তি শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয়।.........ইহাই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি........আমার প্রাণের বাসনা এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শন শাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্ব্বত রাজ্যের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ দিন কয়টি কাটাইব।"

কর্ম্ম ক্লান্ত সৈনিক যেন চাইছেন একটু প্রশান্তির প্রচ্ছায় মাথা রেখে দু'দণ্ডের বিশ্রাম। হিমালয়ের হিম গম্ভীর ধ্যানী মূর্ত্তির সঙ্গে একীভূত করতে চাইছেন নিজেকে। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম? কোথায় ছুটি? "কাজ শেষ না হলে তো মুহূর্ত্ত দাঁড়াবার সময় নেই!" বন্ধুগণ, সম্ভবতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মতো এবারেও বিফল মনোরথ হইব,......।"

ঠাকুর যে আমার হাতে দিয়ে গেছেন কঠোর কর্ম্মের রজ্জু।

কেমন করে ফিরে আসি গুহা নির্জ্জনে? তবুও আমার ঐকান্তিক বাসনা,—"আমি অকপটভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাহাই নহে, একরূপ বিশ্বাস করি যে, জগতের অন্যান্য স্থানে না হইয়া এইখানেই আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটিবে।"

কিন্তু যে জন্যে এখানে আসা তার খবরটা কি?

শরীর কি একটুও ফিরেছে ?

ফিরেছে। কিন্তু শ্রমতো কমেনি! দিন রাত লোক আসে—আসে স্বামিজীর মনোমুগ্ধকর বাণী শুনতে।

তবুও শান্তি। তবুও বিশ্রাম।

এমনি দিনে খবর এলো মুর্শিদাবাদ থেকে। অক্লান্ত শ্রম ও যত্নে অখণ্ডানন্দজী আর্ত্ত পীড়িতদের সেবা করে চলেছেন। বড় আনন্দ পেলেন স্বামিজী। খুশীতে ভরে গেল মন।

ফিরে এলেন স্বপ্ন সাধনা থেকে, ফিরে এলেন নির্জ্জন ধ্যান ও মুক্তির মোহনা থেকে কর্ম্ম মুখরতায়। চাইলেন নিজেই যেতে মুর্শিদাবাদ। কিন্তু দিল না যেতে, যেতে দিল না গুরু-ভাই ও ভক্তবৃন্দ। অবশেষে আর কি করা। পাঠিয়ে দিলেন স্বামিজী নিত্যানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দজীকে অখণ্ডানন্দজীর পাশে। কলকাতায়ও মিশনের কাজ চলছে জোড়। যেখানে যে বীজ বপন করেছিলেন স্বামিজী, সেখানেই সাফল্যের অঙ্কুর উদ্‌গম। খবর আসতে লাগল চতুর্দ্দিক থেকে—

সেই মুর্শিদাবাদ, মাদ্রাজ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেশ ভালোভাবেই চলছে প্রচার। চলেছে সেবার কাজ।

মন তপতন্‌হা থেকে চলে এলো কর্ম্মব্রতে। চলে এলো সেবা ধর্ম্মে। সদ্যোত্থিত অরুণোদয়ের মতো নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—ঝাঁপিয়ে পড়লেন থৈ হীন তরঙ্গ উদ্বেল কর্ম্ম-সমুদ্রে।

আড়াই মাস কাটল আলমোড়ায়। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বিভিন্ন দেশ থেকে এলো আমন্ত্রণ লিপি।

হোলো যাত্রা—এলেন বেরিলীতে।

অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ। জ্বর এলো। জ্বর এলো তার প্রতাপের উত্তাপ ছড়িয়ে। কিন্তু তাই বলে নেই বিশ্রাম। নেই বিরতি।

শরীর তো পুড়ে যায় জ্বরে। তাই নিয়েই দর্শন করতে গেলেন অনাথ আশ্রম। উৎসাহ দিলেন, দিলেন সাহস ও বেদান্তের বাণী ছাত্রদের। প্রতিষ্ঠিত হোল একটি ছাত্র-সমিতি।

১২ই আগষ্ট বেরিলী ছেড়ে যাত্রা করলেন আম্বালার পথে।

আম্বালা।

কাটল একটি সপ্তাহ। কিছুটা সুস্থ হলেন স্বামিজী এখানে এসে।

আলোচনা করতে লাগলেন নানামত নানা পথের পথিকদের সঙ্গে। আবার এসে হাজির হলো মিঃ সেভিয়ার।

সেখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মুরী ও বারমুলারের গাঁ ছুঁয়ে যাত্রা করলেন শ্রীনগর। একটু সুস্থ হলেন এখানে এসে।

এবারে কাশ্মীর অভিযান।

কাশ্মীর। আহা কিনা তার রূপ! প্রকৃতি এখানে ঐশ্বর্য্যময়ী। যৌবনা যুবতীর মতো কমনীয়। সৌন্দর্য্যের অমরা কাশ্মীর। তাই বুঝি লোকে বলে একে ভূ-স্বর্গ। কাশ্মীরের রাজা রামসিং জানাল স্বামিজীকে অভ্যর্থনা। সে কত না সম্ভ্রম।

কাশ্মীর থেকে জম্মু। জম্মু হ'য়ে আবার এলেন শিয়ালকোটে, সেখান থেকে এলেন লাহোরে।

লাহোর থেকে এলেন তিনি জয়পুর। তারপরে ক্ষেত্রী হ'য়ে কিষেনগড়, আজমীর, যোধপুর ও ইন্দোর, হ'য়ে উপনীত হলেন খাণ্ডোয়ায়। প্রায় সমস্তটা রাজপুতনা পরিভ্রমণ করলেন পাঁচ-ছয় মাস কাল ধ'রে।

তারপরে ডাক দিল আবার তাঁর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র—

ডাক দিল স্বদেশের শ্যামতট কলকাতা।

১৮৯৮ এর জানুয়ারীতে চলে এলেন মহানগরীর কেন্দ্র বিন্দুতে।

হে প্রভু, তোমার অকুণ্ঠ আশিস্ পেলে কে পারে চলার পথে বিঘ্নের প্রাচীর তুলতে। তোমার দয়া বই তো এক পা-ও চলবার সামর্থ্য নেই আমার। কিন্তু তোমার করুণারুণ কটাক্ষে রাত্রি যেন রাত্রি বলে মনে হয় না। আমি যেন দেখি তাকে দিনের বৃন্তে একটি অতসীর পুর্ণ প্রস্ফুটনের মতো। সে কত শান্ত। আঁধারের মাঝেও তোমার ঐশ্বর্য্যের শুভ্রতা। তোমার একটি নির্দ্দেশের জন্যে আমি জেগে থাকি দিন রাত্রি। যে দুঃখ-সুখের মঞ্জুষা দিয়ে গেছ তুলে হাতে, তাই ব'য়ে ব'য়ে বেরাচ্ছি দেশ—দেশ। তুমি আমার সহায় হও। নির্জ্জন নিশীথে চুপি চুপি দুটি কথা কয়ে যাও। আমার সব কাজ সব ধ্যান সব জ্ঞান তোমাকে পাবার জন্যেই প্রবাহিত। তোমার সীমাহীন অসীম ব্যাপ্তির সঙ্গে, তোমার অন্তহীন অনন্ত বিস্তৃতির সঙ্গে বেঁধে দিও একটি স্নেহের রাখিবন্ধন। তবেই আমি কর্ম্ম-সমুদ্রের উচ্ছল-তরঙ্গে পাড়ি উজিয়ে পৌঁছিতে পারব সার্থকতার মোহনায়। মুক্তির তীর্থ সমতলে।

মনভরা অভিলাষ বিবেকানন্দের—

সাধ জেগেছে মনে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার।

কোথায়—

ঐ শ্যাম সবুজ অরণ্য পারে। গঙ্গার তীর তীর্থে। বেলুড়ে।

বললেন সবাইকে ডেকে, বললেন মন খুলে মনের কথাটি।

—মন চায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করতে। তোরা থাকবি সবাই দল বেঁধে। শব্দ গ্রথিত মন্ত্রের মতো থাকবি। মাতিয়ে তুলবি সারাটা দেশ। প্রচার করবি মানব-ধর্ম্মের মহান-বাণী। সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গ করবি অকাতরে। যে যেমন পারিস, যার যতটুকুন সাধ্য মানুষের সেবায় করবি আত্ম-নিয়োগ।

দেখতে লাগল গুরু-ভাইরা জমি। ভালো জমি তালাস করতে লাগল ঘুরে ঘুরে।

মিলল সে স্থান। বেলুড় গ্রামে। গঙ্গার পশ্চিমকূলে। মিস হেনরিয়েটা টাকা দিল। কেনা হ'য়ে গেল জমি।

সুরু হোল মঠ নির্ম্মাণের কাজ। মিস ওলি বুলও লক্ষাধিক টাকা দান করল মঠের জন্যে। চলল কাজ। এত দিনের স্বপ্ন স্বামিজীর রূপান্তরিত হোল বাস্তবে। মনভরা খুশী। আনন্দে—আবেগে দিনগুলো কাটছে বেশ তৃপ্তির মধ্যে।

ওদিকে আবার সেভিয়ার দম্পতি ঘুরে বেরাচ্ছে—

ঘুরে বেরাচ্ছে হিমালয়ের পথে পথে একটি মঠ নির্ম্মাণের জন্যে। আলমবাজার থেকে মঠ নিয়ে এলো ওরা নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে—বাগান বাড়ীতে। বেলুড় গ্রামে।

স্বামিজীও এলেন চলে সেখানে। বাস করতে লাগলেন আনন্দে। ১৮৯৮এর প্রথম দিককার কথা এগুলো।

চতুর্দ্দিক থেকে ভেসে আসছে সাফল্যের সংবাদ। মুমুক্ষু জনতার অবিচ্ছিন্ন মিছিল। তারা যেন অধীর হয়ে আছে স্বামিজীর দু'টো আশীর্ব্বাণীর অপেক্ষায়।

সমাগত ঠাকুরের জন্মতিথি। আয়োজন করছেন সব নিজহাতে। মহোৎসবের আয়োজন। এলো সে পুণ্য দিনটি।

আহ্বান করলেন স্বামিজী গুরু-ভাইদের। বললেন—তোদের আজ গ্রহণ করতে হবে উপবীত। তোরা সবাই আমার কাছে এসে বোস।

এগিয়ে এলো সবাই মন্ত্র মুগ্ধের মতো। বলতে লাগলেন স্বামিজী,—"শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ। বেদ বলিতেছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার রহিয়াছে।.........অদ্য শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি, এই পুণ্য দিনে ইহারা নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী গ্রহণ করুক ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব। কালে ইহাদিগকে তুলিতে হইবে ব্রাহ্মণ করিয়া।"

কিন্তু তা সাধন সাপেক্ষ। বর্ণ বিভাগ কেন হবে কুলের কুক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত? বর্ণ সে তো অর্জ্জন করতে হয়। অর্জ্জন করতে হয় আপন শক্তিবলে। সাধন মার্গে আরূঢ় হয়ে। ওরে, যে হেতু রাম এসেছে চাষার ঘরে আর শ্যাম এলো ব্রাহ্মণের কুলে, অমনি কি রাম হোল চাষা. আর শ্যাম হবে ব্রাহ্মণ? না রে না তা করে জাত বিভাগ চলে না রে। জানিস না ছান্দোগ্যোপনিষৎ এর গল্প? সরস্বতীর বনতীর। ধীরে এলো নেমে সন্ধ্যা। ফিরে এসেছে ঋষিপুত্রগণ তপোবনে। স্নান করে শুদ্ধ শুচিবাস পরে সবাই বসল ঘিরে গুরু গৌতমকে। এমনি সময় এক বালক এসে প্রবেশ করল। হাতে তার অর্ঘ্যের ফুল। মনে ভক্তির শ্রোত-ধারা। বলল বালক—ভগবান, আমায় দান করুন ব্রহ্মবিদ্যা।

সৌম্য শান্ত তনু বালকের। দেখে মহর্ষি বড় আনন্দ পেলেন। জিজ্ঞাস করলেন—বল তোমার কি গোত্র। এযে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার লব্ধ ধন। গোত্র না জানলে তো তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে পারিনে বৎস!

নিবিড় আকুল প্রাণ বালকের গুমরি উঠল। বলল, ভগবন্! গোত্র তো জানি না। তবে আজ যাই। আসব ফিরে কাল মাকে জিজ্ঞেস করে।

প্রণাম করে প্রস্থান করল বালক।

মাকে জিজ্ঞাস করল তার বংশ ও পিতৃপরিচয়।

কিন্তু পরিচয় পেল না। অশ্রু সজল কাজল চোখে মা জবালা বলল—ওরে, দারিদ্র্য দুঃখের পেষণে তোকে কুড়িয়ে পেয়েছি বাছা। তুই গোত্রহীন সন্তান। এই তোর পরিচয়। রাত পোহাল।

প্রভাতে সোনার অরুণোদয় হয়েছে। সত্যকাম এসে ঢুকল ঋষির তপো-তীর্থে। সরস্বতীতীরে। বলল গিয়ে নত শিরে ভক্তিপ্লুত মনে—ভগবন্—পরিচয় পেলাম না কিছু। গোত্র বলা ভার। বললেন জননী—'জন্ম তোর ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে।' এই মোর সর্ব্ব পরিচয়।

গৌতম উঠে এলেন আসন ছেড়ে। জড়িয়ে ধরলেন বালককে বুকে। আবেগে অনুরাগে সত্যকামকে করলেন আশীর্ব্বাদ। বললেন—তুমি শুধু ব্রাহ্মণ নও। তুমি দ্বিজোত্তম।

ঋত্বিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হোল উপনিষদের মন্ত্র। যেন প্রতিটি শিরা উপশিরায় ওদের সঞ্চারিত হোল মধু মুগ্ধ-ঝঙ্কার। জপ করতে লাগল সবাই গায়ত্রী মন্ত্র।

এ যেন সেই সরস্বতী তীর। তপোবন। আর গৌতম উপবিষ্ট তাঁর অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে।

হয়ে গেল উপবীত।

কিন্তু গোরা হিন্দু সমাজ তো তেতে আগুন।

বললে এ তোমার কেমন ধারা? তুমি উল্টে দিতে চাইছ হিন্দুর প্রথা আচার? তার চিরাচরিত আইন কানুন?

কিন্তু বিদ্রোহী তাঁর হোম বহ্নিতে আহুতি দিলেন প্রতিবাদের পত্রগুচ্ছ। কান দিলেন না বিবেকানন্দ প্রথার নামে শাসন ও আধিপত্যের বাক বিতণ্ডার দিকে। উন্নত শিরে লিখে দিলেন মানুষের চিত্তপটে চিরসত্যের মন্ত্র ছন্দ। জ্বেলে দিলেন অন্ধকার-অন্তরাকাশে সূর্য্যের শিখা প্রদীপ। ফিরিয়ে আনলেন তাদের আত্ম-চেতনা। লুপ্ত সম্বিৎ। সমাজপতিদের প্রতিবাদের প্রাকার দুর্গ ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দিলেন তিনি। বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করতে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ কঠোর হয়ে।

বর্ণের ধুয়ো দিয়ে দিয়ে পঙ্গু করে দিচ্ছে তোমাদের চলমান জীবনকে। উন্মোচন কর জীর্ণ-কন্থার আবরণ। একবার দাঁড়াও সোজা হয়ে।

কি হবে হীন সার্থের পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়ে থেকে? ওঠো। জাগো। ঐ মুক্ত আকাশ। আর অবারিত উন্মুক্ত দিগন্ত।

দাঁড়াও এসে তার মাঝখানে। ব্যাপ্ত হোক চিত্তের চিন্তা। মনের দিগন্ত হোক প্রসারিত। প্রতিরোধ যারা করছেন মানুষকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে, বলব তারা মূঢ়। তারা স্বার্থান্ধ। এ ভ্রান্ত প্রচেষ্টা ক্ষণিকের। দৃঢ় মন লয়ে তোমরা—শুধু তোমরা এগিয়ে এসো। শূদ্র, বৈশ্য আর ব্রাহ্মণে মিলে দ্বন্দ্বের মাঝে মীমাংসা নেই। মনে রেখো পৃথিবীতে আছে শুধু একটি জাত। তা হচ্ছে মানবজাতি। আর শ্রেণী আছে দুটো। এক ধনী আর দরিদ্র। এই-টুকু শুধু জেনে নেও। তার পর যাত্রা কর, যাত্রীদল রাত্রির তপস্যায়। জয় অনিবার্য্য। মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

যুগধর্ম্মের অমোঘ বাণী ঝঙ্কৃত হোল যুগাচার্য্যের কণ্ঠে। প্রাণ—প্রাণ শুধু চাই প্রাণের মতো প্রাণ। করলেন আত্মনিয়োগ গঠন মূলক কাজে।

১৮৯৮র জানুয়ারী থেকে অক্টোবর অবধি কেটে গেল মঠ প্রতিষ্ঠার কাজে। আবার যাত্রা করলেন স্বামিজী—যাত্রা করলেন মধ্য, উত্তর ও পশ্চিমভারতে। কাজ শেষ করে ফিরলেন খাণ্ডোয়ায়।

মাত্র অল্প দিনের বিরতি।

খাণ্ডোয়া থেকে যাত্রা করলেন কলকাতার পথে।

লক্ষ কাজ। তার মাঝেও তোমার স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো আভাসিত হয়। আভাসিত হয় থেকে থেকে। জাগিয়ে যায় সে এক মহা মন্থন। অধীর হয়ে যাই। তাকিয়ে থাকি কপোল-কল্পিত ভারতবর্ষের দিকে। ইচ্ছে হয় হাওয়ার মত উড়ে যাই। জড়িয়ে ধরি তোমার পদ পঙ্কজ, তুমি কি দেবে না সাড়া? সাড়া দেবে না আমার এ কান্নায়?

স্বদেশের মায়া মোহকে কাটিয়েছি। তলিয়ে দিয়েছি তার স্মৃতিকে বিস্মৃতির অতলান্তে। ছিন্ন করে ফেলেছি সকল বন্ধন, কেবল তোমার ডাকের অপেক্ষায় আছি কান পেতে। সম্মতি পেলেই সন্ধানী হয়ে বেরিয়ে পড়ব।

মন মরু। যে দিকে তাকাই দেখি যেন আঁধারের প্রারব্ধ যৌবন। কিন্তু তার মাঝেই আবার নক্ষত্রের ঝিকমিক। স্বাতীর দ্যুতি।

আমি ছুটব। ছুটব সেই দ্যুতি বিচ্ছুরণের দিকে। হে প্রভু, প্রধাবিত হোক তোমার করুণারুণ আশিস। আমি চলে আসি তোমার বাঞ্ছিত ভূমি ভারতবর্ষে। তোমার স্পর্শপুণ্য মৃত্তিকায়। বাংলাদেশে।

এলেন কলকাতায়।

আকুল আকুতি জানিয়ে পত্র দিয়েছিল—

পত্র দিয়েছিল মার্গারেট নোবেল, স্বামিজীর কাছে। ইচ্ছে তার ভারতবর্ষে আসতে। ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে।

তা বেশ তো। কেন অমন করে কান্না?

লিখেছিলেন স্বামিজী,—"দারিদ্র্য, অধঃপতন, আবর্জনা, ছিন্নমলিন-বসন পরিহিত নর-নারী যদি দেখতে সাধ থাকে, তবে চলে এসো, অন্যকিছু প্রত্যাশা করে এসো না। আমরা তোমাদের হৃদয়হীন সমালোচনা সহ্য করতে পারি না।"

স্বদেশ-প্রেমিক পারবে না সইতে, সইতে পারবে না তার ভারতবাসীর নিন্দা বা ফাঁকা সহানুভূতির কথা শুনতে। স্বজাতির দৈন্য নিয়ে অন্যে দু'টো কথা বলুক এ তাঁর কাম্য নয়। এ তাঁর বুকের দহন-জ্বালা। বজ্রাঘাত।

তাই বুঝি অমন চিঠি দিয়েছেন তিনি মার্গারেটের কাছে।

চলে এলো ওরা। এলো ১৮৯৮ এর জানুয়ারীতে।

এলো মিসেস ওলিবুল আর মিস জোসেফিন ম্যাক্লেয়ড ফেব্রুয়ারীতে। মার্চ্চ মাসে মিস মার্গারেট নোবল গ্রহণ করল ব্রহ্মচর্য্য। নাম হোল তার নিবেদিতা।

আশীর্ব্বাদ করলেন স্বামিজী নোবলকে। বললেন —"যাও বৎসে, তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পুর্ব্বে পাঁচশত বার লোক-কল্যাণব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" নিবেদিতা নতশিরে গুরু বাক্য গ্রহণ করল মনে প্রাণে।

চলছে দিন। দিন চলছে সাধন ভজনার অধ্যয়নের ভেতর দিয়ে।

শুনছে নিবিষ্ট চিত্তে গুরুর উপদেশ।

কিন্তু এত শ্রম আর কত সইবে দেহে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ, তাঁর কর্ম্মমুখর পথে যেন প্রবল প্রতিরোধ হয়ে দেখা দিল রোগরিপু। আর উপায় কি? ডাকলেন ডাক্তার। তারা বলল স্থান পরিবর্ত্তন করতে। যদি না বায়ু বদল করেন, তবে দেহ দিন দিন ভেঙ্গে পড়বে। বেড়ে যাবে আরো অসুস্থতা।

যেতে হলো বিবেকানন্দকে দার্জ্জিলিং।

শরীর একটু ফিরল বটে।

কিন্তু শ্রম-মুখর মানুষের ভাগ্যে শুধু শ্রমই নেমে আসে আশীর্ব্বাদের মত।

চুপটি করে রইতে চাইলেও তা আর হয়ে ওঠে না। যেমন নাকি কবি। তাকে যদি না মৌন করে দেয় বিধি, তবে কেউ পারে না তাকে ছন্দ দোলার দোলনা থেকে নামিয়ে আনতে। পারে না কাব্যকুঞ্জের সুরভিমধুর স্নিগ্ধ মাধুরী থেকে সহজের সীমায়িত গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে। তার গান চিরন্তনের। তার কণ্ঠ মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসেও রণিত ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

খবর গেল কলকাতা থেকে—

কি?

কলকাতা মৃত্যুর কবলে।

কেন?

প্লেগ লেগেছে।

প্লেগ?

হ্যাঁ মহামারীর আকার ধারণ করছে দিন দিন। অসহায় নগরবাসী প্রাণ ভয়ে ভীত। ত্রস্ত। তারা এই দুর্দিনে পাশে একটিও স্বজন পাচ্ছে না। তার ওপরে আবার প্লেগ 'রেগুলেশান এ্যাক্টে' মানুষ ব্যতিব্যস্ত। সরকার তার আইন রক্ষার্থে মোতায়েন করেছে ফৌজ।

এমন সংবাদের চেয়ে যদি বিবেকানন্দের বুকের একখানা পাঁজর খসে পড়ত, তবে হয়ত এর চেয়ে কম ব্যথা পেতেন বিবেকানন্দ।

তিনি অধীর উন্মত্তের মত ফিরে এলেন—

ফিরে এলেন কলকাতায়।

অজস্র প্রচার-পত্র ছড়াতে লাগলেন। ছড়াতে লাগলেন রাজপথে, অলিতে গলিতে ও নিরন্ধ্র বস্তিতে। বললেন সাবধান হতে। সতর্ক হয়ে চলতে জন-সাধারণকে। সুরু করে দিলেন সেবা, ডাকলেন বোন নিবেদিতা ও আরো অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে। ঝড়ের মত আত্ম-প্রকাশ করলেন অসহায় পীড়িত জীবের জনতার সেবায় বিবেকানন্দ ও তাঁর বাহিনী।

কিন্তু একটু ভাবনায় পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ।

কেন ?

বলি এত টাকা আসবে কোথ্ থেকে ? বললেন স্বামিজীকে। বললেন এক গুরু ভ্রাতা,—"স্বামিজী টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে ?"

"কেন ? যদি লাগে তো মঠের জন্য নবক্রীত জমি বিক্রয় করিব। সহস্র সহস্র মানুষ আমাদের চোখের সামনে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে। আর আমরা মঠে বাস করিব ? আমরা সন্ন্যাসী, না হয় পুর্ব্বের মতো আবার গাছের তলায় বাস করিব, ভিক্ষার চালে উদর পুরণ করিব।"

তবুও ওদের এই অসহায় অবস্থায় জান কবুল করে দিতে হবে। ছিনিয়ে আনতে হবে মৃত্যুর কবল থেকে।

প্রভু, এ তোমার কেমন খেলা। এ কোন পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র। এ কেমন লিপিকা। যখন লিখেছ তখন জবাব দেয়ার ভাষাটি দাও শিখিয়ে। শিখিয়ে দাও মৃত্যুপথ যাত্রীদের মরণ মিছিলকে রুখতে। তাদের বাঁচাতে।

জমি বিক্রি করতে আর হোল না। অর্থ এলো মুঠো মুঠো। প্রচুর সাহায্য করল স্বদেশবাসী—সাহায্য করল অকুণ্ঠভাবে অকৃপণ হস্তে। ভাড়া লইলেন একটি প্রশস্ত জমি। নির্ম্মিত হোল ঘর। স্থান দেয়া হোল ব্যাধিগ্রস্থ পীড়িতদের। স্বামিজী ঘুরে ঘুরে তাদেরই সেবায় উৎসাহ যোগাতে লাগলেন—

উৎসাহ যোগাতে লাগলেন কর্ম্মিবৃন্দের মনে।

কর, সেবা কর। নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করে যা ঠাকুরের নাম নিয়ে। ভয় নেই। সহায় ঠাকুর। শুধু ওদের বাঁচা। ওদের বেদনার লাঘব কর।

নীলকণ্ঠ বিষ পান করে বর্ষণ করলেন সুধা-বারি। সহস্র, সহস্র, লাখো, লাখো মানুষ পেল প্রাণে বল। পেল সাহস। বাঁচল তারা। বেদান্তবাদীর বৈদান্তিক সাম্যবাদের ভিত হোল সুপ্রতিষ্ঠিত। যারা ছিল কাল ঘোর বিরোধী ও সমালোচক স্বামিজীর, রাত ভোরে দেখা গেল তারা হয়ে উঠেছে অনুরাগী। আহ্বান করলেন স্বামিজী উদাত্ত কণ্ঠে—

আহ্বান করলেন স্বদেশবাসীকে। বললেন "হে ভারত। ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল, আমি ভারতবাসী; ভারতবাসী আমার ভাই।"

বিস্ময়ে হতবাক তামসিক ভারত ফিরে তাকাল, ফিরে তাকাল কর্ম্মবীরের দিকে। দেখল এক জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত অরুণ এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিকিরণ করছে কিরণ।

সেখানে জাতি, ও কুলের বন্ধন নেই। নেই ধনী-দীনের বৈষম্য। সবাই এক। সবাই সমান।

রাত্রির যাত্রীরা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করল।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি ফিরে তাকালেন বৈদিক যুগে।

কি দেখলেন?

দেখলেন, চতুরাশ্রমের সুনিয়ন্ত্রিত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি স্তর বিশেষে জীবনের গতিবিধিকে করতে পারে সুসামঞ্জস্য। নিয়ে যেতে পারে ক্রমোন্নতির পথে। মনুষ্যত্বের সার্থক সীমানায়। তাই তিনি জপ, তপ ও ধ্যান অপেক্ষা কঠোর কর্ম্মের মধ্যে 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' জীবেরে শিখাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, ধর্ম্মকে কঠোর কর্ম্মের প্লাবন-ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে। উপলব্ধি করলেন সমাজ ও জাতি আচ্ছন্ন 'তমোগুণে'। ঢলে পড়ছে তারা দিন দিন শৈথিল্যের পঙ্ক-অঙ্কে। তাই তো রজো-গুণের শুভ-উদ্বোধনে যুবশক্তিকে আহ্বান করলেন প্রথম। যারা হবে আগামী দিনের সৈনিক, তাদের তৈরী করে দেয়ার জন্মেই বিদ্রোহীর এ প্রয়াস।

দলে দলে লোক এলো এগিয়ে। এগিয়ে এলো নবভারতের জনতা। এক জাতি, এক প্রাণ, একতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে লাগল তারা।

কালের নিঃশব্দ মন্থর চরণ-ক্ষেপ ক্ষিপ্র ও সতেজ হয়ে উঠল।

ঝড়ের গতিতে উড়ে গেল প্লেগের দিন গুলো—

গেল মহানগরীর ওপর দিয়ে বয়ে।

স্বামিজীর মন হয়েছে আশ্বস্ত। সঙ্গীরা পেয়েছে একটু বিশ্রাম। আর্ত্ত মুমূর্ষু মানুষের অজস্র প্রাণ চেতনা আবার উঠল সতেজ ও প্রাণময় হয়ে। কলকাতা পরিণত হোল শান্তি-তীর্থে। প্রেম-সলিলের শীতল তরঙ্গমালা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল মানুষের মনকে। তারা নবজীবনের আনন্দে বিষণ্ণ দিনের গ্লানি থেকে চলে এলো নির্ভাবনার রাজ্যে। এলো ভেদ, বিভেদহীন তীর্থে।

এমনি দিনে এক পত্র এলো। লিখেছে মিঃ সেভিয়ার।

কাকে ?

স্বামিজীকে।

কি ?

চলে আসুন এবারে স্বামিজী।

কোথায় ?

আলমোড়ায়।

যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ। সঙ্গে গেল স্বামী সদানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, তুরিয়ানন্দ ও স্বরূপানন্দ। আরো গেল। গেল তাঁর চার জন পাশ্চাত্য শিষ্য।

নাইনীতাল। রইলেন এখানে কয়েকটা দিন। মিলল এখানে এসে স্বামিজীর সঙ্গে খেতরির মহারাজা।

যোগেশ দত্ত একদিন এলো—

এলো স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। বাল্য-বন্ধু যোগেশ। তাকে দেখে বড় আনন্দ পেলেন স্বামিজী। যোগেশ দত্তেরও কি আর আনন্দের দৈন্য আছে! বেশ কথা বলছেন স্বামিজী। কথায় কথায় বলল যোগেশ,— দেখ ভাই, পার যদি একটা কাজ করতে তবে মনে হয় দেশের মহা কল্যাণ সাধিত হবে।

কি সে কাজটি ?

এ দেশের শিক্ষিত যুবকদের যদি পার সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাতে, তবে তারা এসে মাতৃভূমির সেবায় নিশ্চয় করবে আত্মোৎসর্গ।

কথা কয়টি শুনলেন স্বামিজী। কিন্তু হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর তনুশ্রী। বললেন—যোগেশ, তা হবার নয়। "তুমি মস্ত একটা ভুল করছ।

ওরা স্বদেশে ফিরে এসে ইউরোপীয় সমাজে মিশবার চেষ্টা করবে, একথা তুমি নিশ্চিত জেনো। তারা পদে পদে সাহেবদের খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার নকল করবে, স্বদেশ বা জাতীয় আদর্শের কথা ভ্রমেও চিন্তা করবে না।" সে ভাব-ভাবনায় ওদের কিছু এসে যাবে না। ভঙ্গুর সমাজের বুকে প্রাণের বীজ বুনবার বাসনায় ওরা বসে নেই। ঐ দেখছ না, এত দৈন্য এত দুঃখ তবুও চেতন ফিরে এলো না রে। কেবল পরের শেখান বুলি, পরের আচার, কায়দা, অনুকরণের কি না দুশ্চর তপস্যা। কত তৃপ্তি পাচ্ছে তাতে। নিজের দিকে চাইলে না। জানলে না দেশকে। তার অন্তহীন অনন্ত সম্পদকে। তাদের ভাব-ভাবনায় জড়ত্ব। তাদের চলাতে বলাতে উদ্যমহীনতা।

যদি এমন না হবে তবে কি আর এমন সোনার দেশ দিন দিন এগিয়ে যায় রত্ন ছেড়ে রাত্রির দিকে? তাই তো মা আমার নগ্না। আভরণহীনা! ব্যথা বেদনায় জর্জ্জরিতা!

বলতে বলতে দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা। দিগ্‌ভ্রান্ত আহত পাখীর মত চঞ্চল হয়ে গেলেন স্বামিজী মুহূর্ত্তে। সমস্তটা দেহ কাঁপতে লাগল থর থর করে।

আলমোড়ায় এসে বাস করতে লাগলেন সেভিয়ার সাহেবের বাংলোয়। অনুরাগী ভক্ত ও সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একদিন হারিয়ে ফেললেন স্বামিজী তাঁর জ্ঞান। স্মৃতির অলক্ষ্য পথ ধরে ছুটে এলো কতগুলো কথার মিছিল। সত্যকথা। মন্ত্রের মত সমুচ্ছ্বসিত। বেদ বাক্যের মত অভ্রান্ত এ নাদ ঝঙ্কার।—"আমি নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমি দেখিতেছি যে ভারত যুবাবস্থা।" তার উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তার যাত্রা অব্যাহত। তোমরা কেউ ভেঙ্গে পড়ো না। চেতন। বীর্য্য। বল। সঙ্গে যোগ করে দাও ঈশ্বরে অনুরাগ। কে, কে পারে তবে আর বিঘ্নের প্রাচীর তুলে জয় যাত্রাকে ব্যাহত করতে?

শিক্ষা দিচ্ছেন স্বামিজী। শিক্ষা দিচ্ছেন তাঁর অনুরাগী ভক্তদের। কিন্তু নিবেদিতার মন মন্থন করে যায় গ্লানির সমুদ্র।

বড় ব্যথা। বড় আঘাত লাগে থেকে থেকে তার চিত্তে। মাঝে মাঝে কান্না আসে। পুঞ্জিত মনের মেঘ নির্গলিত অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসে নির্ব্বিবাদে। তবুও একটু শান্তি। চোখের জলকে বড় প্রিয় লাগে তখন। কেন লাগবে না? মানুষের দুঃখে, মানুষের বেদনায়, সান্ত্বনার মত নীরব শান্তির প্রশান্তি এনে দেয় যে চোখের দু'ফোটা স্বচ্ছ জলই।

কিন্তু নিবেদিতার এত ব্যথা কেন, কেন তার চোখে আসে জল?

প্রিয় জনের আঘাত। প্রভুর উপেক্ষা।

দিন দিন যেন স্বামিজী কঠোর কঠিন হয়ে নিবেদিতাকে আক্রমণ করছেন, দিচ্ছেন আঘাত। তার ইংরেজ সুলভ মনকে তীব্র তিক্ততার বাণ নিক্ষেপে শত ছিন্ন করে দিচ্ছেন। নিবেদিতার প্রতিটি কথা ও কাজের মাঝে খুঁজে বের করছেন হাজারো ভ্রান্তি। ভুলের মরু। ক্রটির পাহাড়।

অধীর নিবেদিতা। তাই তো কেঁদে কেঁদে করে আত্মশোধন।

ওগো, আর সইতে পারি না তোমার দেয়া আঘাত। তোমার নির্ম্মম মনের উপেক্ষিত দৃষ্টিতে আমার সমস্ত দেহ মনকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় জীবনের খেলা শেষ করে দিতে। এ তোমার কেমন ভাব! কেন এমন করে আমার সব কাজকে অবহেলার আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছ? কেন জ্বেলে দিচ্ছ মনের দিগন্তে অবজ্ঞার চিতাবহ্নি। অশান্তির দহন জ্বালা। আমার চারিদিকে যেন ঘনিয়ে আসছে একটা দুর্ভেদ্য আবরণ। একটা কঠিন ব্যূহ। কেমন করে তোমার দিকে এগিয়ে যাই। মনে হয় যেন তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলেই শান্তি পাও অনেক। তৃপ্তিতে তোমার মন যায়ে ভরে। ওগো; তুমি এমন করে দাঁড় করিও না ভেদের পাচিল, দাঁড় করিও না আমার অন্তরঙ্গতার অগ্রগতির পথে।

যেন একটা স্তব্ধ মেঘাচ্ছন্নতার মত গম্ভীর হয়ে যায় নিবেদিতার মুখখানা। বড় খারাপ লাগে। কোথায় যেন তলিয়ে যেতে চায় তার সত্তাটা। ছুটে যায় নিবেদিতা সঙ্গীদের কাছে। বলে মনের কথা খুলে, বলে কেঁদে কেঁদে।

এমনি করে কাটছে দিনের পর দিন। রাত্রি নামে অঝোরে। রুক্ষ অলক গুচ্ছ বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বিনিদ্র নয়নে জেগে থাকে সারা রাত। ঘুম চোখে আসে না। মানসিক দ্বন্দ্বে আন্দোলিত নিবেদিতার মন, মরুর মত খাঁ খাঁ করে থেকে থেকে। এ অতি মর্ম্মান্তিক বেদনা। লিখল নিবেদিতা,—

"এই সময় আমার সমস্ত যত্নপোষিত ধারণাগুলির উপর যে নিত্য আক্রমণ ও

তিরস্কার বর্ষিত হইতে লাগিল, আমি তাহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক সময় অকারণে দুঃখভোগ করিতে হয়। আমি লক্ষ্য করিলাম, অনুকূল ভাবাপন্ন প্রিয় আচার্য্যের স্থান অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থানে এমন এক ব্যক্তির চিত্র উদয় হইল, যিনি অন্ততঃ উদাসীন এবং সম্ভবতঃ প্রতিকূলভাবাপন্ন হইবেন এবং এই কালে আমি যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তাহা যুক্তি দ্বারা বিচার করিবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র।"

কিন্তু এ দ্বন্দ্ব কিসের?

অনুরাগের, স্নেহের।

ভালোবাসারও একটা জ্বালা আছে। আছে স্নেহের সমুদ্রেও এক প্রবল দ্বন্দ্বের তরঙ্গাভিঘাত। সে আঘাত দূরের জলকল্লোলকে টেনে নিয়ে আসে নিকটে। সে স্নেহ-বন্ধনের পরিবর্ত্তে দেয় মুক্তির মহামুগ্ধ প্রান্তরের দুয়ার খুলে। যার বাঁধন শাশ্বত। যার টান আজন্মের।

স্বামিজী ও নিবেদিতার হোল তাই।

তাই তো অমন করে নিবেদিতাকে কঠোর ও কঠিন করে তুলে নিলেন স্বামিজী সাধন বেদিতে।

যেখানে মোহ নেই। বন্ধন নেই। নেই কাম কামনার বিন্দু কণাটি এমন এক পবিত্র তীর্থে।

তার পর হোল স্বপ্রকাশ। অবসান হোল ভাবসঙ্ঘাতের। নতুন সূর্য্য উদিত হোল নিবেদিতার মানস পটে। মুগ্ধ হয়ে গেল পাশ্চাত্ত্য মহিলা।

কি দেখল সে?

দেখল রাত্রি যেন রবি রশ্মি হয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করছে।

সে কি?

রাত। গভীর রাত।

দিকে দিকে শান্ত ভাব। কোথাও জন মানবের সাড়া নেই। এমনি সময় ডাকলেন স্বামিজী নিবেদিতাকে। বললেন—ঐ দেখ আকাশে চাঁদ। কত নির্ম্মল। কত শোভা স্নিগ্ধা। মুসলমানেরা এই চাঁদকে বড় আদর করে। বড় ভালোবাসে। এসো। তুমিও এসো। প্রত্যক্ষ কর ঐ আকাশের চন্দ্র। তার পরে নতুন জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নাও। আদর্শ হয়ে উঠুক ঐ নির্ম্মল রজত শুভ্র চাঁদটি তোমার। সুরু হোক আমাদের নতুন জীবন আকাশের নতুন চাঁদের সঙ্গে।

কথাটি নেই নিবেদিতার মুখে। চুপ হয়ে বসে আছে স্বামিজীর পদ-প্রচ্ছায়। স্বামিজী স্পর্শ করলেন তার মস্তক। করলেন আশীর্ব্বাদ। মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল তার ভুল ভ্রান্তি। মিলিয়ে গেল জন্মলব্ধ সংস্কার। একটা বিদ্যুৎ গতির মত যেন তার দেহ-মনে কি এক শক্তি সঞ্চার হোল। আনন্দে অনুরাগে ভরে গেল নিবেদিতার তৃষিত মন।

পেল সে বহু কষ্টলব্ধ সাধনার ধন। পেল দিব্যজ্ঞান। প্রজ্ঞার আলো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন,—'নরেন দিবে সবাইকে জ্ঞান। স্পর্শমাত্রে সঞ্চারিত হবে তা।' আজিকার এই নিশীথ নির্জ্জনে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করল তা। ধন্য হোল তার জীবন। পেল এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—..................."মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্ব্ব প্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।"

ধন্য হয়েছি আমরা তার মত নিষ্ঠা প্রাণ একজন পাশ্চাত্ত্য মহিলাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে। আধার ভালো হলে স্ফুরণে কি আর বিলম্ব ঘটে? প্রিয় শিষ্যাকে আচার্য্যদেব তাঁর মনের মত করে তৈরী করতে লাগলেন।

* * * *

আধ্যাত্মিক আলোচনা। ধর্ম্ম প্রচার। লোক শিক্ষা। এ সবগুলো যেন স্বামিজীকে আর টেনে রাখতে পারছে না—

টেনে রাখতে পারছে না বাস্তব জগত। মন চায় নির্জ্জন বনছায়া। বৈরাগ্যের গেরুয়া। বহির্জগতের ওপর এলো একটা বিতৃষ্ণার ভাব। উদাসী পথিক এবার একটু নীরব নিঝুম শান্তির আশ্রয় চাইছেন। সকল বন্ধন ও কর্ত্তব্যের আহ্বান থেকে স'রে যেতে চাইছেন দূরে অতি দূরে—অন্তর লোকে। একাকী গভীর অরণ্যের ছায়া সুনিবিড় স্থানে কাটাতে লাগলেন। কেটে যায় একটা সপ্তাহ। কি জানি কেন যেন ফিরে এলেন স্বামিজী আবার সহজে।

৫ই জুন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো তার বিষাদের ম্লান তনু নিয়ে।

এত দিনে দু'টো মর্ম্মান্তিক সংবাদ এসে জমে আছে আলমোড়ায়। কেমন কেমন করে মনটা। রাতটা কেটে গেল একরকম। ভোর হোল। পাখী

ডাকল। বাইরের পৃথিবীতে এতটুকুও পরিবর্ত্তন নেই। পরিবর্ত্তন কেবল স্বামিজীর মনোজগতে।

কেন?

ওরা সংবাদ দিল, পাওয়ারীবাবা আর এ জগতে নেই! নেই মিঃ গুড্-উইনও। সাঙ্কেতিক লেখক গুড্উইন। অনুরাগী ভক্ত গুড্উইন!

আর যোগী পাওয়ারীবাবা!

ভাবতে লাগল সকলে, কি যেন ঘ'টে যায়।

কিন্তু না। একটিও কথা কইলেন না বিবেকানন্দ। যে কাজ করছিলেন তা সেরে ফেললেন একমনে।

কেটে গেল কয়েকটা ঘণ্টা।

মন কাঁদে। বুক ফেটে যেতে চায়। কিন্তু তবুও চোখে এক ফোঁটা জল নেই। যদি আসত—ভালো ছিল।

হে প্রভু, আর কত প্রশ্ন করবে? কত আর দেব উত্তর? তোমার এখনো পরীক্ষা চলছে? এবার নিবৃত্ত হও। ক'র না আর আমায় ব্যথা-বিদ্ধ। দিও না জ্বেলে বহ্নি। সইতে পারি না। বইতে পারি না এ ব্যথার বোঝা। কান্নার ঝর্ণা।

সেখান থেকে যাত্রা করলেন স্বামিজী। সঙ্গে রইল শুধু পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-গণ।

কাশ্মীর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন স্বামিজী।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে টোঙ্গায় করে এলেন মারীতে। তিন দিন পরে আবার যাত্রা করলেন।

২৫শে জুন।

শ্রীনগরে এসেছেন বিবেকানন্দ। অল্প সময়ের মধ্যে জমে যায় লোকের ভীড়। জানায় তারা অভিনন্দন। বরণ করে ভক্তি বিনম্র চিত্তে।

বেশ কাটছে দিনগুলো। আনন্দের বান ডেকেছে যেন। ঝিলাম নদীর ঝিলমিল রূপে মুগ্ধ করল বিবেকানন্দকে। কত লোক। মুখর বিবেকানন্দ।

কিন্তু ওকি!

ওরা কি দেখছে?

সকলের চোখ পড়ল বিবেকানন্দের দিকে। অপলক নেত্র। অবাক হ'য়ে দেখছে সবাই। দেখছে শ্রান্ত সন্ন্যাসীর হাব-ভাব।

ক্লান্তি যখন নামে, তখন শ্রান্ত হয়ে আসে চরণ। শুধু চরণ কেন? নীরব হয়ে যায় তখন তার মুখর কণ্ঠও।

কেন কি হোল?

দিন দিন যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছেন স্বামিজী। নিস্পৃহ ভাব। খেয়াল নেই কোন দিকে। উদ্দাম কর্ম্মের বিসর্পিল শিখাটি কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চাইছেন। বিবেকানন্দ গুটিয়ে আনছেন নিজেকে কর্ম্মের ফেনিল তরঙ্গ থেকে। এ যেন এক ঘোর আত্ম-দ্বন্দ্ব। প্রবল প্রতিরোধ। নিস্তরঙ্গ সীমানার এক কোণে স্তব্ধ শান্ত হ'য়ে ব'সে একটু শান্তির সুখ স্পর্শ পাবার জন্যে উন্মুখ। নেমে এসেছে তাঁর আনন্দের অঙ্গনে স্তব্ধতার যবনিকা। সূর্য্যের প্রাখর্য্যে কে যেন দিয়ে দিল সন্ধ্যার গুণ্ঠন। তাই তো বিবেকানন্দ পৃথিবীর সব কাজ ভুলে গিয়ে, সব হাসি-কান্নার সীমানা পেরিয়ে পৌঁছিতে চাইছেন নিঃসীমের দেশে—অন্তর লোকে।

কিন্তু কোথায় যাবেন?

ঐ যে ডাকে। ডাকে। ডাকে। ডাকে বাইরের পৃথিবী।

দিগ্‌ভ্রান্ত বিবেকানন্দ। কোন দিকে এগোবেন? কোন পথ ধ'রে করবেন যাত্রা? তন্ময় হ'য়ে যান স্বামিজী ভাবতে ভাবতে। ধীর, গম্ভীর হ'য়ে ওঠে তনু-মন। অবশেষে দ্বন্দ্বের দুয়ার খুলে এলো কাব্যের ঝর্ণা। লিখলেন কবিতা—

"হের বিগলিত, নিবিড় কৃষ্ণ বারিদ পুঞ্জ গগনে,
সারা নিশা ধরি ধরণী আবরি' ঘন ঘোর আবরণে,
ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তোমার জাগিয়া উঠিল ধরা,
বিহগ মুখর, কুঞ্জ কানন বন্দনা-গীতি ভরা।"

* * * *

"ভাবি দেখ তুমি, নিখিল বিশ্ব তোমার দরশ তরে
ভরি যুগচয়, খুঁজিল তোমায়, কত না প্রদেশ 'পরে।
ছাড়ি কত জন, গৃহ পরিজন, ছিঁ'ড়িয়া প্রণয়-ডোর,—
লভিতে তোমায় লঙ্ঘি সাগর, পশিল কাননে ঘোর।"

* * * *

"চল অবিরাম বাধাহীন পথে—জগৎ করিতে তৃপ্ত—
—গগন কেন্দ্রে হে দেব ছড়ায়ে মুক্ত-কিরণ দীপ্ত!
প্রতি প্রদেশের প্রতি নরনারী উন্নত শির তুলি
হেরুক আনন্দে বন্ধন পাশ নিঃশেষে গেছে খুলি।"

কবিতার নাম দিলেন '৪ঠা জুলাইর প্রতি।' জমাট কবিতা। কিন্তু এ ছন্দ-সুর কোন মনের? কোন লোকের?

এক দিকে সাধক কবি দেখছেন, দেখছেন তাঁর মনের অঙ্গনে মুক্ত, শুদ্ধ সেই মহান্ত পুরুষের প্রেম-ঘন-তনু।

আর?

আর একদিকে পদদলিত লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর কবি। দুঃখ, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে হেলায় ধুলায় মিলিয়ে দিয়ে চাইছে মানুষ একটু শান্তি, একটু মুক্তি। কিন্তু তা কবে আসবে? কবে পারবে মানুষ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন যাপন করতে?

আলমোড়ায় জিজ্ঞেস করেছিল এক পাশ্চাত্ত্য শিষ্যা—

জিজ্ঞেস করেছিল স্বামিজীকে—"আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি স্বামিজী?"

উত্তরে বলেছিলেন—"ভারতবর্ষকে ভালোবাসো।" ভালোবাসো আমার জন্মভূমিকে। আমার দরিদ্র পীড়িত ভাই-বোনদের। তবে আমি মনে করব—তুমি যা করলে তা অনেক। তুমি যা দিলে তার তুলনা নেই।

এসেছিলেন অশ্বিনী বাবু—

এসেছিলেন বরিশালের অশ্বিনী বাবু—স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে আলমোড়ায়।

মেঘমুক্ত আকাশ। কোথাও নেই বিন্দু মলিনতা। যেন ধু'য়ে মুছে গেছে সমস্তটা মেঘপুঞ্জি। উঠেছে চাঁদ আকাশে। স্নিগ্ধ শুভ্র শুচি-বাস পরে জ্যোছনাময়ী তন্বী যেন হয়েছে তপযুক্তা। এমনি এক মধু মুগ্ধ সন্ধ্যায় এলেন অশ্বিনী বাবু। বসলেন। কত কথা। অবশেষে বললেন,—"সমগ্র পৃথিবী আপনি ঘুরে এসেছেন স্বামিজী! জাগ্রত করেছেন লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অন্তরে ধর্ম্মভাব। কিন্তু আপনি কি সুস্থির করতে পেরেছেন—আমাদের দুঃখিনী জন্মভূমির মুক্তি কোন পথে?"

হঠাৎ যেন আত্মার আকাশে হোল কতগুলো উল্কাপাত। স্পন্দিত হ'য়ে উঠল প্রতিটি শিরা-উপশিরা। সমস্তখানা মুখে জমে গেল সারাটা দেহের তপ্ত শোণিত। রইলেন খানিকটা চুপটি করে বিবেকানন্দ। তারপরে একটা বক্ষদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস। বলতে লাগলেন—"নতুন করে আমি কিছুই স্থির করিনি অশ্বিনী বাবু, তবে বহু চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় একটা সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি যে—ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড......।" মঙ্গল ও মুক্তি নিহিত রয়েছে ধর্ম্মের মধ্যে। তাকে লাভ করতে হবে সাধনা দ্বারা। তবেই অগ্রগতি। তবেই স্বাধীনতা। দুঃখিনী জন্মভূমির বন্ধন মুক্তি।

"কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থায় কি আপনার কোন আস্থা নেই?"

"বিন্দুমাত্র না।"

কেন?

"ভারতের প্রাণ-শক্তির আধার-স্বরূপ যে অগণ্য জনসাধারণ যাকে 'মাস্' বলা হয়ে থাকে, তাকে জাগ্রত করবার, উন্নত করবার চেষ্টা না করে—কেবলমাত্র কতগুলি প্রস্তাব পাশ করলেই কোন কাজ হবে এ আমার বিশ্বাস নয়।"

কেবল প্রস্তাব পাশ করে কথার পাহাড় রচনা করলে কি আর মানুষের মুক্তি আসে—দুঃখ ঘোচে?

যারা পতিত। সমাজ যাদের করে অবহেলা। তাদের বলতে হবে

ডেকে। আনতে হবে প্রাণ প্রবাহের নব তরঙ্গ তাদের স্তিমিত জীবনে। আঁধারকে ঠেঁস দিয়ে দিনের সাধনা বৃথা। দিনের খোঁজে যেতে হোলে আঁধারকে উত্তরণ করে যেতে হবে। যেতে হবে তাকে আলোয় আলোকিত করে। তা না হলে যে পথ মিলবে না। অন্ধকারের গর্ভে থাকতে হবে নিমজ্জিত হয়ে আজন্ম। ওরা কারা? ওরাই হচ্ছে দেশের দশের ও বিশ্বের প্রতিবিম্ব, মুখপত্র। ওদের এড়িয়ে যাওয়া মানে নিজেদের কবর খনন বৈ আর কি?

* * * *

অধীর মন। আর এক মুহুর্ত্তও নয়। যাত্রার ব্যাকুল বাসনা স্বামিজীর অন্তরে। যাবেন তিনি ভ্রমণে। যাবেন অমরনাথে—মহাতীর্থে। বললেন নিবেদিতাকে সঙ্গে চলতে। সম্মতি জানাল এক বাক্যে। হোল যাত্রা সুরু। চললেন বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে সঙ্গে ক'রে। অন্যান্য শিষ্যেরা র'য়ে গেল পহেলাগামে।

বস্ত্রাবাস ক্রয় করবার জন্য ফিরে এলেন স্বামিজী ইস্‌লামবাদে।

অনেক সঙ্গী জুটে গেল পথে। সে কি আর একজন-দু'জন লোক? তিন-চার হাজার মুমুক্ষু যাত্রী। চলেছে তীর্থ পর্য্যটনে। পুণ্য সঞ্চয় করতে। স্বামিজীও মিশে গেলেন তাদের সঙ্গে। তাদের দলের হয়ে তিনি চললেন, চললেন হেঁটে অমরনাথের পথে।

বন্ধুর পথ। তা হোক? তবুও চলার ছন্দে এলো না শ্লথ লগ্ন। পাহাড়ের চড়াই ধরে কিন্তু হাঁটতে হবে। বেশ ত সে জন্যে বিন্দু বিচ্যুত হন নি বিবেকানন্দ সঙ্কল্প থেকে। সমতল থেকে উঠতে হবে অনেক, অনেক উর্দ্ধে। হিমাচ্ছন্ন হিমগিরি। হাঁটতে হবে তার ওপর দিয়ে নগ্ন পায়। হোক না। তার জন্যে কি আর তীর্থ যাত্রা বন্ধ হ'য়ে যাবে?

সে দেশ বড় ঠাণ্ডা। বড় শীতল।

কি যায় আসে তাতে? দেহ থেকে আলাদা করে রাখলেই হবে প্রাণকে।

নিবেদিতা অবলোকন করছে স্বামিজীকে—

অবলোকন করছে থেকে থেকে তাঁর হাবভাব। এ যেন এক বিরাট পরিবর্ত্তন। কিছুতেই দমছেন না বিবেকানন্দ। অটল সঙ্কল্প।

ব্যতিক্রম নেই কোন নিয়ম কাননের। যেমন সবাই—তেমন তিনিও চললেন সবার মত। সকলের একজন হ'য়ে।

ক্লান্ত যাত্রিগণ রজনী যাপনের জন্যে বস্ত্রাবাস ফেললেন প্রান্তরে। কিন্তু নিবেদিতা ও স্বামিজীকে শিবির স্থাপন করতে দেখে জানাল তারা আপত্তি। শুনলেন না সে কথা বিবেকানন্দ। ক্রমে তাদের ভুল ভাঙ্গল। তারা হ'য়ে পড়ল স্বামিজীর অনুগত। রাত পোহালে বাওয়ানের নির্ঝরিণীতে স্নান করলেন সবাই মিলে। তারপরে আবার সুরু হোল যাত্রা। চললেন স্বামিজী ১৮ হাজার ফিট উঁচুতে তুষার কবরী ভেদ করে।

রাত। দু'ঘণ্টা অতীত হ'য়ে গেছে। জেগেছে চাঁদ আকাশে। জ্যোছনার অমল ধবল স্নিগ্ধ কান্তি ঝরছে হিমগিরির শির তীর্থে। তাই দেখতে দেখতে এগোচ্ছেন স্বামিজী, এগোচ্ছেন তাঁর বহু বাঞ্ছিত অমরনাথের দিকে।

মন এখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। রাত্রিকে যেন মনে হয় প্রকৃতির সতঃস্ফূর্ত্ত হাসি। কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব!

হে ঈশ্বর, তোমার দানের হিসাব করি এমন আমার সাধ্য কি? দিকে দিকে বিচ্ছুরিত তোমার মহিমার দ্যুতি। আকাশে তুমি নীলাম্বর। নির্ম্মল। স্নিগ্ধ—সুন্দর। বনে তুমি সবুজ। আবার কখনো পীতাম্বর। নদীর পীযূষ ধারায় শুনতে পাই তোমারই নূপুর নিক্কন। প্রকৃতির বুকে পুঞ্জীকৃত তোমার ঐশ্বর্য্যের দিগন্ত বিসারী মিনার। কত তার রং। কত না ঝিলমিল। অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকি। ভাবি একি মধুর ভাব! এ কোন মুগ্ধ স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি।

কিন্তু নয়নে এমন নেশা ধরিয়ে দিয়ে মনে কেন মুঠামুঠা ছড়িয়ে দিলে অন্ধকার। চোখে দেখি তোমারই ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য। কিন্তু অন্তরে কেন তুমি অমূর্ত্ত? হে অমিতাভ, তোমার কনক প্রভায় মুক্ত ক'রে দাও রুদ্ধ পথের আগল। প্রভাময় হ'য়ে ওঠো আমার অন্তরে। যাক ধুয়ে মুছে অপসৃত হয়ে পুঞ্জিত মেঘের অন্ধকার। শুধু একবার,একবারটি দাও তোমার শান্তির সুখ স্পর্শটি আমার তৃষা শুষ্ক মনে। বলে দাও পথের কথা। তোমার সিংহদ্বারের ঠিকানা।

ভক্তের চিত্তে জেগেছে ঈশ্বর দর্শনের তস্পৃহা।

আর কি ডাক না শুনে রইতে পারেন তিনি! তাঁর আসন যে উঠেছে কেঁপে। জেগেছে ঝড়। ডাকলেন তাই বিশ্বনাথ যেন হাতছানি দিয়ে। সব কষ্ট যেন কোথায় গেল মিলিয়ে। একটা আনন্দের অমিয় লহরে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললেন স্বামিজী—

এগিয়ে চললেন সম্মুখের দিকে।

সুরু হোল এবারে চড়াই পরিক্রমা।

২রা আগষ্ট। রাত।

হাঁটছেন স্বামিজী হিমগিরির পথে পথে।

হে রাত্রি, তোমার মত আমিও অফুরন্ত।

ভেবেছো মৌন মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার পথ আটকে। না গো, তা পারবে না। তোমার মত অনেক রাত্রিকে আমার হৃদয়ে ঠাঁই দিতে পারব। তাতে একটুও টলবো না। যাব না কখনো বিভ্রমের দেশে। না হয় চল, তুমিও চল আমার সঙ্গে। চল অভিসারে, দিবসের অনুধ্যানে। কি ব'সে ব'সে ভাবছ? কেবল নিঃসীমের সাধনা। আর নিথরের ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে কি হবে? এসো জগৎস্রোতে ভেসে যাই। যাই সেই জগৎজোয়ারের কলরবে আনন্দের খোঁজে। এই আনন্দের খোঁজই ঈশ্বরের সন্ধান। এই আত্মার অভিসারই পরমাত্মার প্রেমপরশ। চল, কেন রইবে পড়ে এমন তমোময় হ'য়ে?

তমোনাস রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চললেন—

চললেন দুর্গম বন্ধুর উপলাকীর্ণ পথ পেড়িয়ে। চড়াই উৎড়াই চললো।

এখন রাত কত?

তা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। আকাশের পূর্ব্বভালে পড়েছে আলোর আল্পনা। পাখীও ডাকছে দু'-একটা। কিন্তু তুষার প'ড়ে প'ড়ে যেন একটা শ্বেত শুভ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না, চলছেন, শুধু হেঁটেই চলেছেন স্বামিজী। ভোর হোল, উঠেছে সূর্য্য। তার কিরণ দীপ্তিতে কনকোজ্জল হয়ে গেল তুষার-মৌলি। পথও ক্রমে এসেছে ফুরিয়ে। অবসান হোল দুর্গম পথের।

সহসা চিৎকার করে উঠল যাত্রীদল।

চমক লাগে। ফিরে তাকায় সবাই, তাকায় ঐ দুরে বহু দুরে—অমরনাথের পবিত্র শুদ্ধ গুহাটির দিকে।

যুক্ত করে জানায় প্রণাম। আনন্দে—আবেগে জয়ধ্বনি ক'রে ওঠে মুমুক্ষু যাত্রীদল।

বলে কিনা—"জয় শঙ্কর কী জয়। জয় শিব কী জয়।"

সম্মুখে নির্ম্মল ঝর্ণা। গলিত তুষারের স্বচ্ছধারা। ওরা এক এক ক'রে অবগাহন করতে লাগল। নামলেন স্বামিজীও। নিবেদিতাকে বললেন স্বামিজী,

"স্নান করিতে যাইতেছি।" নিবেদিতা তাঁর পিছু পিছু এলো। স্নানান্তে প্রবেশ করলেন গুহার মধ্যে। শ্রীশ্রীঅমর নাথ।

আনত শিরে প্রণাম করলেন স্বামিজী। বসলেন ধ্যানে। বোন নিবেদিতাও প্রবেশ করল গুহা-মধ্যে। মন ডুবিয়ে দিলে ভক্তির সমুদ্রে। কেউ বাধা দিল না নিবেদিতাকে।

শুনছেন সঙ্গীতের ধ্বনি। আর দেখছেন প্রকাশাতীতকে। অগম্যকে, অনন্তকে। বিশ্বনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর প্রিয় ভক্তের সম্মুখে।

বিলুপ্ত চেতনা, কিন্তু স্নিগ্ধ প্রফুল্ল বদন। মুদিত নয়ন—তবুও মনে হয় ফুটন্ত একটি প্রসূন, অনড় নিস্তেজ দেহ। যেন মনে হয় একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গ ব'য়ে যাচ্ছে।

এমন ভাব তো হবেই!

মানুষের দেহে যখন দেবতার আবির্ভাব ঘটে—

ঘটে যখন অন্তহীন অনন্তের প্রকাশ সীমায়িত দেহভাণ্ডে, তখন যে লাখো কোটি বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রাবল্যে সে মানুষটিও হ'য়ে যায় ব্রহ্মাণ্ডের আধার। বিচ্ছুরিত হয় প্রতিটি রোমকূপ থেকে আলোর দ্যুতি। নয়নে লাগে ভাবের নেশা, চেতনার পরিধি ব্যাপ্ত হ'য়ে চলে যায় অসীমে। তাই তো অমন তন্ময়তা, অমন বিহ্বলতা।

স্বামিজীরও তাই হোল। শিব ভাবতে ভাবতে, নিজেও যে শিবময় হ'য়ে গেলেন।

কেটে গেল বহুক্ষণ। ভাঙ্গল ধ্যান। নিবেদিতার সঙ্গে জলযোগ ক'রে আনন্দে আবেগে বলতে লাগলেন বিবেকানন্দ—"আমার আজ সাক্ষাৎ শিব দর্শন হইয়াছে। এখানে যাত্রীর বিত্তহরণ করিবার জন্য প্রসারিত হস্ত পাণ্ডা নাই, ধর্ম্মের ব্যবসায় নাই, চিত্তবিক্ষেপকর কোন কিছুই নাই, এ এক নিরবচ্ছিন্ন পূজা আরাধনার ভাব। আর কোন তীর্থস্থানে আমি এত আনন্দ পাই নাই।"

পরে আবার বললেন নিবেদিতাকে—"দেবাদিদেব অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিয়াছেন।"

জ্ঞান যখন ফিরে এলো, ভাঙ্গলো যখন চেতন, তখন তিনি একজন অন্তর্জগতের লোক। চোখের কোণে জমানো রক্তের খাণ্ডা। দেহে প্রবল স্ফীতি, কেবল বলছেন শিব, শিব। শিবনাম কর্ণে। আর শিব স্বয়ং অন্তরেও। যাত্রা করলেন ফেলে আসা পথে স্বামিজী।

৮ই আগষ্ট এলেন শ্রীনগরে ফিরে। সেপ্টেম্বর অবধি রইলেন। দিন কাটে, রাত আসে। কিন্তু কে রাখে তার হিসেব? ভাব-ভোলা যে ভাবের পাগল। অন্তর্মুখী চিত্ত অন্তরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে পরমাত্মাকে। তাকে নিয়েই লীলা মত্ত দিন রাত। সবার কাছ থেকে বিযুক্ত হ'য়ে থাকবার একটা সযত্ন প্রয়াস স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। কিন্তু তবুও তাঁর মনের ক্রান্তিবৃত্তে ছায়া সঞ্চারিত হয় ভারতবর্ষের। মূর্ত্ত হয়ে ওঠে দুর্ভাগা জাতির ক্লিন্ন কঙ্কাল। মন নেমে আসে হিমগিরি থেকে সমতলের দেশে। মানুষের রাজ্যে।

এমনি দিনে এক অনুধ্যানী এসে জিজ্ঞেস করল—"স্বামিজী, যখন দেখি, প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, তখন আমরা কি করিব?"

"কি করিবে? নিশ্চয়ই বাহুবল প্রয়োগ করিয়া প্রবলকে নিরস্ত করিতে হইবে।"

এমন একটি কথা বলেছিলেন স্বামিজী আর এক জায়গায়। বলেছিলেন বিদ্রোহী—"যেখানে দুর্ব্বলতা ও জড়ত্ব, সেখানে ক্ষমার কোন মূল্য নাই, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। যখন তুমি বুঝিবে সহজেই জয়লাভ করা তোমার করায়ত্ত, তখনই ক্ষমা করিও। জগৎ যুদ্ধক্ষেত্র, সংগ্রাম করিয়া নিজের পথ করিয়া লও।" আবার একটি প্রশ্ন—আচ্ছা স্বামিজী, "সত্য অধিকার রক্ষার জন্য একজন প্রাণবিসর্জ্জন করিবে, না প্রতিবিধান না করিতে শিক্ষা করিবে?"

বললেন "সন্ন্যাসীর পক্ষে অপ্রতিরোধই ধর্ম্ম, কিন্তু গৃহস্থের আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

সংগ্রাম হবে রক্ষার জন্য। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য। দুর্ব্বল ধুকে ধুকে মরবে, সবল তার বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে যাবে প্রতাপের চাকা, এ কক্ষণো সহ্য করবার নয়। যারা একে বলে অদৃষ্টের পরিহাস, তারা ভীরু। অদৃষ্ট রচনার ভার আপনার ওপর, অহিংসা ভালো কিন্তু হিংসার পায় মাথা কুটে দুর্ব্বলের মতো ভিক্ষা যাচ্ঞা ক'রে নয়। সমানে সমানে অহিংসা হ'লে তবেই প্রকৃত মুক্তমনের প্রকাশ। দুর্ব্বলকে সবলেরা করে করুণা। তাচ্ছিল্যের দয়া। এ করুণা বা দয়ার মধ্যে অহিংসা নেই।

এখানে দাম্ভিকতার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। বুদ্ধিমান লোকেরা একে বলে আত্ম প্রতারণা। আর যারা সবল, জুড়ে আছে ঐশ্বর্য্যের সিংহাসন, তারা বলবে মহানুভবতা এর নাম। আমি বলি মিথ্যা কথা, এসো সমান হ'য়ে একবার নেমে এসো। দেখি কেমন তোমার মন। কেমন সাম্যবাদী আর অহিংসাপরায়ণ তুমি।

লিখলেন স্বামিজী "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" পুস্তকে—"অহিংসা ঠিক, নির্ব্বৈর বড় কথা, কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও তবে তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনং উদ্যন্তং'। হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রাহ্মণ বধেও পাপ নেই, মনু বলছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্যপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ পরকালেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য, স্বধর্ম্ম করহে বাপু। অন্যায় করোনা, অত্যাচার করোনা। যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জ্জন ক'রে স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তুমি কিসের মানুষ?"

সবাই তো আর আত্মানন্দে মত্ত হ'য়ে পরমাত্মার লীলায় লিপ্ত হ'য়ে থাকে না। তিনি যাকে যে কাজ দিয়েছেন, তাই করে যাও বলিষ্ঠ ভাবে। ধর্ম্ম হবে তারই। ধর্ম্মের নামে ভীরুতাকে আশ্রয় কোর না। মনে রেখ ধর্ম্ম পালন করা বীরের কর্ম্ম। সেখানে দুর্ব্বলতার ঠাঁই নেই। নেই ভীরুতার প্রশ্রয়। সংসারটা ভরা সুখ, দুঃখ। সেখানে নিস্পৃহ থাকলে কি আর চলে? যা সত্য, যা চিরঞ্জীব, চিরন্তন তাকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে। বাধা পেয়ে সরে যেও না। অন্ধকার দেখে ভয় পেও না। ওরে, বিপদ বন্ধুর পথ এড়িয়ে গেলে তো আনন্দের সংবাদ—সে সংবাদটি জানবে না? দেখবে না সংসার আশ্রমের ঋষিকে?

আশ্বাস দিয়েছিলেন কাশ্মীরের মহারাজ স্বামিজীকে, একখণ্ড জমি দেবেন ঝিলাম নদীর তীরে। ভাবতে ছিলেন বিবেকানন্দ একটি সংস্কৃত কলেজ আর একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু আশার মুক্ত শুদ্ধ চিন্তায় সহসা এলো যেন একটা রুদ্ধতার গ্লানি। এলো যেন মনের অম্বরে ভেসে কতোগুলো কালো খণ্ড মেঘ। চাইলেন না জমি দিতে কাশ্মীরের মহারাজ। বহু চেষ্টা হোল। কিন্তু না। কিছুতেই জমি স্বামিজী পেলেন না।

বড় ব্যথা পেলেন। দুঃখে ভেঙ্গে যেতে চাইল বুকের পাঁজর। বুঝলেন তিনি এখানে কিছু হবার নয়। ওরা জড়বাদী। বিষয়ের এক কণা ছেড়ে

দিলে ওদের আহার নিদ্রা যাবে বন্ধ হ'য়ে। এ দেশীয় রাজ্য থেকে বৃটিশ-ভারত অনেক ভালো। অনেক মুক্ত তাদের মনের পরিধি।

২০শে সেপ্টেম্বর। আমন্ত্রণ লিপি এলো আমেরিকার কনসাল জেনারেলের কাছ থেকে। যাত্রা করলেন স্বামিজী তার সঙ্গে দেখা করতে ডালহ্রদে।

মাত্র দু-দিনের বিশ্রাম।

ফিরে এলেন আবার শ্রীনগরে।

মন আবার ওঠে বিষিয়ে। অন্তরলোকে ফিরে যেতে চায় যেন তার কর্ম্মের উদ্যম স্রোত। সেখানে অনেক শান্তি। অনেক তৃপ্তি। আত্মরতির সুখ সায়রে ডুবে থাকাই ভালো। কেউ জানবে না কেউ বিব্রত হবে না তার জন্যে। মনের নির্ম্মল পরিবেশে ধীরে ধীরে আভাসিত হয় ক্ষীরভবানীর মন্দির। যেন ডাকছেন মহামায়া মহারাত্রি থেকে, উত্তরণের মন্ত্রটি শিখিয়ে দেবার জন্য। লিখলেন আর একটি কবিতা। আকুল ব্যাকুল চিত্তে যাত্রা করলেন স্বামিজী ক্ষীরভবানীর দুর্গম পথে। বললেন সবাইকে—তোমরা কেউ এসো না আমার সঙ্গে। এলেন ক্ষীরভবানীর প্রস্রবণ তটে।

অন্তর্মুখী বিবেকানন্দ এখন আত্মধ্যানে মগ্ন। উগ্র তপস্যায় কেটে যায় দিনরাত্রি। খেয়াল খুশির দাসত্ব থেকে চলে এসেছেন বিবেকানন্দ উন্মুক্তির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। যত ইচ্ছে এগিয়ে যাও। কেউ বাঁধা দেবে না। কেউ দাঁড়াবে না পথ আটকে।

স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুমারী কন্যাকে পুজা করেন স্বামিজী। সযত্নে অর্ঘ্য সাজিয়ে অর্পণ করেন তাঁর পাদপদ্মে। লুটিয়ে পড়েন চরণ-প্রান্তে। মাতৃজ্ঞানে সন্তানের ভাব নিয়ে বলেন—মা, আমার মনের মেঘ করে দাও অপসৃত। নিয়ে এসো আমাকে কাম কামনা, মোহ বাসনার আবর্ত্ত থেকে তোমার চরণ তলে। শাস্ত্রের অলঙ্ঘনীয় বাক্যকে প্রত্যক্ষ করছেন বিবেকানন্দ বাস্তবে। উপলব্ধি করছেন জীবন দিয়ে ভারতীয় সাধনার ঐক্যটি। শিবশক্তির মিথুন লীলায় লীলাময় বিবেকানন্দ। তাইতো অমন আত্মভোলা ভাব।

একেই বলে বুঝি তন্ত্রের ষোড়শী পুজা! তান্ত্রিক তাই অদ্বয় সত্য লাভের অভিলাষে জীবনের অর্ঘ্য সাজিয়ে দিচ্ছেন কুমারীর চরণ-প্রান্তে।

সহসা চমক লাগে চিত্তে। চোখ পড়ে মন্দিরের দিকে। স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে প্রতিটি শিরা উপশিরা স্বামিজীর।

একি! তুমি আছো মা, ভাঙ্গা দেউলে! এমনি করে ভেঙ্গে দিয়ে

গেল নির্ব্বিবাদে মুসলমানেরা তোমার পবিত্র মন্দির? ওরা ভীরু। হিন্দুরা কি পারলে না প্রতিরোধের দ্বারা তোমায় রক্ষা করতে? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

সহসা তাঁর ভাব-সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হোল দৈব বাণী। ভেসে ভেসে এলো তা কর্ণে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বিবেকানন্দ। শুনলেন যেন—

কি?

বলছেন মা—"যদিই বা মুসলমান আমার মন্দির ধ্বংস করিয়া প্রতিমা অপবিত্র ক'রিয়া থাকে, তাহাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস্, না আমি তোকে রক্ষা করি?"

কে? কে তুমি?

আবার শুনলেন স্বামিজী—"যদি আমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি আমি সপ্ততল স্বুবর্ণমন্দির এই মুহূর্ত্তেই গঠন করিতে পারি না? আমার ইচ্ছাতেই এই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে।"

জ্ঞানের খররৌদ্রে বিদগ্ধ হ'য়ে গেল অজ্ঞানের আবরণ। দাম্ভিক বিবেকানন্দ নেমে এলেন সমতল সৈকতে। রজোগুণের সম্রাট সিংহাসন থেকে লুটিয়ে পড়লো জননীর চরণ-প্রান্তে। মনে পড়ে ঠাকুরের কথা। বলেছিলেন "নরেনের মনে একটা অজ্ঞানের পাতলা আবরণ মা-ই রাখিয়া দিয়াছেন.........।"

উন্নত শির মুহূর্ত্তে গেল নত হয়ে। ভাববিহ্বল বিবেকানন্দ তন্ময় হয়ে গেলেন।

হে মহামায়া, তোমার মায়ার খেলা বুঝি এমন সাধ্য নেই তো মা।

যদি এলে, কেন কথা বলেই শুধু চলে যাচ্ছ? দেখা দাও। দেখাও তোমার মাধুরী। রেখো না আর আমাদের অন্তরঙ্গতার মাঝে দূরত্বের বনবীথি, রেখ না সমুদ্রের ব্যবধান। তোমারই বাণী ব'য়ে চলেছি দেশে দেশে। আমি কে? তোমার দীপ-জ্বালানো প্রদীপের সল্‌তে। শিখা সঞ্চার কর, তাই জ্বলি। কথা বলি। যে বীণাটি দিয়ে দিলে হাতে, তার স্বুর বেঁধে না দিলে বাজাই কি করে? তুমি স্বুর বেঁধে দাও। চোখ দিয়েছ দু'টি। সে তো চর্ম্ম চোখ। কই? মর্ম্মচোখ তো দিলে না। ফুটল না তার চিরজাগর আঁখি দু'টি। যেমন বনের কণ্ঠে দিয়েছ গান। নদীর প্রাণে কল্লোল, সূর্য্যের চোখে পৃথিবীকে দেখবার দৃষ্টি—ঠিক তেমনটি কর আমার স্তিমিত শিখাটিকে। প্রজ্বলন্ত হোক আমার জ্ঞানের প্রদীপটি। আমি রাত্রির অন্ধকারে সেই জ্যোতিষ্মান্ আলো জ্বেলে পৌঁছে যাই তোমার পদপ্রান্তে।

৬১

শ্রীনগর।

স্বামিজী ফিরে এসেছেন আবার এখানে। ভক্তবৃন্দ তো পরম খুশী। কিন্তু এ কেমন ভাব?

ওরা দেখছে স্বামিজীকে অপলক নয়নে, দেখছে তাঁর হাব-ভাব। যেন একটা অসমতার ভাব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ছে দিন দিন। বলাবলি করছে তাই অনুরাগী ভক্তরা,—দেখছিস? কেমন কেমন মনে হয় না রে! কোথায় গেল সে উদ্যম। যেন দিন দিন এক মহা মগ্নতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন স্বামিজী, তাই না রে?

প্রাণ কেঁদে উঠল তাদের। বিলাপ ক'রে জানাল মনের আকুতি। অশ্রুসজল কাজল চোখে বলতে লাগল তারা—ওগো হে পান্থ, তোমার পথ কি তবে শেষ হ'য়ে গেল? চাইছ কি তুমি বিহঙ্গ হ'য়ে বিহার করতে আকাশে? যাচ্ছ কি চলে এই শ্যামলীম ধরণীর মোহ কাটিয়ে অনন্তের অভিসারে? তুমি যদি মৌন—তবে আমরা যে যাই মূক হয়ে। কথা কও। দেও সাড়া। যেও না কর্ম্মের ফেনিল তরঙ্গ থেকে অবসর নিয়ে অন্তর লোকের প্রশান্তিতে। কাজ যে অনেক বাকী। অনেক বিলম্ব আছে রাত্রি অবসানের। এ তুমি কোথায় এনে ছেড়ে দিলে? নিভিয়ে দিলে প্রদীপটি! দিকে দিকে রাত্রি। গহন ঘন কালো রাত্রি। নিঃসীম অন্ধকার। আমরা তো রিক্ত। তাই বলে কি তুমিও ফেলে চলে যাবে এমন নিঃসম্বল ভাবে? তুমি প্রবঞ্চিতের সখা হয়ে এলে বলেই তো আমরা ধন্য। পেয়েছি তোমাকে আমাদের অভাবে। তাইতো তুমি নিষ্কিঞ্চন। কি আছে আমাদের? আছে শুধু কান্না আর কাকুলি। দাও, দাও আমাদের চোখের জলের প্রত্যুক্তি। প্রত্যাসন্ন হোক তোমার অন্তরঙ্গতা। নেমে এসো। এসো হে তাপস, প্রমার পত্র নিয়ে হাতে। হোক জনে জনে লোকে লোকে তার প্রবহণ।

আকুল ব্যকুল হয়ে ডাকছে স্বামিজীকে তাঁর প্রিয় ভক্তবৃন্দ। কিন্তু কি জবাব দিলেন স্বামিজী। তিনি যেন বলতে চাইছেন—

ওরে আর চলতে চায় না আমার উদ্যমের রথ। চাকায় ধ'রেছে তার জ্ঞানের মরিচা। অজ্ঞানের গুণ্ঠন উন্মোচন করেছেন মা। এবার আমায় বিদায় দে তোরা। আর কেন? কি হবে আর মরুর বুকে কূপ খনন ক'রে? মিলবে না একবিন্দুও তৃষার বারি। আমায় যে মা ভুলে দিয়েছেন

অমৃত্রের পাত্র হাতে। তাই তো—"আমার কর্ম্মের স্পৃহা স্বদেশ প্রেম সমস্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। হরি ওঁ! আমি ভুল করিয়াছিলাম, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। মা—মা—তিনিই সব, তিনিই কর্ত্তা—আমি কে ? তাহার অজ্ঞান সন্তান মাত্র।"

দিনগুলো কাটছে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে। স'রে দাঁড়িয়েছেন কর্ম্মী বিবেকানন্দ। স'রে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বের অঙ্গন থেকে মুক্তির প্রাঙ্গণে। কেবল ধ্যান, তপ আর জপ। দিন কাটছে এমন এক মহা মগ্নতার মধ্যে। এ যেন তাঁর জীবনে এক বিরাট বিবর্ত্তন। স্তব্ধ হয়ে গেল জন সমুদ্র। থমকে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগল তারা বিদ্রোহীর এ ভাব-বৈচিত্র্য।

ভাবের পাগল একদম বসলেন বেঁকে। স'রে দাঁড়ালেন কলমুখর বিশ্ব থেকে শান্তিনিকেতনে—অন্তর লোকের ছায়াঘন বীথিবনে। কর্ম্মের ফেনায়িত তরঙ্গ থেকে স'রে এলেন বিবেকানন্দ বিরতির বেলাভূমে।

লোকেরা বলে এ আবার কেমন ভাব ?

কেন ?

যেমন প্রস্থন আর ভ্রমর। দূর থেকে ভ্রমর ফুল দেখে করতে থাকে কত গুন্‌গুনানী। কত না পূর্ব্বরাগ, আর্ত্তি ও আকুলতা। কিন্তু যেই মিলন হোল, বসল ভ্রমর ফুলে ?

গেল মৌন হ'য়ে। রইল না আর বেদনার কান্না। সে যেন মুহূর্ত্তে হ'য়ে গেল একটা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মালেক।

ধরো বর আর বধূ।

কেঁদে কেঁদে বলছে বঁধু—

তোমার কখন লগন হবে
আমায় খুলে বল',
বাতায়নে ব'সে ব'সে
ক্লান্ত পরাণ দিনের শেষে
তোমার পরশ পাবার তরে
হোল যে চঞ্চল।

এমনি কত গান, কত আবেগ অনুরাগের বংশীধ্বনি থেকে থেকে বেজে উঠতে থাকে বঁধুর নিরুদ্ধ অন্তরে। তার আকুল করা ব্যাকুল কান্নার ঝর্ণা নেমে আসে দু'টো নীল নয়ন বেয়ে।

কিন্তু যখন মিলন হয় ?

তখন বঁধু কেবল অনিমিখ নয়নে চেয়ে থাকে তার প্রিয়জনের পানে। আর ধীরে চুপে বলে—

আমার সব সাধনা শেষ বাসনার উত্তরণে
তোমায় পেয়ে ধন্য হ'লেম এই জীবনে।

মিলনের সুখ আস্বাদনে দু'জনেই তখন মৌন। মৌনের তপে তন্ময় তখন দ্বৈত সত্বা এক আত্মা, এক প্রাণ হ'য়ে ওঠে।

থেমে যায় কান্না। থাকে না আর আর্ত্তি।

স্বামিজীরও হোল তাই।

এত দিন কেবল বেজেছিল অনুরাগের বাঁশীটি। ভরা ছিল তাতে পুর্ব্বরাগের বিষাদ-ঘন সুর। ছিল দর্শনলোভন আকুতি।

কিন্তু আজ?

আজ তাঁর কর্ম্মময় জীবনের মায়াঘন ছায়া ছবি বিস্মৃতির অতলান্তে। জ্ঞান গরিমার সৌধচূড়া ধূলায় লুণ্ঠিত। আজ তিনি এক অনন্ত সম্পদের সম্রাট। যার তুলনা ভুবনে নেই।

অসীম এসে সীমায় ধরা দিলে, অরূপ এসে রূপময় হ'য়ে উঠলে তা দেখে তন্ময় না হবেন কে?

যাকে খুঁজে খুঁজে এত কান্না। যাকে মনের আসনে রেখে বাইরে এত মন্দির নির্ম্মাণ। যার আগমন প্রতীক্ষায় এত সব কাব্যের ঝঙ্কার—তিনি যে এসেছেন। এসেছেন সেই সুন্দর।

এসেছেন তাঁর দর্শনে।

কেবল কি তাই?

না।

তবে?

ওরে স্পর্শনেও সেই রূপাতীত ধরা দিয়েছেন রূপময় হ'য়ে। তাইতো বিবেকানন্দ বিবেকের আনন্দে মুগ্ধ, স্তব্ধ। বাঁশরী আর বাজে না; যেন হাওয়া বয় ধীরে। চুপি ডাকে পাখী। আর পলকহীন নির্ব্বাক স্বামিজী থাকেন তাকিয়ে। এ হোল যোগীর যোগযুক্ত ভাব।

কেউ বলবে একে পাগল। কেউ বা করবে ভীরু বলে অবজ্ঞা। আবার কারো চোখে এ ভাব নিছক কর্ম্মথেকে অবসর নেয়ার একটা সযত্ন প্রয়াস বলেই প্রতীয়মান হবে।

কিন্তু না। তা নয়।

যোগী বা সাধকের জীবনে এ অপূর্ব্ব ক্ষণটি আসে। আসে থেকে থেকে—বারে বারে। যখন এমন হয়, তখন আর থাকে না সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি। কেবল স্রষ্টাকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। স্বামিজী পেয়েছেন যে সেই স্রষ্টার ঠিকানা। মিলেছেন তাঁর সঙ্গে। কি কথা বলবেন আর?

বলবেন না কি শুধু— এসেছ বলে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ে কান্না আমার।
সকল জ্বালা সকল ব্যথার
হয় গো অবসান,
থেমে গেল আমার যতেক
কান্না করুণ গান।

কাটল কয়েকটা দিন এমনি নীরবতার মধ্যে।

ভিক্ষুর অন্তরে নিরন্তর মনোময়ের আরাধনা। কিন্তু কর্ম্মের আবর্ত্ত থেকে ধ্যান-লোকে এলেই কি চেতন মনকে ছায়াচ্ছন্ন করা যায়? যার সঙ্গে রয়েছে নাড়ীর যোগ, তাকে তো মুহূর্ত্তে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তো সে যোগ বন্ধন ছিন্ন ক'রে নির্জ্জন নিকেতনে মনের মন্দিরে সমাসীন হয়েও শুনতে পেলেন যেন মানুষের কান্না। মানুষের আহ্বান।

কেমন ক'রে রইবেন আর স্তব্ধ আসনে ধ্যানী মন লয়ে। কেন?

ওরে, মানুষের কান্নার প্রভাব তো কম নয়। তার ডাকে যে পাষাণ যায় গ'লে। হয় নির্গলিত ঝর্ণা। প্রজ্জলন্ত অগ্নি হ'য়ে যায় সমুদ্র। আর সেই স্রষ্টা এসে সৃষ্টির মাঝে পরিগ্রহ করেন রূপ। যোগীর নয়নে তখন বিশ্ব এসে ধরা দেয় অখণ্ড সত্ত্বা লয়ে।

নেমে এলেন স্বামিজী সহজে। এলেন আবার ফিরে সেই মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে। পাঠ করতে লাগলেন তাঁর রচিত কবিতাটি—যাহা তিনি লিখেছিলেন ক্ষীরভবানী যাত্রার প্রাক্কালে 'কালী দি মাদার'।

"লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি! করাল নাম তোর মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালী তুই প্রলয় রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে।"

না মা। আমায় তুই ধ'রে রাখিস না। ছেড়ে দে লক্ষ জনার মাঝখানে। তাদের হ'য়ে তাদের দুঃখ বেদনার মাঝে আমিও একীভূত হয়ে যাই।

নব যুগের ঋত্বিক আহ্বান করলেন মৃত্যুরূপা এলোকেশীকে। কেন?

ওরে দুঃখের দরিয়ায় পাড়ি না দিয়ে কে পেয়েছে সুখের কূল? আগে পরিচিত হ'তে হবে দুঃখের সঙ্গে। তার পরে সুখ সন্ধান। এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? তাই তো মা আমার মৃত্যুরূপা এলোকেশী। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েই জানতে হবে জীবনের সংবাদ।

চিনতে পেরেছি মা। জেনেছি তোমার অমন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির স্বরূপটি। বুঝে নিয়েছি তোমার আসলটি। বাইরে তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী। কিন্তু অতলে? অতল তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য। জ্যোতির বিচ্ছুরণ। তুমি মা কারুণ্য পূর্ণেক্ষণা। তোমার করুণা আর ক্ষমার তো শেষ নেই। তবে যদি তুমি প্রলয় রূপিণী? আমাকে কর মা প্রলয়ঙ্কর। নিক্ষেপ কর ভয়ঙ্করের মধ্যে। মৃত্যুর বিভীষিকায়, ভয়ের বিকৃত ভঙ্গীতে রুদ্ধ করে দাও আমার চলার পথ। আমি তার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে যাই। মৃত্যুর আরাধনায় জীবনের জয়গান গেয়ে উঠি। ভয়ঙ্করের সঙ্গে লড়াই করে চলে যাই মা, শঙ্করের চরণ-প্রান্তে। দাও মা, আমায় সেই মন্ত্রটি শিখিয়ে দাও। আমি দুঃখের তপ করে তোমাকে পেতে চাই। প্রলয়ের তরঙ্গে শুনতে চাই মা তোমার পদধ্বনি। দেখতে চাই তিমির রাত্রির গহন-ঘন অন্ধকারে তোমারই চরণ পদ্মটি।

লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করছেন স্বামিজী। যেন তাহাদের ডেকে ডেকে বলছেন, ভয় পেয়ে পিছু হ'টে যাসনে। বীর্য্যবান হও, বল সঞ্চয় কর। বিপদের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় নির্ভাবনায়।

আয়, আয় তোরা। চলে আয়, মগ্ন হ'য়ে যা রাত্রির তপস্যায়। আসুক দুর্য্যোগ। খেলে যাক বিদ্যুৎ। হোক বজ্র পতন। এক পা পিছু হটিস না। তন্ময় হ'য়ে যা বজ্রের তপে। মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ কর মুখোমুখি হাহাকার, আর্ত্তনাদে ভয়পেয়ে রুদ্ধ করে দিস না তোর বাতায়নের দরজা। জানিস না? মা আমার 'মৃত্যুরূপেন সংস্থিতা।' ডাক সেই মৃত্যুরূপা ভয়ঙ্করীকে।

যা চলে নির্ভয়ের রাজ্য। আগে মায়ের প্রলয় রূপি ভয়ঙ্করী রূপের ধ্যান ক'রে সিদ্ধিলাভ কর। কর ঐ মৃত্যুরূপের আরাধনা। দেখবি মা আমার প্রসন্না, স্নিগ্ধা। তাঁর চরণে চারুচন্দ্রের প্রভা, ললাটে সূর্য্যের স্বাক্ষর, মায়ের অঙ্গে অনিন্দ্য কান্তি। কোথায় গেছে লুপ্ত হ'য়ে তাঁর কালো রূপ। বলবি তখন

মা আমার কালো নয় কো নয়
মায়ের হাসি ঝরলে পড়ে
বিশ্ব ভুবন আলো হয়।
মায়ের চরণ-পদ্ম-প্রভা
দূর করে দেয় তামস বিভা
মায়ের পায়ের নূপুর ধ্বনি
দুঃখ ব্যথার করে লয়।
মা আমার কালো নয় কো নয়।

দেখবি ঘুঁচে গেছে ঐ কালো রূপ। দুঃখ এসে তোর দুয়ারে জ্বেলে দিয়ে গেছে সুখের দীপশিখাটি! মৃত্যু নিয়ে এসেছে জীবনের জয়গান, সব ব্যথা সব গ্লানির ওপরে ফুটে উঠেছে মায়েরই চরণ-পদ্মটি।

বললেন স্বামিজী নিবেদিতাকে--"মাকে আপনা হইতে যেমন অমঙ্গলের মধ্যে, আতঙ্কের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যে, তেমন যাহা কিছু আনন্দ ও মাধুর্য্য দেয়, তাহার মধ্যেও চিনিতে শেখ।...........মৃত্যুর ধ্যান করো ভয়ঙ্করের পুজা করো! কেবল ভয়ঙ্করের পুজার মধ্য দিয়াই ভয়ঙ্করকে জয় করিতে পারো, অমরত্ব লাভ করিতে পারো।...........যন্ত্রণার মধ্যেই আনন্দ থাকিতে পারে! মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁহার অভিশাপও আশীর্ব্বাদ। হৃদয়ে চিতা জ্বালাও, সেখানে সকল গর্ব্ব, স্বার্থ ও কামনাকে পুড়াইয়া ছাই করো। তখনই, কেবল তখনই মা আসিবেন।"

শ্মশানেই শ্যামা মায়ের শান্তির কোল। শ্রান্ত সন্তানকে মা বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরবেন বুকে। প্রত্যক্ষ কর সেই নগ্ন ভয়ঙ্করকে। দু'হাতে লুণ্ঠন কর জীবনের জঞ্জালকে।

শেষ হোল কাশ্মীর ভ্রমণ। যাত্রা করলেন স্বামিজী সেখান থেকে। পিছু ফেলে এলেন শ্যামশ্রী কাশ্মীরের রম্য নিকেতন। লাহোর এসে পৌঁছলেন।

মাত্র কয় দিনের বিরতি।

এবারে ঘরে ফেরার পালা। ১৮ই অক্টোবর পৌঁছে গেলেন বেলুড়ে। একটা আনন্দের সাড়া পড়ে যায় মুহূর্ত্তে। অপ্রত্যাশিত ভাবে বেলুড়বাসী তাদের স্বামিজীকে পেয়ে যেন অধীর উদ্বেল হয়ে উঠল।

দু'একটা দিন কাটল।

সহসা তাদের মুখে নেমে এলো বিষণ্ণতার অন্ধকার। জাগল মনে চিন্তার ঝড়।

কেন ?

স্বামিজীর শরীর ভেঙ্গেছে। চোখের কোণে জমানো রক্ত, বিবর্ণ হ'য়ে গেছে দেহের রং। আহা পাণ্ডুর যেন দেখাচ্ছে তনুশ্রী। ওরে একি হলো রে ?

কোথায় চলে গেল সেই উদ্যম উৎসাহ আর কর্ম্ম প্রেরণা। যা ডেকে নিয়ে আয় ডাক্তার। ওরা ডাক্তার ডাকল।

কিন্তু ডাক্তার এসে কি করবে ! এ রোগ তো ডাক্তার সারাতে পারবে না। এ তো মনোব্যাধি নয়, এ যে প্রাণনিধির সঙ্গে মিলনের মোহ মুগ্ধ ভাব। কি ছাই খেয়াল থাকবে আর বাইরের পৃথিবীর দিকে ? ঠাকুর বলতেন "শরীর শরা মন বুদ্ধি............।" ওরে এ যে শরায় ধরেছে বুদ্ধির রং। তাই তো অমন বিবর্ণ হয়ে গেছেন স্বামিজী। ভাবে কেবল অনুরাগের স্ফুরণ। চিন্তার আকাশে হয়েছে চিত্তের বিকাশ। বলার তো নেই কিছু আর। পাবারও স্পৃহা নেই। লাভালাভের সারটুকু মজুত করে বসেছেন বিবেকানন্দ। যোগীর যোগে এসে ধরা দিয়েছেন সেই মহান্ত পুরুষ। এবার যেন শুধু বলছেন তিনি—

'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।

যে লাভের পরে আর কোন লাভকে লাভ বলেই মনে হয় না, সেই দুর্লভকে লাভ করেছেন স্বামিজী। লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর আমিত্বের অহঙ্কার। তাই তো ঐ শোন তিনি কি বলছেন। একজন অনুরাগী এসে জিজ্ঞেস করল স্বামিজীকে—জিজ্ঞেস করল কি যেন একটা কাজের কথা।

কি বললেন স্বামিজী ?

বললেন—"আমি কি জানি, মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

মায়ের হুকুমনামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ।

শরৎচন্দ্র এসেছে—

এসেছে গুরুদর্শনে বেলুড়ে। দু'একটা কথা তার সঙ্গে বললেন স্বামিজী। কথায় কথায় বললেন এক সময়—"শিব স্বয়ং আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করছেন, তিনি কিছুতেই আর যাবেন না।"

তাই বুঝি তুমি শুনতে পেয়েছ নিষ্কামনার বাণী। গ্রহণ করেছ প্রণতির দীক্ষা। অন্ধকার রাজ্যের সীমানা দখল করেছো আলোর সৈন্য নিয়ে। কিন্তু ওদের কাছে তোমার এ ভাব যে অনাত্মীয়ের ভাব। তাই তোমার সতীর্থ আর ভক্তের দল উঠেছে ব্যস্ত হ'য়ে।

নিয়ে এলো স্বামিজীকে বাগবাজার। নিয়ে এলো বলরাম বাবুর বাড়ীতে।

কেন ?

চিকিৎসার জন্তে।

দিন যেতে লাগল। সবাই উৎকণ্ঠিত। অপলক নয়নে দেখছে স্বামিজীকে। ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগলেন স্বামিজী সহজে। আনন্দে অধীর অনুরাগীবৃন্দ। বলেন কত কথা। আবার সুরু হোল ধর্ম্ম চর্চ্চা। দর্শন আলোচনা।

ওরে যোগ কি জানিস্ ? যোগ হোল আধ্যাত্মিক জীবনের সোপান। একে আয়ত্ত করতে হলে চাই—অভিমান শূন্যতা ও বাসনা শূন্য মন। অহঙ্কারকে দিতে হবে নির্ব্বাসন। তবে হবে দিব্য-জ্ঞান—ভাগবত অনুভূতি। সেই জ্ঞানাঞ্জন চিনিয়ে দেবে—জানিয়ে দেবে তোর জীবনকে। তোর চলার ছন্দকে। জ্ঞানের জ্ঞানকে জান। জান সেই শাশ্বত, অদ্বিতীয় জ্ঞানকে। জ্ঞানের জ্ঞানই হোল সেই পরা প্রজ্ঞার জ্ঞান। একে জানতে পারলেই হোল। আর কি চাই। শ্রদ্ধার অন্ত'র্দীপ্তির সঙ্গে যোগ করে দে মনোভঙ্গিটি। দেখবি, ফসল ফলেছে সফলতার। মেঘের বুকে বেরিয়েছে তারার মালা।

এমনি কত কথা। কত ব্যাখ্যা।

চলে এলেন স্বামিজী শ্রীমার বাড়ীতে। এলো নিবেদিতাও। সবাই জানাল তাঁকে সাদর আহ্বান।

পুর্ণ হয়েছে আয়োজন। নৈষ্ফল্যের গুহায় জ্বালিয়ে দিয়েছি সফলতার দীপমালা। বিঘ্নের উপল বন্ধুর পথকে এনেছি সহজ সীমায়। এবারে চল মা। তোমার আশীর্ব্বাদ বৈ তো ফুটবে না শতদল। বিকাশ হবে না বিভুতিভূষণের। তুমি করবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। আনবে মরুর বুকে সমুদ্রের সঙ্গীত। রিক্তের বেদনায় ছড়িয়ে দেবে শান্তির বারি। আর অপুর্ণতার মাঝে আনবে পুর্ণতার স্বাচ্ছন্দ্য। চলো মা। এবারে বেলুড় চল।

আহ্বান জানাচ্ছেন স্বামিজী—

আহ্বান জানাচ্ছেন শ্রীমাকে শ্যামা পুজা করবার জন্যে। কেন যাব না? তোরা আয়োজন করেছিস। আমি যাব না? ওরে আমার কি আর আনন্দের সীমা আছে নরেন? চল।

এলেন শ্রীমা বেলুড়ে।

মহাসমারোহে পুজা হোল। আশীর্ব্বাদ করলেন মা—আশীর্ব্বাদ করলেন সবাইকে। তোদের কল্যাণ হোক। সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর তোরা। জগৎকে জানিয়ে দে আনন্দের সংবাদ, মুক্তির মন্ত্র। তোরা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়। জনে জনে বিলিয়ে দে ভক্তি-মুক্তির নামামৃত। মানুষ হ'য়ে যারা মানুষের দাবী থেকে বঞ্চিত—তাদের টেনে তুলে নে কোলে। মুছিয়ে দে কান্নার অশ্রু। ভয় কি? ঠাকুর তোদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন।

আনন্দের মধ্যে সমাপন হোল উৎসব। ভক্তি-বিনম্র-চিত্তে সবাই গ্রহণ করল শ্রীমার চরণ-রেণু।

দুপুরের দিকে শ্রীমাকে নিয়ে যাত্রা করলেন—কলকাতার দিকে, যাত্রা করলেন স্বামিজী, ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করতে হবে যে শ্রীমাকে। তাই আর রইতে পাড়লেন না বেলুড়ে।

নিবেদিতার মন ভরা অভিলাষ—মা কিছু বলুক। প্রসারিত ক'রে দিক অভয়ের হস্ত।

বুঝতে পাড়লেন মা। বুঝতে পাড়লেন নিবেদিতার অন্তরের আকুতি। বললেন কত কথা। করলেন আশীর্ব্বাদ। ঈশ্বরের দুয়ারে পাঠালেন প্রার্থনার সঙ্গীত,—কল্যাণ হোক। মঙ্গল হোক। বছর বছর বের হোক আদর্শ মেয়েরা। তাদের জীবন করুক উৎসর্গ। উৎসর্গ করুক সমাজ-কল্যাণ

ব্রতে। চিন্তায় জাগুক তাদের সত্যের দীপলেখা। উদ্বুদ্ধ হোক ভারতীয় সাধনার ঐক্যে। জ্বেলে দিতে দাও হে প্রভু, জ্বেলে দিতে দাও জাতির স্তিমিত জীবনে শক্তির দীপ-বহ্নি। শিব-সত্যের প্রতিষ্ঠায় ওরা যেন দিতে পারে আত্মাহুতি।

শ্রীমার কল্যাণ-স্তুতি শুনে আনন্দে অধীর হ'য়ে গেলো নিবেদিতা। উৎসাহের সঙ্গে জুড়ে দিলে মনোভঙ্গিটি। সুরু করল তার কর্ম্ম জীবন দ্বিগুণ প্রেরণা লয়ে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা দিন—

কেটে গেল সময়ের ডানায় ভর ক'রে হাওয়ার মতন। এলো ৯ই ডিসেম্বর। স্মরণীয় দিন। ইতিহাসের উজ্জ্বল পাতায় স্বর্ণলেখা দিন।

কেন?

মহাতীর্থের দ্বার উদ্‌ঘাটন হবে আজ। ভারতীয় সাধন তীর্থের আর একটি কেন্দ্র চূড়ায় উড়বে মুক্তির গৈরিক পতাকা। উন্মুক্ত হবে সিদ্ধিদ্বার। যাত্রা করবে যুগ যুগান্তের যাত্রী নব জীবনের তীর্থ তোরণে। অতিক্রম ক'রে যাবে তারা মৃত্যু লাঞ্ছিত রাত্রিকে। তলিয়ে দেবে বিঘ্ন বেদির ভিতখানাকে পাতালপুরীর অতলে। নিয়ে যাবেন স্বামিজী ঠাকুরের দেহাবশেষ, নিয়ে যাবেন নীলাম্বর বাবুর বাড়ী থেকে বেলুড়ে।

সূর্য্য ওঠেনি এখনো। সবে ডাক দিয়ে গেল দু'-একটি পাখী। লোকেরা বলে একে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। স্বামিজী ডাকলেন শিষ্যবৃন্দকে। বললেন—যা, গঙ্গায় স্নান ক'রে আয়। সবাই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর শীতল সলিলে করল অবগাহন। পরিধান করল গৈরিক। সেরে নিল আহ্নিক।

এবারে যাত্রার পালা।

এগিয়ে এলেন বিবেকানন্দ। দাঁড়ালেন পবিত্র তাম্রাধারের সম্মুখে। প্রণাম করলেন। মনে পড়ে গেল বিস্মৃত দিনের মধু-মুগ্ধ ক্ষণগুলো। এক এক ক'রে যেন মাল্যগ্রথিত পুষ্পের মত এসে উঁকি মারতে লাগল মনের প্রচ্ছায়। একটু তন্ময় হয়ে গেলেন স্বামিজী। একটা ঢেউ খেলান নদীর মত সমস্তখানা মনকে মন্থন ক'রে গেল যেন। ব'লে উঠলেন আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে—ব'লে উঠলেন বিবেকানন্দ—'জয় রামকৃষ্ণ কী জয়।'

হে প্রভু, আছো তুমি অনলে অনিলে। আছো অন্তরীক্ষে। আবার মানুষের মনোলোকে। কি সাধ্য আমার, তোমাকে বন্দী করে রাখি ক্ষুদ্র দেউলে? তুমি দয়া করে যদি থাকো তবেই আমরা ধন্য। যদি দাও প্রদীপ

জ্বেলে, তবেই হয়ে উঠবে মন্দির দেবতার লীলালয়। কর যদি দাক্ষিণ্যের বাহু উত্তোলিত, তবেই অতিক্রান্ত হয়ে যায় তিমির-ঘন গহন রাত্রির। তাকি তুমি করবে না? দেবে না কি জ্বেলে প্রীতির প্রদীপ? আনবে নাকি সাফল্যের জয়-স্পন্দন?

ধীরে ধীরে স্মরণ লোকে আভাসিত হয় ঠাকুরের কথা। পথে চলতে চলতে, বলতে লাগলেন স্বামিজী—ওরে তোরা জানিস, "ঠাকুর একবার আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেথায় খুশী নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকবো, তা সে কুঁড়ে ঘরই হোক আর গাছ তলাই হোক।"

আমি তো তাঁর আদেশ বৈ কিছু করছি না। নির্ভর করেছি প্রভুর আশীর্ব্বাদের ওপর। "তোমরা স্থির জেনো, যতদিন তাঁর নামে, তাঁর অনুগামীরা পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, সর্ব্বমানবে সমপ্রীতির আদর্শ রক্ষা করতে পারবে, ততদিন ঠাকুর এই মঠকে তাঁর দিব্য উপস্থিতি দ্বারা রাখবেন ধন্য করে।"

পৌঁছে গেলেন বেলুড়ে।

প্রণাম করছেন স্বামিজী—প্রণাম করছেন সাষ্টাঙ্গে। রাখলেন তাম্রাধার। সমাপন হোল পুজা। যজ্ঞাগ্নি জ্বলতে লাগল। যুগাচার্য্য তারই সম্মুখে উপবেসন ক'রে পড়তে লাগলেন বেদস্তুতি। এ যেন সেই অতীত ভারতের ঋষি। সকলে ভক্তি বিনম্রচিত্তে শ্রবণ করল। জানাল প্রণতি। ভোগ হোল। নিজ হাতে স্বামিজী নিবেদন করলেন শ্রীগুরুর সমীপে। আহ্বান করলেন সবাইকে। বললেন বিবেকানন্দ,—"ভ্রাতৃবৃন্দ আইস, আমরা কায়মনোপ্রাণে লোক-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন বহুকাল ধরিয়া এই পবিত্র স্থানে বাস করেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও সূক্ষ্ম আবির্ভাবে ইহা পরিণত হউক পুণ্যক্ষেত্রে, এই কর্ম্মকেন্দ্র হইতে বহু জন-হিতায় বহুজন সুখায় সর্ব্বসম্প্রদায়, সর্ব্বধর্ম্মের ভেদদ্বন্দ্ব নিরসনের ভাবধারা প্রচারিত ও আচরিত—হইবে।"

থাকবে না সম্প্রদায়ের ভেদ-দ্বন্দ্ব। মানুষ করবে না মানুষকে অবজ্ঞা—অবহেলা। অমৃতের পুত্র সকলে। ঈশ্বরের সন্তান সবাই। তাঁরই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ক'রে যাবে এক মনে অখণ্ড বিশ্বে। এই তো আমাদের আদর্শ।... ...."এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তাতে জগত ফেলবে ছেয়ে; মানুষের জীবন-গতি দেবে ফিরিয়ে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের একত্র সমন্বয়ে বেরোবে এখান থেকে আদর্শ মানুষ। এই মঠ

ভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তে হবে প্রাণের সঞ্চার, যথার্থ ধর্ম্মানু-রাগিগণ সব এখানে এসে কালে জুটবে—মনে ঐরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।"

হে প্রভু, পুর্ণ কর আমাদের মনস্কামনা। সঞ্চার কর তোমার শান্ত স্নিগ্ধ ছন্দটি আমাদের কর্ম্ম-কামনায়। জগৎকে দেখতে দাও—দাও দেখতে তোমারই সার্ব্বভৌম মতবাদের তীর্থ নিকেতন। মানুষ যেন এখানে এসে পায় তার জীবনের দুর্লভকে। পায় যেন সত্যের স্বাক্ষরটি। তোমার আদর্শ প্রচার করতে দাও জগতের দিকে দিকে।

একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা মনে করলেন স্বামিজী। প্রস্তাব করলেন। এক বাক্যে জানাল সবাই সম্মতি।

১৩০৫ সাল। ১লা মাঘ। প্রকাশিত হোল 'উদ্বোধন' পত্রিকা। শ্রম ও কর্ম্ম দিয়ে 'উদ্বোধন' কে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে লাগলেন সবাই।

অক্লান্ত শ্রমে শরীর ভেঙ্গেছে স্বামিজীর। একটু বিশ্রামের দরকার এখন। কিন্তু বেলুড়ে থাকলে তো বিশ্রাম মিলবে না! স্বামিজী তাই যাত্রা করলেন বৈদ্যনাথের পথে। উঠলেন এসে প্রিয়নাথ মুখুয্যের বাড়ীতে।

কিন্তু এখানে এসে হোল কি?

শরীর যে আরো অসুস্থ হ'য়ে যাচ্ছে দিন দিন।

মেঘ-মসি আকাশের মতো সমস্তখানা শরীর যেন একটা ক্লান্তি ও অবসাদে গেল ম্লান হ'য়ে। হাঁপানি রোগ বেড়ে গেল অতি মাত্রায়।

দিনগুলো যায় চলে একরকম। কিন্তু রাত্রে তো ঘুম আসে না! জেগে থাকতে হয় সমস্তটা রাত। সে কি কেবল জেগেই মুক্তি?

না।

তবে?

কখনো ব'সে, কখনো শুয়ে, তবুও একটু শান্তি, একটু আরামের খোঁজ পাচ্ছেন না বিবেকানন্দ। যেন একটা কষ্টের সমুদ্রে পাড়ি উজিয়ে পড়েছেন এসে উত্তাল-ক্ষুব্ধ মোহনায়। এখানে শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করতে হয় মৃত্যুকে। জীবনটা যেন একটা জঞ্জাল, একটা নিশ্চল স্থবির স্থাণুর মতোই মনে হয় বারে বারে।

এক দিন তো বিষম বিপদ। ভাবছে সবাই, আজ আর আশা নেই। বুঝি যাবেন চলে স্বামিজী। করবেন দেহত্যাগ।

কেন?

কিছুতেই সহজ সীমায় আসছে না শ্বাসের গতি। এলোমেলোভাবে ধেয়ে চলেছে। কখনও বা শ্লথ মন্থর তার গতি। আবার কখনো ক্ষিপ্র সতেজ, বেগবান ঝর্ণার মতো উচ্ছল হ'য়ে চলছে। যেন অমন একখানা শুদ্ধ পবিত্র দেহ পেয়ে তারা হয়ে উঠছে লীলামত্ত। খেলা করছে থেকে থেকে।

কিন্তু—'রাখে কৃষ্ণ মারে কে—'

দেখতে দেখতে ব্যাধির প্রহরীরা মানল পরাজয়। ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠলেন স্বামিজী। শুনতে পেলেন যেন কর্ম্মসমুদ্রের উদাত্ত আহ্বান। আরব্ধ কর্ম্ম স্রোত তাঁকে বারে বারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। আর যেন নিয়ত দিন রাত শুনতে পেলেন তিনি ফেলে আসা দিনের ডাক।

কেমন ক'রে আর থাকবেন কর্ম্মযোগী নীরবতার আসনে বসে?

বিশ্রাম নেয়া হোল না। চিকিৎসকগণের একান্ত অনুরোধ ফেরাতে পারল না তাঁকে সঙ্কল্প থেকে। যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন কলকাতার পথে। ৩রা ফেব্রুয়ারী পেঁাছলেন বেলুড়ে।

কাজ কর্ম্ম বেশ ভালো ভাবেই চলছিল তখন। বড় খুশী হলেন স্বামিজী। আনন্দে মন খানা ভ'রে গেল। কোথায় লুপ্ত হ'য়ে গেল রোগের তাণ্ডব। পুর্ব্ব জীবনের সবগুলো কাজই গ্রহণ করলেন আবার অবাধে। সেই—আলোচনা, সভা, ধ্যান ও জনকল্যাণ-ব্রত। কিন্তু মনের আকাশে স্বপ্নের স্বাক্ষর—কি সে স্বপ্নটি?

কেবল কেন্দ্র বিন্দুতে আটকা পড়ে রইলে তো চলবে না। প্রচার করতে হবে ঠাকুরের আদর্শ দেশে দেশে। ডাকলেন গুরু ভাইদের। আর ডাকলেন প্রিয় শিষ্য বৃন্দকে। বললেন খুলে মনের কথাটি।

প্রচার করতে হবে প্রভুর বাণী সমগ্র ভারতবর্ষে। প্রতিটি মানুষের মনে মনে, ঘরে ঘরে শোনাবি তোরা ঠাকুরের মুখ নিসৃত অমৃত মধুরবাণী। যা, চলে যা, দেশ দেশান্তরে যা। কেন ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে রইবেন আমার ঠাকুর? ওরে জগৎ-পতির পরিচয় জানিয়ে দে জগতের সবাইকে।

বললেন স্বামিজী, বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দজীকে ঢাকার অঞ্চলে যেতে।

সহসা যেন বজ্রপতন হোল বিরজানন্দের মস্তকে। কি বলছ তুমি? ন পারি কিছু বলতে। না জানি কোন তত্ত্ব। কি গান শুনাব? কি কথ কইব? "স্বামিজী, আমি কিছুই জানি না, কি বলব লোককে?"

ধীর গম্ভীর বিবেকানন্দ। রইলেন ক্ষাণিকটা চুপ করে। বললেন তার পরে,—"যাও বল গিয়া যে, আমি কিছুই জানি না, তাহাই এক মহত্তম বার্ত্তা।'

বলগে, আমি কিছু নয়। শুনাতে এসেছি প্রভুর কথা। গাইতে এসেছি তাঁরই গান।

কিন্তু বিরজানন্দের অন্তর নিরন্তর ভাবছে ত্যাগ তিতিক্ষার কথা। ভাবছে আত্মসাক্ষাতের ভাবনা।

হে ঈশ্বর, আমাকে জানতে দাও আগে। পরিচয় নিতে দাও আত্মার। আমি কে? তার হদিস না ক'রে কেমন ক'রে যাই অন্যকে বলতে তোমার রূপ-ঐশ্বর্য্যের কথা। স্বরূপ উপলব্ধিই তো ঈশ্বর লাভ। কিন্তু পেলাম না তো এখনো আত্মার আত্মীয়টিকে খুঁজে। তুমি আমার সহায় হও। দাও বলে আমায় তোমার সন্ধান জানবার উপায়টি। দিয়ে দাও প্রণতির দীক্ষা।

মন বোঝে মনের কথা। বুঝলেন স্বামিজী বিরজানন্দের আকুল মনের ব্যাকুল বাসনা।

বললেন ডেকে—"স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করলে তুমি নরকে যাবে। যদি তুমি সেই পূর্ণব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে চাও, তা হ'লে অন্যের মুক্তির জন্য সাহায্য কর; নিজের মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনাশ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।"

ব্রহ্মকে উপলব্ধি কর' মানুষের মধ্যে। তাদের অন্তরে। যারা দুঃখ দৈন্যের চাপে নিয়ত প্রত্যক্ষ করছে মৃত্যুকে। যারা লাঞ্ছনার, অবজ্ঞার বস্তু হ'য়ে রইল জগতের বুকে। যাদের চোখের জলের খোঁজ কেউ নিলে না। মুছিয়ে দিলে না কান্নার অশ্রু আপন আঁচলে, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। তাদের দুঃখ বেদনায় শুনাও গিয়ে অভয়ের মন্ত্র। মানুষের দাবীকে, মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দাও। সংগ্রাম কর সত্যের ধ্বজা ধ'রে। "......ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হ'য়ে জগদ্ধিতায় কর্ম্মে এগিয়ে যাও। যদি পরকল্যাণ কামনায় কর্ম্মে অগ্রসর হ'য়ে নরকেও যেতে হয়, কি আসে যায় বা তাতে?"

সহসা স্বামিজী যেন একটু আনমনা হ'য়ে গেলেন। ধীরে ধীরে ঢুকলেন গিয়ে ঠাকুর ঘরে। বসলেন ধ্যানে। কেটে গেল অনেক সময়। ফিরে এলেন।

কি শুনে এলেন—আর কি বা এলেন দেখে? দেখে এলেন অভয়ের হস্ত। শুনে এলেন সম্মতির মন্ত্র। বললেন—"আমি, আমার শক্তি তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করব। শ্রীভগবান সর্ব্বদা তোমাদের পশ্চাতে থাকবেন, কোন চিন্তা নেই।"

৬৩

মনের আকাশে উদিত হ'য়েছে নবারুণ।

বুঝতে পেরেছে ভক্তবৃন্দ, বুঝতে পেরেছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের' গুহ্যতত্ত্বটি। আর বুঝতে পেরেছে তারা তাদের প্রিয় প্রভুর আদর্শ।

হে প্রভু, রইবে যদি ছায়ার মতো শান্তির প্রশান্তি ছড়িয়ে—তবে আর ভাবনা কিসের? দিয়ে দাও যদি মনভরা ভাব, আর কণ্ঠ ভরা সুর—তবে গান গাইব, নৃত্য করব আনন্দে, তা আবার বলতে হবে কেন? শক্তি যদি দাও বাহুতে, মুক্তির রেণু মাখিয়ে দিলে যদি মনে—তবে আর কোন্ দৈন্যে রইব নয়ন বুজে গহন বনে ধ্যানাসনে বসে? না—না। তোমার পথেই আমাদের যাত্রার সূচনা হোক, হোক তোমার রূঢ় বাস্তবের মধ্যাহ্নে আমাদের শোভা-যাত্রা সুরু।

বিরজানন্দ চলল ঢাকা। সঙ্গে সঙ্গী হোল প্রকাশানন্দ। স্বামিজীর নির্দ্দেশ আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—এই সম্বল ক'রে ওরা যাত্রা করল।

তুরিয়ানন্দ ও সদানন্দ গেল গুজরাটে। মঠে রইলেন স্বামিজী।

কত লোক আসে। কলেজের ছাত্র। অধ্যাপক। কেবল কি তারা? আসে নিঃসম্বল মানুষটি থেকে পথের পথিক অবধি। আসে, যে যার মনের খোরাক আহরণ করতে। আসে বিদ্রোহীর বজ্র দৃঢ় বাণী শুনতে—"দু'হাজার বীর হৃদয়, বিশ্বাসী, চরিত্রবান ও মেধাবী যুবক এবং ত্রিশকোটী টাকা পেলে ভারতকে আমি নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।"

পারি এই নিশ্চল স্থবির দেশটাকে একটা গতির দোম দিয়ে চালিয়ে দিতে। কিন্তু কে, কে দেবে এমন সম্পদ?

বড় আক্ষেপ স্বামিজীর মনে। কোথায় সে বীরেন্দ্র বাহিনী, আর কোথা থেকে বা আসবে অর্থ?

মন আবার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত জ্বলে ওঠে মুহূর্ত্তে। নৈরাশ্যের ঘন ঘোরে দেখতে পান যেন লক্ষ কোটি আশার দীপদ্যুতি। বিঘ্নের প্রাচীর চুরমার ক'রে গেলে তো নির্ব্বিঘ্নের সীমানা। অন্ধকারের উজান ঠেলে উঠতে পারলেই উত্তরণের আনন্দ! তাই আশায় বুক বেঁধে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন যুবকবৃন্দকে। এলো কয়েকটি যুবক এগিয়ে। এলো জগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে।

সন্ধ্যার ধূসরিমায় ধরণী গুণ্ঠিতা। জাহ্নবীর বুকে কুলুকুলু কলতান। ধীর মৌন মলয়ের বিসারিত করুণা। পাখীদের নীড়ে ফেরার শ্রান্ত পক্ষ বিধুনন। স্বামিজী পায়চারি করছেন, পায়চারি করছেন কয়েকটি ছেলে নিয়ে ভাগীরথীর তীরে। ছিল কয়েকজন ব্রহ্মচারীও। সহসা যেন বিবেকানন্দের মন থেকে অলক্ষ্যে বেরোতে লাগল,—"শোন বৎসগণ! শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, জগতের কল্যাণ কামনায় দেহ বিসর্জ্জন ক'রে গেছেন। আমি তুমি—প্রত্যেককেই জগতের কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জ্জন করতে হবে। বিশ্বাস কর, আমাদের হৃদয়মোক্ষিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হ'তে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্ম্মবীরগণ উদ্ভূত হ'য়ে জগৎ আলোড়িত ক'রে দেবে।"

মূঢ় ম্লান মুখে দিয়ে দাও ভাষার জোয়ার এনে। বক্ষে জ্বালিয়ে দাও বিদ্যুৎ বহ্নি। মানুষকে মানুষ হবার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে যাও। ওরে, বীজ বুনে যাও। ফসলের ভাবনা নেই। দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও কর্ম্মের অগ্নি মন্ত্র। লাখ লাখ কোটী কোটী বীরেব জন্ম হবে এই ভারতবর্ষে। আলোড়িত ক'রে দেবে যুগ ও জীবনকে। জগত বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকবে এই অবজ্ঞাত অবহেলিত ভারতবর্ষের দিকে।

বললেন বিবেকানন্দ,—"আমি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই যাহাতে মানুষ তৈরী হয়।"

এই মানুষ তৈরী করবার মানসে শ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ। অক্লান্ত চেষ্টা দিয়ে গড়তে লেগে গেলেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের।

জিজ্ঞেস করে এক ভক্ত,—"স্বামিজী! আপনি অসাধারণ বাগ্মিতাবলে ইউরোপ, আমেরিকা মাতাইয়া আসিয়া নিজ জন্মভূমিতে চুপ করিয়া আছেন, ইহার কারণ কি?"

বললেন স্বামিজী,—"আগে জমি তৈরী করতে হবে এদেশে। পাশ্চাত্ত্যের জমি অনেক উর্ব্বর। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ, ক্ষীণ মন, রোগ শোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্‌চার ফেক্‌চার দিয়ে কি হবে?..............কতগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন ক'রে কতগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে ঐরূপে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে।......দেখছিস্

না, পুর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য উঠ্‌বার আর বিলম্ব নাই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার ক'রে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে আর আলস্য ক'রে বসে থাকলে চলছে না, শিক্ষাহীন ধর্ম্মহীন বর্ত্তমান অবনতিটার কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে—ভাই সব উঠ, জাগ, কত দিন আর ঘুমুবে? ....ধর্ম্মটা দেশের সকল লোক যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বুঝাগে, ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত কর্।"

যুব-ভারতের পুরভাগে এসে দাঁড়ালেন নব যুগের মহান নেতা। মানুষের সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠল তাঁর অন্তরে। মানুষের জীবন দর্শন হোল তাঁর সাধন লব্ধ ধন। তিনি আকাশে আকাশে লিখে দিলেন অগ্নি আখরে বজ্রদৃঢ় বাণী।

বল্‌লেন,—"আমি আমার ধর্ম্মের বাহিনীতে চাই কুলী-মজুর। সুতরাং শিক্ষিত ক'রে তোল তোমাদের পেশাকে। কৃচ্ছ্র সাধকদের জন্য নিগ্রহ-ই যথেষ্ট। কিন্তু কর্ম্মীর জন্য চাই সুগঠিত দেহ, চাই লৌহের পেশী, চাই ইস্পাতের স্নায়ু।"

ধর্ম্মকে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেমন সূর্য্যের রশ্মি, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা আর জোয়ারের উচ্ছলতা, ঠিক তেমনটি হবে ধর্ম্মের ধারা। তাকে তো কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না। ওরে, তাঁকে জানবার, বুঝবার ও উপলব্ধি করবার অধিকার প্রতিটি অন্তরের।

"কয়দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্, তখন একটা দাগ রেখে যা।"

প্রত্যেকটি মানুষই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কে কোন্ অধিকার স্পর্দ্ধায় করবে তাকে বরখাস্ত?

বললেন আবার,—"রয়েছে তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি। সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল।........"

শক্তির জাগরণ হলেই মুক্তির দিগন্ত। স্বাধীনতার অধিকার। কে পারবে আর ধ'রে রাখতে লাঞ্ছনার কারা দুর্গে।

বলতে বলতে বিদ্রোহীর আত্মায় যেন ধরে যায় আগুন। বলতে থাকেন,—"ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি,

সেই কাজে লেগে যা। তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী করগে, আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে তার ভাবনা নেই।.........."

আত্মবিস্মৃত জাতির সম্মুখে খুলে ধরলেন স্বামিজী তাদের জীবন বেদের পাতাগুলো। বুঝিয়ে দিলেন কর্ম্মময় জীবনের উদ্দেশ্য। তাদের জীবনের ছন্দে জুড়ে দিলেন মুক্তির সুর। কেবল আত্মিক মুক্তির মন্ত্রটিই নয়, দিয়ে দিলেন ঐহিক মুক্তির মন্ত্রটিও শিখিয়ে। তাদের অন্তরে জ্বেলে দিলেন উল্কার বহ্নি।

বললেন,—"এই দেখ্‌না যারা আগে ভাবতো আমাদের কোন শক্তি নেই—তারাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষফণ্ড কত কি খুলছে। দেখছিস্ না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হ'য়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে? আর তোরা—

নিজের দেশের লোকের জন্য তা' করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হ'য়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হ'য়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে—চলে যা সে দিকে। নয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে, মর্‌ছে, তা'তে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা' ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখলে আমার কষ্ট হয়। লেগে যা লেগে যা! দেরী করিস্ নি—মৃত্যু দিন দিন নিকটে আসছে! আর পরে করবি বলে ব'সে থাকিস নি—তা হলে কিছু হবে না।"

কাজ ফেলে রাখাই মানে অসমাপ্তির ছেদে টানা। জীবনের গতিকে আটকে রাখা মানে মহৎ কাজের সমাধি সাধন করা। সম্মুখে অবারিত উন্মুক্ত আকাশ, আর থৈহীন, অন্তহীন সমুদ্র। একবার ঐ ফেন-শুভ্র বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হও, উদ্বুদ্ধ হও তোমরা বজ্রের আহ্বানে। বেজে উঠুক বোশেখের বিদ্রোহী সঙ্গীত। ঈশানের রাঙ্গা মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাক মনের সমস্তখানা আকাশ। তারপর ফেটে পড় পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুতে। আলোড়িত ক'রে দাও তামাম দেশটা। মিথ্যাকে, হীনতাকে ও অত্যাচার-অশান্তিকে নিক্ষেপ কর নির্ব্বাসনের কারাগারে। আগে রাষ্ট্রিক মুক্তি। সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা। তারপরে ব্যক্তিগত মুক্তির চিন্তায় তন্ময়তা।

এসেছেন 'হিতবাদী' কাগজের সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্কার দেখা করতে স্বামিজীর সঙ্গে।

কি কথা বলছেন স্বামিজী ?

বলছেন তার সঙ্গে পাঞ্জাব দেশের অভাব অভিযোগের কথা। তাদের দুঃখ, তাদের ব্যথার রিপোর্ট দিচ্ছেন যেন স্বামিজী সম্পাদক মশাইকে।

কিন্তু একি কথা বলছেন ?

এ কথা শুনতে তো তিনি আসেন নি। জানতে এসেছিলেন সে আদির অনাদি মহান্তপুরুষের ঠিকানা। সম্পাদকের সঙ্গে র'য়েছে তাঁর দুই বন্ধু। তারা তো অবাক। ভাবছে মনে মনে—সন্ন্যাসীর মুখে একি কথা ? তবে একি সন্ন্যাসী ? না দেশকর্ম্মী ?

অবশেষে বলে ফেললেন এক বন্ধু,—"এসছিলেম বড় আশা করে স্বামিজী, আপনার নিকট দু'টি ধর্ম্ম কথা শুনতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অতি সাধারণ কথা নিয়ে আলোচনা হোল।"

সাধারণ কথা ? জীবের দুঃখ বলার নাম সাধারণ কথা ? দুঃখে ব্যথায় আরক্তিম হ'য়ে উঠল স্বামিজীর মুখখানা। যেন মেঘ মাখা সূর্য্যের মতো নেমে এলো সমস্ত দেহে একটা বিবর্ণের ছায়া। বলতে লাগলেন ধীরে ধীরে—"যত দিন আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম্ম ! ইহা ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম্ম।"

শুনে গেলেন সম্পাদক মশাই স্বামিজীর স্পষ্ট প্রত্যুত্তর। বুঝে গেলেন নব যুগের সন্ন্যাসীর মত ও পথের ঠিকানা।

ঝড়ের বেগে চলছিল এ দিন গুলোর কর্ম্ম তরঙ্গ। যেন আর সময় নেই। সুরু হ'য়ে গেছে সংগ্রাম। সেই আত্ম জাগৃতির সংগ্রাম। 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের' কাজ চলেছে বায়ুর বেগে। ফিরে এসেছেন স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা থেকে। গ্রহণ করলেন তিনি সন্ন্যাসীদের প্রচার কার্য্যের নেতৃত্ব। স্বামী অভেদানন্দ র'য়ে গেলেন বেদান্ত প্রচারার্থে আমেরিকায়।

কলকাতা, মাদ্রাজ ও মায়াবতী মঠ থেকে প্রচার হ'তে লাগল বেদান্তের বাণী। মানব ধর্ম্মের অভীমন্ত্র।

স্বামিজী শিক্ষা দিতে লাগলেন সত্যের শাণিত তরবারি উত্তোলন করতে। আর শিক্ষা দিতে লাগলেন সেই তরবারির তীক্ষ্ণ ধারে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিতে মিথ্যা আচার প্রথার ভ্রান্তিকে। বললেন ভেদবাদের প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার

ক'রে দিয়ে সেখানে উন্মুক্তির বায়ু প্রবেশের পথ ক'রে দিতে। বললেন বিবেকানন্দ—"না, আপোষ নহে, চূণকাম নহে, গলিত শবদেহকে ফুল দিয়া ঢাকিয়ো না। চরম সত্য প্রচার কর। লোক সমাজের শ্রদ্ধা লাভ করিবে না, অথবা অবাঞ্ছনীয় কলহের কারণ ঘটিবে বলিয়া ভীত হইয়ো না। সত্য গোপন না করিয়া যদি তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যের সেবা কর, তাহা হইলে তুমি এমন ঐশী শক্তি লাভ করিবে, যে শক্তির সম্মুখে, তুমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর না, এমন কথা বলিতে লোকে কম্পিত হইবে।........চতুর্দ্দশ বর্ষ কায়-মন-প্রাণে সত্যের সেবা করিলে, লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে। কেবল এই উপায়ে-ই তুমি জনসাধারণের কল্যাণ করিতে পার, তাহাদের বন্ধন মোচন করিতে পার এবং সমগ্র জাতিকে উন্নত করিতে পার।"

এমনি দিনে স্থির করলেন স্বামিজী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাবেন। সম্মতি জানাল বন্ধুবর্গ। শরীর ভেঙ্গেছে। অসুস্থতা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। গ্রীষ্ম এসে পড়েছে। এখন সমুদ্রযাত্রায় স্বাস্থ্যের উন্নতিই হবে। ২০শে জুন। ধার্য্য হোল এই দিনটি। কিন্তু সঙ্গে স্বামী তুরিয়ানন্দকে নেয়ার জন্য স্বামিজী ব্যগ্র। চাইছেন না যেতে তুরিয়ানন্দ। নীরব কর্ম্মী রইতে চান নীরবেই বেলুড়ে। কিন্তু তুরিয়ানন্দকে না হোলে তো চলছে না! অবশেষে স্বামিজী একদিন তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন "ভাবছ নাকি আমার দেহটা এমনি কাজ করতে করতে শেষ হয়ে যাক?"

স্নেহ প্রবণ তুরিয়ানন্দের দু'টি নয়ন বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা। সম্মত হোলেন তিনি। নিবেদিতাও যাবেন ব'লে প্রকাশ করলেন অভিমত। যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল।

১৯শে জুন। আয়োজন করা হ'য়েছে মঠ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ও তুরিয়ানন্দকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার।

স্বামিজী বললেন সভাতে,—"গুহায় বসে ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করা রূপ প্রাচীন আদর্শের বর্ত্তমান কালে আর প্রয়োজন নেই।............. মানব ভ্রাতাকেই মুক্তির জন্য সাহায্য করিতে হইবে।.........তোমাদের প্রত্যেককেই স্মরণ রাখতে হবে এই মঠের উদ্দেশ্য, মানুষ প্রস্তুত করা। ....এখানে অবাধ্যগণের ঠাঁই নেই। যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতা রহিত হ'য়ে দূর ক'রে দাও। বিশ্বাসঘাতক কেউ না থাকে। বায়ুর মত মুক্ত ও অবাধ গতি হও, অথচ এই লতা ও কুক্কুরের মত নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।"

কঠিন আইন ও শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে বেঁধে দিলেন মঠের ভাইদের। একটি সংগঠনকে বড় হ'তে হ'লে এমন নিয়ম শৃঙ্খলা না হ'লে কিছুতেই দাঁড়ান সম্ভব নয়। একটা তড়িৎ স্পর্শের মত মঠের বুকে সঞ্চারিত হোল স্বামিজীর আদর্শের বজ্রবাণী। বললেন আবার—

"...জীবন একটি যুদ্ধ। যুদ্ধ করিয়া আমাকে মরিতে দাও। দুই বৎসরের দৈহিক ব্যাধি আমার বিশ বৎসরের শক্তিকে ছিনাইয়া লইয়াছে। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে সর্ব্বদাই এখানে রহিয়াছে; সেই বোকাটা একটি মাত্র চিন্তা লইয়াই আছে; সে চিন্তা হইল 'আত্মন'।—"

আত্মাকে জাগ্রত কর। সত্য পথে বিঘ্নের উপল সরিয়ে এগিয়ে যাও। ভয়কে জয় ক'রে ঐ ভীমা ভয়ঙ্করী শঙ্করীর মত গলায় পর ভয়ের মুণ্ডমালা। বীর্য্যের স্বাক্ষরে দেশটাকে শক্তিশালী ক'রে তোল'। আর মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে রাখ ঐ একটি সত্য—"আত্মন"।

ছ'টা বছরের ভেতর দিয়ে পার হ'য়ে গেছে অনেক গুলো ক্ষুদ্র বৃহৎ অভিজ্ঞতার দিন। এবারে আর দুর্ব্বোধ্য বা রহস্য জটিল নয় পাশ্চাত্ত্যের মাটি ও মানুষ। মুক্ত হ'য়ে গেছে গুহা পথের দরজা। দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হ'য়েছে তার অন্তরাল। আকাশ গঙ্গার অশ্রান্ত প্রবাহের সঙ্গে তারাও আজ পাল উড়িয়ে দিতে চাইছে তরণীতে। আর থাকতে হবে না পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করতে হবে না পথিক জনের জন্য নগ্ন ভয়ঙ্করের মধ্যে। এবারে স্বামিজী স্বয়ং সম্পূর্ণ। নিশ্চিতির নির্ম্মেঘ আকাশে ডানা মেলে দিলেই অমনি আহ্বানের সঙ্গীত, অভিনন্দনের মাল্য।

দ্বিতীয় বার যাত্রা করছেন বিবেকানন্দ—

যাত্রা করছেন পাশ্চাত্ত্য দেশে। সেই ভোগ-ঐশ্বর্য্যের লীলা নিকেতনে, ইংলণ্ডে—আমেরিকায়।

সঙ্গে যাচ্ছে বোন নিবেদিতা। আর যাচ্ছে মহাপণ্ডিত তুরিয়ানন্দজী।

প্রিন্‌সেপ ঘাট।

জাহাজ এবারে 'গোলকুণ্ডা'।

অগণিত জনতার অবিচ্ছিন্ন মিছিল। এসেছে তারা তাদের প্রিয় প্রভুকে বিদায়াভিনন্দন দিতে।

আশীর্ব্বাদ করলেন স্বামিজী তাদের। আর দিয়ে দিলেন প্রণতির দীক্ষা।

ওরা রইল তাকিয়ে। তাকিয়ে রইল ব্যথাভরা বুকে অশ্রুসজল চোখে।

নোঙ্গর তুলল জাহাজ। শেষ সঙ্কেত-ধ্বনিতে একবার ঘোষণা করল যাত্রার পবিত্র মুহূর্ত্তটি।

ছাড়ল জাহাজ। চলল এগিয়ে, এগিয়ে চলল জাহ্নবীর বুকে হংস বলাকার মত ভেসে ভেসে তরঙ্গ বন্দনা ক'রে নৃত্যের তালে তালে। ধীরে ধীরে দূরে স'রে যেতে লাগল মাতৃভূমির শ্যামা-তট।

সেই সবুজ ঘাসের মসৃণ গালিচা। নবনী-কোমল মাটির মাধুর্য্য। আর জনতার শোভাযাত্রা।

তন্ময় হ'য়ে দেখছেন বিবেকানন্দ। কবির অন্তরে মাতৃভূমির মোহিনী মূর্ত্তি স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। অন্য দিন গুলোর চেয়ে যেন আজকে দিনটি বড় মধুর লাগে

স্বামিজীর কাছে। মন বারে বারে ফিরে আসতে চায়। ফিরে আসতে চায় সেই ছেড়ে আসা শ্যাম-তটে—তার আলু থালু কাশ ও শণ ফুলের গুচ্ছে, জুঁই, কমলা, পারিজাতের উদ্যানে। আরো দেখছেন চেয়ে, ঐ নীল আকাশের কোলে পুঞ্জিত মেঘের অঞ্জন। কত রং, কত বিচিত্র তার রূপ-জৌলুস।

ধীরে ধীরে যেন কোন স্বর্গলোকের পারিজাতটি আভাসিত হ'তে লাগল স্বামিজীর নয়নে। বিভোর ভাবে, যেন তাঁর অন্তর দুয়ারে নেমে এসেছে স্বর্গ। বক্ষের বুকে জেগেছে বিরহের বিধুনন। চোখ বুজে আসে। নয়নে কে যেন এনে দেয় তন্দ্রা। ভাব-বিভোর কবির অন্তরে ছন্দ জাগে কাব্যের। লিখলেন তাঁর রোজনামচায়,—"আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুলচে, আর সকলের নীচে, যার কাছে ইয়ারকান্দী, ইরাণী, তুর্কীস্থানী গালচে কোথায় হার মেনে যায়। সেই ঘাস, যতদুর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছেঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস।…………"

"হুঁ, বলি এইবার গঙ্গামাতার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট। আর ঐ তাল তমাল আম লিচুর রঙ্গ, নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে, পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!"

যন্ত্র-দানবের বিকট চিৎকারে ভ'রে যাবে আকাশ বাতাস। আর কি শুনতে পাবে দোয়েল, কোয়েল, শ্যামা ও ফিঙের মধুকণ্ঠের সঙ্গীত? দেখ, প্রাণ ভ'রে দেখে নাও মায়ের শান্ত, সৌম্য তনুশ্রী। এগিয়ে চলল জাহাজ।

বঙ্গোপসাগর। অন্তহীন, নিঃসীম। এযেন মহাভারতের দূরনিরীক্ষ সাধনার মতই অনন্তের স্থানটুকু জুড়ে আছে।

কোথায় সুরু। আর শেষ বা কোন সীমানার মোহনায় তা কে জানে? কেবল মানচিত্রের বুকে সীমা-চিহ্নিত হ'য়ে পড়ে নেই। চলেছে অনন্তের আহ্বানে ঐ আকাশের সঙ্গে একটা রাখীবন্ধনের সঙ্গীত গেয়ে। স্বামিজীর ভাষায়,—"কি সুন্দর! সামনে যতদুর দৃষ্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত ফেনিল, বায়ুব সঙ্গে তালে তালে নাচছে। পিছনে আমাদের গঙ্গাজল; সেই বিভূতিভূষণা, সেই গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।"

অবিরাম চলছে জাহাজ। অশ্রান্ত গতিবেগে নীল নভে একটি পাখীর মতো উড়ে চলেছে যেন।

"…………এবার খালি নীলাম্বু ; সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান।" দেখতে দেখতে কেটে যায় চারটা দিন।

২৪শে জুন।

দূরে ঐ দেখা যাচ্ছে অগ্নিশতদলের মত মাদ্রাজের তট-রেখা। দেখা যাচ্ছে স্বামিজীর কর্ম্মকেন্দ্রের অরুণ লেখা। সহসা চোখ নেমে এলো, নেমে এলো মুগ্ধ সীমানার সার্থক ভূমিতে। মাদ্রাজ। মন যায় অধীর হ'য়ে, ইচ্ছে হয় নেমে আসতে সমতলে। পদপাত করতে মাটিতে।

কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠবার নয়।

কোন ভারতীয় যাত্রী নামতে পারবে না মাদ্রাজের বন্দরে।

কেন ?

ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল বন্ধন। খেই ধ'রে আছে তারা প্লেগ রেগুলেশন এ্যাক্টের, কিন্তু সত্যি কি তাই ?

না।

তবে ?

ইংরেজের চোখে বিবেকানন্দ বিভীষিকা। উল্কার অগ্নি, বজ্রের বিদ্যুৎ, তাই।

লিখলেন স্বামিজী 'পরিব্রাজক' বইতে—॥……"আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, কোন কালো আদমী এগ্রিমেণ্ট অপিসের সার্টিফিকেট ছাড়া বাইরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এত দিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এখন প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাইরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমাদের দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব 'নেটিভ'।…………ধন্য ইংরেজ সরকার ! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলাম।"

নামা হোল না মাদ্রাজে। দিলে না নামতে, চলল জাহাজ নীল জলের বুকে ভেসে ভেসে।

কলম্বো বন্দর।

দয়ালু সরকার এবারে আর বাঁধা দিলেন না।

নামলেন বিবেকানন্দ জাহাজ থেকে। পরিদর্শন করলেন বৌদ্ধ বিদ্যালয় মঠ ও মন্দির। জানাল সবাই স্বামিজীকে অভ্যর্থনা। মাত্র অল্প কয়টা দিনের বিরতি।

২৮শে জুন কলম্বো বন্দর পরিত্যাগ করল 'গোলকুণ্ডা'।

চলল জাহাজ নিঃসীম সমুদ্রের তরঙ্গ বন্দনা ক'রে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে। চলল জাহাজ সেই আরব্ধ প্রজ্জলন্ত দীপদ্যুতির সন্ধানে। দেখতে যাচ্ছেন স্বামিজী তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রের ফসল। কত বিচিত্র দেশের গাঁ ছুঁয়ে, বিচিত্র মাটির ধুলি ধুয়ে চলেছে 'গোলকুণ্ডা'।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ পিরামিডের দেশ—সেই টলেমি বংশের প্রাচীন ভূমি······

তার পর ধূ-ধূ বালু। আরব দেশের দুস্তর মরুতপ্ত প্রান্তর। কত কথা স্মরণে উঁকি মারে স্বামিজীর। ইচ্ছে হয় দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করতে এই স্থানগুলো।

আরো সম্মুখে এগিয়ে—সেই ভোগ আর ত্যাগের রাখীবন্ধন সুয়েজখালকে পাড়ি দিয়ে তার পরে ভূমধ্য সাগরের বুকে। পবিত্র এ ভূমধ্য সাগরের তটতীর্থ। যেমন অবারিত, উম্মুক্ত দিগন্তশায়ী—তেমনি বহু বর্ণ, বহু জাতির মিলনক্ষেত্র এই সাগর তীর। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে। ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছে উজ্জ্বল কাহিনী। সেই মিশর, এসিয়া মাইনর, গ্রীস দেশ—ফিনিশিয়। আরো কত। ইহুদি, আসীরিয়, বাবিল ও ইরানী বহু বিচিত্র দেশের মধ্য দিয়ে বহু কথার মালা গেঁথে চললেন স্বামিজী।

৩১শে জুলাই। পৌঁছল এসে 'গোলকুণ্ডা' লণ্ডনে। 'টিলবেরী' ডক। অজস্র জনতার ভিড়। দাঁড়িয়ে আছে তারা অধীর অপেক্ষায়। নামলেন বিবেকানন্দ। জানাল তারা অভিনন্দন।

এবারে আর বক্তৃতা নয়। কেবল বৈঠকি আলোচনা। কিন্তু তা ব'লে কি লোকের ভিড় কমে?

দলে দলে লোক আসছে তাদের তৃষ্ণাতুর মনের প্রভঞ্জনে একটু বারি বসন্তের সন্ধানে। আসছে মহা জিজ্ঞাসার জবাব শুনতে ভারতীয় সন্ন্যাসীর কাছে।

ওদিকে আবার ডাক এলো আমেরিকা থেকে। আমন্ত্রণ লিপি আসতে লাগল থেকে থেকে।

অবশেষে যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন আমেরিকার পথে ১৬ই আগষ্ট। সঙ্গে গুরুভ্রাতা তুরিয়ানন্দ আর শিষ্যবৃন্দকে নিয়ে নিউইয়র্ক রওনা হলেন বিবেকানন্দ।

অভেদানন্দের প্রচার বার্ত্তা শুনে বড় খুশী হলেন স্বামিজী। বেশ লাগে। মন একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির ছোয়া পেয়ে যেন আনন্দে ওঠে নৃত্য করে। সফল হয়েছে স্বপ্ন। সার্থক হয়েছে সাধনা। সোনার ফসলে ভ'রে গিয়েছে দিগন্ত বিসারিত প্রান্তর। নিউইয়র্কে নেমে অতিথি হোলেন স্বামিজী মিঃ ও মিসেস্ লিগেটের।

কেটে গেল তিনটি দিন। সত্যি লিগেট-দম্পতির আপ্যায়ন আর আতিথেয়তার মাঝে ক্রুটি নেই বিন্দু। সভা। প্রশ্নোত্তর। এবং নতুন নতুন ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হোল স্বামিজীর। অভেদানন্দ পরিচয় করিয়ে দিলে সবাইকে। পরিচয় করিয়ে দিলে নতুন অনুরাগীদের সঙ্গে স্বামিজীর। ওরা যেন পেল বহু সাধনার ধনকে তাদের মধ্যে।

কত আনন্দ! কি খুশী। দিনগুলো যেতে লাগল বেশ ভালো ভাবেই।

অভেদানন্দের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গেলেন স্বামী তুরিয়ানন্দ।

গ্রহণ করলেন প্রচারের ভার।

অল্পদিনের মধ্যে বেশ একটা প্রভাবের যাদু ছড়িয়ে দিলেন তুরিয়ানন্দ। লোকেরা যেন পেল এক শান্তির প্রশান্ত কোল। আমেরিকার ভক্ত নরনারী গ্রহণ করল তুরিয়ানন্দকে তাঁদের অন্তরের আসনে।

র'য়ে গেলেন তুরিয়ানন্দ মণ্টক্লেয়ারে। বায়ু বদল করতে স্বামিজী চলে এলেন ক্যালিফর্নিয়ায়।

শরীর একটু সুস্থ লাগে। রোগজর্জ্জর দেহে ফিরে এসেছে বল। আর তো ব'সে থাকলে চলছে না। কর্ম্মব্যস্ত বিবেকানন্দ আবার কর্ম্মের আনন্দে দাঁড়ালেন। সুরু হোল বক্তৃতা, প্রচার ও নতুন কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন।

স্যান্‌ফ্রানসিস্‌কো, ওকল্যাণ্ড ও আলামেডাতে তিনটি বেদান্ত কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হোল। কাজ চলল বায়ুর বেগে।

এ যেন ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বল আতপ থেকে ক্ষরিত হচ্ছে অমৃত। বিশ্রাম নেই। রক্তাক্ত পৃথিবীর বুকে বর্ষণ করতে চলেছেন স্বামিজী, আকাশ গঙ্গার স্নিগ্ধ হাসি। প্রাণ-সাগরে শত ধারায় আপ্লুত ক'রে দেবেন কালো পৃথিবীটার দুর্ভেদ্য স্থান। তারপরে বিশ্রাম। স্নিগ্ধ, শান্ত ভাব। মহাজিজ্ঞাসার আকুলতা। মহামিলনের সুখ-স্পর্শ।

হে প্রভু, আর কতদিন ধ'রে রাখবে এমন মুখর দিনের কোলাহলে? আমি যে তোমাকে পাবার জন্যেই প্রধাবিত হচ্ছি। লুকিয়ে আর কোথায় থাকবে? তোমার মন্দিরের সোপান পেরিয়ে চলেছি। আর বাকী নেই বেশী। এবারে বাহু বাড়িয়ে দাও। দাও তোমার চরণ-পদ্মের প্রভা ছড়িয়ে আমার পথে। জানি, এই কর্ম্মের জমিন আবাদ করাই তোমার অর্চ্চনার ফুল-শয্যা। এই সোপান উত্তরণের ইতিতেই তোমার মৌন উপলব্ধি। আর স'রে যেও না। আমি যেমন ব্যগ্র ব্যাকুল চিত্তে তোমার সন্ধানেই ছুটেছি, তুমিও তেমনি তোমার দয়ার সমুদ্রে একবার তরণী ভাসিয়ে দাও। এসো। চলে এসো আমার ঘাটে। আর কত কাল রইব ব'সে?

শত লক্ষ কর্ম্মের মধ্যেও যোগীর যোগে আভাসিত হয় যেন সুন্দরের তনু শোভা। শুনতে পান যেন নূপুর ধ্বনি। মাঝে মাঝে তাই তন্ময় হ'য়ে যায় মন। স্তব্ধতার আসনে ব'সে কার অভিসার আশায় যেন কাটিয়ে দেন রাত্রির মৌনতা। বাহ্যিক ভাবনার সীমানা পেড়িয়ে মন চলে অসীম সিন্ধুর সন্ধানে—সেই আত্মজনের খোঁজে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল লিখলেন বিবেকানন্দ।

লিখলেন তার শিষ্যা মিস ম্যাক্লিয়ডকে,—"·········আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হ'য়ে যায়, আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যায়। তার কাজ তিনিই জানেন।"

'এবার নীরব করে দাও হে তোমার—
মুখর কবিরে।'

এ কি সেই সুন্দরের অভিসার নয়? আর মন চায় না চলতে। দেহ অবসন্ন। বাহ্যিক কল-কোলাহল থেমে যাক। নেমে আসুক মধ্যাহ্নের তপ্ত কিরণে চন্দ্রের স্নিগ্ধ প্রশান্ত ছায়া। জীবনে আসুক নিঃসঙ্গের কান্না। নিভে যাক জীবনের দীপ-লেখা। কিন্তু আর প্রেয়ঃ নয়—কেবল সেই শ্রেয়র সন্ধান। তারই অভিসার। তার জন্যেই কান্না।

"আমি ভালোই আছি, মানসিক দিক থেকে খুব ভাল। দেহের শক্তি অপেক্ষা আত্মার শক্তিই বেশী অনুভব করছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই

হোল, পুঁটলী পাট্‌লা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় বসে আছি। হে শিব! ভিড়িয়ে দাও আমার তরণী ওপারে........"

আজ আমার মনে হচ্ছে, তোমাকেই সবার চেয়ে বেশী ভালোবেসে ফেলেছি। বিশ্ব-সংসারের মায়া ঘেরা ছায়ানীড় তো আর রাখতে পারছে না। পৃথিবীর সব হাসি কান্নার উর্দ্ধে ধ্বনিত হয়ে উঠছে তোমারই নূপুর নিক্কন। শুনতে পাচ্ছি যেন অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি। এ যেন সেই মহাসাগরের কান্না। ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনির জন্যে অধীর আকুল হ'য়ে গেছে চিত্ত। থাকতে চায় না মন, থাকতে চায় না আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির আবেষ্টনে আবদ্ধ।

মন যেন বলে—

আমার তরী ভিড়াও প্রভু
তোমার সাগর পারে—
নতুন ক'রে সজ্জিত হও
পুরাতনের হারে।
সন্ধ্যা এলো ডুবল বেলা
সাঙ্গ আমার সকল খেলা,
এবার কেবল তোমার তরে
রইনু বসে দ্বারে—
নতুন করে সাজাই এসো
পুরাতনের হারে।

এ যেন সেই গুহা থেকে প্রাণ-নির্ঝরিণীর বাঁকে এসে মিলনের বাসনায় আকুল আত্মা কাঁদছে ডুকরে।

ওগো, সব দেখে এলাম। ছুঁয়ে এলাম মানুষের কান্নার অশ্রু, জানি না মুছিয়ে দিতে পেরেছি কিনা। ভূখণ্ডের কোমল, শ্যামল, উপলবন্ধুর পথেই এত কাল হেঁটেছি। অন্ধকারের কারাগারে এনেছি আলোর রবিলেখা। মিলিয়ে দিয়েছি সমতলের দিগন্তে। বদ্ধজলাশয়ে এনেছি বিশ্বপ্লাবনের ধারা। রচনা করেছি প্রাণের পরিধি। এবারে আমায় ফিরতে দাও, ফিরতে দাও প্রভু আত্মার সরসী কূলে। নিয়ে চলো মনের জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে, তোমার পদ-প্রান্তে।

মনে প'ড়ে যায় অতীত আহ্বানের কণ্ঠ "ওরে নরেন, তুই আয়,..........।

আহা! আবার তাঁরই সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি, সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর!

তবে কি সত্যিই তুমি আমাকে ডাকলে? ডাক। ডাক। আবার ডাক!

আমি যে কাঁদছি, সেই বালকের কান্না। কাঁদছি তোমার কোলে মাথা রেখে দু-দণ্ড ঘুমোব ব'লে। ওগো,......"আমার আত্মাকে আবার রোমাঞ্চিত ক'রে দিয়েছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে মানুষের মায়া। বিস্বাদ বোধ হচ্ছে কাজ-কর্ম্ম। জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় স'রে দাঁড়িয়েছে। কেবল প্রভুর আহ্বান। তিনি আমাকে ডাকছেন,......মৃতেরা মৃতের কবর দিক। তুই ও-সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে আয়, চলে আয় আমার পিছু পিছু...........।"

"সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

"হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি! আমার সামনে অপার নির্ব্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময় সময় উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তি সমুদ্র! মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্য্যন্ত যার শান্তি ভঙ্গ করছে না।"

সামনে অথৈ সমুদ্র। বিরাজিত শান্তি। বিদায় দাও হে পৃথিবী! তোমার কোল জুড়ে এতদিন অনেক দামাল খেলা খেলেছি। এবারে বিদায় দাও। "আমি যে জন্মে ছিলুম, তাতে আমি খুশী আছি, এত যে দুঃখ ভুগেছি, তাতেও খুশী, জীবনে কখনো কখনো বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী।—"

তোমার কোলে যে আমায় প্রথম স্পর্শটুকু দিয়েছিলে, সে জন্য আমি ধন্য। এ ঋণ শোধ করবার সামর্থ্য আমার নেই। রেখে যাচ্ছি না কাউকে। "আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছিনা। দেহটা গিয়েই আমাকে মুক্তি দিক অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই; সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে,............শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য চলে গেছে, পড়ে আছে একটা কেবল পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর চিরশিষ্য চিরপদাশ্রিত দাস।"

পৃথিবী, বিদায়! তোমার বুক থেকে গুটিয়ে এনেছি আমার কর্ম্মের তাবু। স্তব্ধ ক'রে দিয়েছি কামানের গর্জ্জন। আর আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। বড় ভালোবেসেছিলে আমাকে। এত শ্রম, এত দ্বন্দ্ব, তবুও যখনই ফিরে এসেছি তোমার সামনে—তখনই বাহু বাড়িয়ে টেনে নিয়েছ কোলে।

"অনেক দিন হোল ছেড়ে দিয়েছি আমি নেতৃত্ব। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার আর অধিকার নেই। তাঁর ইচ্ছা-স্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত্ত ব'লে মনে হ'ত। এখন আবার সেই প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবা-

হিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না, পাছে প্রাণের এ অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়।"

তাই আমি থেমে গেলাম। গেলাম মৌন, চুপ হ'য়ে। ওরে, এমন মধুক্ষণে আমি আর কি গান গাইব ?

"………এর আগে আমার পশ্চাতে ছিল উচ্চাশা, আমার প্রমের পেছনে ছিল ব্যক্তিত্ব, আমার শুদ্ধির পশ্চাতে ছিল আতঙ্ক, আমার পরিচালনার পেছনে ছিল শক্তির আকাঙ্ক্ষা। এখন সে গুলি অদৃশ্য হচ্ছে ; আমি স্রোতের টানে ভেসে চলেছি। মাগো! তুমি আমায় যেখানেই ভাসিয়ে নিয়ে যাও, আমি সেই 'অশব্দ অস্পর্শ' অদ্ভুত, আজব দেশে তোমার উষ্ণ কোলেই ফিরে আসছি। আমি আসছি—আর অভিনেতার মতো নয় দর্শকের মতো! আহা! চারি দিকে কী অপরূপ প্রশান্তি।" আবার যেন সেই ডাক শুনলেন—স্বামিজী, বললেন—"যাই প্রভু যাই।" বলল যেন তাঁর অন্তর—

যাই গো প্রভু যাই
এই পৃথিবীর ধুলি বালির
স্মরণ ল'য়ে যাই।
তোমার দেয়া বাতাস আলো
আমায় বড় বাসত ভালো
তোমার নদীর শীতল বেলা
দিত আমায় ঠাঁই—
যাই গো প্রভু যাই।
এই পৃথিবীর অন্ধকারে
প্রদীপ জ্বেলে যাই।
যখন আমার দিনের আলো
ঢেকে দিত রাতের কালো
তখন তোমার রবি, শশী
ব'লত যে ভয় নাই—
যাই গো প্রভু যাই
এই পৃথিবীর সবার তরে
প্রণাম রেখে যাই।

লুপ্ত হ'য়ে গেছে ব্যক্তি সত্তার কাহিনী। রঙ্গিন পৃথিবীটা যেন স'রে যেতে চাইছে দূরে, অনেক দূরে। কেবল ইতিহাসের জাগর প্রহরা। আজিকার এ নীরব অঙ্গনে শুনতে পাই যেন অতীত দিনের বজ্র নির্ঘোষ। না, তাও নয়। সেই বালক নরেন্দ্রের কান্না। ঈশ্বর অনুসন্ধান। কোথায় সেই হৃদবিহারী বনমালী? প্রবল সংগ্রাম। আত্ম জিজ্ঞাসার লড়াই।

বিবেকের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম। তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার মূর্ত্তরূপ। জীবন জিজ্ঞাসার আংশিক জবাব। চাই নির্ব্বিকল্প সাধনা।

তবে কি সেই মুগ্ধ প্রশান্ত মুহূর্ত্তটি আবার এলো ফিরে? না। 'জগদ্ধিতায়' প্রাণ বিসর্জ্জন দে। লক্ষ কোটি মানুষের দুঃখ বেদনাকে প্রশমিত কর। মুছিয়ে দে তাদের কান্নার অশ্রু তোর অভয়ের অঞ্চলে। মর্ম্মে জ্বেলে দে বজ্রের বহ্নি।

সে দিনকার জাগ্রত নরেন তবে কি আজ ফিরে এলো? ফিরে এলো কি তার জীবন দেবতার স্নেহের কণ্ঠটি শুনে অন্তর বিশ্বে?

বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তার পারের আবিল আবর্জ্জনা ধুয়ে মুছে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে। গতির চরম শিখরে উঠেছে তরঙ্গের চূড়া। এবারে ফিরে আসার পালা। তাই তো ভাঁটার মন্থর প্রবাহ। উজানের গতি।

স্তব্ধ হ'য়ে গেছে গর্জ্জন। স্তিমিত হ'য়ে গেছে তরঙ্গ। প্রশান্তির কোলে এলিয়ে পড়েছে ক্লান্ত জলরাশি। কেবল ধু ধু করে অসীম দিগন্ত। যেন গতিহীন বিরতির এক মহামগ্ন সাধনায় আত্মস্থ আত্মা। এ হোল সাফল্যের মৌনতা। পরিণতির পরম মুহূর্ত্ত, এবং তারই পূর্ব্বাভাস।

শ্রান্ত দেহ। আর যেন চাইছে না মন কর্ম্মের কোলাহলে প'ড়ে থাকতে। এবারে একটু বিশ্রামের শান্ত নীড় খুঁজছেন ক্লান্ত সৈনিক। যেখানে থাকবে না কোলাহল, ভেঙ্গে যাবে না কর্ম্মের তরঙ্গ-বিক্ষোভে যেখানকার মৌনতা; স্তব্ধ, শান্ত, সমাহিত হৃদয়ের নীরবতায় আসবে না ভেসে বায়ুর নিস্বন, ঠিক এমন একটি স্থান চাইছেন স্বামিজী।

কিন্তু ভক্তদের কণ্ঠে প্রার্থনার কান্না। তারা যেন বলছে ডেকে ডেকে,— এ তোমার কেমন ভাব? যে গানের সুর দিলে, শুনবে না তার কণ্ঠস্বর? যে রাত্রির অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিলে আলো, দেখবে না তার প্রভা? ওগো, নেমে এসো, নেমে এসো তপের আসন থেকে মানুষের রাজ্যে। আকাশে যেমন কোটি মৌন তারার চোখে জ্বল জ্বল করছে আক্ষেপের অগ্নি, আমাদের বুকেও তেমন জ্বলছে ব্যথার কাকুলি।

আর কেমন ক'রে নীরব থাকবেন বিবেকানন্দ। মানুষের কান্না, মানুষের হাহাকার, মানুষের দুঃখ দহনকে দূর করবার জন্যেই যে তাঁর আবির্ভাব। তিনি কি না এসে পারেন মানুষের আহ্বানে? সাড়া দিলেন ভক্তদের আকুল কান্নায়।

নেমে এলেন—

নেমে এলেন নীরবতার স্তব্ধ আসন থেকে মুখর দিবসের তপ্ত-মধ্যাহ্নে।

এদিকে এপ্রিলের মাঝামাঝি স্বামিজীর শিষ্যগণ বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করলেন কালিফোর্ণিয়ার স্থানে স্থানে। সুরু করলেন সেখানে 'বেদান্ত' প্রচার।

এমনি দিনে আহ্বান এলো স্বামিজীর—

আহ্বান এলো লস্ এঞ্জেল্স থেকে। কিন্তু তিনি সানফ্রানসিস্কোর কাজ অসমাপ্ত রেখে কেমন ক'রে যাবেন? মহা ভাবনায় পড়লেন। লস্ এঞ্জেল্সে তখন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন স্বামিজীর শিষ্যা মিসেস্ হেইনস্বোরো। কিন্তু স্বামিজীর মনটা যেন আর থাকতে চাইছে না একটি নির্দ্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ। নব প্রতিষ্ঠিত সানফ্রানসিস্কোর বেদান্ত সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম, এইচ, লোগান এবং স্বামিজীর অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যা তা বুঝতে পারল। কিন্তু এখানকার প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে হোলে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী

যে না হোলেই নয়। তাই তারা জানাল অনুরোধ, অনুরোধ জানাল স্বামিজীর কাছে। পত্র দিলেন স্বামিজী তুরিয়ানন্দকে। লিখলেন চলে আসতে কালিফোর্ণিয়ায়।

স্বামিজীর পত্র পেয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন তুরিয়ানন্দ। অভেদানন্দ নেই নিউইয়র্কে। সেখানকার ভার তুরিয়ানন্দজীর 'পর ন্যস্ত ক'রে তিনি বক্তৃতা করছেন তখন যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে। সব কথা খুলে জানালেন তুরিয়ানন্দ, স্বামিজীকে। আসা হোল না তার সানফ্রানসিস্কোতে।

বেশ একটু ভাবনায় পড়লেন বিবেকানন্দ।

আবার এমনি দিনে ১৬০ একর জমি প্রদান করলেন স্বামিজীকে তাঁরই এক শিষ্যা মিস্ মিম্মি, সি, বুক।

এ যে আরো বন্ধন। কিন্তু উপেক্ষা করবেন এমন সাধ্য নেই তো তাঁর।

সবই ঠাকুরের খেলা। তিনি যেন ধ'রে রেখেছেন তাঁর নরেনকে মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য। মাকে ব'লে মায়ার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন নরেনের অদ্বৈত অনুভূতি।

বলেছিলেন একদিন নরেনকে, 'তুই করবি না তোর ঘাড় করবে।'

'এ যেন সেই ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন ঠাকুর। কিন্তু মন চাইলেও দেহ নিয়ে আর পাড়লেন না স্বামিজী কর্ম্ম-সমুদ্রে সন্তরণ করতে। চলে এলেন একটু বিশ্রামের জন্য 'ক্যাম্পটেইলর' পল্লীতে।

তিনটি সপ্তাহ কাটল। আবার উঠে দাঁড়ালেন। ফিরে এলেন আবার সানফ্রানসিস্কোতে। ভগ্ন শরীর। শঙ্কা হোল শিষ্যদের। তারা বারণ করল' স্বামিজীকে বক্তৃতা করতে। স্থানীয় সুবিখ্যাত ডাক্তার ফষ্টার দেখা শোনা করতে লাগলেন স্বামিজীকে। কিন্তু তবুও তিনি মে মাসের শেষ দিকে চারটি বক্তৃতা দিলেন, বক্তৃতা দিলেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে। স্থানীয় সংবাদ পত্রগুলি প্রশস্তি বন্দনা করতে লাগলেন স্বামিজীর। লিখল 'প্যাসিফিক বেদান্তিন' "স্বামিজী সুগভীর ভাব দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্পন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ভাবরাশি প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত সততই প্রতিধ্বনিত হইবে। তাঁহার সঙ্গে কি শিশু, কি ভিক্ষুক, রাজা কিম্বা ক্রীতদাস অথবা বেশ্যা সকলেই সমান অধিকারের সহিত আলাপ করিতে পারে। তিনি বলেন, ইহারা সকলেই এক পরিবারের অন্তর্গত। আমি তাহাদের সকলের মধ্যে আমার আমিত্ব দেখিতে পাই এবং আমার মধ্যেও আমি তাহাদের স্বরূপ অনুভব করি। এই পৃথিবী

এক পরিবার সদৃশ, যুগান্তপূর্ব্ব ব্যাপিয়া সত্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রই বিরাজমান।”

এমনি দিনে আর একখানা পত্র পেলেন স্বামিজী। লিখেছে লণ্ডন থেকে লিগেট্‌-দম্পতি। যাচ্ছে তারা জুলাই মাসে প্যারিসে। স্বামিজীকে আহ্বান ক'রেছে তারা তাদের সঙ্গে যাবার জন্য। ভালোই হোল। প্যারী-প্রদর্শনীর ধর্ম্মেতিহাস সভায় বক্তৃতার জন্যও নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন স্বামিজী এমনি দিনেই। যাত্রা করলেন। বিদায় নিলেন কালিফোর্ণিয়ার শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছ থেকে। পথে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য চিকাগো ও ডিট্রয়েটে নামতে হ'য়েছিল স্বামিজীকে। এলেন তারপরে নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্ক।

বাস করতে লাগলেন ‘বেদান্ত-সমিতি'র ভবনে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বিবেকানন্দ। দেখা হোল তাদের সঙ্গে। বেদান্ত-প্রচার চ'লেছে জোর।

স্বামিজীর মনটা ভ'রে যায় খুশীতে। আনন্দে অন্তর নৃত্য করে থেকে থেকে। সেখানকার বেদান্ত-সমিতির প্রথম সভাপতি মিঃ লিগেট্‌ অন্যান্য কার্য্যের জন্য বাধ্য হোলেন পদত্যাগ করতে। স্থান পূর্ণ করল কলম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেলপারকার। স্বামী তুরিয়ানন্দও এতদিনে বেশ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছেন তাদের। এপ্রিল থেকে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান ও যোগ-শিক্ষা দান ক'রে চলেছেন তুরিয়ানন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে। যোগ দিলেন এসে বিবেকানন্দ। যেন আনন্দের বান ডাকল। দিতে লাগলেন গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা। পাঠিয়ে দিলেন তুরিয়ানন্দকে কালিফোর্ণিয়ায়। বলে দিলেন বিদায়ের প্রাক্কালে—“যাও বীর, কালিফোর্ণিয়ায়, আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর। উড্ডীন কর বেদান্তের পতাকা। মুছে ফেল মন থেকে ভারতবর্ষের চিন্তা। আদর্শ জীবন যাপন কর। কৃতকার্য্য হবে জগজ্জননীর কৃপায়।”

নিবেদিতাও এসে গেলেন এত দিনে নিউইয়র্কে। কয়েকটি বক্তৃতা করলেন বেদান্ত সমিতির অনুরোধে। বক্তৃতা করলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। শ্রোতাদের উৎসাহ দিন দিন বেড়ে চলল। শুনতে চাইল তারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আরো। ১৭ই জুন বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা, বক্তৃতা দিলেন

'হিন্দু রমণীর জীবনাদর্শ' সম্বন্ধে। এবং পরবর্ত্তী রবিবারে 'প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা' নিয়ে বক্তৃতা দিলেন সমাগত জনতার সম্মুখে।

৩রা জুলাই।

এলেন বিবেকানন্দ ডিট্রয়টে। ফিরে এলেন এক সপ্তাহ পরে নিউইয়র্কে। কয়েকটি দিন কাটল। একটু বিশ্রাম করলেন। প্রস্তুত হ'তে লাগলেন প্যারিস যাত্রার জন্য।

অন্তরে সম্পাত হোল সূর্য্যের। পৌঁছল এসে স্বামিজীর কর্ণে বাইরের পৃথিবীর ডাক। কেমন ক'রে উপেক্ষা করবেন স্বামিজী। যাত্রা করলেন, যাত্রা করলেন তাই ২০শে জুলাই প্যারিসের পথে।

মানুষ বিবেকানন্দ ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে। জীবনের দু'টি বিপরীত ছন্দ এসে ধরা দিয়েছে এক কাব্যে। দ্বি-মুখী খরস্রোতা নদী মিলেছে এসে এক মোহনায়। একদিকে বাস্তবতার রূঢ়-প্রান্তর, আর এক দিকে অবাচ্যানুভূতির জ্যোতি বিচ্ছুরণ। এক দিকে মায়াময় খেলা ঘরের হাহাকার, কান্না ও আর্ত্তি, আর এক দিকে অনন্ত অপার শান্তির অসীম-সমুদ্র। এ দু'ধারা এসে মিলেছে তাঁর জীবনে। তাই মুমূর্ষু পৃথিবীর কান্না শুনে আকুল হ'য়ে যায় মানুষ-বিবেকের চিত্ত। নেত্র কোণে জ্বলে ওঠে বহ্নি-বন্যা। কিন্তু অন্তরে?

অন্তরে তাঁর ফল্গুর শীতল প্রবাহিণী।

আজিকার বস্তুবাদীরা এ ভাব ভাবনাকে দিয়েছেন নির্ব্বাসন। বস্তুর মিনার তৈরী করতে যাচ্ছেন তাঁরা হিংসার মন নিয়ে। যার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ দেখা দিল পৃথিবীর বুকে সংগ্রাম ও অশান্তি।

প্রশ্ন জাগতে পারে, তবে সংগ্রাম ছাড়া উপায় কি?

উপায় হোল, বস্তু সত্তার সঙ্গে ভগবৎ সত্তার সংমিশ্রণ। বলি তা কেমন ক'রে, কোন পথে?

আত্ম-শুদ্ধির পথে। ত্যাগের মহামন্ত্র উচ্চারণে।

তবে কি বিশ্ববাসী সবাই যাবে ত্যাগের তপে তন্ময় হ'য়ে?

না।

তবে কি ক'রে সম্ভব বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধিত দানবদের ক্ষুধার কবল থেকে অসহায় মানুষদের রক্ষা করা?

চাই সাধনা। দৃষ্টিকে দিতে হবে প্রধাবিত ক'রে দিগন্তে। খণ্ড স্বার্থের

সীমানা থেকে বসতে হবে অখণ্ডের সাধনায়। তারপরে পাড়ি ধরতে হবে উদ্বেল উদধিতে। সংগ্রাম তো করতেই হবে। তবে সে সংগ্রাম হবে আত্মজাগরণের সংগ্রাম। আত্ম-শুদ্ধির যুদ্ধ। তবেই আসবে মানুষের সত্যি-কারের মুক্তি। আসবে পবিত্র স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতার ভিত অক্ষয় ও অমর হ'য়ে থাকবে যুগে যুগে। থেমে যাবে সংগ্রাম। মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে কান্নার অশ্রু। বিশ্ব শান্তির দরবারে প্রয়োজন হবে না এটম্ আর হাইড্রোজেন বোমার হিসেব পেশ করতে। অতীত ভারতবর্ষের দিকে তাকালে এ স্বাক্ষর আমরা দেখতে পাই—রাজভিক্ষু অশোকের রাজত্বে। প্রতিটি ভারত-বাসীকে আজ ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেই সাধন সমরে।

* * * *

প্যারী নগরী। উঠলেন এসে লিগেট্ দম্পতির ভবনে। কয়েক দিন গেলে এক আমন্ত্রণ পেলেন বৃটানি প্রদেশের লানিওঁ থেকে। লিখেছে মিসেস্ ওলিবুল। এখানে এসে দেখা হ'য়ে গেল স্বামিজীর সঙ্গে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক মঁসিয়ে জুল বোওয়ার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে শিখে ফেললেন বিবেকানন্দ ফরাসী ভাষা।

লিগেট্ দম্পতির আতিথ্যে স্বামিজী বড় আনন্দ পেলেন। প্রতিদিন তাঁর আলয়ে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, ধর্ম্মযাজক ও সাহিত্যিকগণ আমন্ত্রিত হ'তে লাগলেন।

স্বামিজী লিখলেন তার পরিব্রাজক পুস্তকে,—"কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, গায়ক গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর ও বাদক প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ, মিষ্টার লিগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্ব্বত-নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃ-সঙ্ঘর্ষ-সমুত্থিত-চিন্তা-মন্ত্র-প্রবাহ, সকলকে দেশ কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তো।"

চিকাগো মহাসম্মেলনের অনুরূপ সভার আয়োজন হ'য়েছিল প্যারীতে। কিন্তু ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হ'তে পারল না।

কেন ?

বাঁধা দিল রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়।

চিকাগো তাদের উৎসাহকে দিয়েছে ম্লান ক'রে। কারণ, মনে করেছিল রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়, বিশ্বের বিজয়-তোরণে লিখে দেবে খৃষ্ট ধর্ম্মের বাণী।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে ঘোষণা করবে জগৎ-সমক্ষে। কিন্তু ফল হোল বিপরীত। তাই খৃষ্টান জগতে বিবেকানন্দ আজ একজন সম্ভ্রমের সম্রাট। ধর্ম্ম সভার প্রস্তাব উত্থাপিত হ'তে না হ'তেই পাদ্রিগণ জানাল প্রতিবাদ। সাহস পেল না তাদের বিরুদ্ধে কাজ করতে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ। আর কি করবে! অবশেষে ধর্ম্মেতিহাস সভারই আয়োজন করা হোল। প্যারীর ধর্ম্মমহাসভা স্থগিত রইল। আলোচনার বিষয় বস্তু হোল শুধু ধর্ম্মের ইতিহাস। 'ভাববার কথায়' লিখেছেন স্বামিজী—"উক্ত সভায় অধ্যাত্মবিষয়ক এবং মতামত সম্বন্ধীয় কোন চর্চ্চার স্থান ছিল না, কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গ-সকলের তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে, এই সভায় বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রচারক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। এ সভায় জনকয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ক চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন।"

অসুস্থ শরীর।

তবুও এলেন স্বামিজী সভামঞ্চে। অভ্যর্থনা জানাল সবাই স্বামিজীকে। আসনে উপবেসন করলেন বিবেকানন্দ। কথা ছিল একটি প্রবন্ধ পাঠ করবার। কিন্তু রুগ্ন ভগ্ন দেহ নিয়ে তা আর তৈরী করতে পাবলেন না বিবেকানন্দ।

সুরু হোল সভা।

বললেন জর্ম্মান পণ্ডিত ওপর্ট,—

বললেন তার প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে—শালগ্রাম শিলা নাকি 'যোনি চিহ্নের' প্রতীক। আর শিব লিঙ্গহোল পুংলিঙ্গের চিহ্ন।

কথাগুলো শুনে আর বসে থাকতে পারলেন না স্বামিজী। প্রতিবাদ করলেন উক্ত মতবাদের। বললেন, "লিঙ্গাদি পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপমধ্যস্থ শিলাকরণ্ডমধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থিভস্মাদি রক্ষণশিলার প্রাকৃতিক প্রতিস্বরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধপুজিত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। অপিচ নর্ম্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপাল প্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।

"শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতি অশ্রুতপূর্ব্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্ব্বাচীন এবং উহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময় সঙ্ঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধতন্ত্রসকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।"

বক্তৃতা দিলেন আরও একটি। এবারে বললেন বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম্মমতের বিস্তার সম্বন্ধে। উদ্‌ঘাটন করলেন তার ঐতিহাসিক তত্ত্ব। উল্লেখ করলেন গ্রীক প্রভাবের কথা।

বহু লোকের অভিমত, ভারতবর্ষের 'পর গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু একথা সত্যি নয়। যারা তা মনে করেন,স্বামিজী বললেন তাদের অধ্যয়ন করতে সংস্কৃত সাহিত্য। তবেই স্পষ্ট হ'য়ে যাবে, যে ভারতীয় সভ্যতা গ্রীক প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়। অনেকাংশে দেখা যায়, গ্রীকগণই হিন্দুদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে।

শেষ হোল সভা।

স্তম্ভিত হোলেন জগতের জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। সাধুবাদ করলেন স্বামিজীকে প্রতিটি অভ্যাগত অকুণ্ঠ ভাবে। প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করলেন স্বামিজী বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির সঙ্গে। এদের ভেতর আবার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় হ'য়ে উঠলেন মঁসিয়ে জুল বোওয়া, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেডিস্, ক্যাথলিক পাদ্রী পেয়রং ইয়াস্যঁাৎ, কামান নির্ম্মাতা মিঃ হিরম্ ম্যাকসিম, ইউরোপের প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ গায়িকা ম্যাডাম ক্যালভে, অভিনেত্রী কুল সম্রাজ্ঞী সারা বার্ণহার্ড, ডেমিডফ ও আরও একজনার সঙ্গে পরিচিত হোলেন স্বামিজী। আনন্দে অধীর হ'য়ে তাঁর সম্বন্ধে 'পরিব্রাজক পুস্তকে' লিখলেন বিবেকানন্দ,—

"আজ ২৩শে অক্টোবর। কাল সন্ধ্যার সময় প্যারী হইতে বিদায়। এ বছর প্যারী সভ্য জগতের এক কেন্দ্র, এ বছর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশ সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারীতে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম ঘোষণা করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে করবে তার স্বদেশকেও সর্ব্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত। আর অমার জন্ম ভূমি—এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য থেকে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির

নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর বসুজ ও তাঁর সতী সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!”

২৪শে অক্টোবর।

যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ পূর্ব্ব ইউরোপ ভ্রমণে। তিনটি মাস প্যারীতে বাস ক'রে দেখলেন স্বামিজী—

দেখলেন, দ্রুত এগিয়ে চলেছে পাশ্চাত্ত্যবাসী। কিন্তু মহৎ চিন্তা, জ্ঞানের সাধনা ও শিল্পকলার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অবার মাথা চারা দিয়ে উঠছে সাম্রাজ্যবাদী হিংস্র দানবদের লোভের ক্ষুধা। বললেন তাই নিবেদিতাকে স্বামিজী,—“পাশ্চাত্ত্যের সামাজিক জীবন বাইরে মধুর হাস্যের ন্যায় মনোহর, কিন্তু তলদেশে হাহাকারে ভরা, যাহা ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে। কৌতুক ও লঘু চাপল্যের অন্তরালে কি গভীর বেদনার অনুভূতি।”

দিন কেটে গেল জার্ম্মান পেরিয়ে আসতে। ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় এসে পৌঁছল ট্রেন অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে। কিন্তু প্যারীর মত আর কোন সহরই পারলনা স্বামিজীর মনকে আকৃষ্ট করতে। বললেন তিনি অষ্ট্রিয়াকে দেখে,—“তুরস্ক যদি ইউরোপের রুগ্ন পুরুষ হয়, তবে অষ্ট্রিয়া ইউরোপের রুগ্না নারী।”

২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা থেকে যাত্রা ক'রে অনেকগুলো দেশ পেরিয়ে ৩০শে অক্টোবর পৌঁছলেন এসে তুর্কীর রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে।

ইউরোপের দিকে তাকিয়ে স্বামিজী বড় হতাস হ'য়ে পড়লেন। তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে উঠল ফুটে মানুষের কান্নার আঁখিগুলো। ছায়ার মত আভাসিত হোল যেন তাঁর নয়নে, যুদ্ধের বিভীষিকা। বললেন স্বামিজী,—“ইউরোপ হোল এক বিরাট সামরিক শিবির।”

এগারটি দিন কাটল আনন্দের মধ্যে কনষ্টান্টিনোপলে। হোল বেদান্ত আলোচনা বৈঠকী সভায়। এবারে এলেন এথেন্সে। যাত্রীদল সহ যাত্রা করলেন মিশরের দিকে।

মনে পড়ে অতীত মিশরের কথা। মনে পড়ে সেই সব দিন গুলোর কাহিনী, যে দিন ছিল মিশরের গৌরবের দিন। পার্থিব সুখ সম্পদে ভরা একটা ঐশ্বর্য্যের উপঢৌকন। কিন্তু আজ? আজ তার কিছু নেই। কেবল পড়ে আছে মিশরের শ্মশান শিয়রে অতীত দিনের স্বাক্ষীস্বরূপ পিরামিড, স্পিনস্ক ও নীলনদের নিস্তরঙ্গ স্রোত-ধারা। আজও ব'য়ে যায় নীলনদ, ব'য়ে যায় অতীত দিনের দুঃখ, সুখের স্মৃতি নিয়ে।

সহসা মনে পড়ে স্বামিজীর ভারতবর্ষের কথা। আকুল হ'য়ে যায় চিত্ত। চঞ্চল হ'য়ে ওঠে মন। আর বিলম্ব নয়। এবারে ফিরবেন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের পথে।

এমনি দিনে এলো এক দুঃসংবাদ। এলো স্বামিজীর কাছে। বেঁচে নেই আর মায়াবতী মঠের সংস্থাপক মিঃ সেভিয়ার।

বড় ব্যথা পেলেন বিবেকানন্দ। সমস্তটা পৃথিবী যেন মুহূর্ত্তে গেল অন্ধকার হ'য়ে। ঝাপসা হ'য়ে এলো চোখ। মনের মধ্যাহ্নবেলায় সহসা যেন কে এনে দিল সন্ধ্যার গুণ্ঠন। মিঃ সেভিয়ারের স্মৃতি এসে যেন উঁকি দিতে লাগল স্বামিজীর মনে। বড় অসহায় লাগে যেন। জর্জ্জরিত দেহ বেদন-রোদনে। এমন দিনে মৃত্যু! ভারতের আত্মজাগরণের সন্ধি লগ্নে কেন মৃত্যু এলো নেমে? কেন কেড়ে নিয়ে গেল মহাযজ্ঞের একজন ঋত্বিককে? ব্যথার আঘাতে আহত পাখীর মত যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ—

যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের দিকে।

ঠাঁই নিয়েছ' ভিন্ জগতে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু দেখতে পাই তবুও তোমার মুখচ্ছবি—

দেখতে পাই মনের অন্তরালে। নিঃসীমের গভীরে।

উথ্‌লে ওঠে প্রাণ। ছুটে যেতে চায় অন্তর। কিন্তু আবার ঘনিয়ে আসে ঘোর। নামে গোধূলির অন্ধকার। একাকী হ'য়ে পড়ি। প্রহর গণি স্তব্ধ রাত্রির।

মন মেঘের মত উড়ে যায়। কান্না আসে।

বড় ভেঙ্গে পড়েছেন বিবেকানন্দ মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুতে। থেকে থেকে কেবল তার স্মৃতিরা এসে ভিড় করে মনে। মর্ম্মের অঙ্গনে যেন আনাগোনা করছে নিয়ত প্রিয় শিষ্য।

কিন্তু এমন ক'রে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না!

দাঁড়াতে হ'বে দৃঢ় হয়ে। ব্যথার বৃন্তে ফোটাতে হবে সান্ত্বনার শতদল। অনেকটা ফিরে এলেন সহজে। ফিরে এলেন স্বামিজী দেহ পিঞ্জরের মনোসায়রে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ৯ই ডিসেম্বর।

ফিরে এলেন স্বামিজী—

ফিরে এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে বেলুড়ে।

কিন্তু ঢুকতে পারছে না মঠে। বসেছে সন্ন্যাসীরা খেতে।

রাত। দাঁড়িয়ে দরোয়ান। বললেন তাকে দরজা খুলে দিতে। কিন্তু চাবী ছিল না তার কাছে। এলো ছুটে দরোয়ান সন্ন্যাসীদের নিকটে। বলল—এক সাহেব এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে। চাবী দরকার।

ত্রস্ত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলো দরোয়ান। খুলল দরজা।

কিন্তু একি! সাহেব তো নেই, গাড়ী যে শূন্য।

অবাক্ হ'য়ে গেল সে। কিন্তু স্বামিজী দেয়াল টপ্‌কে পৌঁছে গেছেন এত সময়ে, পৌঁছে গেছেন ওদের খাবার ঘরে। দাঁড়িয়েছেন এসে টুপি মাথায় দিয়ে বেশ গম্ভীর ভাবে।

সবাই তো বিস্ময়াবিষ্টের মত রইল তাকিয়ে। কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দজী একটি প্রদীপ নিয়ে এলেন এগিয়ে—

এগিয়ে এলেন স্বামিজীর সম্মুখে।

আর তো আত্মগোপন করা চলে না।

হেসে ফেললেন বিবেকানন্দ। বললেন—"বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তা'হলে রাত্রে আর খাবার জুটবে না। তাই পাঁচিল টপ্‌কে এসে পড়লুম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও।"

আনন্দে রাত্রি উঠল মুখর হ'য়ে।

এত সময়ে মঠ বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়েছে বিবেকানন্দের আগমন বার্ত্তা। কিন্তু বেশীদিন থাকবেন না স্বামিজী বেলুড় মঠে। আয়োজন করতে লাগলেন মায়াবতী যাবার জন্যে। মিঃ সেভিয়ার নেই। কে করে এখন মঠের কাজ কর্ম্ম। একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। তাই যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ, যাত্রা করলেন ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতা থেকে মায়াবতীর পথে। পৌঁছলেন এসে কাঠগুদামে। কিন্তু পড়লেন বড় অসুবিধায়।

কেন?

মেঘ মলিন আকাশ। দিগ্‌বলয় আচ্ছন্ন তুষারের তন্দ্রায়।

আকাশের নীল সামিয়ানাটা কালো হ'য়ে গেছে মেঘাঞ্জনে। তার 'পরে সুরু হোল আবার শিলাবৃষ্টি।

কষ্টের আর কি শেষ আছে? ক্লান্ত-দেহ। রুগ্ন শরীর। বড় কষ্ট পেলেন পথে বিবেকানন্দ। ১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারী এসে পৌঁছলেন—

পৌঁছলেন এসে মঠে। সান্ত্বনা দিলেন মিসেস্ সেভিয়ারকে। কাটল কয়েকটা দিন। বললেন একদিন স্বামিজী—

বললেন মিসেস্ সেভিয়ারকে,—"সত্যই আমার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক এখনও পুর্ব্বের ন্যায় সবল ও কার্য্যক্ষম।"

বললেন স্বামী স্বরূপানন্দকে 'প্রবুদ্ধভারতের' কথা। বললেন সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে।

দিনগুলো কাটতে লাগল প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে।

দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ। কোলে তার নানা রংএর পাখী। উদার ব্যাপ্ত পরিবেশ। পাহাড়ের সারি। তাদের ধ্যানী মূর্ত্তি। আহা কি রূপ! যেন চাইছে তারা মর্ত্তের মাটিতে স্বর্গের সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বললেন একদিন বিবেকানন্দ—

বললেন তাঁর অনুরাগী ভক্তদের কাছে,—"সব কাজ ত্যাগ ক'রে আমার জীবনের অবশেষ দিনগুলো এই মঠেই কাটিয়ে দেব। নিশ্চিন্তে অধ্যয়ন ও পুস্তকাদি লিখব। বালকের মত মুক্ত হ'য়ে মনের আনন্দে হ্রদতীরে পরিভ্রমণ করব।"

কিন্তু আশার পাখীগুলো উড়ে গেলো নিরাশায় ডানা ঝাপ্‌টে। মিলিয়ে গেল এক এক ক'রে নৈষ্ফল্যের অন্ধকারে। হতাশ লাগে স্বামিজীর। দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল শরীর। আকাশ বিস্তৃত স্বপ্ন এসে ঠাঁই নিল যেন সীমিত সীমানার গণ্ডিতে। হাঁপানী রোগ। ঘুম হয় না রাত্রে। রুদ্ধ হ'য়ে আসে শ্বাস। রাত্রির প্রহরগুলো কাটে যেন যুগের বিরতি নিয়ে। জীবনের আকাশ থেকে খসে পড়ে পরমায়ুর পলগুলো। ঝড় জাগে সবার মনে। বিদীর্ণ আত্মার আকুতি জানায় অনুরাগী ভক্তবৃন্দ ঈশ্বর সমীপে। জল ঝরে নয়নে। দুরু দুরু করে বুক।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ডিসেম্বর মাস।

১৩ই জানুয়ারী। আয়োজন করেছে শিষ্যেরা স্বামিজীর অষ্টত্রিংশ জন্ম উৎসবের। বললেন তাদেরকে স্বামিজী,—'আমার দেহের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।" কে শোনে কার কথা।

ওরা দেখতে পেল যেন নিরাশার বন্দরে আশার রবিদীপ্ত। নিঃসঙ্গের অঙ্গনে শুনতে পেল পৃথিবীর প্রার্থনা। না, না, কিছুতেই দেবে না তারা তাদের গুরুজীকে অসমাপ্তির ছেদ টানতে। পুর্ণতার পরিতৃপ্তি, তারপরে বিদায়ের বিজয়া। তাই ঈশ্বরের দরবারে পাঠাল, পাঠাল ওরা প্রার্থনার কান্না। পরিয়ে দিল স্বামিজীর গলে ফুলমালা। উঠল শরীর একটু সুস্থ হ'য়ে।

মানুষের কান্নার অশ্রু মুছিয়ে দেয়ার জন্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাব। তাই যেন শুনলেন প্রাণের ঠাকুর অন্তরের আকুল আকুতি। প্রসন্ন হলেন প্রভু। পুর্ণ করলেন ওদের মনোবাসনা।

আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠা করেছে মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তি। নিত্য হয় সেখানে পুজা, হোম ও কীর্ত্তন।

একদিন পড়ল তা স্বামিজীর চোখে। মায়াবতী মঠ, সে তো অদ্বৈত আশ্রম। সেখানে কেন মূর্ত্তি-পুজা?

মনে মনে অনেক কথা ভাবলেন স্বামিজী। কিন্তু বললেন না তখন কিছু।

কিন্তু সন্ধ্যাকালে যখন মিলেছে এসে সবাই অগ্নিকুণ্ডের সামনে, তখন তীব্র কটাক্ষ করলেন স্বামিজী। প্রকাশ করলেন তার মনের অভিপ্রায়। কিন্তু তাই ব'লে ঠাকুরের ঘরটি বন্ধ করবার কথা কিছু বললেন না।

স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার বুঝতে পারলেন স্বামিজীর কথাগুলো। অদ্বৈত আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ হয়—যদি এখানে থাকে কোন বিগ্রহ। যারা দ্বৈতভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে চায়, চায় যারা সাকার সাধনায় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে, তাদের পক্ষে অদ্বৈত আশ্রমের কোন প্রয়োজন নেই। পুজা বন্ধ ক'রে দিল তারা।

যুক্তির জয় হোল। কিন্তু মন তো মানতে চায় না। কয়েকজন শিষ্য এ নিয়ে আলাপ করল সুযোগ মত শ্রীমার সঙ্গে। উত্তরে বললেন মা, ওরে, "শ্রীগুরুদেব অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈত সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ প্রত্যেকেই অদ্বৈতবাদী।"

এবারে কাটল মনের মেঘ। ভ্রান্তির অন্ধকার থেকে এলো তারা আলোর দিগন্তে। মন আশ্বস্ত হোল।

স্বামিজী এত দিনে চলে এসেছেন বেলুড় মঠে। মায়াবতীর ব্যাপারটা নিয়ে মনটা বেশ একটু ভাবনায় ছিল। বললেন একদিন তাই,—"আমার ইচ্ছা ছিল যে, অন্ততঃ আমাদের একটি মঠও থাকবে, যেখানে কোন প্রকার বাহ্যপুজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তি থাকবে না। কিন্তু মায়াবতী গিয়ে দেখলাম সে বৃদ্ধ সেখানেও আসন গেড়ে বসে আছেন,—ভাল—ভাল।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বামিজীর অন্তরের পরিচয় মিলেছে কতবার। মায়াবতীর মঠে স্নেহানুরক্ত শিষ্যদের সঙ্গে মান অভিমানের পালা, তাদের 'পর রোষভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং তীব্র ভাষায় আত্মশুদ্ধির জন্য উপদেশ কতবারই তো দিয়েছেন স্বামিজী। কিন্তু এর অতলের যে মনটি তার পরিচয় পেতেও আর বিলম্ব ঘটেনি মুহূর্ত্ত। সে মনের আকাশে ছিল প্রসন্ন প্রভাতের হাসি। ছিল চাঁদঝরা স্নেহ, ভালোবাসা। একটি ঘটনার কথা বলছি—মায়াবতী মঠ। সময় হ'য়ে গিয়েছে মধ্যাহ্ন ভোজনের। কিন্তু খাবার তো আসছে না। বড় বিরক্ত হোলেন স্বামিজী। রাগে অভিমানে আরক্তিম হ'য়ে গেল মুখ। ভৎসনা করতে লাগলেন সবাইকে। অবশেষে খুঁজতে লাগলেন বিরজানন্দকে। কোথাও পাচ্ছেন না। চলে এলেন রান্নাঘরে। দেখলেন এসে

স্বামিজী, আপ্রাণ চেষ্টা করছে বিরজানন্দ রান্না নামাতে। কিন্তু ভিজে কাঠ, কি ক'রে রান্না নামাবে? কিছু বললেন না স্বামিজী। ফিরে এলেন নীরবে। যখন খাবার এলো, তখন অভিমান ভরে শিশুর মত বললেন গম্ভীর হ'য়ে,—"এসব এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি খাব না।"

জানত বিরজানন্দ গুরুর প্রকৃতি। অসহায় দৃষ্টিতে একবার স্বামিজীর দিকে তাকিয়ে খাবারের থালাখানা রাখল তার সম্মুখে। রইল দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে রইল বিরজানন্দ আনতশিরে নির্ব্বাক হয়ে। এমনি ক'রে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত্ত। অবশেষে চুপি চুপি এসে বসে পড়লেন খাবার নিয়ে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন বিরজানন্দকে। ব্যথা পেলেন অন্তরে, বললেন স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে,—"আমি কেন চটেছিলুম জানিস্? খুব খিদে পেয়েছিল কি না ভাই!"

মায়াবতী মঠেও একটু বিশ্রাম পাননি স্বামিজী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লাহোর কন্ফারেন্সের সভাপতি মিঃ রাণাডের ভাষণের প্রতিবাদে 'প্রবুদ্ধ ভারতে' লিখলেন 'সামাজিক সভায় মিঃ রাণাডের অভিভাষণের' সমালোচনা' নামে একটী প্রবন্ধ।

বলেছিলেন রাণাডে—ছিলনা প্রাচীন যুগে জাতিভেদ। ঋষিগণ ছিলেন বিবাহিত। তাহার প্রাণস্বরূপ তিনি ক্ষত্রিয়রাজ-নন্দিনীগণের সঙ্গে ঋষিগণের বিয়ে অর্থাৎ অসবর্ণ বিয়ের একটী সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন।

* * * *

বিবাহিত ছিলেন শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরুগণও। অতএব আমাদের গঠন করতে হবে একদল বিবাহিত আচার্য্য। অসম্পূর্ণ সন্ন্যাসী জীবন আচার্য্য ছিল না বৈদিকযুগে। এখনও থাকা উচিৎ নয়।

স্বামিজী প্রত্যুত্তরে লিখলেন—"সন্ন্যাসীগুরু ও গৃহস্থ গুরু, কুমার ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত ধর্ম্মাচার্য্য উভয় প্রকার আচার্য্য, বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। অতএব তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম কল্পনার সাহায্য না লইয়া স্বাধীনভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করার প্রয়োজন। সন্ন্যাসী আচার্য্যগণ, গৃহস্থগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পূর্ণব্রহ্মচর্য্যরূপ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা উপনিষদ্বক্তা, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।"

"একদিকে বিবাহিত গৃহস্থ ঋষি—কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার—শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে র'য়েছেন—খুব কম ক'রে বল্লেও বল্তে

হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরণের; আর অন্যদিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ-সন্ন্যাসি-ঋষিগণ, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্বেও এমন উচ্চ ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন, যার অমৃতবারি সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধেরা এবং পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রাণভরে পান ক'রে তাঁদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তি লাভ করেছিলেন এবং যা' পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তিনচার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজ-সংস্কারগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করবার শক্তি পর্য্যন্ত দান করছে।"

"হিন্দুজাতি অনাদি কাল হইতে জড়ের পরিবর্ত্তে চৈতন্য, ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগকেই শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অতএব 'যতদিন সমগ্র হিন্দুজাতির মনের ভাব এইরূপ চলিবে—আর আমরা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিবৃন্দ ভারতীয় নর নারীর 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্ব্বত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা করিতে পারেন?"

"আমাদের সংস্কারদলের ভিতরের ব্যাপারের যদি ভাল করে খবর নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা' দেবতাদের ভাল করে গুণ্‌তে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাজ কর্ম্মের এ রকম সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব যে দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের নিজেদের হৃদয় মধ্যেই। কিন্তু এদিকে দেখ, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একলা দাঁড়িয়ে র'য়েছে, কারো কিছু সাহায্য চাচ্ছে না, জীবনে শত ঝড়ঝাপ্‌টা আস্‌ছে, বুক পেতে সব নিচ্ছে, কাজ কচ্ছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমন কি, কর্ত্তব্য বলে লম্বা নামে সাধারণ পরিচিত সেই পচা বিট্‌কেল ভাবটাও নেই। সারা-জীবন কাজ চলছে, আনন্দের সহিত স্বাধীনভাবে কাজ চলছে। কারণ, ক্রীত-দাসের মত জুতোর ঠোকর মেরে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও সে কার্য্যের মূলে নেই।"

*　　*　　*　　*

"বেঁচে থাকুন রাণাডে ও সমাজসংস্কারক দল! কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত! ভুলো না বৎস, এই সমাজে এমন সব

সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্ত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছো না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দ। ২৪শে জানুয়ারী।

ফিরে এলেন স্বামিজী বেলুড় মঠে। কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই আমন্ত্রণ লিপি এলো ঢাকা থেকে।

যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ—

যাত্রা করলেন সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে। বহির্গত হোলেন পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে ১৮ই মার্চ্চ।

নারায়ণগঞ্জ। জানাল ঢাকা অভ্যর্থনা সমিতির লোকেরা স্বামিজীকে অভিনন্দন। ২৫শে মার্চ্চ এসে পৌঁছলেন স্বামিজীর মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দ। নারায়ণগঞ্জে যুক্ত হলেন তারা স্বামিজীর সঙ্গে। সেখান থেকে সদল বলে যাত্রা করলেন লাঙ্গলবন্দে। চাপলেন ট্রেণে অপরাহ্নে। পৌঁছলেন এসে ঢাকা টাউনে। অভ্যর্থনা জানালেন ঢাকার প্রখ্যাত উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ। জনতা আনন্দে অধীর হ'য়ে বারে বারে বলতে লাগল "জয় রামকৃষ্ণ।" নিয়ে এলো স্বামিজীকে জমিদার মোহিনীমোহন দাসের বাড়ীতে।

বুধাষ্টমীতে অবগাহন করলেন বিবেকানন্দ ব্রহ্মপুত্র নদে। দুটি বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী ঢাকায়। শেষের দিনের বক্তৃতায় তিনি বললেন,—

বললেন মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে—"এই মূর্ত্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিতভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহার নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম! যে সকল সংস্কারক মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি, ভাই তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দেও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র। জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি? সংস্কারকদল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক; কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন?"

অন্ধ সংস্কারকদের মাথা হোল নত। মুগ্ধ—স্তব্ধ হ'য়ে গেল তারা স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে।

ছুঁৎমার্গের বাইরে স্বামিজী। বিশ্বাস করেন না তিনি ছোঁয়া ছানির ভাবকে। সকলের দেয়া খাবার দ্রব্য গ্রহণ করছেন আনন্দে। কিন্তু গোড়া হিন্দুর দল জানাল' আপত্তি। বললেন স্বামিজী—"বাবু! আমি ফকির সন্ন্যাসী, আমার আবার জাতি বিচার ও আচার নিয়ম কি? শাস্ত্র বলিতেছেন, সন্ন্যাসী মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবে, এমনকি, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর গৃহ হইতে খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষেধ নাই।"

ঢাকা থেকে এলেন বিবেকানন্দ দেওভোগে—

এলেন সাধু নাগমহাশয়ের আবাস ভূমি দর্শন করতে।

নাগমহাশয় নেই। চলে গিয়েছেন তিনি মর-জগতের মায়া কাটিয়ে। চলে গেছেন পুণ্যলোকে স্বর্গধামে। যদি আজ তিনি থাকতেন, তবে কত না আনন্দ পেতেন যেন।

উপনীত হোলেন স্বামিজী তাঁর সাধন কুটীরে। ভক্তি বিনম্র চিত্তে জানালেন শ্রদ্ধা। তাকিয়ে রইলেন পলকহীন নয়নে।

বেঁচে আছেন নাগমহাশয়ের স্ত্রী। তার কি আর আনন্দের সীমা আছে? কত সব অন্ন ব্যঞ্জন তৈরী করতে লাগলেন তিনি। স্নানে গেলেন স্বামিজী। ছায়া মেদুর পল্লীকুঞ্জ। শীতল শান্ত পরিবেশ। বড় ভালো লাগে তাঁর। স্নানান্তে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। এত দিন পরে যেন একটি নিশ্চিত শান্তির ঠাঁই মিলেছে। ঘুম ভাঙ্গল বেলা শেষে। চাইলেন খাবার। আহারান্তে একটু বিশ্রাম ক'রে ফিরে এলেন আবার ঢাকায়। ঢাকা থেকে এলেন কামাক্ষ্যায়। সেখান থেকে চন্দ্রনাথ দর্শন ক'রে ফিরে এলেন গৌহাটীতে। এখানেও তিনটি বক্তৃতা দিতে হোল তাঁকে।

শরীর ভেঙ্গেছে। নিত্য নতুন রোগ এসে ঠাঁই নিতে চাইছে জীর্ণ দেহে। বড় ভাবনা হোল শিষ্যদের। তারা নিয়ে এলো স্বামিজীকে শিলংএ। এখানে এসে কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে হোল আলাপ। আসামের চীপ কমিশনার স্যার হেনরী কটন তাদের অন্যতম। পুর্ব্বে হেনরী শুনেছে স্বামিজীর নাম।

আজ এত' কাছে পেয়ে যেন আত্মহারা হ'য়ে গেল সে। বলল এক সময়—"স্বামিজী! ইউরোপ আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন করিয়া অবশেষে আপনি এই জঙ্গলে আসিয়াছেন কি দেখিতে?"

মধুর কণ্ঠে উত্তর করলেন স্বামিজী—"আপনার মত ঋষি যেখানে বাস করে, তাহা তীর্থস্থান, আমি তীর্থদর্শনে আসিয়াছি।"—বলতে বলতে জড়িয়ে ধরলেন

স্বামিজী তাকে বাহুপাশে। সকলে তো অবাক! ভাবছে তারা—নিশ্চয়ই পুর্ব্বে পরিচয় ছিল, কিন্তু—না। পরিচয় এই প্রথম। হোক না তা। কি হয়েছে তাতে?

প্রজ্ঞাবান যোগী দেখতে পান মানুষের মনোলোকটি। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ওঠে ভাস্বর হয়ে মানুষের জীবন দর্শন। কটন সাহেব যে তাঁর হৃদয় রাজ্যেরই একজন। তাকে পেয়ে অমন হবেন না স্বামিজী?

শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান বটে। কিন্তু স্বামিজীর স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছে না। কটন সাহেব সিভিল সার্জ্জনকে নিযুক্ত করল স্বামিজীর চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু রোগ যেন বেড়েই চলল। শঙ্কার আকাশে অমঙ্গলের সঙ্কেত। ভগ্ন শরীর দিন দিন যেন পতনের সাধনায় তন্ময়। শিষ্যদের মন ভেঙ্গে যায়। দিন রাত তাকিয়ে থাকে শ্রীগুরুর রোগজীর্ণ দেহখানার দিকে।

আর ভাবে—কি হবে উপায়!

রাতে চোখে ঘুম আসে না। চোখ চেয়ে থাকে কত শিষ্য। কেবল অমঙ্গল মুহূর্ত্তটির পায়ের শব্দ যেন তাদের বুকে করে বজ্রের আঘাত।

এত কষ্ট! স্বামিজীও যেন আর পারছেন না সংগ্রাম করতে। অবশেষে হতাশার নৈরাশ্য। বললেন—"যদি দেহত্যাগই হয়, তাহাতেই বা কি? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা দেড় হাজার বছরের পক্ষেও যথেষ্ট।"

রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। যন্ত্রণা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। শিয়রে দাঁড়িয়ে এক ব্রহ্মচারী। চোখে তার অশ্রুর নির্ঝর। প্রাণে বিদায়ের বিধুর কান্না। এক মনে সেবা ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু চোখের 'পর এমন ভাব প্রত্যক্ষ করা যে দুঃসাধ্য! বিদীর্ণ আত্মার আকুতি জানাল ভক্ত ঈশ্বরের সমীপে। বলল,—"হে ভগবান, দয়া করিয়া এই রোগ-ভার আমাকে অর্পণ কর, বিনিময়ে স্বামিজী সুস্থ হয়ে উঠুন।"

চোখ মেলে তাকালেন বিবেকানন্দ। সে দৃষ্টিতে মাখানো করুণা। ব্যথা জর্জ্জর কণ্ঠে বললেন "ওরে, আমি দুঃখ কষ্ট ভোগ করার জন্যেই দেহ ধারণ করেছি, অধীর হোস্‌নে।"

কেঁদে ফেললেন ব্রহ্মচারী।

সে কান্নার করুণ সুরে কেঁপে উঠল ঈশ্বরের আসন। বুঝিবা কান পেতে শুনলেন তিনি ভক্তের আকুল আবেদন। সত্যি স্বামিজী একটু সুস্থ হ'য়ে উঠলেন।

শ্বাস কষ্ট আর রইল না। উৎকণ্ঠার কারাগার থেকে উন্মুক্ত হোল ব্রহ্মচারী।

আসন্ন বিপদ কেটে গেল। একটু চিন্তা-মুক্ত হোল সবাই।

শেষ হয়েছে পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ। আসাম আর ঢাকার বিশেষ স্থানগুলো পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে এলেন বিবেকানন্দ বেলুড়ে।

চিকিৎসার বিরাম নেই। ডাক্তার কবরেজের ভিড় দিনের পর দিন বাড়তে লাগল।

এবারে আর কাজ করবার সামর্থ্য রইল না। দেহ পড়ল অচল হ'য়ে।

এই বুঝি নিশ্চিত শান্তির ঠাঁই।

বড় ক্লান্তি। শ্রান্তি এসে ঘুমিয়ে পড়ে কোলে। নেমে আসে স্তব্ধতার গুণ্ঠন রাত্রির মত। এ যেন অনন্ত-নীরবতা। অনন্ত-মগ্নতার অভিসার।

কিন্তু গ্লানির সমুদ্রটা যে খেপে গেছে। বন্দী জীবনের দ্বারে এসে আঘাত হানছে বারে বারে।

তাই তো চোখে ঘুম আসে না। রুদ্ধ হয়ে যেতে চায় শ্বাস।

বহুমূত্র রোগ। তারপরে আবার হাঁপানীর টান।

মুখে রুচি নেই। কিছু খেতে পারেন না স্বামিজী। যেন বন্দী কারার দিনগুলো নির্ম্মমভাবে ব্যঙ্গ ক'রে যাচ্ছে, ব্যঙ্গ ক'রে যাচ্ছে স্তিমিত সূর্য্যকে।

সারাটা রাত কেটে যায়। এক একটা প্রহর যেন এক একটা বছরের আয়ুকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় নির্ম্মম ভাবে। সকাল হয়। পাখী ডাকে। কর্ম্ম ব্যস্ত মানুষেরা পথে নামে। স্বামিজীর চোখে ঘনিয়ে আসে ঘোর।

বাইরের পৃথিবীটার কোন বৈচিত্র্য নেই। সেই গঙ্গার বুকে সূর্য্যের প্রণতি। জোয়ার, ভাটা। প্রভাতের বন্দনা। আবার গোধূলির বুকে ক্লান্ত দিনের বাসর শয্যা। পরিবর্ত্তন কেবল স্বামিজীর। নিত্যি পরিবর্ত্তন—রোগ বর্দ্ধন। যন্ত্রণা। গ্লানি ও রাত্রি জাগরণ।

চিকিৎসার ত্রুটি নেই। কবরেজি চিকিৎসা হ'চ্ছে। তারও হাজিরার ত্রুটি নেই।

কিন্তু এ কেমন হোল, ভাবে কবরেজ। এত চেষ্টা! এত ঔষধ! একটু পরিবর্ত্তন নেই? আবার পা দু'খানাও একটু ফুলেছে। কবরেজ বললে কিনা—সোঁত এসেছে। রক্ত নেই।

তাই জল জমেছে পায়।

কত লোক আসে। দেখে যায়। কেউ নীরবে দু-কোঁটা চোখের জল গোপন করে। আবার কেউবা জিজ্ঞেস করে—একটু কম মনে হচ্ছে না কি স্বামিজী?

যেন আহত বেদনায় স্বামিজী উত্তর দেন—"উপকার অপকার জানি না। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন ক'রে যাচ্ছি।"

আবার কেউ এসে জুড়ে দেয় আলোচনা।

কত উপদেশ, কত না আলাপন।—ওরে, ঈশ্বরকে পেতে হোলে ঐ মানুষের সেবা ক'রে যা। প্রাণ সমাপন কর মানুষের কান্নার অশ্রু মুছে দিতে।

এমনি সময় একজন সেবক এসে বললে—বেশী কথা বলবেন না স্বামিজী। কবরেজ বারণ ক'রে দিয়েছেন। দুর্ব্বল হয়ে পড়বেন।

মেজাজ ক'রে ওঠেন স্বামিজী,—"রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম। এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করবার জন্ম প্রস্তুত হয়, তা হ'লে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক। পর-কল্যাণে হলই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়।....."

জীবনের উপান্তে এসেও পৃথিবীর জন্মে তাঁর কত মায়া। যে নর একদিন নারায়ণের মতো পুজো পেয়েছে, পেয়েছে স্বামিজীর সেবা, তাদের তিনি কেমন ক'রে ফিরিয়ে দেবেন অবহেলে? তাই তো আবার বললেন—ওরে, "এরা এতদুর থেকে কষ্ট ক'রে আমার ছুটো কথা শুনবার জন্ম এসেছে, আর অমনি অমনি ফিরে যাবে?"

না না আমাকে একটু কথা বলতে দে তোরা। আমার মনের সুখে আঘাত হেনে দেহটার মতো পঙ্গু ক'রে দিস নে। "তোরা যা পারিস কর। আমি জড়ের মত চুপটি ক'রে বসে থাকতে পারব না।"

বারণ ক'রে যেন বিষম বিপদে প'ড়ল ভক্তটি। একটি কথা বলায় এ যে লক্ষ কথার ধারা বর্ষণ সুরু ক'রে দিল। বড় অপ্রস্তুত হোল সে। একটু বিরক্তির ভাব লয়েই বুঝি চুপটি ক'রে রইল ভক্ত, রইল নির্ব্বাক প্রহরটির মত দাঁড়িয়ে।

বলি ছাই, বিপদের ওপর বিপদ। এমনি সময় এলো আর একদল লোক। কানখাড়া ক'রে আছেন স্বামিজী। বললেন—দেখ বাইরে কারা। ডাক ওদের ভেতরে।

উপায়হীন ভক্ত। ডাকল।

সুরু হোল আবার কথা।

চাইছে তারা জীবনের সন্ধান। পথের ইঙ্গিত। বলতে বলতে অতীত জীবনের কত কথা না বলে ফেলল ভদ্রলোক।—কত অন্যায় কাজ করেছি স্বামিজী। আজ যেন সেদিন গুলো এসে দহন জ্বেলে দিয়েছে বুকে। আঘাত

করছে থেকে থেকে। জীবন তাই বিস্বাদ লাগে। ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয় নিজেকে। মনে হয় যেন আমি কত নগণ্য। কত ছোট আমার প্রবৃত্তি।

স্বামিজী বুঝলেন তার মনের ভাব। জ্বলছে তার বুকে অনুশোচনার বহ্নি। আর কি! পাপ ক'রে যে বুঝতে পারে তার পাপকে। সে তো আর পাপী নয়! তার আত্মশুদ্ধি হয়ে যায় তখনই। তাই বললেন স্বামিজী—"ছিঃ, নিজেকে অমন দুর্ব্বল ভাবতে আছে? যা করেছ ভালই করেছ, এখন আরও ভাল হও।"

যেন মুহূর্ত্তে ধুয়ে মুছে গেল লোকটির অন্তরের মলিনতা। আভাসিত হোল সত্যের শুদ্ধ সুন্দর মূর্ত্তি। বারে বারে প্রণাম করল, অন্তরের প্রণাম। আনন্দের শিহর্ দোলায় দোলতে দোলতে ফিরে এলো বাড়ীতে।

অন্যায় যে করে তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সংশোধন সম্ভব নয়। তার পাপ স্খালনের মুক্ত পন্থা হোল তাকে আপন ক'রে নেয়া। আঘাত হেনে নয়—আপন ক'রে তবে শুদ্ধির মন্ত্র উচ্চারণ। বুকে টেনে তারপরে সুখের সন্ধান। জীবনের মহান প্রান্তের সীমা নির্দ্দেশ।

ওরা এক এক ক'রে চ'লে গেল।

এবারে স্বামিজী একা। নীরব ক্ষণগুলো যেন শীত-রাত্রির মত থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। সময় তো আর কাটে না। কত বইর প্রথম পাতার প্রথম ছত্রটি থেকে শেষ পাতার শেষ ছত্রটি অবধি মুখস্থ হয়ে যায়। কিন্তু তবু যেন সময় আর কাটে না।

দেখতে দেখতে জুলাই মাস কেটে গেল।

একটু যেন সুস্থ বোধ করছেন স্বামিজী।

নদীর যেন বাঁক ফিরেছে। এসছে তার সুমতি।

দেখতে দেখতে কেটে গেল আগষ্ট মাসটিও। অনেক ভালো লাগে। একটু একটু ক'রে বল ফিরে আসে। ফুলাটা নেই মোটে। মুখে রুচি এসেছে। সারা রাত ঘুম এসে চুমু দিয়ে থাকে চোখে। ভোর হলে যেন ডেকে তুলে দেয়।

স্বামিজী প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়।

সুরু হয় আবার বেদান্ত আলোচনা। গীতা ব্যাখ্যা আর সেবা ধর্ম্মের মহা মন্ত্র উচ্চারণ।

মুখর হয়ে ওঠে বেলুড় মঠ। অপূর্ব্ব প্রাণ-চেতনা নিয়ে কাজে লেগে যায় সতীর্থরা। ভক্তের দল যেন ফিরে পায় নব-জীবন। আনন্দে আবেগে ঈশ্বর সমীপে পাঠায় প্রাণের অকুণ্ঠ প্রণতি। বলে—তোমার দয়ার অন্ত নেই নিয়ন্তা। তোমার করুণার বরুণ ঝরে দিকে দিকে। তাই তো আমরা আছি, তোমার মহিমার খেলা খেলতে।

বেলুড় মঠের 'পর হিন্দু সমাজের কটাক্ষ। তারা করে নিন্দা। বলে কত কথা সন্ন্যাসীদের। গঙ্গা দিয়ে নৌকো চলে। আরোহীরা তাকিয়ে তাকিয়ে বলে কত কুৎসিত কথা। আচার নেই নাকি। বিচারের বালাই লুপ্ত। যত সব ধার্ম্মিক এসে জুটেছে! বলি, বিলেতি কায়দায় কি আর ধর্ম্ম করা চলে? আর তার নায়ক হয়েছে কোন এক দত্ত ঘরের নরেন্দ্র।

কথাগুলো কানে যায় শিষ্যদের। তারা ব্যথা পায় মনে। প্রতিবাদটি করে না। শুনে চ'লে আসে নীরবে। বলে স্বামিজীর কাছে।

স্বামিজী তাদের আশ্বস্থ করেন। বলেন—জানিস না বুঝি, "দেশে কোন নতুনভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন পন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম্ম সংস্থাপক মাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে।......" ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? নতুনকে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রাণও বিসর্জ্জন করতে হয়। এক একটা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। নতুন শাসন প্রবর্ত্তন হয়। পুরানো দিনগুলো নীরব কান্নায় মিশে যায় বিস্মৃতির অতলান্তে। নয়া মানুষের প্রাণ-চেতনা নতুন দিনগুলোকে জানায় অভ্যর্থনা। দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে প্রগতির ভাবনা। ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের পট পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। প্রায়ান্ধ স্থবিরের দল তখন বুঝতে পারে ভুল। নেমে আসে আত্মাভিমানের সিংহ দ্বার খুলে নতুনের শোভা যাত্রায়।

কাজ ক'রে যা। কথায় কান দিস না।

দ্বিগুণ উদ্দীপনা লয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা কর্ম্ম সমুদ্রে। বিঘ্নের উপল মাড়িয়ে চলে বক্ষ উচিয়ে। নির্ভয়ে এগিয়ে যায় যে যার কাজ করতে।

ক্রমে ক্রমে দিনগুলো যেতে লাগল মঠের।

এতবড় বাংলাদেশটার অনেক লোকই তখন মঠের কার্য্যক্রমে সুখী ছিল না।

নিত্যের খোরাক হ'য়ে উঠল যেন মঠের নিন্দা তাদের কাছে।

এ জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা পুরাতনের জীর্ণতাকে আকরে মরণকে বরণ করে হাসিমুখে। কিন্তু তবুও নূতনকে জানায় না অভ্যর্থনা। সেদিনকার মঠবাসী হিন্দু সমাজের কাছে এমনি এক উপেক্ষার বস্তু হয়ে দেখা দিল।

কিন্তু এ ভ্রম তাদের ভেঙ্গে দিলেন স্বামিজী—

ভেঙ্গে দিলেন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মঠে দুর্গোৎসব ক'রে।

শ্রীমার অনুমতি প্রার্থনা ক'রে লোক পাঠালেন স্বামিজী বাগবাজারে। ফিরে এলো সে মায়ের আদেশ নিয়ে। পুজা হোল। পুজারী হোলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ। তন্ত্রধারকের কাজ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বলি হোল না মঠে। মায়ের আদেশ। জননীর দুয়ারে পশুবলি নয়।

গরীব দুঃখী যেন সত্যিকারের মাতৃমন্ত্র শুনল বেলুড়ে। ব্যথাভরা বুকে মায়ের আহ্বান যেন বারে বারে শুনতে পেল তারা। আনন্দে আবেগে মহাপুজার মণ্ডপে সমবেত হোল হাজারো হাজারো সন্তান। পরিতৃপ্ত হ'য়ে গেল' তারা মায়ের প্রসাদ পেয়ে। ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের কানে জল গেল। চোখ ফুটল। দেখল তারা, দেখল নিন্দাবাদীরা, ধূর্ত্ত আবরণধারী সন্ন্যাসী নয় এরা। সত্যের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে তাঁরা আকাশে। হিন্দুর আচার নিষ্ঠাকে গ্রহণ করেছে অন্তর দিয়ে।

সে দিনের উৎসবকে মুখর করে দিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। করলেন লক্ষ্মীপুজা আর শ্যামাপুজাও।

দিকে দিকে রোল উঠল। নিন্দাবাদীদের নিন্দার কণ্ঠে ধ্বনিত হোল আনন্দের সংবাদ। বলতে লাগল' তারা,—"মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দু সন্ন্যাসী।"

অদ্বৈতবাদী অর্চনা করলেন দেব-দেবীর। জ্ঞান দিলেন অজ্ঞান জনের অন্ধকার অন্তরে। যেন বলে দিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ডেকে ডেকে—ওরে, দ্বন্দ্ব কিসের? কেবল মনের ভ্রম। দেখার দোষ! মা আছেন শূন্যের মধ্যে পূর্ণ হয়ে। আবার মা আসেন মূর্ত্তির মাঝে স্ফূর্ত্তির মন লয়ে। কিছুই ব্যর্থ নয়। কিছুই উপেক্ষার বা অবহেলার বস্তু নয় রে। ডাক দিতে পারলে তিনি আসেন অধীর মন লয়ে নেমে—

নেমে আসেন কান্নার অশ্রু মুছে দিতে। আসেন প্রেমের খেলা খেলতে।

তাই বুঝি বাংলার প্রেম ধর্ম্মের আছে একটা স্বকীয় ভাব। আছে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তা না হলে কেমন ক'রে রামপ্রসাদ পেল মাকে

কন্যারূপে ? রাঘবানন্দ বা কেমন ক'রে লাভ করল মাকে পত্নীরূপে ? কেন তা লাভ করতে পারবে না ?

বাংলার প্রেম ধর্ম্ম যে একান্ত মানবীয় ধর্ম্ম। ভক্তের তৃষাশুষ্ক মনে দেবী এলেন মূর্ত্তি ধ'রে। খেলে গেলেন কত খেলা। দর্শনে, স্পর্শনে ধন্য করলেন ভক্তকে। প্রেমের যমুনায় এক সঙ্গে করলেন অবগাহন। দেবতা এলেন এখানে মানুষের প্রিয় হ'য়ে। প্রিয়া হ'লেন দেবী। কেবল কান্না। কাঁদতে জানলে কি আর ভাবনা আছে ? কান্নার মাঝে যদি থাকে আন্তরিকতা, থাকে যদি চোখের জলে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, তবে তিনি না এসে থাকেন এমন সাধ্য কি ?

স্বামিজী তো শাস্ত্রকে উপেক্ষা করতে বলছেন না, বলছেন না দেব-দেবীকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে। তিনি যে পূর্ণতার সংবাদ জানাতে এসেছেন। এসেছেন দ্বন্দ্বের অন্ধকারে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা ছড়াতে।

বললেন বিবেকানন্দ,—"আমি শাস্ত্রমর্য্যাদা ধ্বংস করতে আসি নি, এসেছি পূর্ণ করতে।"

কিন্তু এ পূর্ণতার আনন্দ উপভোগ কর মানুষের মাঝে। ঈশ্বরকে দর্শন কর পতিতের অন্তরে। অবজ্ঞাত অবহেলিত আত্মার সংবাদ লও, তবেই প্রভু মহা খুশী হবেন। দেখা দেবেন। কথা বলবেন। জড়িয়ে ধরবেন বাহুতে। হ'য়ে যাবে ঈশ্বর-সঙ্গ লাভ। সার্থক হবে জনম।

মঠের জমি নিড়াতে এসেছে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ। তার মাঝে আবার একজনার নাম কেষ্টা। তাদের নিয়ে স্বামিজীর কত না রঙ্গ-রস। বলি কেষ্টা, তোর নামটা তো বেশ! যেমন তোর রূপ তেমন তোর গুণ, তাই বুঝি অমন সেরা নামটি রেখে দিলে তোর মা ?

কেষ্টা একটু হাসে। কোদালিটায় দ্বিগুণ বল দিয়ে মাটির চাকা কাটে। আর মিটি মিটি তাকায়।

হ্যাঁরে, তোকে কিন্তু আমার ভারী ভালো লাগে।

যেন কেষ্টার চোখে মুখে ফুটে ওঠে চপলতার হাসি। আড় চোখে তাকায়। ঘাম ঝরে ফোটা ফোটা। এক হাতে মোছে। আর হাতে টেনে তোলে জংলা গাছগুলো।

এমনি সময় স্বামিজীকে ডাকলে যেন কে। দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। বলে পাঠালেন স্বামিজী—"না আমি এখন যেতে পারব না। এদের নিয়ে বেশ আছি।"

সত্যি গেলেন না স্বামিজী। ফিরে গেল স্বামী-সুবোধানন্দ।

আবার জুড়ে দিলেন গল্প।

—বলি ও কেষ্টা।

এবারে কেষ্টা বলল—"ওরে স্বামী-বাপ্ তুই আমাদের কাজের বেলায় আর এখানে আসিস না।······"

বলি কেন রে ?

"তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর বুড়ো বাবা এসে বকে।"

—তাই নাকি ?

বারে বকবে না ? কাজে ফাকি দিলে নিন্দে করবে না ? তোর সঙ্গে বসে বসে গল্প করলে কাজ কি এগোবে ?

সহসা যেন একটা করুণ কান্না গুন্‌গুনিয়ে উঠল স্বামিজীর অন্তরে। চোখে এলো জল।

বললেন—"না—না বুড়ো বাবা বকবে না, তুই তোদের দেশের দু'টো কথা বল।"

বুড়ো বাবা কে ?

স্বামী অদ্বৈতানন্দ। ভারী কড়া লোক। কাজে অবহেলা করলে আর উপায়টি নেই।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন আবার কত কথা। কেষ্টার ব্যথার মনে দিলেন আনন্দের বারি। সত্যি, এ যেন দুঃখের মথিত সমুদ্রে সান্ত্বনার দীপশিখাটি।

আর একদিন আবার কেষ্টার সঙ্গে জুড়ে দিলেন স্বামিজী গল্প।

সে কত না কথা। যেন কেষ্টার তাঁর একজন সমজদার সেজে এসেছে।

বলি ওরে কেষ্টা ?

আজ্ঞে—

"ওরে তোরা আজ এখানে খাবি ?"

কেষ্টা বলল—"আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন খাই না······"

কেন রে ?

"এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে যে জাত যাবেরে বাপ্।" বললেন স্বামিজী,—"নুন কেন খাবি ? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে তাহ'লে তো খাবি ?"

সম্মতি জানাল কেষ্টা।

এলো লুচি, মণ্ডা। খেল পেট ভরে। খেল মহা তৃপ্তির সঙ্গে।

বললো—"হাঁরে স্বামীবাপ্—তোরা এমন জিনিষটা কোথায় পেলি, হামরা এমনটা কখনো খাইনি।"

বললেন স্বামিজী—"তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল।"

নারায়ণ সেবা হয়ে গেল। আনন্দে আবেগে স্বামিজী দেখলেন তাদের খাওয়া। বলতে লাগলেন সন্ন্যাসীদের—"দেখ্ এরা কেমন সরল। এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হবে? পরহিতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ, এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। ইচ্ছে হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রী ক'রে বিলিয়ে দেই এই সব গরীব দুঃখাদের মধ্যে। আমরা তো গাছতলাই সার করেছি। আহা দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না—আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?......দেশের লোক দু'বেলা দু'মুঠা খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মন চায়, ফেলে দেই তোর শাখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দেই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা। সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়ি পতি যোগাড় ক'রে নিয়ে আমিও দরিদ্র নারায়ণদের সেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই।"

হে প্রভু, এমন কৃপা যখন করলে তখন সামর্থ্য দাও আমাকে। সেবার মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যেতে দাও তোমার চরণপ্রান্তে। যেমন মেঘের বুক ভরা থাকে কান্নার অশ্রু, তেমনি আমার বুক ভরে দাও ব্যথিতের বেদনায়। আমি তাদের দুঃখের দহনে এনে দেই শান্তির বারি। সঙ্গীর মিছিল। ওরা বাঁচতে শিখুক। সমাজের বুক জুড়ে হোক ওদের প্রতিষ্ঠার আসন বিস্তৃত। মানুষের দাবী নিয়ে মানুষের মত চলার শক্তি ওদের মাঝে আসুক। তবেই আমার সাধনা সফল মনে করব। আমার চাওয়ার চাইতেও অনেক বেশী দিয়েছ মনে ক'রে তোমার কাছে চলে আসব। হে করুণাময়, তুমি আমার সহায় হও। সামর্থ্য দাও।

আবার লেগে গেলেন স্বামিজী কাজে। কর্ম্মের সমুদ্রটায় আর একবার মন্থন জাগাবার ব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ফেনিল-তরঙ্গে।

শিষ্যদের মনে জাগে ভয়। তাদের শঙ্কাকুল মনে সঞ্চারিত হয় আশঙ্কার কালো মেঘ। তাই হোল। শরীর আবার ভেঙ্গে পড়ল। শয্যা নিতে হোল স্বামিজীকে।

ডাক্তার স্যাণ্ডর্স এসে বলে গেল—

বলে গেল কিনা রোগ জটিল। নড়াচড়া করতে দেবেন না। বেশী কথা বলা নিষেধ। আর চিন্তা ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ অবসর নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

মহা বিপদে পড়লেন স্বামিজী।

এবারে আর শিষ্য ও সতীর্থরা ছাড়ছে না। বেশী কথা বলতে দেয় না। লোক এলে আগেভাগেই তাদের ব'লে ক'য়ে সরিয়ে দেয়। তেমন কোন কথা বার্ত্তা কেউ বলতে যায় না স্বামিজীর সঙ্গে। একরকম নিঃসঙ্গের অঙ্গনে যেন রুদ্ধ ক'রে রেখেছেন তারা বদ্ধ ঘরে স্বামিজীকে।

কিন্তু স্বামিজীর মন ভাবে—

ভাবে অভিমানে ও দুঃখে—তোমরা কেউ এলে না আমার কাছে? বেশ। যাও সব দূরে সরে যাও। একা থাকব আমি। থাকব আমার অন্তর দেবতার আন্তরিকতা লয়ে। তাই হোল।

সকালে সন্ধ্যায় একক সন্ন্যাসী বেদ পাঠ করেন।

যেন কোন অতীত যুগের ঋষিকল্প মূর্ত্তি এসে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তাঁর মাঝে। আনন্দের অমিয় সরসীতে ভেসে ভেসে দিন রাত কেটে যায়। দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকগুলো দিন।

শরীর একটু সুস্থ মনে হচ্ছে এখন।

কিন্তু তা বলে উঠতে দিচ্ছে না তাঁকে—

উঠতে দিচ্ছে না মঠবাসী।

ডিসেম্বর মাস। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হোল কলকাতায়। এলো সব বিশেষ বিশেষ লোকেরা। দেখা করতে গেল তারা স্বামিজীর সঙ্গে বেলুড়ে। বললেন তাদের কাছে স্বামিজী একটি বেদ বিদ্যালয়ের কথা। সকলেই সে প্রস্তাবে জানাল সম্মতি। তাদের দিকে তাকিয়ে—স্বামিজী নীরব দর্শকের মতো দুঃখের দহনে জ্বলে পুড়ে রুদ্ধ কক্ষে বসে থাকেন একা। কান্না করুণ নয়নে প্রত্যক্ষ করেন বাইরের কাজ। যেন প্রাণ ফেটে কান্না আসে। ইচ্ছে হয় ছুটে আসতে মাটিতে। রোগ ভোগের যন্ত্রণাকে ঝেরে ফেলে দিতে।

কিন্তু না। নিয়মকে ভঙ্গ ক'রে নয়। এই মর্ত্ত্যভূমির আইন কানুন বাঁচিয়ে যত দিন থাকা যায়। জীবভাবে বিচরণ করতে গিয়ে শিব নির্দ্দেশ যে তাঁকে মানতেই হবে।

কিন্তু মন তবু কাঁদে।

বারে বারে বলতে ইচ্ছে হয় যেন—

মৃত্যুর তোরণ দ্বারে জানি যেতে হবে
পৃথিবীর কান্না লয়ে ছেদ টেনে এ মর্ত্ত্য বৈভবে,
কিন্তু তবু হায়।
জীবনের উপান্ত বেলায়
আসক্তির রূঢ় রজ্জু বারে বারে টানে—
মনে হয় আশা, আলো জমা এইখানে।
এখানের বন ভালো, নদী ভালো, হয়ে যাই হারা—
ভালো লাগে চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশের তারা,
পাখীদের কুহু গান
বনানীর বন তান
তাও ভালো, তাও ভালো, ভালো মানুষেরা-
এখানের অন্ধকার তাও যেন সেরা।
জীবনের আয়ু ক্ষীণ, ভগ্ন দিন, সমাপ্তির যবনিকা নামে—
স্থবির রাত্রিরা এসে ভিড় করে ডাহিনে ও বামে;
সম্মুখে অপার শান্তি
নিয়ন্তার স্নিগ্ধ কান্তি
তবু মন নাহি চায় যেতে কভু প্রশান্ত প্রচ্ছায়,
দুঃখের দহন লয়ে প'ড়ে রব' ভুবনের এক কিনারায়।

স্বামিজীর মন যেন এই কথাটিই আজ বলতে চাইছে। বলতে চাইছে, ভুবনের আনন্দ আভাতির কথা। দুঃখ, দহন, ব্যথা ও আঘাত সইতে রাজি, তবু বিদায়ের আহ্বানকে যেন অভ্যর্থনা জানাতে চায় না মন। স্মরণ হয় স্বামিজীর কত কথা। মনের বাসর ঘরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় মুহূর্ত্তে। ছায়ার মত সঞ্চারিত হয় অতীত ঐতিহ্যের স্মরণীয় লগনগুলো। শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে আসে শির। ভালো লাগে পৃথিবী, মায়ার ছায়া সম্পাত হয় আবার। সেই পঞ্চবটীর কুঞ্জে পাখীদের গুঞ্জরণ। জাহ্নবীর নৃত্যছন্দ, দক্ষিণেশ্বর মন্দির। মাতৃমূর্ত্তি। আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্নেহের সমুদ্রে অবগাহন। কৃপালাভ। আরো, আরো, কত স্মৃতি এসে ভিড় করে মনের বিষণ্ণ গোধূলি বেলায়। তন্ময় চিত্ত আনন্দের সে আয়োজনকে ছেড়ে যেতে নারাজ।

যেন এখনো অনেক, অনেক বাকী আছে পরপারের পাড়ি ধরতে।

সত্যি যাওয়া আর হোল না এবারে।

শরীর দিন দিন সুস্থ হ'তে লাগল। এমন দিনে এক বিখ্যাত অভ্যাগত এলেন স্বামিজীর সাক্ষাৎ প্রার্থী হ'য়ে, এলেন বেলুড়ের তীর্থ দেখতে। কে সে?

জাপানের এক বিখ্যাত পণ্ডিত।

নাম?

ওকাকুরা।

এসেছেন তাঁরই সঙ্গে জাপানী বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ওডাও।

কেন?

দর্শন লোভন আকুতি জুড়াতে। এসেছেন শ্রীমুখের বাণী শুনতে।

একটি ধর্ম্মমহাসভার আয়োজনের সঙ্কল্প নিয়ে এসেছেন ওকাকুরা ও ওডা স্বামিজীর উজ্জ্বল উপস্থিতি কামনা করে।

ওডা বললেন স্বামিজীকে—"আপনার মত খ্যাতনামা ব্যক্তি যদি আমাদের এই কার্য্যে সহায় হন তা হ'লে, নিশ্চয়ই সফল হবে আমাদের উদ্দেশ্য। জাপানে এখন ধর্ম্মসংস্কার দরকার হ'য়ে উঠছে। আপনার ন্যায় শক্তিমান আচার্য্য ব্যতীত আর কার দ্বারা তা সুসম্পন্ন হবে?"

শুনলেন যেন স্বামিজী এ আহ্বানের মধ্যে প্রাচ্যের প্রাণপ্রবাহের খরতরঙ্গ। উত্থানের মন্ত্র ঘোষণায় যেন তাঁর অন্তরে এল মহামানবের আহ্বান সঙ্গীত।

আনন্দে অধীর হ'য়ে যান স্বামিজী। আগামী পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন বড় আশা ও আনন্দ নিয়ে। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আবার বললেন ওকাকুরা,

বললেন যন্ত্র বিজ্ঞানের দেশ জাপানীর আজ দরকার আধ্যাত্মিক চেতনা। দরকার সাংস্কৃতিক আদান প্রদান। মিলনের রাখীবন্ধন।

কথাগুলো যেন স্বামিজীর চিন্তা জগতে গিয়ে একটা স্পন্দন জাগাল। যে ভাবনা তাঁর চিত্তকে এত দিন আন্দোলিত করছিল, ওকাকুরা এসে তাতেই আবার যোগাল ইন্ধন। আবেগে আনন্দে বিহ্বল বিবেকানন্দ। এত দিন পরে যেন তারই উত্তর সাধক রূপে দেখতে পেলেন ওকাকুরা ও ওডাকে তাঁর সম্মুখে। বললেন স্বামিজী ম্যাক্লিয়ডকে,—"পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে আমরা দুটি ভাই যেন আবার মিলিত হ'য়েছি।"

কত আলাপ আলোচনা চলতে লাগল তাঁদের মধ্যে।

সেই বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ও তার সঙ্গে উপনিষদের যোগসূত্রগুলো উদ্‌ঘাটন করলেন স্বামিজী। তন্ময় মনে শুনছেন—

শুনছেন আর ভাবছেন—ওকাকুরা ও ওড, এ যেন এক বিশাল সমুদ্র। কোথায় অন্ত আর কোথায় শেষ? অনন্ত বিস্তৃতির মাঝে অশ্রান্ত প্রবাহে চলেছে সাম্য, সত্য ও মুক্তির গান গাইতে গাইতে।

মাঝে মাঝে ভ্রম হ'য়ে যায়। অভিভূতের মত তাকিয়ে থাকেন। আর মনে ভাবেন, একি হিন্দু সন্ন্যাসী না বৌদ্ধ শ্রমণ?

যা ভাব তাই। যে পথ ধ'রে খুশী হেঁটে যাও, দেখবে ঐ এক মূর্ত্তি। এক সত্য। যেমন জল, সিন্ধুতে তরঙ্গ-উদ্বেল। আকাশে মেঘের ওড়না। আবার বাতাসে কণা কণা। ফসলের মাঠ পায় সিঞ্চনের আনন্দ। মানুষ মেটায় তৃষ্ণা। তাইতো বলে, জলের আর একটি নাম প্রাণ। কিন্তু তরঙ্গ, ওড়না আর কণা মিলবে গিয়ে কোথায়? মিলবে সেই তপতীর্থের তাপসের পদ প্রান্তে। মহাদেবের শ্রীচরণে।

দ্বন্দ্ব কিসের? কেবল বাইরের পৃথিবীটায় শ্রেণী-সংগ্রাম। কিন্তু অখণ্ডের দেশে অনন্ত একতা।

বিবেকানন্দ যে সেই খণ্ডের সমন্বয়ী অখণ্ডের ঐক্যতান। তাই তো ভ্রম হয় বৌদ্ধ শ্রমণ, না হিন্দু সন্ন্যাসী বলে।

ওকাকুরা বললেন একদিন—

বললেন স্বামিজীকে, চলুন স্বামিজী বুদ্ধগয়ায়। সেখান থেকে না হয় কাশীধাম যাওয়া যাবে। সম্মতি জানালেন স্বামিজী। যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। বুঝি বিশ্বনাথ ডাক দিয়েছেন, ডাক দিয়েছেন তাঁর প্রিয় ভক্তকে আকুল কণ্ঠে। এ মহা আনন্দের আহ্বান। তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না।

সমস্ত মন মুহূর্ত্তে একটা গতিশীলতার আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। ডাঃ ওকাকুরাকে নিয়ে যাত্রা করলেন স্বামিজী—

যাত্রা করলেন বুদ্ধগয়ার দিকে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ জীবনের সর্ব্বশেষ ভ্রমণে বাংলার শ্যামল অমল কোল ছেড়ে যাত্রা করলেন—যাত্রা করলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

বুদ্ধগয়া—

জীবনের প্রথম প্রভাতে এসেছিলেন স্বামিজী বুদ্ধগয়ায়—এসেছিলেন নির্ব্বাণের মহাপথ জানতে। এসেছিলেন ব্যক্তি জীবনের মুক্তি মানসে। নিয়ে এসেছিলেন কি ?

নির্দ্দেশ।

কার ?

ঈশ্বরের।

কি সে নির্দ্দেশটি ?

যা, চলে যা।

কোথায় ?

সেই পাগল পুজারীর পদপ্রান্তে। জমা আছে তাঁর কাছে তোর মহামুক্তির সাধনাটি। জমা আছে তপ্ত-ক্লিষ্ট অন্তরের অমৃত ভাণ্ডটি।

ছুটে এসেছিলেন সেদিন। সেই দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্নিগ্ধ ছায়ায়।

সে দিনগুলো ছিল একান্ত আত্মমুক্তির বাসনা ব্যাকুল দিন। নিজের মুক্তি কামনার অধীর আকুলতার দিন। কিন্তু আজ--

আজ এলেন কেন স্বামিজী আবার সেই বোধিদ্রুমমূলে ? কেনই বা তন্ময় হ'য়ে ব'সে আছেন নয়ন মুদে ?

মানুষের ব্যথা মানুষের কথা মানুষেরই আঁখিজল
ক'রে দেবে নাকি তোমার হৃদয় বেদনায় চঞ্চল ?
কপট কুটিল হিংস্র ধারায়
কখন আসিবে তব ইশারায়
মহামুক্তির খর-তরঙ্গ রিক্তের বেদনায়—
তুমি কি দেখ না ঘনায়িত মেঘ ধরণীর সীমানায় ?
বঞ্চিত যারা, বঞ্চনা লয়ে ধুকে মরে পলে পলে—
মানুষের চির অধিকারটুকু কেড়ে নেয় যারা ছলে,

যাদের চোখের জল মুছিবার
ধরণীর কোলে কেহ নাহি আর
তোমার করুণা, তোমার আশিস তাও কি পাবে না তারা—
হবে কি তা হ'লে জীবের জনতা দুখের আঁধারে হারা?

আজিকার এ সাধনায় বুঝি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠছে—

মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে মানুষেরই জীবন দর্শনের পাতাগুলো।

তাতে একটি সুর। একটি ছন্দ। একটি কাব্যেরই ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নিয়ত। আজ আর আপন মুক্তির আকুল সাধনায় তন্ময় হ'য়ে ব'সে নেই কবি। খণ্ড-ক্ষিপ্ত বিশ্বে অখণ্ডের অভিমন্ত্রটি শুনতে চাইছেন স্বামিজী—

শুনতে চাইছেন অভয়ের আশ্বাস। চাইছেন মানুষের দুঃখ ব্যথার প্রতিকার। চাইছেন অন্যায় থেকে ন্যায়ের বিদ্রোহ। অসমতা থেকে সমতার বিপ্লব। অন্ধকার থেকে আলোর অভিযান। আর চাইছেন দুঃখ থেকে সুখের বজ্র বিক্ষোভ।

তাই বুঝি আবার বলছে তাঁর মন—

এসো এসো প্রভু নেমে এসো তুমি ধরণীর ক্রন্দনে—
এসো নেমে এসো মানুষের যত কর্ম্মের বন্ধনে।
অন্তরে হোক সুখ সঞ্চার
অবসান হোক দুখ ঝঞ্ঝার
অশিবে রুদ্র, শিবে সমুদ্র, শান্তির বারি ঢালো—
মানুষের দুখে মানুষের বুকে প্রজ্ঞার দীপ জ্বালো।

ধ্যান স্তিমিত নয়ন। এক মনে বসে। সাড়া নেই। শব্দ নেই। একটা নিঃসীমের রাজ্যে যেন অনন্ত মগ্নতায় তন্ময় স্বামিজী। কথা বলছেন যেন তার জীবন দেবতার সঙ্গে এক মনে।

কি বলছেন?

বলছেন ধরণীর দুঃখের সংবাদ। চাইছেন তার প্রতিকার। যারা অবহেলিত, উৎপীড়িত, দরিদ্র, দুঃখী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই এ মৌন সাধনা। নিখিলের ব্যথা দূর করবার এ একটা সযত্ন প্রয়াস। নীরব। নিঝুম চতুর্দ্দিক। কোথাও নেই কোন সাড়া।

কেবল দুজন মুখোমুখি। স্বামিজী আর তার জীবন দেবতা। বাতাস বইছে ধীরে। কোলাহল গেছে স্তব্ধ হ'য়ে। কেবল ইতিহাসের জাগর

প্রহরা। তাকিয়ে আছে যুগ সন্ধির স্মরণীয় মুহূর্ত্তটিকে ধারণ করবার মানসে। এমনি কেটে গেল বহুক্ষণ।

অবশেষে ধ্যান ভাঙ্গল। প্রফুল্ল বদনে তাকালেন আবার বাইরের পৃথিবীর দিকে। কি ভাবলেন তিনিই জানেন।

যাত্রা করলেন। জাপানী বন্ধুদের নিয়ে—যাত্রা করলেন বারাণসীর পথে।

বারাণসী।

হিন্দুর পবিত্রতম তীর্থ। বিশ্বনাথের মন্দির। মুমুক্ষু জনতার ভিড়। একে একে প্রত্যক্ষ করলেন সব।

আহ্বান করলেন উদাত্ত কণ্ঠে—

আহ্বান করলেন সেবা ধর্ম্মের দীক্ষায় দীক্ষিত করতে যুবকবৃন্দকে। এলো তারা। উদ্বুদ্ধ হোল স্বামিজীর অগ্নি উজ্জ্বল আদর্শে। ঝাঁপ দিল তারা কর্ম্মের সমুদ্রে। জীবন উৎসর্গ করল সম্বলহীন, পঙ্গু, রুগ্ন ও অসহায় তীর্থযাত্রীদের সেবায়।

ছোট্ট একটি বাড়ী। গঙ্গা থেকে কিছুটা দূরে।

স্বামিজীর নির্দ্দেশে ভাড়া নেওয়া হোল তাই। সেবকবৃন্দ দলে দলে নিয়ে আসতে লাগল সেখানে রুগ্ন, আর্ত্ত পীড়িতদের। চলল সেবা। শুশ্রূষার একটুও ত্রুটী নেই। বেশ দু'দিন তিনদিনের সেবা ও শ্রদ্ধায় ভালো হ'য়ে গেল তারা। সূত্রপাত হোল কাশীধামে নরের সেবা নারায়ণ জ্ঞানে।

বড় আনন্দ লাগে। বুক ফুলে ওঠে স্বামিজীর গর্ব্বে। যেন এতদিন পরে পেয়েছেন তিনি তাঁর মনের পরিব্যাপ্ত পরিধি। যারা বুঝে নিয়েছে স্বামিজীকে মনে প্রাণে। দীক্ষা নিয়েছে সেবা ধর্ম্মে। আর ভাবনা নেই। জীবনের সায়াহ্ন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছেন বিবেকানন্দ আগামী দিনের ছবি। আশায় আবেগে দুই চোখ ফেটে আসে কান্না। বিদীর্ণ আত্মাটির আকুল আহ্বান যেন ছড়িয়ে পড়ে আদিগন্তে। সন্ন্যাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যায়।

আনন্দে অধীর বিবেকানন্দ। বুঝি ঈশ্বর তাঁর নালিশের জবাব পাঠিয়েছেন। এত দিনের সাধনা তাই আজ কর্ম্মে ও বাস্তবতায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

হে ঈশ্বর, তোমার দয়া হ'লে আর কে রাখতে পারে? বজ্রের আসনে বসিয়ে অগ্নির মন্ত্র না দিয়ে দিলে সে সাধন যে যাবে ব্যর্থ হয়ে। যেমন রেখছ ধ'রে—তেমন আবার সরে যেও না নিঃসঙ্গের অঙ্গনে ফেলে। তোমার

করুণার কটাক্ষটুকুই আমাদের মহাসম্পদ। শুধু ঐ টুকু দিলেই হবে। ঐ টুকু পেলেই তিমির রাত্রে জ্বলে উঠবে স্বাতীর দীপমালা। রাত্রির বৃন্তে ফুটে উঠবে প্রভাতের প্রসূন।

বললেন কর্ম্মীদের—"তোমরা প্রকৃত পন্থা বুঝিয়াছ! আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা তোমাদের কল্যাণ করুক! সাহসের সহিত অগ্রসর হও। তোমরা দরিদ্র বলিয়া হতাশ হইও না, অর্থ আসিবে। তোদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা তোমাদের বর্ত্তমান প্রিয়তম কল্পনাগুলিকেও ছাড়াইয়া যাইবে।"

কর্ম্মীদের মন নৃত্য ক'রে উঠল ঝড়ের বেগে। জেলে দিল তারা উদ্দীপনের আলো। বিঘোষিত হোল দিকে দিকে মানব ধর্ম্মের মহিমময় বাণী। প্রতিষ্ঠিত হোল 'সেবাশ্রমের ভিত'। 'রামকৃষ্ণ মিশনের' আর একটি শাখা প্রসারিত হোল কাশীধামে।

অনেক ঝড় ব'য়ে গেল। বিঘ্নের সমুদ্রে বান ডেকে গেল বারে বারে। বাঁধা বিপদের বন্ধুর পথে তবুও নিঃশঙ্ক চিত্তে দুর্য্যোগের দুস্তর সমুদ্রে তারা পাড়ি ধরল। বিপন্ন রাত্রির যাত্রীরা দেখল প্রভাতের প্রসন্ন হাসি। সূর্য্যের দীপ্ত স্বাক্ষর। একটা আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সৌধ চূড়ায় উড্ডীন হয় ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনের গৈরিক-পতাকা। বেশ লাগে।

এখানে এসে স্বামিজীর শরীরও একটু ভালো হয়েছে। কাশীর জল বায়ু ভালো। দিন কাটছিল মহা আনন্দের মধ্যে।

এমনি দিনে পত্র এলো বেলুড় থেকে।

আর অপেক্ষা করা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব এসে গেছে। স্বামিজীকে যে সেখানে থাকতেই হবে।

তাই ফিরলেন কাশী থেকে। নিয়ে এলেন নশ্বর দেহটিকে শ্মশানের বহ্নি শিয়রে।

বেলুড়ে এসেই আবার শয্যা নিতে হোল স্বামিজীকে। দেখতে দেখতে শরীর ভেঙ্গে পড়ল। আবার যেন ঝড়ের গতিতে সমস্তটা দেহকে আক্রমণ করল কঠিন পীড়া। মঠবাসীর মনে নেমে এলো বিষাদের বিষণ্ণ গোধূলি।

উৎসব মুখর বেলুড় মঠ ;

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মদিন। অনেক লোকের ভিড়। মুমুক্ষু জনতার সে এক অবিচ্ছিন্ন মিছিল। আসছে তারা দল বেঁধে, আসছে পবিত্র তীর্থের রজরেণু কুড়োতে।

কিন্তু সন্ন্যাসীদের মনে তো আনন্দ নেই!

ম্লান মুখ। অশ্রু সজল নয়ন। শত কর্ম্মের উদ্দাম চাঞ্চল্য যেন অসহায় চীৎকার ক'রে লুটিয়ে পড়ছে জাহ্নবীর চরণপ্রান্তে। বিষণ্ণ সন্ধ্যার ম্লান মুহূর্ত্তগুলো এক এক ক'রে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। নিয়ত মনকে মন্থন ক'রে একটি সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে—স্বামিজীর অনুপস্থিতি! স্বামিজীর নীরবতা! তাই তো সমস্ত আনন্দোচ্ছলতার মাঝেও যেন নেমে এলো বিষাদের যবনিকা।

কত লোক আসছে। দেখা করতে চাইছে স্বামিজীর সঙ্গে। কিন্তু তাদের যেতে দিচ্ছে না সন্ন্যাসীরা স্বামিজীর কাছে। বলে দিচ্ছে, স্বামিজী অসুস্থ। কেবল কয়েকজন শিষ্য বসে আছে স্বামিজীর কাছে। বলছেন দু-একটি কথা। ছিল শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীও। উঁকি উঁকি চাইছে। আর গোপনে মুছে ফেলছে চোখের জল শরৎ। কেমন ক'রে বসে থাকে অমন বন্দী সিংহের পদপ্রান্তে? ওরে, এ যে অসহ্য যন্ত্রণা। বুক ফেটে যেতে চায়।

বুঝতে বাকী রইল না স্বামিজীর। বললেন তার প্রিয় শিশুকে—

"ওরে, কি ভাবছিস? শরীরটা জন্মেছে, আবার চলে যাবে। তোদের ভেতর ভাবগুলোর কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি তা হলেই জান্‌ব, দেহটা ধরা সার্থক হ'য়েছে।" শরৎচন্দ্র আর রইতে পাড়ল না স্থির। দু'টি চোখ চেপে ধ'রে কেঁদে ফেলল। যেন গঙ্গার সমস্তটা তরঙ্গ স্পন্দিত হয়ে উঠল তার অন্তরে।

এমনি সময় বোন নিবেদিতা এলো। সঙ্গে কয়েকজন ইংরেজ সঙ্গিনী। কিন্তু বারেক তাকিয়েই বিদায় নিল নিবেদিতা। দাঁড়াল না মুহূর্ত্ত।

কেমন ক'রে দাঁড়াবে?

বুঝি এ অসহায় দৃশ্য দেখতে হোলে বুক বেঁধে আসতে হয় পাষাণে। চোখ দু'টোকে শাসিয়ে দিতে হয় নির্ম্মম শাসনে। আর অন্তরের সমস্ত আবেগ

আকুলতাকে দিতে হয় নির্ব্বাসনের কারা দুর্গে। তা না হলে কেউ সুস্থির মন লয়ে স্তিমিত সূর্য্যের বিদায় অভিসার প্রত্যক্ষ করতে পারে না। পারবে না।

চলে গেল নিবেদিতা।

নিয়ম মত চলেছে ঔষধ সেবন! ঘড়ি ধ'রে দেয়া হচ্ছে ফলের রস আর পথ্য।

কিন্তু এমন আইনের দাসত্ব করতে আর চাইছে না স্বামিজীর মন। যেন বিদ্রোহীর আত্মাটি এমন স্থির নিশ্চিত ঠাঁই চাইছে না। আজন্ম কর্ম্মব্যস্ত স্বামিজী কেমন ক'রে রইবেন বন্দী কারার অন্তরালে ?

লোকেরা এসে যায় ব্যর্থ মনে ফিরে। দেখা করতে পারে না। শিষ্য ও অনুরাগীর দল দূর থেকে জেনে যায় অবস্থা। দর্শন করতে যায় না।

এমনি ক'রে আর কত দিন চলে ? বললেন তাই সতীর্থদের ডেকে স্বামিজী—"দেখ, এ দেহ রেখে আর কি হবে, পর-কল্যাণ সাধনে পাত হ'য়ে যাক। ঠাকুর অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা ভোগ ক'রেও জীবনের শেষ দিনেও পর-হিতায় উপদেশ দিয়েছেন। আমারও কি তাই করা উচিত নয় ?........."

কিন্তু তবুও বাইরের কেউ এলে ঐ এক কথা।

স্বামিজী অসুস্থ। দয়া ক'রে দেখা করতে চাইবেন না।

এ কথাগুলো স্বামিজী শুনলেন। এবারে আর রইলেন না নীরবে। প্রতিবাদ করলেন।

বললেন আবার—"....তৃণসম অকিঞ্চিৎকর, এ দেহ থাক আর যাক, আমি গ্রাহ্য করি না। সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে যে আমার কত আনন্দ হয়, তা তোমরা ভাবনায়ও আনতে পারবে না। আমার স্বদেশী ভাইদের আত্মার শক্তি জাগ্রত করতে সাহায্য করবার জন্যে বারে বারে জন্মগ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত নই।"

দে, তোরা আমাকে সবার সঙ্গে কথা বলতে দে। তাদের দেখে আমার প্রাণটা জুড়াক। মনটা একটু আনন্দ পাক।

বিদায়ের প্রাক্কালেও মানুষের জন্যে তাঁর কত অনুরাগ, কত মমতা বোধ।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসটি অবধি। যেন ঝড়ের ঝাপটার দুরন্ত গতিতে এ মাসগুলো এসে থমকে দাঁড়াল জুনের উষায়। নিয়ে এলো একটা হতাশার বাণী। কান্নার করুণ কাহিনী।—বুঝি আর রাখা গেল না। সত্যি বুঝি তাই হয়।

এবারে সম্পূর্ণ শয্যা নিতে হোল স্বামিজীকে। আর মন নেই কোন কাজে। কেউ এসে কিছু জিজ্ঞেস করলে তাকে মুখ ক'রে ওঠেন। বলেন বিরক্তির কণ্ঠে—আমায় আর জ্বালাসনে। যা ভালো লাগে তাই করগে যা।

অবাক লাগে। বিস্ময় নিয়ে ফিরে আসে জিজ্ঞাসু। মনে ভাবে, এ কিসের আভাস ?

তবে কি সত্যিই এলো—

এলো কি তবে নীল নির্ম্মল আকাশখানা জুড়ে, একখানা শ্রাবণের কালো মেঘ ভেসে ? আচম্‌কা বুকের ভেতরটায় একটা মন্থন জাগে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন নীরব হয়ে এসে দাঁড়িয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে। আবার অমঙ্গল ভাবনাকে ঝেঁটিয়ে দেয় মন থেকে। সহসা চিত্ত চঞ্চলতাকে স্থির বুদ্ধির বিচারের দরবারে দেয় দাঁড় করিয়ে। কিন্তু তবু মন গুমরে ওঠে। বারে বারে যেন বিষণ্ণ মুহূর্ত্তগুলো উঁকি মারে মনের এ-কোণে ও-কোণে।

তবে কি নেতা বিবেকানন্দ নিতে চাইছেন অবসর ? গুরু, গুটিয়ে বসতে চাইছেন হাত ? একি ত্যাগের তীব্র তিতিক্ষা নয় ? নয় কি পৃথিবীর মায়ার আবরণে আড়ালের গুণ্ঠন টেনে দেয়ার প্রয়াস ?

গুরুভাইদের মন গেল ভেঙ্গে। স্বামিজীর তীব্র ধ্যানাকাঙ্ক্ষা তাদের মনে সঞ্চার করল একটা দুর্য্যোগের সন্ধ্যার। দেখল যেন দুঃখের আঁধার রাত্রি-গুলোর মিছিলের আয়োজন। শিহরণ জাগে মনে। আতঙ্কে ওঠে। চোখ ফেটে নেমে আসে স্বচ্ছ জলের ধারা।

সহসা মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—"ওরে, নরেন যেদিন নিজেকে চিনতে পারবে, সেদিন আর দেহ থাকবে না।"

তবে আজ কি সেই পরিচয়ের পালা ?

এমন কত কথার তারা জ্বলে উঠতে লাগল অন্তরে। সংশয়ে কাঁদে মন। প্রাণ ঢেলে সেবা ক'রে যায় সবাই। যেন একটুও না ত্রুটী হয়। একটুও না নিয়মের বিঘ্ন ঘটে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

একজন গুরুভাইর সঙ্গে বলছেন কথা স্বামিজী।

বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ। কত আলোচনা। বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সতীর্থ—"আচ্ছা স্বামিজী! আপনি কে, তাকি বুঝতে পেরেছেন ?"

বললেন—"হ্যাঁ এখন আমি বুঝেছি।"

আর কোন কথা বললেন না স্বামিজী। জিজ্ঞেস করবারও সাহস পেল না সতীর্থ। কথাবার্ত্তার তো বিরাম নেই। কখনো বলছেন হাসির কথা। কখনো বা আবার কৌতুক ক'রে যাচ্ছেন সমানে। কাউকে যেন বুঝতে দিতে চাইছেন না স্বামিজী—বুঝতে দিতে চাইছেন না তাঁর বিদায়ের লগনটী।

কিন্তু দিন তো ঘনিয়ে এসেছে। নেমে আসছে ধীরে ধীরে সাতটি তারার স্বর্গ-ভূলোকে। আসছে বরণের মালা আর স্মরণের শঙ্খ বাজিয়ে।

তাই তো বললেন স্বামিজী শুদ্ধানন্দকে আনতে একখানা পঞ্জিকা।

পঞ্জিকা এনে দিল শুদ্ধানন্দ।

দেখতে লাগলেন। কত মনোযোগ। কত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার। যেন সেই মহাসমাধির মহাদিনটির নিশ্চিত লগনটির জন্মে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন স্বামিজী। কিন্তু সিদ্ধান্তে পোঁছতে পারছেন না। আবার খুলে বসলেন। আবার দেখতে লাগলেন।

হে ঈশ্বর, এবার আসতে দাও তোমার পদপ্রান্তে। আর ধ'রে রেখো না বিশ্বের অঙ্গনে। যে মুক্তির মোহন মুহূর্ত্তটি মানুষকে দেয় মহাজিজ্ঞাসার জবাব, আমাকে সেই মুক্তি দাও আজ। হৃদয়ের বুভুক্ষা নিয়ে আর চাই না কর্ম্মের সমুদ্রে হাল ধরতে। এবার কোটি সাথী ছেড়ে একজন বন্ধু চাই। চাই একটি সুখকর শ্রান্তিহীন কোল। তা আর কোথায় পাব? কেবল তোমার অভিসার, তোমার সন্ধানের মাঝেই তা লুক্কায়িত রয়েছে। তুমি আমাকে আসতে দাও। জাগ্রত ক'রে দাও মহামনের।

দেখছেন তো দেখছেনই পঞ্জিকা। দেখছেন সেই বিদায় বসন্তের মধুর মুহূর্ত্তটি।

ঠিক এমনি পঞ্জিকা পাঠ করতে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণও—বলেছিলেন দেহত্যাগের কয়েকটা দিন পূর্ব্বে। কিন্তু সেদিন সবাই বুঝতে পেরেছিল ঠাকুরের বিদায়ের আয়োজন। বুঝতে পেরেছিল সে নির্ধারিত বিদীর্ণ দিনটির কথা।

কিন্তু আজ?

কারুর খেয়াল হোল না। বুঝল না কেউ স্বামিজীর অভিসার-আয়োজন। বুঝল না কেউ মহামুক্তির সাজ-শয্যা।

যত দিন ঘনিয়ে আসছে ততই যেন স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল দেখাচ্ছে স্বামিজীকে।

মনে হচ্ছে যেন শরীর অনেক ভালো হয়েছে। আর বিপদের শঙ্কা নেই।

কেন এমন হবে না?

বধূ চলেছে অভিসারে। দেহের লাবণ্য, বাইরের সাজ, সব কিছুকে যদি না দর্শন লোভন করে তোলে, তবে কি বর গ্রহণ করবে তাকে? অন্তরে অনন্ত সৌন্দর্য্যের পিপাসা। তারই সুখ অঙ্কে এলিয়ে পড়বে সমর্পণের আনন্দে। শুদ্ধির শুচি-শর্ব্বরীতে মিলনের মধুক্ষণে আলাপন করবে দু'জনে। পরিয়ে দেবে ফুলের মালা। শুনাবে সঙ্গীত। বলবে, আমাকে গ্রহণ কর। জড়িয়ে ধরবে বর তার বাহুতে। ললাটে দিবে চুম্বন।

তাই রোগ জীর্ণ দেহে এসেছে রূপের জৌলুস। বাইরের আলাপনে সুস্থতারই সাবলিল ছন্দ। কিন্তু মন বলে কি?

মন বলে, ওগো, সে লগনটী কখন আসবে? কখন তোমার পদপাত হবে আমার অন্তরের দুয়ারে?

তাই তো বুঝি পঞ্জিকা দেখছেন। আর মনে ভাবছেন—এই দিন! না, না আজ নয়। আসবেন তিনি, আসবেন তাঁর সময় হ'লে।

বিরহের অনল জ্বলে বুকে। আর তো যেন সময় সয় না। আর রাখতে পারছেন না স্বামিজী নিজেকে ধরে। মিলনের ব্যাকুল বাসনায় আকুল মনে যেন বলছেন—

নিশি ভোরে তব করুণ পরশ খানি
দিয়েও দিলে না গভীর আঁধার মাঝে—
চকিতে চপল ছলনার হাসি আনি
আমাকে আবার বাঁধিলে লক্ষ কাজে?
এই হাসি তুমি, এই ঘোর-ঘন-অমা—
এই প্রীতি তুমি, সাগর-স্নিগ্ধ-ক্ষমা।
আমি উতরোল দুবাহু বাড়িয়ে বলেছিনু আসি—আসি,
ক্ষণ সমীরণ সম সরে গেলে রেখে এতটুকু হাসি!
কি খেলা বুঝি না কি কথা বলিতে চাও—
কত ব্যথা দিয়ে রচিব তোমার ঠাঁই?
বন্ধ্যা এ মন-মরুতে বহ্নি দাও,
তবুও তোমার দেখা যেন প্রভু পাই।

এখনো রচিত হয়নি তাঁর ফুলশয্যা। বাসর ঘরের উন্মুক্ত হয়নি দ্বার। কিন্তু বধু যে তার নিরুদ্ধ অন্তরে আর সইতে পারছে না এ প্রেমের বিরহ-জ্বালা। যেন মরুভূমিতে কে ধরিয়ে দিয়েছে আগুন। উন্মত্ত মন কেবল বারে বারে তাঁকেই খুঁজছে। তারই চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়ে থাকতে চাইছে নীরবে নিভৃতে এককোণে একেলা।

বিদায়ের বাকী আর মাত্র তিনটি দিন।

কিন্তু এমন ভাবতো লক্ষ্যিত হচ্ছে না বাইরে। বেশ খুশীর মন। কথা বলছেন। হাসছেন। আবার বেড়াতে বেরিয়েছেন মঠ-প্রাঙ্গণে। সঙ্গে রয়েছে সতীর্থ আর ভক্ত শিষ্যরা।

গঙ্গার কূল ধরে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। আর চাইছেন এদিক সেদিক। কি ভাবছেন? কি দেখছেন? শিষ্যেরা ভাবল।

এমনি সময় বললেন স্বামিজী—

বললেন একখণ্ড শ্যামল সবুজ মাটিকে নির্দ্দেশ করে—

কি?

"আমার দেহান্ত হোলে ঐখানে অগ্নি-সৎকার ক'রো।"

এ তুমি কি কথা শুনালে? কোন মন্ত্রে স্তব্ধ করে দিলে মুখর দিনের আনন্দকে। চঞ্চলা জাহ্নবী যেন সহসা গেল স্তব্ধ হ'য়ে। দেখে নিল স্থানটি। বাতাসের বেগ গেল মন্থর হ'য়ে। একবার লুটিয়ে পড়ল সেই পবিত্র স্থানটিতে। পাখীদের কণ্ঠে যেন কি একটা আহত বেদনার সঙ্গীত উঠল ধ্বনিত হয়ে। চুপ হয়ে গেল ক্ষণকাল। সতীর্থ আর ভক্তদের শিরে হোল বজ্রপাত। রইল তারা ঠায় দাঁড়িয়ে।

কি কথা আর বলবে?

নীরব হয়ে গেছে কণ্ঠ। থেমে গেছে আলাপনের ছন্দ। কেবল অলক্ষ্যে নয়ন সিক্ত হয়ে গেল জলে। আর আত্মায় জাগল একটা বিধুর জিজ্ঞাসা—তবে কি সত্যি তুমি চললে?

গেল দিন। এলো রাত।

হোল ভোর। ডাকে কাক।

আজ একাদশী। উপোস করবেন স্বামিজী।

কেবল কি উপোসই শুধু?

না

তবে ?

সেবা করবেন শিষ্যদের। পরিবেশন করবেন ব্যঞ্জন নিজ হাতে।

সম্মত না হয়ে আর উপায় কি ?

জানাল সম্মতি সবাই।

বলি, এ আবার কেমন ভাব ? কিসের সঙ্কেত ?

কেন, প্রেম যে সমদর্শী। সেখানে তো ভেদের ভাবনা থাকে না। তুমি আর আমি, কোথায় তফাৎ ? কেবল বাইরে দ্বন্দ্ব, কিন্তু যখন ভক্তকে ভগবানের একান্ত ক'রে পেতে হয়, যখন ভক্তের প্রেম খেলায় প্রেমময়কে নেমে আসতে হয়—তখন তো আর অহং জ্ঞান থাকে না। থাকে না বড় ছোটর ভেদ। এক অঙ্গনে ধুলার খেলা খেলতে হলে যে ধুলি মাখতে হবে তারো গায়। ধরতে হবে ভক্তের চরণকেও জড়িয়ে। তা না হলে তো প্রেমের খেলা জমবে না।

তাই তো ভক্তের কণ্ঠেও আমরা শুনতে পেয়েছি এমন উক্তি—

"আমার অঙ্গে তোমার বিলাস
তাই ধরতে হয় আমারও পায়।
আমার একলা দায় নহে গো
রয়েছে তোমারও দায়।"

এমন সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে বাউল ভক্তদের কণ্ঠে। এক আত্মা এক প্রাণ হ'য়ে যখন মিলন হয় তখনই রস সম্ভোগের আনন্দ।

স্বামিজী বুঝি এই রস সম্ভোগের আয়োজনেই ব্যস্ত।

খাওয়া হ'য়ে গেল ভক্তদের। জল ঢেলে দিলেন হাতে স্বামিজী। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন হাত। কিন্তু শিষ্যের মনে যে সঙ্কোচের শিহরণ। বলল—"একি করছেন স্বামিজী ?......আমি আপনার সেবক, আপনার সেবা গ্রহণ করি কেমন করে।"

মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন স্বামিজী,—"যীশুখৃষ্ট কি তাঁর শিষ্যদের পা ধু'য়ে দেন নি ?

সহসা বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠল। পায়ের নীচ থেকে সরে যেতে চাইল যেন বসুধা ধরিত্রী। সমস্ত বিশ্বময় যেন নেমে এলো আঁধারের যবনিকা। ঘনিয়ে এলো শিষ্যের নয়নে ঘোর।

বলতে ইচ্ছে হোল তার স্বামিজীকে—"কিন্তু সে যে শেষ দিন!"

কিন্তু বলা আর হোল না। রুদ্ধ হয়ে এলো কণ্ঠ। নীরবে গ্রহণ করল গুরুর সেবা শিষ্য।

কিন্তু অন্তরে যেন আভাসিত হোল সেই বিদায় বিধুর দিনটির মৌন মুহূর্ত্তটি। এলো অবস হয়ে দেহ। সমস্ত কর্ম্ম কোলাহলকে ছাপিয়ে—জেগে উঠল কেবল একটি কথা, একটি সুর।

সে সুর কান্নার। সে কথা বিলাপের।

রাতটা কেটে গেল মহা দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে।

ঘুম এলো না কারো চোখে। সজাগ রাত্রির সঙ্গে সতীর্থ আর শিষ্যেরাও রইল সজাগ। এক, দুই, তিন ক'রে বেজে গেল ঘণ্টাগুলো ঘড়িতে।

প্রভাত হোল। ৪ঠা জুলাই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

ঝিমু ঝিমু ভাব। অবসন্ন দেহ। ক্লান্ত লাগে শরীর। মন কাঁদে কি যেন একটা আশঙ্কা লয়ে। কিন্তু ওদের অমন ভাব কেন?

স্বামিজী তো বেশ উঠে বসলেন শয্যায়। প্রক্ষালন করলেন মুখ।

কিন্তু হ্যাঁ, গেলেন না তিনি সবার সঙ্গে সাধনাগারে। গল্প জুড়ে দিলেন অতীতের ইতিবৃত্ত নিয়ে। সে কত কথা। কত কাব্য। কত না ছন্দ!

সেই অতীতের মায়ামুগ্ধ দিনের বুকে ত্যাগের কিরণ সম্পাত। তারপরে প্রবল তন্‌হায় মন ছুটে চলল ঈশ্বর সন্ধানে। বহু পথ, বহু সীমা হোল পরিক্রমণ। কিন্তু কেউ তো দিতে পারলে না তাঁর ঠিকানা! অবশেষে পাগল পুজারী দক্ষিণেশ্বরের কালীঘরের বামুন দিয়ে দিলে হদিস্‌। জীবন দেবতার সন্ধান মিলল।

দুঃখ-দৈন্যের সংসারটার আর্ত্ত চীৎকার। অভাব অনটনের বিষণ্ণ দিন। আবার তারপরে আত্মীয় স্বজনদের দুর্ব্ব্যবহার এসে অতিষ্ঠ করে তুলল জীবন। চাইল গিয়ে দৈন্যোত্তরণে সভাবের দিনগুলো।

সুরু হোল জীবনের জয়-যাত্রা।

তারপর? তারপর?

কৃপালাভ পাগল পুজারীর। দর্শন হোল চিন্ময় তনু মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে।

কামনার সমুদ্রটা উঠল গর্জ্জন করে। একটি ভিক্ষা করল আকুল প্রার্থনায় "চাই নির্ব্বিকল্প সাধনা।"

সে দিনগুলো এসে ছায়ার মত আভাসিত হোল আজ। মনে পড়ে গেল আরো কত কথা।

কিন্তু নির্ব্বিকল্প সাধন দিতে ঠাকুর হলেন নারাজ।

কে শোনে কার কথা। কাঁদোন ধোয়া কণ্ঠে আবার জানাল মিনতি কাতর আবেদন। মনে মনে বলতে লাগল যেন একান্ত গোপনে—

অন্তিম আকুতি কণ্ঠে, কতবার হ'য়ে গেল ডাকা—
বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত হোল আত্ম সমাপন,
স্মৃতির সমুদ্র তবু রয়ে গেল কুয়াশায় ঢাকা—
স্তিমিত জীবন দীপ কামনার তবুও ক্রন্দন!
ধূসরিত প্রান্ত পথে অতীতের ইতিবৃত্ত হায়!
নতুনের বাণী লাগি তাই আছি কান পেতে আমি,
নতুন বধূর মত ভাষাহীন রজনী পোহায়—
তবুও তোমার কণ্ঠে কথা নেই—রাত্রি আসে নামি!

এমনি সময় অবার জিজ্ঞেস করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

জিজ্ঞেস করেছিলেন—"তুই কি চাস নরেন?"

নির্ব্বাক নরেন। শুধু আছে তাকিয়ে। চোখের পার গড়িয়ে পড়ছে জল। কাঁপছে থেকে থেকে অধরপুট। কিন্তু তবুও নির্ব্বাক। মান করেছে নরেন। মান করেছে তার আকাঙ্ক্ষিত সাধনাটি না পেয়ে। কিন্তু মন যে বিলাপ করছে। বলছে যেন আবেদনের স্বরে,—

দুঃখের মঞ্জুষা লয়ে তব দ্বারে ব্যর্থ বিচরণে
ফিরে যাব অবশেষে জীবনের উপান্ত বেলায়?
এবার না হয় হোক শেষ লেখা তোমার স্মরণে
একবার পেতে দাও স্বাদ, গন্ধ তোমার খেলায়।

শুয়ে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উঠে বসলেন। আবার শুধালেন—"বল, তুই কি চাস—নরেন?"

"নির্ব্বিকল্প সমাধি·········।"

পারলেন না আর ঠাকুর ধ'রে রাখতে নিজেকে। এলো চোখ ফেটে কান্না। এবং সেই আকুল সুর ঠাকুরের নরম মনকে ফেলল আচ্ছন্ন করে।

অবশেষে?

শিখিয়ে দিলেন নির্ব্বিকল্প সাধনার মন্ত্রটি।

কিন্তু ছুটে গেলেন মায়ের মন্দিরে। বললেন কেঁদে কেঁদে—"নরেনের অদ্বৈত অনুভূতি তোর মায়ার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখ মা। ওকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

নামিয়ে দিলেন নরেনকে কর্ম্মের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে।

কত ঝড় ব'য়ে গেল। কত রাত্রি প্রভাত হোল। কত পথ কত নদী কত গিরি ও মরু পেল তাঁদের জীবনের ছন্দ। চলার গতি। তামসিকতার অন্ধকার হোল অপসৃত। ভাঙ্গার আনন্দে নৃত্যছন্দা নদী গেল থেমে। প্রবাহ তার রইল শান্তির স্নিগ্ধ শীতল ধারা ল'য়ে।

আত্ম বিস্মৃত জাতির বুকে এলো জীবনের সংবাদ। তারা বাঁচল। জাগল। ঘুম তাদের ভাঙ্গল।

তবে আজ কি সেই সব দিনগুলো এসে মিছিল করে দাঁড়িয়েছে মনের ক্রান্তিবৃত্তে?

বুঝি তাই।

সহসা কি যেন ভাবলেন স্বামিজী।

তার পরে আবার বলতে লাগলেন সতীর্থ ও শিষ্যদের—

বলতে লাগলেন শ্রীশ্রীকালীপুজার কথা।

রাত পোহালে শনিবার। অমাবস্যা। তা কালীপুজার পক্ষে তো প্রশস্ত দিনই বটে। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দ পুজার আয়োজনে লেগে গেল।

স্বামিজী ঢুকলেন গিয়ে মঠের ঠাকুর ঘরে।

কিন্তু একি!

অবাক বিস্ময়ে তাকাল সবাই ঠাকুর ঘরের পানে।

কেন?

সমস্ত দোর দিয়েছেন বন্ধ করে স্বামিজী। জানালায়ও এতটুকু ফাঁক নেই।

বলি, এমন তো কোনদিন হয় না! একটু ভাবনায় পড়ল গুরুভাই ও শিষ্যেরা। কেটে যায় এক ঘণ্টা।

না। কোন সাড়া নেই তো!

দু'ঘণ্টা।

একই ভাব।

তিন ঘণ্টাও গেল।

এবারে বের হোলেন স্বামিজী—

বের হোলেন একটি শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে। যেন কত আনন্দ! প্রফুল্ল মুখ। নয়ন দু'টি যেন কি এক অবাচ্য অনুভূতি লাভে উজ্জ্বল। চলায় বলায় অপুর্ব্ব ভাব-তরঙ্গের আভাস।

এক একখানা ক'রে সোপান বেয়ে বেয়ে নামলেন।

কণ্ঠে কিন্তু তখনো অস্ফুট সঙ্গীতের সুর। গাইছেন আর হাঁটছেন মঠের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—"মন চল নিজ নিকেতনে।"

প্রত্যক্ষ করতে লাগল সবাই স্বামিজীর হাব ভাব।

ভাবল তারা—এ যে অনেক, অনেক প্রভেদ।

তবে কি! তবে কি এ পথ নির্ব্বাণের?

না, না। মনকে আবার সংযত করে সতীর্থ ও শিষ্যেরা। অনুসরণ করতে থাকে স্বামিজীকে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে তারা মঠ প্রাঙ্গণে।

সহসা প্রেমানন্দজী চম্‌কে ওঠে। আরো এগিয়ে যায় স্বামিজীর কাছে। কান দিয়ে শোনে।

কি?

আপন মনে চুপি চুপি বলছেন স্বামিজী—

বলছেন—"যদি থাকত এখন আর একজন বিবেকানন্দ, তবে বুঝত বিবেকানন্দ কি করেছে!! কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করবে।"

প্রেমানন্দজীর বুকের ভেতরটা যেন সহসা শূন্য হয়ে গেল। অবাক লাগল তার। ভাবল, এমন কথা বলবার লোক তো স্বামিজী নন। তবে, একি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত আত্মার উক্তি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই হোল সেই রূপ। সেই অদ্বৈত অনুভূতির পূর্ণ প্রকাশ। প্রেমঘন তনুর প্রশান্ত স্ফুরণ। মায়ার আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন মা। নেই আর মায়ার ছায়া গুণ্ঠন।

সর্পিল দিনগুলো পেয়েছে নিশ্চিত উন্মুক্তির দিগন্ত। আকাশ হয়েছে নির্ম্মল। নেই মেঘের কণাটিও নভে। এবারে আর ভাবনা নেই। ডানা মেলে দিলেই নিত্য শুদ্ধ পবিত্র দিব্য ধাম। কেবল আয়োজনের অপেক্ষা। যাত্রার শুভ লগনটির প্রতিক্ষা। তাই বুঝি অমন সব কথা বলছেন স্বামিজী। কথা বলছেন চুপি চুপি ধীরে ধীরে। কিন্তু এ কথাগুলো কি নেতা বিবেকানন্দের?

না।

তবে?

এ হোল যোগী বিবেকানন্দের যোগসিদ্ধ বাণী। কবি বিবেকানন্দের কাব্য মধুর ছন্দ। আর আত্মস্থ বিবেকানন্দের আত্মার উক্তি।

সাধক যখন যোগমার্গে আরূঢ় হ'য়ে যান। মিলন ঘটে যখন প্রেমময়ের সঙ্গে নিবিড় গভীরভাবে, তখন লুপ্ত হ'য়ে যায় তাঁর আমিত্ব। সেখানে আভাস প্রকাশ ঘটে সেই সত্য সুন্দরের। দোঁহে মিলে এক অখণ্ড সত্তায় রূপময় হয়ে ওঠে তখন প্রেমিক। প্রেমময় তার সমস্তটুকু অহং এর বোঝা সরিয়ে দিয়ে চেপে বসেন, চেপে বসেন সম্রাটের সাজে মনের মন্দিরে। সিংহাসন জুড়ে। সাধক তখন তার সুন্দরের তার পরম ঈপ্সিতের রস সম্ভোগে যায় নির্ব্বাক হয়ে। কেবল যা বলান তাই বলেন সাধক। যে সঙ্গীতটি গাইতে বলেন, কেবল শুধু তাই ওঠে ধ্বনিত হয়ে। যে কাব্যের মালঞ্চ পরতে চান, সাধক শুধু সেই কুসুমের মালাকার সেজে বসেন।

স্বামিজীর হয়েছে তাই। সেজেছেন তিনি নববেশে। মিলেছেন তাঁর বরের সঙ্গে। তাইতো বর যা বলাচ্ছেন, তাই বলছেন স্বামিজী।

এমনি কেটে গেল অনেকটা সময়।

ঘণ্টা বাজল—খাবারের ঘণ্টা।

সন্ন্যাসীরা গিয়ে বসল। বসলেন গিয়ে স্বামিজীও তাদের সঙ্গে।

নিয়মের ব্যতিক্রম হোল এখানেও।

শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে তো এক সঙ্গে আহার স্বামিজী করতেন না।

আজ যেন তাই স্বামিজীকে সন্ন্যাসীরা পেয়ে পরম খুশী। আনন্দের সঙ্গে আহার করতে লাগল সবাই। আর ভাবতে লাগল– এর কারণ কি ?

স্বামিজী তাদের আস্বস্ত করলেন—

আস্বস্ত করলেন তার শরীর অনেক ভালো লাগছে আজ এই বলে।

আহার হ'লে গেল।

ডাকলেন ব্রহ্মচারিবৃন্দকে—

ডাকলেন সংস্কৃত ক্লাসে।

সবাই তো অবাক। বলাবলি করছে—আরে কি হোল রে। এমন তো শীঘ্রও দেখিনি স্বামিজীকে ! তিনটা না বাজতে তো এমন করে কোন দিন ডাকেন নি তিনি !

কিন্তু তবুও তাদের স্মরণে এলো না স্বামিজীর ভবিষ্যৎ বাণীটি—" আমি চল্লিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচব না।" যেন বিস্মরণের আবরণে গুণ্ঠিত হয়েছে তাদের স্মৃতির গ্রন্থ। একটু ভাবনার চোখে তারা তাকিয়ে রইল ৩৯ বছরের

প্রেমঘন মূর্ত্তিটির দিকে। একটু অবাক লাগল তাদের, বিস্ময় জাগল মনে। কিন্তু শুধালো না কিছু।

বেলা পড়ে এলো। সূর্য্য হেলেছে পশ্চিমে। গঙ্গার জলে পড়েছে তার বিদায়ী চোখের বিধুর দৃষ্টি। আরক্ত হয়েছে জাহ্নবী, যেন চঞ্চল ছন্দে এসেছে ধীর লগনটি নেমে। আলতু হাওয়া মাঝে মাঝে সজাগ করে দিচ্ছে বিরহী কন্যা জাহ্নবীকে। আবার একটু চলে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যায় ম্লান হয়ে। স্মরণের নেপথ্যে এসে দাঁড়ায় যেন একখানা বিষাদের শিলালিপি।

এমনি সময় প্রেমানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে মঠের বহিঃপ্রাঙ্গণে বেড়াতে বের হোলেন স্বামিজী। বেলুড় রোড ধ'রে হাঁটলেন, সে প্রায় মাইল দু'য়েক হবে।

কত কথা বললেন। জিজ্ঞেস করল প্রেমানন্দজী বেদ বিদ্যালয়ের কথা।

অনেকগুলো উপদেশ দিলেন স্বামিজী সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে। ব্যক্ত করলেন মনের একান্ত অভিলাষের কথাটি। বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার প্রসঙ্গে বললেন স্বামিজী, "অন্ততঃ এতে অনেক কুসংস্কার বিনষ্ট করবে।"

রাত নেমে এলো।

ফিরলেন স্বামিজী মঠে।

সমাগত হয়েছে সন্ধ্যারতির পবিত্র মুহূর্ত্তটি। ব্রহ্মচারিবৃন্দ এক এক করে স্বামিজীর পদধূলি গ্রহণ ক'রে ঠাকুর ঘরে ঢুকল।

স্বামিজী চলে এলেন তাঁর নিজের ঘরে। দ্বিতলে।

সঙ্গে ছিল একজন ব্রহ্মচারী। বললেন স্বামিজী তাকে সমস্ত দরজা, জানালা খুলে দিতে।

আজ্ঞা পালন করল অনুরাগী সেবক।

ধীরে ধীরে স্বামিজী এগিয়ে এলেন জানালার কাছে। তাকালেন বাইরের পৃথিবীটার দিকে। তাকালেন দক্ষিণেশ্বরের তীর্থ চূড়ার দিকে!

নিঃসীম অন্ধকার। কেবল আকাশে নক্ষত্রের নিষ্প্রভ দ্যুতি। গঙ্গার বুকে আত্মবিদারণ আর্ত্ত চীৎকার। স্তব্ধ আকাশ। নেই একটি নিশা পাখীরও পক্ষ ঝাঁপটের শব্দ। বাতাসে যেন কিসের একটা উদাস ভাব, বনমর্ম্মরিতে যেন তারই কান্নার সুর।

দূরে বহু দূরে কারখানার চিমনি। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে যন্ত্রদানবের অগ্নি দীপ্ত মূর্ত্তি। আর গঙ্গার বুকে ভিন্‌দেশী মাঝিদের সতর্ক হালের ক্ষীণ শব্দ একটু আধটু ভেসে আসছে মাঝে মাঝে কানে। কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই আর স্বামিজীর। এতক্ষণে তিনি ডুবে গেছেন গভীরে। আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ।

কি দেখছেন তিনি ?

আর কি বা ভাবছেন ?

দেখছেন, বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে পৃথিবীর মোহন মূর্ত্তিটি।

আর ভাবছেন, ভাবী ভারতবর্ষের রূপ। ভাবছেন তাঁর জীবনের প্রথম দিনটি থেকে বিদায়ের শেষ সন্ধ্যার কথা।

এই ঘনায়মান অন্ধকারে তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে রূপময় হয়ে উঠেছে সেই সব দিনগুলো—যে দিনগুলো ছিল একান্ত আপনার—একান্ত প্রিয়।

ভয়কে জয় করবার দিন। বাসনাকে ত্যাগের আগুনে আহুতি দেবার দিন, সন্দিগ্ধমনকে সত্যের আলোতে প্রত্যক্ষ করবার দিন। সেই সব দিনগুলোকে আজ আর একবার দেখে যাচ্ছেন স্বামিজী। দেখে যাচ্ছেন তাঁর আত্মার স্পর্শে। মনের আরশি। সহসা ফিরে এলো জ্ঞান।

বললেন ব্রহ্মচারীকে বাইরে গিয়ে জপ করতে।

এ আদেশের অন্তরালে যে কি বিরাট রহস্য রয়েছে লুকানো তা বুঝল না ব্রহ্মচারী। আদেশ পালন করল মাত্র।

মহাযোগী মহাধ্যানে যোগারূঢ় হলেন।

হস্তে জপ মালা। নয়নে দিব্য কান্তি। ললাটে সূর্য্যলেখা। আর অন্তরে ?

অন্তরে মন্থর সঙ্গীত।

তোমার সৃষ্টির মাঝে কত কাজে
বেলা বয়ে গেছে। রাত্রিরা এসেছে কতবার
ত্রাসের সমুদ্র ল'য়ে কতনা বিচিত্র সাজে
দিবসের বুকে ফেলে ছায়া। বারম্বার
আমি তার সমুদ্ধত ছলনায় হেনেছি আঘাত।
এনেছি কাড়িয়া, মৃত্যুরে করিয়া অবহেলা
রাত্রির জঠর থেকে পূর্ণতার প্রসন্ন প্রভাত।

কিন্তু আজ? থেমে গেছে সব কাজ সব জ্বালা সব খেলা
তোমার ইঙ্গিতে। রাত্রি যেন রাত্রি নয় সূর্য্য ঝরে গোধূলির বুকে,
মন্দাকিনী মধুছন্দা, কর্ণে আসে তাহারই সঙ্গীত
পবনের রথ চলে শুনি শব্দ কাণ পেতে সুখে
এবার আমাকে ডাক, ডাক প্রভু, পাঠাও ইঙ্গিত।

বুঝি শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রিয় নরেনের আকুল কান্না। তাই বুঝি ডাক দিলেন মধুর কণ্ঠে—"আয়, আয়, চলে আয়......।"

একটি ঘণ্টার আকুল কান্নার পরিসমাপ্তি হোল। শুয়ে পড়লেন স্বামিজী মেঝের 'পর।

ডাকলেন ব্রহ্মচারীকে। বললেন ক্ষীণ কণ্ঠে—একটু বাতাস!

রাত ৯টা।

স্তব্ধ নিঝুম চতুর্দ্দিক। স্থির হয়ে গেছে এতক্ষণে গঙ্গার কলোচ্ছ্বাস। বাতাসে নেই আর নিস্বন। থেমে গেছে বনমর্ম্মর। স্তিমিত হয়ে গেছে তারারা।

একটু অস্ফুট কান্নার শব্দ শোনা গেল। দু'টি চোখ বেয়ে নেমে এলো দু' ফোটা জল। বুঝি এই শেষ কান্না। শেষ অশ্রু বিন্দু রেখে যাচ্ছেন তাঁর ধরিত্রী জননীর চরণ প্রান্তে।

নীরব রাত্রিটার কালি ঢালা অন্ধকারে যেন হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল। পর পর দুটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। চোখের তারা দু'টি স্থির হয়ে গেল স্বামিজীর। মস্তকটি হেলে পড়ল বালিশ থেকে।

একটা আত্ম বিদীর্ণ চীৎকার করে উঠল ব্রহ্মচারী—একি। একি! স্বামিজী। স্বামিজী!

কোন সাড়া এলো না।

বিমূঢ় ব্রহ্মচারী উন্মত্তের মতো ছুটে গেল সন্ন্যাসীদের কাছে।

ছুটে এলো সবাই ত্রস্ত পদসঞ্চারে—

ছুটে এলো শায়িত সন্ন্যাসীর শয্যা পার্শে। কিন্তু এতক্ষণে দেবলোকে পড়ে গেছে আনন্দের রোল। কেবল সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর চোখে নীরব অশ্রু।

ওরা এসে দাঁড়াল। কিন্তু নির্ব্বাক। স্তব্ধ। নিঝুম রাত্রির মতো তাঁরা মৌন। বক্ষে ধ্বনিত হোতে লাগল লাখো বজ্রের গর্জ্জন। আর প্রাণ পুলিনের তটে তটে উজান ব'য়ে গেল কান্নার সমুদ্রের। নির্গত হোতে লাগল

তাই নয়নে নয়নে। অপলক নেত্রপাতে প্রত্যক্ষ করতে লাগল তারা তাদের প্রিয় প্রভুর প্রেমঘন স্নিগ্ধ তনু। যেন যোগী মহাযোগে মগ্ন। রণ-শ্রান্ত সন্তান মাতৃ অঙ্কে চির শান্তির ঘুমে শায়িত।

"রাত্রি দিন ধুক্‌ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।"

হে পাঠকগণ, দু' ফোঁটা চোখের জলে স্বামিজীর স্মৃতি তর্পণ করে—

তোমরাও বল—

বল, লাখো কোটি কণ্ঠে—"নগ্ন মূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের সম্মুখে প্রণাম।"

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

—সমাপ্ত—